পরিচয়

পরিচয়

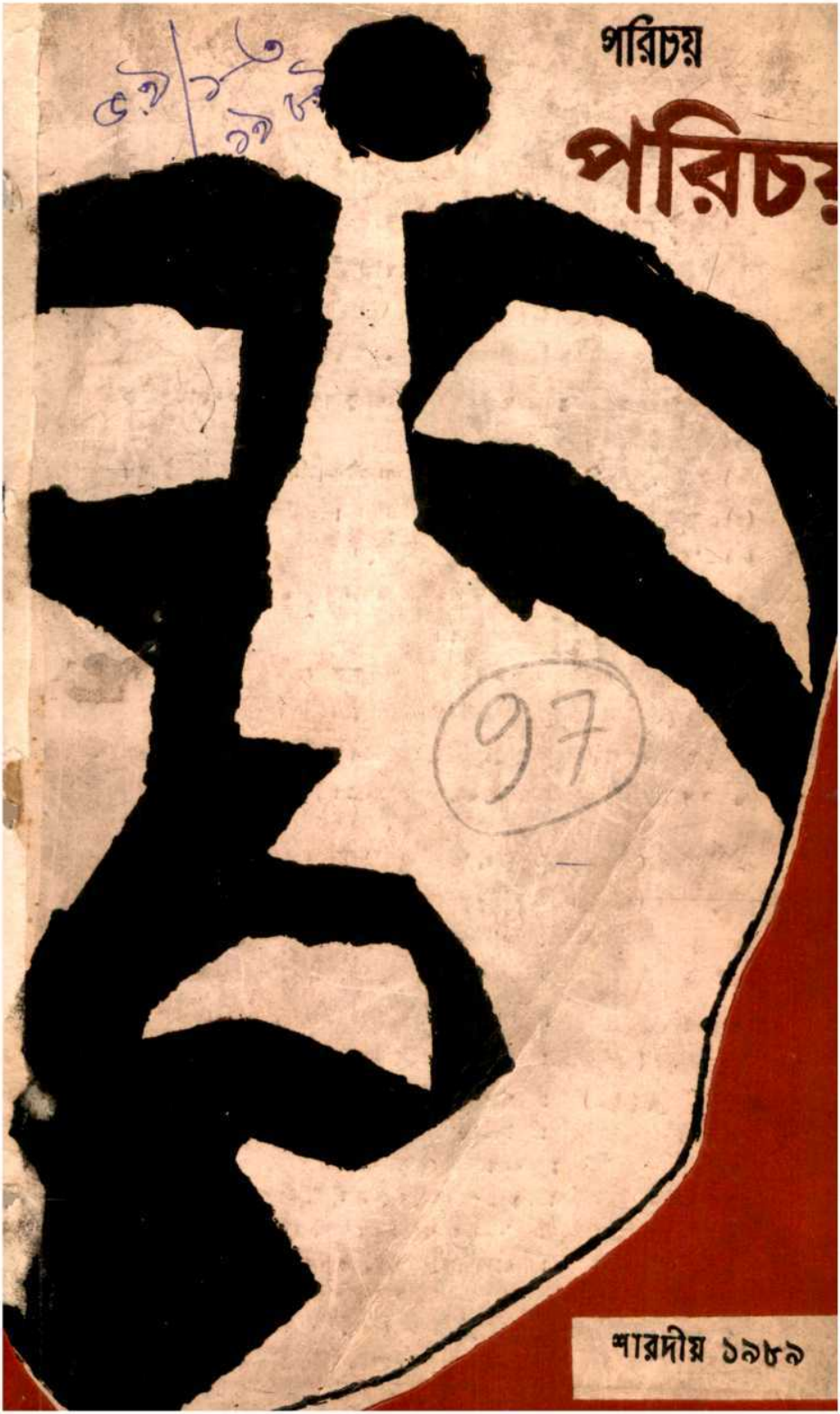

শারদীয় ১৯৮৯

বিভিন্ন কৃষি উপকরণ ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য একমাত্র
নির্ভরযোগ্য সরকারী প্রতিষ্ঠান।

ওয়েষ্ট বেঙ্গল এ্যাগ্রো ইণ্ডাষ্ট্রীজ কর্পোরেশন লিঃ

(একটি সরকারী সংস্থা)

২৩বি, নেতাজী সুভাষ রোড (৪র্থ তল)
কলিকাতা—৭০০০০১

চাষী ভাইদের জন্য নিম্নলিখিত উৎকৃষ্ট মানের কৃষি উপকরণ সরঞ্জাম সঠিক মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

(ক) এইচ, এম, টি, ইন্টার ন্যাশানাল। এসকটস। মিৎসুবিশি ট্রাকটরস্।

(খ) কুবোটা। মিৎসুবিশি পাওয়ার টিলারস্।

(গ) 'সুজলা' ৫ অশ্বশক্তি ডিজেল পাম্পসেট্।

(ঘ) বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি, গাছপালা প্রতিপালন সরঞ্জাম।

(ঙ) সার, বীজ ও কীটনাশক ঔষধ।

কর্পোরেশনের সরবরাহ করা কৃষি যন্ত্রপাতি অত্যন্ত উচ্চমানের তাছাড়া বিক্রয়ের পর মেরামতি ও দেখা শোনার দায়িত্ব নেওয়া হয়। যন্ত্রপাতির গুণগত মানের বা মেরামত করার বিষয়ে কোন অভিযোগ থাকলে জেলা অফিসে অথবা হেড অফিসে (ফোন নং ২০-২৩১৪।১৫) যোগাযোগ করুন।

জেলা অফিস ঃ

২৪ পরগণা (দক্ষিণ)	:	১৪, তারাতলা রোড, কলিকাতা-৮৮
" (উত্তর)	:	ডাক বাংলো মোড়, বারাসাত
হুগলী	:	সাহাপুর রোড, তারকেশ্বর, আরামবাগ, হুগলি
বর্ধমান	:	সদর ঘাট রোড, জি, টি, রোড, মেমারি, বর্ধমান
বাঁকুড়া	:	লালবাজার, বাঁকুড়া ষ্টেশন রোড, বিষ্ণুপুর
মেদিনীপুর (ওয়েষ্ট)	:	সুভাষ নগর, মেদিনীপুর
মেদিনীপুর (ইষ্ট)	:	পাঁশকুড়া রেলওয়ে ষ্টেশন, পোঃ পাঁশকুড়া
বীরভূম	:	সিউড়ি
মালদা	:	মনস্কামনা রোড, মালদা
মুর্শিদাবাদ	:	১৬, শহীদ সূর্য সেন স্ট্রীট, বহরমপুর
জলপাইগুড়ি	:	'সবারি' কাছারি রোড, জলপাইগুড়ি
দার্জিলিং	:	বাঘা যতীন পার্ক, শিলিগুড়ি। মাটিগাড়া
কুচবিহার	:	এন, এন, রোড, কোচবিহার। দিনহাটা
পুরুলিয়া	:	নীলকুঠী ডাঙ্গা রোড, পুরুলিয়া
নদিয়া	:	১।১ এম, এম, ঘোষ স্ট্রীট, কৃষ্ণনগর

বক্রেশ্বরে

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ আরোগ্যনিকেতন বক্রেশ্বরে। কলকাতা থেকে মাত্র ২২৯ কিলোমিটার দূরে সতীপীঠ বক্রেশ্বর। তন্ত্র সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসাবেও এখানকার ট্যুরিস্ট লজে উঠুন। পছন্দসই ঘর এবং খাবার পাবেন স্বল্প খরচে। ডর্মিটারীর ব্যবস্থাও আছে। এখান থেকে শান্তিনিকেতন, কেঁদুলি, তারাপীঠ, মশানজোড় এবং নানুর ঘুরে আসতে পারেন।

বুকিং-এর জন্যে যোগাযোগ করুন : রিজার্ভেশন কাউন্টার, পশ্চিমবঙ্গ ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন, ৩/২, বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট), কলকাতা ৭০০ ০০১ অথবা ম্যানেজার, বক্রেশ্বর ট্যুরিস্ট লজ।

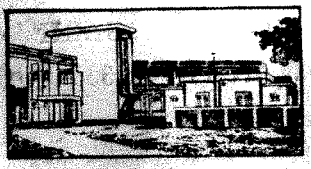

বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (ঈস্ট)
কলকাতা - ৭০০ ০০১
ফোন : ২৮-৮২৭১ গ্রাম : TRAVELTIPS;
পশ্চিমবঙ্গ পর্যটন

TCP/TB 414 FM/89

Man Is The Measure Of All Things

There is nothing higher than man. For it is man who builds—A Family—A Community—A Nation···

Our concern is community welfare. We believe in a happy worker—working at his best for higher Production. That's why—priority is given to the basic necessities for him like Housing, Water supply, Education, Health care, Banking and Social up-liftment.

Top priority to welfare jobs is our prime objective to expend workers' colonies, start new hospitals and dispensaries, arrange for portable water and set up recreational and educational centres.

In general, improvement of ecological and social balance is what we are promoting.

Afforestation, voluntary saving schemes, road building, co-operative movement and Banking facilities are few more from our long list. We are geared to have better standards of living for our men, for better performance of the company.

Eastern Coalfields Limited
(A subsidiary of Coal India Ltd)
SANCTORIA : P. O. DISHERGARH
DIST. BURDWAN, PIN 713333
(West Bengal)

Lalit Kala Akademi

Publications

Books

R. N Tagore Collection of Essays	Rs. 200 00
Painted World of Warlis : (Yashodhara Dalmia)	Rs, 200·00

Portfolios

Romance of the Cowherd God (6 Colour Plates)	Rs 50 00
J. P. Goenka Collection No. 32 (6 Colour Plates)	Rs. 50·00

Monographs

Y. K, Shukla (Hindi & English)	Rs. 20 00
K S. Kulkarni (Hindi & English)	Rs. 20·00
Ram Kumar (Hindi)	Rs. 8·00
R. S, Bisht	Rs. 20·00
Ramgopal Vijayavargiya	Rs 20 00

Colour Reproductions

Jamini Roy	Rs. 10·00
M D Tali	Rs 8 00
Jaya Appaswamy	Rs. 8 00

Journals

Lalit Kala (C) No 35	Rs. 35·00
Lalit Kala (A) No. 23	Rs. 95 00
Samkaleen Kala No. 7 & 8 (Hindi)	Rs. 35 00

Many other publications on art, Catalogues and a variety of multicolour reproductions

For trade enquiries please write to :—

The Secretary
Lalit Kala Akademi
Rabindra Bhawan
New Delhi-110 001

Sales Emporia
Bahawalpur House
Bhagwan Das Road
New Delhi-110 001
Tel No. 388507

Hindustan Cables Limited

(A Govt. of India Undertaking)

RUPNARAINPUR UNIT

P. O. Hindustan Cables, Dist. Burdwan,

PIN 713 335

Ever at the forefront of Technology

Proves it again by

PRODUCING OPTICAL FIBRE CABLES FOR THE FIRST TIME IN INDIA

The Glass fibre, thinner than human hair with enormous transmission capacity, revolutionising the World of Telecommunications.

H, C. L—Pioneers in the manufacturing of all types of Telecommunication Cables, accessories and microprocessor based testing equipment and supplying to Dot., Defence, Railways and other Public Sector Undertakings

Intensive R & D activity—an over-riding priority at H. C. L. contributing to continuous technological upgradation in products and quality

AT H. C. L., GROWTH THROUGH EXCELLENCE IS A COMMITMENT & WAY OF LIFE

Regd. & Corporate Office : 9, Elgin Road, Calcutta-700 020

Other Uuits : Hyderabad ALLAHABAD

Regional Offices . New Delhi Calcutta Madras

'পরিচয়'—এর পাঠকদের জন্য

'পরিচয়'-এর সম্পাদক ও লেখকদের বই দে'জ-এর উপহার

'পরিচয়'-এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ ৫০ ০০

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা ৩০.০০

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের
শ্রেষ্ঠ কবিতা ৩০ ০০

রাম বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা ৩০ ০০

শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতা ২০.০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর শ্রেষ্ঠ কবিতা ৩০ ০০

অমিতাভ দাশগুপ্তের
শ্রেষ্ঠ কবিতা ২০.০০

পূর্ণেন্দু পত্রীর

গত শতকের প্রেম ২৫.০০

আসুন বসুন ১৫ ০০

কবিতার ঘর ও বাহির ১০ ০০

সমর সেন

বাবু বৃত্তান্ত ২০.০০

অশ্রুকুমার সিকদার

বাক্যের সৃষ্টি : রবীন্দ্রনাথ ১২.০০

ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী

১ম ৭৫,০০ । ২য় ১০০,০০ ।
৩য় ১০০.০০

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের কালান্তর ৭০.০০

উত্তর প্রসঙ্গ ৩০.০০

আলো-আঁধারে সেতু :
রবীন্দ্র চিত্রকথা ২০ ০০

সমরেশ বসু

বি, টি, রোডের ধারে ১৬ ০০

দেবেশ রায়

তিস্তা পারের বৃত্তান্ত ১২৫.০০

মফস্বলী বৃত্তান্ত ৩০.০০

অমলেন্দু চক্রবর্তী

গৃহে গ্রহান্তরে ২০.০০

যাবজ্জীবন ৪০.০০

আকালের সন্ধানে ৫০ ০০

অবিরত চেনামুখ ২০ ০০

আফসার আমেদ

সানু আলির নিজের জমি ২৫.০০

আবুল বাশার

সঈদা বাঈ ২৫ ০০

চিঠি লিখলে বিস্তৃত পুস্তক তালিকা পাঠানো হয়।

দে'জ পাবলিশিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

সোভিয়েত দেশ প্রকাশনাগুলির গ্রাহক হোন ও পড়ুন

সোভিয়েত দেশ : প্রাণচঞ্চল ও কর্মমুখর সোভিয়েত জীবনের তথ্য-সমৃদ্ধ সোভিয়েত-ভারত মৈত্রীর সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ইংরাজী, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।

যুব সমীক্ষা : ভারতীয় যুব সমাজকে সোভিয়েত যুব সমাজের অনন্য সাধারণ জীবনযাত্রা ও কার্যকর্ম সম্পর্কে অবহিত করানোর সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ইংরাজী, বাংলা, হিন্দি ও তামিল ভাষায় প্রকাশিত হয়।

সোভিয়েত সমীক্ষা : বিশ্বের সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাবলীর এবং মার্কসবাদ-লেনিনবাদের তত্ত্ব ও তার বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে সমালোচনা-মূলক মাসিক পত্রিকা। ইংরাজী, বাংলা, ওড়িয়া ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত হয়।

সোভিয়েত দেশ, যুব সমীক্ষা ও সোভিয়েত সমীক্ষা-র জন্য যেসব গ্রাহকের চাঁদা ১৯৯০ সালের মার্চ-এর মধ্যে আমাদের দপ্তরে জমা পড়বে, তাঁরা ১৯৯০ সালের একটি সুন্দর বহুবর্ণ ক্যালেণ্ডার বিনামূল্যে উপহার হিসেবে রেজিস্ট্রি ডাক যোগে পাবেন।

নিম্নলিখিত ঠিকানায় সরাসরি যোগাযোগ করুন। শনি ও রবিবার বাদে যে কোন কাজের দিন (শুক্রবার ২টা পর্যন্ত) বেলা চারটের মধ্যে গ্রাহক হয়ে ক্যালেণ্ডার নিয়ে যান।

সোভিয়েত দেশ

১৮, প্রমথেশ বড়ুয়া সরণি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯
টেলিফোন নম্বর : ৭৫-৯৯২২ ৭৫-৯৯৭৩ ৭৫-৭৮৮৯

অস্তিবাদ : জঁ্যা পল সার্ত্রের

দর্শন ও সাহিত্য	মৃণালকান্তি ভদ্র	৪০'০০
ব্যাস-দর্শন	স্বামী বিদ্যারণ্য	৩০'০০
উপনিষৎ-প্রসঙ্গ (কঠোপনিষৎ)	শ্রীমৎ অনির্বাণ	৩৫ ০০
দর্শন-জিজ্ঞাসা	সুধীরকুমার নন্দী	৫০'০০
বিতর্কিতশ্রীকৃষ্ণকীর্তন	সত্যব্রত দে	৩৫'০০
Culture of Bengal through the Ages	Ed B Chatterji	140 00
Mathematical Theory of Plasticity	S, K, Chakraborty	100'00

THE UNIVERSITY OF BURDWAN

Rajbati Burdwan-713104

অধিক জমিতে সেচের ব্যবস্থা করে আপদার ফসল বাড়ান

নিম্নোক্ত মুখ্য লক্ষ্যগুলি হাতে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম ১৯৭৪ সাল থেকে তার যাত্রা শুধু করেছে :

(১) গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প নির্মাণ, সংস্থাপন, নির্বাহ এবং তা যথাযথভাবে কার্যকরী ও পরিচালনের ব্যবস্থা করা।

(২) গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সংস্থাপন করা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ক্ষুদ্র সেচ নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)

৫, মুস্তাক আহমেদ স্ট্রীট (পূর্বতন মার্কুইস স্ট্রীট)

কলিকাতা—৭০০ ০১৬

ফোন : ২৪-৫৮০৬, ২৪-০০৮১, ২৪-৬২০৬

কলকাতার বাইরে যেতে দূরপাল্লার বাসে

রেডারার মত পশ্চিমবঙ্গে কত জায়গাই তো আছে। রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা দূরপাল্লা বাস-সার্ভিসের মধ্য দিয়ে নিম্নলিখিত দ্রষ্টব্য স্থানগুলিতে নিয়মিত যাতায়াতের ব্যবস্থা রেখেছে অল্প সময়ে ও কম খরচে।

দীঘা, বিষ্ণুপুর, শান্তিনিকেতন, সিউড়ী, রাঁচি, কেওনঝড়, জয়রামবাটী, কামারপুকুর, মুকুটমণিপুর, বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, পলাশী, বহরমপুর, ফরাক্কা, চিত্তরঞ্জন, পুরুলিয়া, হলদিয়া, ডায়মণ্ডহারবার, ঝাড়গ্রাম, নামখানা, কাকদ্বীপ, মুর্শিদাবাদ, বারদীঘি, বাসন্তী, রামপুরহাট, জামশেদপুর, হাজারদুয়ারী, কৃষ্ণনগর, নবদ্বীপ, বেথুয়াডহরী, শান্তিপুর।

এসব জায়গায় এবং আরও অন্যান্য জায়গায় আমাদের নিয়মিত দূরপাল্লার সার্ভিস চালু আছে।

টিকিট প্রাপ্তিস্থান :—
দূরপাল্লার বাস স্টেশন
এসপ্লানেড—ফোন নং : ২৮-১৯১৬
উল্টোডাঙ্গা—ফোন নং : ৩৫-৪৭৬৬
দীঘা বুকিং অফিস।

কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা,
৪৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০১৬।

নাগরিক পরিষেবায়

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন

নাগরিকদের প্রতি আবেদন

* নির্দিষ্ট তারিখে ট্যাক্স জমা দিয়ে রিবেটের সুযোগ গ্রহণ করুন।
* বাৎসরিক ট্রেড লাইসেন্স ফী বছরের প্রথমেই জমা দিন।
* পানীয় জল অযথা অপচয় করবেন না বা হতেও দেবেন না।
* বাড়ীর আবর্জনা সকালেই রাস্তার নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলুন।
* পৌরসভার বিনা অনুমতিতে বাড়ী তৈয়ারি করিবেন না বা জলের লাইন নেবেন না।
* কোন রকম বেআইনী কাজ দেখলে পৌরসভাকে জানান।
* পৌর কাজ সম্পর্কে কোনরূপ অভিযোগ থাকলে সাফাই-এর জন্য এলাকার 'সেক্টর' অফিসে এবং জল, রাস্তা ও মেরামতি সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য এলাকার 'বরো' অফিসে জানান।
* অন্যান্য অভিযোগের জন্য কেন্দ্রীয় দপ্তরে জন সংযোগ বিভাগে জানান।
* নাগরিক পরিষেবায় আমাদের সাহায্য করুন।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল করপোরেশন

আধুনিক ফ্যাশন বলতেই

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

আকর্ষণীয় রূপ মসৃণ বুনন, উজ্জ্বল রং, সঠিক পরিমাণ আর

সবার উপর নতুন-নতুন চটকদার ডিজাইন ও ন্যায্যদাম

শাড়ী (সিল্ক, সুতি, ছাপা) ধুতি, বিছানার

ঢাকা এবং চাদর (সুতি ও ছাপা) এবং গৃহসজ্জার

সামগ্রী

বিশেষ আকর্ষণ

পলিয়েস্টার শাড়ী-সার্টিং-স্যুটিং-সালোয়ার কামিজ ইত্যাদি

জনতা শাড়ী (সুতি ছাপা), ধুতি, লুঙি

জনতা

বিপণিতে পাওয়া যায়

দি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স

কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

৪৫, বিপ্লবী অনুকূল চন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭২

With

best

wishes

from :—

GOUR CHANDRA ROY

CIVIL CONTRACTOR &
GENERAL ORDER SUPPLIERS

ASANSOL VILLAGE
ASANSOL-713301

R. S. ENGINEERING WORKS

Minning & Mechanical Engineer

Manufacturer of

Screw type, Props, Haulage Rope Cabbles, Coal Tubs, Cosl Tub Wheel Axle, D-Link, Worm Wheel, Worm Shaft, Spares for Powered Support Face.

Repairer of .

Industrial Engines, Truck & Buses Body, Repairing & Any Tube of Fablication Jobs.

RAMBANDHU TALAW, G. T. ROAD
ASANSOL,-713303

With best compliments from :

H. G. Trading & Engineering Co.

Industrial Engineers

Manufacturers :

Govt. Contractors, General Order Suppliers

Works : 129/3, Modhusudan Paul Chowdhury Lane
Howrah-1

City Office : 40/1, Strand Road, Calcutta-700001
Phone : 25-1795

With Happy "PUJA" Greetings from :—

Cycle Corporation of India Ltd.

(Govt. of India Undertaking)

Registered office

1, Middleton Street, Calcutta-700071

Factories :

1) Asansol Works · (Rabish Division) P.O.—Kanyapur
Asansol (Dt.—Bardhaman)

2) Kalyani Works · (Component Division)
P O.—Kalyani (Dt. Nadia)

Manufacturers of the MOST TRUSTED Brands of Bicycles and Accessories winning
"EUROPEAN GOLD STAR" Award for World Class Quality :—

BICYCLES ·

RALEIGH · : RUDGE : : HUMBER ARJUN (SPORTS)

Accessories :

WITTKOP : : UNION · · STURMEY-ARCHER CCIL

For the Ultimate Joy of Riding & Economy

With best Compliments from :

Nava Bharat Enterpries Limited

Nilhat House Annexe

11, R. N. Mukherjee Road

Calcutta-700001

Rsgd. office .

NABA BHARAT HOUSE

6-3-654 Somajiguda

Hyderabad-500004

Other branches

Bombay * Cochin * Delhi

Madras * Guntur

BURN STANDARD CO. LTD

(A Government of India Undertaking)

A SUBSIDIERY OF BBUNL

BURNPUR WORKS, BURNPUR

DIST BURDWAN, WEST BENGAL

India's Leading Manufacturer of Railway Rolling Stock, Springs, Forgings & Fabricators of Minning Equipments & Ropeways.

Implicitly trusted for quality and reliability our sights are trained on "Turn-Key" project.

Gram	:	"WAGON" Burnpur
Telex No.		0204-210
Answer Back Code		Standard-Al-210
Telephone No.	·	88-521 to 528

Head Office & Registered Office

10/C, Hungerford Street, Calcutta-700-017

Branch Office

1) Burn Standard Co. Ltd.,
(A Govt. of India Undertaking)
A Subsidiary of BBUNL
104, Akash Deep,
26-A, Barakhamba Road,
NEW DELHI

2) Burn Standard Co Ltd ,
(A Govt. of India Undertaking)
A Subsidiary of BBUNL
Esplanade House (3rd floor)
Hazarimal Somani Marg,
Fort. Bombay-400 001.

AKADEMI's Histories of Literature Series

History of Assamese Literature by Birinchi Kumar Barua	Rs. 12·00
History of Bengali Literature by Sukumar Sen	Rs. 15·00
History of Dogri Literature by Shivanath	Rs. 12 00
History of Gujarati Literature by Manukhlal Jhavari	Rs 25 00
History of Indian-English Literature by M. K. Naik	Rs 60 00
History of Marathi Literature by Kusumwati Deshpande and M. V. Rajadhyaksha	Rs. 40 00
History of Rajasthani Literature by Hiralal Maheshwari	Rs 25 00
History of Tamil Literature by M Varadarajan	Rs. 60·00

SAHITYA AKADEMI

Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-1

Rabindra Sarobar Stadium, Block VB, Calcutta-29 (46-1399)

আমরা চাই

শুধু নালা নর্দমা, রাস্তা ঘাট বাজার তৈরী বা সংস্কারই নয়, সামগ্রিক নগরজীবনের সুস্থতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সম্প্রীতিরক্ষা এবং সাংস্কৃতিক বিকাশ খেলাধূলার প্রসারও আমাদের লক্ষ্য, কাম্য।

আসুন, এই লক্ষ্যে আমরা ঐক্যবদ্ধ হই।

গৌতম রায়চৌধুরী
পৌরপ্রধান
আসানসোল পৌরসভা

যেখানে সম্ভব গাছ লাগান

অবশ্যই পান করুন মবনাই চা বাগানে
প্রস্তুত স্বাস্থ্যকর সুস্বাদু
সি টি সি ও অর্থডক্স চা

লিখুন

ভুটান ডুয়ার্স টি অ্যাসোসিয়েশন লিঃ
এজেন্টস : মবনাই টি এস্টেট
নীলহাট হাউস (৬ষ্ঠতল)
১১, রাজেন্দ্রনাথ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-১
ফোন : ২৩-৮৫৮২ ও ২৩-১৫৪১

আসানসোল মাইনস্ বোর্ড অফ্ হেলথ্

(১৯১৫ সালে প্রতিষ্ঠিত)

বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়া খনি অঞ্চলের ৫৬৮ বর্গকিলোমিটার বসতির ৬০০ গ্রামের বর্তমান ১৫ লক্ষ অধিবাসীকে নিম্নোক্ত ভাবে সেবা করে আসছে ঃ

১। সংক্রামক রোগ ও মহামারী নিবারনের ব্যবস্থা করে।

২। কুষ্ঠ রোগীদের চিকিৎসা করে।

৩। ১৯৫৪ সালের ভেজাল নিরোধ আইনের বলে খাদ্যদ্রব্যের নিয়মিত পরিদর্শন ও পরীক্ষা করে।

৪। মাতৃমঙ্গল, শিশুকল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনার বিষয়ে যথোচিত উপদেশ ও ঔষধপত্রাদির ব্যবস্থা করে।

৫। রাসায়নিক ও জীবানু-সম্পর্কিত পানীয় জলের বিশ্লেষণ ব্যবস্থা করে।

৬। স্বল্প ব্যায়ে মানুষের রক্ত, কফ, পায়খানা, প্রস্রাব ইত্যাদির পরীক্ষা করে।

৭। বিভিন্ন শিল্প ও কারখানা হতে নির্গত পদার্থের (Effluent) পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ব্যবস্থা করে।

৮। জনস্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় শিক্ষার প্রচার করে।

৯। মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রে ডিপথিরিয়া, ধনুষ্টঙ্কার ও হুপিং কাফ্ রোগের প্রতিরোধক টীকা দেওয়ার ব্যবস্থা করে।

১০। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ও যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

বার্নপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি, বার্নপুর

"মধুবাতা ঋতায়তে
মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ"—

শারদোৎসবের দিনগুলি মধুময় হোক
বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্নিগ্ধ ছায়ায়।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়
সহ সভাপতি
বার্নপুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

দি শিবপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ
১৭৩ ও ১৭৪, শিবপুর রোড
শিবপুর, হাওড়া—২
ফোন : ৬০-২৪৫৮

তিনশ বছরের কলকাতাকে

জাতীয় নগরী হিসেবে স্বীকৃতিদান
ও

কলকাতার
সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে
কেন্দ্রের কাছ থেকে
১৮২৭ কোটি টাকার
দাবী আদায়ে
আপনার সহযোগিতা চাই।

CALCUTTA MUNICIPAL CORPORATION
The People at your Service.

চিরন্তন ঐতিহ্য

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প

দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধের মিলনের অপর নাম
বাংলার হস্তশিল্প। নিপুন কারিগরের
হাতের ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন রুচিসম্মত
শিল্পবস্তু। রয়েছে মনের মত নানান্
নকশায় তাঁতের শাড়ি, পুরুষ এবং
মহিলাদের পোশাকের কাপড়, বেডকভার,
বেডশীট, পর্দার কাপড়, চামড়া ও কাপড়ের
ব্যাগ এবং ঘর সাজানোর জন্য অনেক উপকরণ।

প্রতিবছরের মত এবারও পূজার কেনাকাটার
তালিকায় বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীকে
শীর্ষে রাখুন।

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্পঃ শিল্পীর গৌরব
ক্রেতার রুচির পরিচয়॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪০৭৩।৮৯

রঞ্জন ধর-এর উপন্যাস

সেই দিনগুলি ১২৲

কালান্তর ঃ এই উপন্যাসের পটভূমি ভারতের কমিউনিষ্ট আন্দোলন। এই আন্দোলনের বিভক্তি, সমস্যা, দ্বিধা, সংশয়, জিজ্ঞাসা, কিভাবে এক কালের নিখাদ বন্ধুত্বে, প্রেমে, সম্পর্কে চিড ধরাল—তারই কাহিনী। কোথাও কোন তত্ত্বগত কচকচি নেই কাহিনী গতিশীল, স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক। প্রত্যেকেরই উপন্যাসটি পড়তে ভাল লাগবে।

দেশ ঃ বেশ মুন্সীয়ানার সঙ্গে গল্প বলা হয়েছে। গল্পের বিষয় এক বামপন্থী দম্পতির সম্পর্ক। কম্যুনিষ্ট পার্টি বিভক্ত হবার পর তাদের মনে দেখা দেয় ভাবনা সংঘাতের টানাপোড়েন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের নিজের বিশ্বাস অনুযায়ী গ্রহণ করতে হয় পরস্পরের বিপরীত অবস্থান ।

সদ্য প্রকাশিত

মনস্বিতা ২০৲

বৃহৎ উপন্যাস। ঔপন্যাসিক তাঁর নিবিড় অনুসন্ধান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কোন এক সরকারী অফিসের পটভূমিকায় দীপার মত এক আশ্চর্য নারী চরিত্র এবং উন্মোচিত করেছেন আরো অনেক পুরুষ ও নারী কর্মীর অন্তর্লোকের রহস্য, যা বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্যের ধারায় নিঃসন্দেহে নতুন সংযোজন।

ভি-পি যোগে বই পাঠানো হয়। ভি-পি চার্জ ক্রেতার।

ঃ প্রাইমা পাবলিকেশনস ঃ

৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

পরিচয়

৫৯ বর্ষ ১-৩ সংখ্যা আগস্ট-অক্টোবর ১৯৮৯ ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৬

প্রবন্ধ

পটভূমি চীন : সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র বাসব সরকার ১
প্রসঙ্গ : কথাশিল্পী ননী ভৌমিক ধনঞ্জয় দাশ ২৬
ভোর আকাশের তারা চন্দন সেন ৩৮
পেরেস্ত্রোইকার পূর্বাপর অনিশ্চয় চক্রবর্তী ৪৩
রুশ দেশের লোককথা প্রসঙ্গে সুধীর করণ ১১৯
আমার চোখে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৪

বিশেষ রচনা

শিক্ষা-অশিক্ষা সুধীর চক্রবর্তী ৮

গল্প

কাঁচা মাংস কার্তিক লাহিড়ী ৫০ র‍্যাংক নম্বর-২১ সাধন চট্টোপাধ্যায় ৬৪ হাল মাহিন্দার অশোককুমার সেনগুপ্ত ৭৪ টোপ চণ্ডী মণ্ডল ৮২ হলফনামা ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ৯৬ ঈশ্বরের খোঁজে চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ১০৭ মাডাইকল সৈকত রক্ষিত ১২৯ বাদশা ও বসুমতী অমর মিত্র ১৫১ মামা-ভাগ্নের গপ্পো চিত্তরঞ্জন ঘোষ ১৮৮ চুহার-৪০ দৌড় জ্যোৎস্নাময় ঘোষ ১৯৭ ন্যাংটো সুধাংশু ঘোষ ২১২ গট আপ কিন্নর রায় ২২১ স্বপ্নের কাছে আফসার আমেদ ২৪৬ পৌষ-পরবের কুশীলব ভগীরথ মিশ্র ২৬০ পদ্মপুরাণ রাধাপ্রসাদ ঘোষাল ২৭৪ প্রত্যয় রঞ্জন ধর ৩০১

কাব্যনাট্য

ফ্ল্যাগ স্টেশন রাম বসু ১৭২

দীর্ঘ কবিতা

পূর্ণেন্দু পত্রী সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত ১৮০-১৮৭

কবিতাগুচ্ছ—১

অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায় মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত কৃষ্ণ ধর সিদ্ধেশ্বর সেন চিত্ত ঘোষ তরুণ সান্যাল সুনীলকুমার নন্দী জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত শিবশম্ভু পাল অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় মানস রায়চৌধুরী দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রণজিৎ সিংহ অতীন্দ্র মজুমদার অমিতাভ দাশগুপ্ত ২৮৫-৩০০

কবিতাগুচ্ছ—২

মণিভূষণ ভট্টাচার্য পবিত্র মুখোপাধ্যায় রত্নেশ্বর হাজরা গৌরাঙ্গ ভৌমিক দেবারতি মিত্র তুলসী মুখোপাধ্যায় গোবিন্দ ভট্টাচার্য ভাস্কর চক্রবর্তী সামসুল হক বাসুদেব দেব নন্দদুলাল আচার্য রবীন সুর যশোদাজীবন ভট্টাচার্য কালীকৃষ্ণ গুহ বিজয়া মুখোপাধ্যায় শুভ বসু অমিতাভ গুপ্ত প্রণব চট্টোপাধ্যায় নবারুণ ভট্টাচার্য সব্যসাচী দেব সুরজিৎ ঘোষ কৃষ্ণা বসু ব্রত চক্রবর্তী প্রদীপ পাল বাণী চট্টোপাধ্যায় দীপেন রায় স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মল হালদার সুবোধ সরকার অশোক চট্টোপাধ্যায় অজিতকুমার মুখোপাধ্যায় সত্য গুহ অমরেশ বিশ্বাস কমল চক্রবর্তী ৩০৯-৩২৯

প্রচ্ছদ

প্রকাশ কর্মকার

P, 5416

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর তাড়ুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

পটভূমি চীন ঃ সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র

বাসব সরকার

চীনের গত মে ও জুন মাসের ঘটনাবলী, সোভিয়েতে গ্লাসনোস্ত পর্বে অনুষ্ঠিতে সাম্প্রতিক নির্বাচন ও নতুন সোভিয়েত পার্লামেন্টের অধিবেশন, এবং পোল্যাণ্ডে সাম্প্রতিক নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির পরাজয় এবং লিচ্ ভালেসার সংগঠন সলিডারিটির সাফল্য এবং সরকার গঠনের অধিকার লাভ সমাজ-তান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কয়েকটি মৌল প্রশ্ন তোলার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯৫৬ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতি কংগ্রেসে নিঃস্তালিনীকরণের সূচনা পর্বে ব্যক্তি পূজার বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ, সত্তরের দশকে চীনে মাওয়ের বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ এবং ১৯৮৫ সাল থেকে গর্বাচেভের 'পেরেসত্রৈকা ও গ্লাসনোস্ত' মার্কসবাদী মানুষদের ধ্যানধারণাকে যথেষ্ট ঘাতসহ করেছে বলেই, গত ছয় মাসের ঘটনাবলী ততোটা বিমূঢ় অবস্থা সৃষ্টি করতে পারেনি। পটভূমি কিছুটা ভিন্ন হলে মার্কসবাদী মহলে তোলপাড় ঘটে যেত, তবু খানিকট সংযত ও সীমিত আকারে হলেও আলোড়ন যে ঘটেনি তেমন নয়। বর্তমান নিবন্ধে যে সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন তোলাই হলো মূল লক্ষ্য।

এই তিন দেশে বিগত ছয় মাসে রাজনৈতিক জীবনে যে উথাল পাথাল চলেছে, তার গোড়ায় কেবল এই ধারণারই নানা রকমফের কাজ করেছে, বর্তমান সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যথেষ্ট গণতান্ত্রিক নয়। সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সে কথা স্বীকারও করেছেন। গর্বাচেভ গ্লাসনোস্ত

আন্দোলনের সূচনা থেকেই বলে আসছেন, সেদেশে এ যাবৎ যা ছিল এবং যার সপক্ষে বহু কথা বলা হয়েছে, বহু তত্ত্ব রচিত ও বহু তথ্য প্রচারিত হয়েছে, সেটা আসলে গণতন্ত্র নয়, গণতন্ত্রের বিকৃতি মাত্র। সুতরাং অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যথেষ্ট পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক কাঠামোয় ব্যাপক সংস্কার করে সোভিয়েতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পোল্যাণ্ডে সলিডারিটি সংস্থাকে নানাভাবে ধিক্কৃত করার পর এমন কি বেশ কিছুকাল নিষিদ্ধ রাখার পর বর্তমানে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, তার নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির বিকল্প একটি শাসন-ব্যবস্থা গড়ে উঠতে ও কাজ করতে পারে। সমাজতন্ত্রের মৌল নীতি ও আদর্শ-বিরোধী একটি সংগঠন নির্বাচনে বিপুল ভোটে জিতে সরকার গঠন করতে পারে, এজাতীয় ধারণা কোন মার্কসবাদী মহলে আদৌ প্রচারিত হয়েছিল কিনা বলা যায় না। সলিডারিটির সাফল্য প্রমাণ করেছে মার্কসীয় চিন্তার মৌলিকত্ব কিম্বা প্রয়োগগত তাৎপর্য ও প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্তে অনেক কথারই পুনর্বিবেচনা দরকার।

গত এপ্রিলের মাঝামাঝি থেকে জুনের ৪ তারিখ পর্যন্ত চীনে যা ঘটেছে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার দীর্ঘ ৭২ বছরের ইতিহাসে তা নজীরবিহীন। বেইজিঙে তিয়েনামেন স্কোয়ারে এতো মানুষ সামিল হলো ধর্মঘট করলো, অবস্থান করতে লাগলো, সবই অহিংস কায়দায় এবং "গণতন্ত্রের দাবীতে"। বলা যায় সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় বিগত পাঁচ বছরে "গণতন্ত্র" বস্তুটি সবচেয়ে মহার্ঘ হয়ে উঠেছে। পরিস্থিতি এমনই চূড়ান্ত পর্যায়ের এবং এতোই জটিল যে, এই সব দেশে বহু মানুষ, সময় বিশেষে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষও মনে করে সমাজতন্ত্রের বদলে গণতন্ত্র দরকার। অন্যভাবে বলা যায় এই সব দেশগুলিতে সমাজতন্ত্রের নামে যা চালানো হয়েছে, গণতন্ত্রের সঙ্গে তার সামান্য কোনো যোগ নেই। সুতরাং সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের মধ্যে মিশ খাবে না, তেল ও জলের মতো তারা আলাদা থাকবে এবং চলতি রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে তারই একটা নকশা বানিয়ে ফেলতে হবে, যাতে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ত্বরান্বিত হতে পারে। চীন, সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডে অবস্থা এই প্রেক্ষিতে মোটামুটি একই রকমের। সুতরাং মৌলিক কিছু পার্থক্য আবিষ্কারের সম্ভাবনা নেই। সেক্ষেত্রে আরো নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সমাজতন্ত্রের একনিষ্ঠ সমর্থকদের, অধিকাংশ সময়ই যার সহজ উত্তর জানা নেই।

প্রথমতঃ সমাজতন্ত্রীদের এতকালের একটি দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে সমাজ-তান্ত্রিক গণতন্ত্র হলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা। সুতরাং সমাজতন্ত্র কায়েম হলে গণতন্ত্রের অগ্রগতি যে অবাধ হবে, সে বিষয়ে সংশয়ের

কোন কারণ ছিল না। গর্বাচেভ সেই ধারনায় প্রথম আঘাত করলেন। পোল্যাণ্ডে সলিডারিটির যে আন্দোলন সম্পর্কে নানা কটু মন্তব্য চলছিল তাতে কিছুটা থমথমে ভাব দেখা দিল। আর সব শেষে চীনের ঘটনা জানিয়ে দিল যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও গণতন্ত্র থাকবে, এটা আদৌ কোন স্বতঃসিদ্ধ নয়।

চীনে হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ যে ভাবে ছাত্র ও যুবদের গণতন্ত্রের দাবীকে সমর্থন জানিয়েছে, তার থেকে প্রমাণ হয় সূচনা-পর্বে অন্ততঃ গণতন্ত্র-দাবীর গণভিত্তি ছিল। এটা খুবই সম্ভব পরবর্তীকালে নানা মতলববাজ তাকে সুকৌশলে ভিন্ন কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজে লাগিয়েছে। তারা প্রতিক্রিয়াশীল, বিদেশের চর ইত্যাদি সব কিছু হতে পারে, কিন্তু তার দ্বারা এটা প্রমাণ হয় না যে চীনের ছাত্র ও যুব জনতা প্রতিক্রিয়াশীলদের আদেশ, নির্দেশ ও পরিচালনায় আন্দোলনের পথে গিয়েছিল। কিম্বা সমস্ত আন্দোলনটাই একটা সাজানো ব্যাপার, যার উদ্দেশ্য ছিল চীনের রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিতে আঘাত ও তাকে দুর্বল করা। বলা বাহুল্য এগুলি হলো এক ধরণের গোঁড়ামি যা সমাজতন্ত্রের ব্যবহারিক রূপের অন্তর্নিহিত সমস্যা অস্বীকার করতে চায় কিম্বা তার মোকাবিলা করার সাহস রাখে না।

দ্বিতীয়তঃ এই সব দেশের সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র নামে যা বলা হয়েছে সেগুলি হয় সংবিধানের নিছক অলংকরণ নয়তো সেগুলি কার্যকর করার গরজ কেউ দেখান নি। যদি প্রথম কথাটি সত্য হয়, অর্থাৎ সমাজতন্ত্রকে পরিপাটি সাজিয়ে হাজির করার কোন তাগিদ থেকে থাকে, তাহলে প্রশ্ন উঠবে কেন এবং কাদের জন্য এই তাগিদ অনুভূত হয়েছিল। দেশের মানুষের মনে গণতন্ত্র সম্পর্কে যে আকাঙ্ক্ষা ছিল তাকে কোন মতে খুশি করার জন্যই কি এই ব্যবস্থা, নাকি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বুর্জোয়া সমালোচকদের জবাব হিসাবে বোঝানো হয়েছিল, সমাজতন্ত্র একটা শোষণহীন সমাজ কায়েম করে বলেই গণশাসনের বস্তুভিত্তি হয়েছে এবং সচেতন মানুষ তাকে কাজে লাগাবে। এই তিন দেশের ঘটনা প্রমাণ করেছে যে, সমাজ শোষণহীন হলেই স্বশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার জন্য দাবী ও আন্দোলন করতে হয়। গর্বাচেভ নিজেই সেই প্রক্রিয়ার উৎসমুখ খুলে দিয়ে সোভিয়েতে বড়ো রকমের সামাজিক সংকটের দায় এড়াতে সক্ষম হয়েছেন। চীনে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার-প্রক্রিয়া চালু করে রাজনীতির ক্ষেত্রে সংস্কারবিমুখতার জন্যই এতো বড়ো মাশুল দিতে হল। আর পোল্যাণ্ডে গণতন্ত্রের প্রবক্তারা কমিউনিস্ট নেতৃত্বের অসংখ্য ভুল-ভ্রান্তির সুযোগে যথেষ্ট গণভিত্তি অর্জন করেছিল বলেই কোন

রক্তপাত না ঘটিয়ে একটা বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে গেল। পোলিশ নেতৃত্বের ভুল ভ্রান্তির অবশ্যই তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেওয়ার কারণ নির্দেশ করা হবে, কিন্তু তাতে এটা প্রমাণ করা যাবে না যে, পোল্যাণ্ডের মানুষ এই পরিবর্তন চায় নি। অথচ সেটা কোন ধরণের পরিবর্তন ভাবতেও অস্বস্তি লাগে যখন দেখা যায় মার্কিন রাষ্ট্রপতি বুশের পোল্যাণ্ড সফর কালে খোলা গাড়ীতে তিনি ও সহাস্য সলিডারিটি নেতা লিচ্ ভালেসা দুজনেই হর্ষমুখর জনতার দিকে দু'হাত তুলে 'ভি' চিহ্ন দেখাচ্ছেন।

তৃতীয়তঃ সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের অবমূল্যায়ণ সম্ভবতঃ ঘটেছে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির মাত্রাগত দুর্বলতার জন্য। চীন, সোভিয়েত, পোল্যাণ্ডে সর্বত্রই শোনা গেছে এই নীতির প্রয়োগ পদ্ধতিতে শুধুই মাত্রাহীন কেন্দ্রিকতা প্রকাশ পেয়েছে, গণতন্ত্র নয়। বিষয়টি কিছুটা খতিয়ে দেখা দরকার।

লেনিন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের কাজে এই নীতিকে স্তম্ভস্বরূপ মনে করেছিলেন। বিপ্লব সংগঠিত করতে এবং বিপ্লবোত্তর ভাঙাগড়ার কাজে এই নীতির প্রাসঙ্গিকতা যে ছিল লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ব্যবস্থাকে স্থায়িত্বদানে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্বে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সোভিয়েতে অর্থনীতির পুনর্গঠনে, চীনে বিপ্লবের সাফল্য সুসংহত করতে, পোল্যাণ্ডে ন্যাটো যুদ্ধজোটের চাপ প্রতিহত করে সমাজতন্ত্রের সংরক্ষণে তার প্রমাণ পাওয়া গিছে। কিন্তু বিপ্লবের কয়েক দশক পরে, সমাজতন্ত্রের ভিৎ শক্তপোক্ত হওয়ার পরেও গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতি বিপ্লব সমকালীন ঐতিহ্য অনুসারী হয়ে থাকলে তার কালনৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা বাড়ে। তখন গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা হয়ে পড়তে পারে নেতৃত্বের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার হাতিয়ার, কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন বিরোধিতার সহজতম উপায়।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে কাঠামোয় বিধৃত সেই সংবিধান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদলানোর কথাও ভাবা হয়। সোভিয়েতে ১৯৩৬ সালের স্তালিন সংবিধান (যা বুখারিনের রচনা বলে শোনা গেছে) ১৯৭৭ সালে বদলানো হয়েছে, চীনেও সংবিধান ১৯৪৯ সালের পর ১৯৭৮ ও ১৯৮২ সালে বদলেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, পরিস্থিতির এই সব পরিবর্তন মেনেও পার্টি সংগঠন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে এই নীতির কোন পরিবর্তন ঘটানো হয়নি। এটা যদি নিছক লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু

তবুও প্রশ্ন থেকে যায় সোভিয়েতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে স্বয়ং লেনিন যখন বিপ্লবকে সুসংহত করার জন্য NEP পর্বে, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের পথ গ্রহণে দ্বিধা করেন নি, তখন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পার্টি ও দেশ পরিচালনার জন্য এই নীতি আঁকড়ে থাকার বিশেষ কারণ কি হতে পারে? সমাজের ডায়ালেকটিকাল কিশোর পটভূমিতে এই নীতি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা কি খুবই অনুচিত কাজ হতো?

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পার্টির একচেটিয়া ক্ষমতার বাতাবরণে যে পার্টি আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে, সোভিয়েত ও চীনের নেতারা তো সেকথা স্বীকার করেছেন। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে পার্টি আমলাতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে এইসব দেশে বহু তাত্ত্বিক আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়েছে। আমলাতান্ত্রিকতা বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থই হলো গণতন্ত্রের নির্বাসন। সুতরাং আজ যখন সমাজতন্ত্রে গণতন্ত্রের দাবী নতুন করে ওঠে তখন মনে করা যায় ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনে মাত্রা ছাড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে তার ছায়া পড়েছে। তাই এই প্রতিবাদী মনোভাব ও আন্দোলন।

মার্কস থেকে লেনিন পর্যন্ত সবাই বলেছেন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই হল মানুষের জীবনে প্রকৃত গণতন্ত্র কায়েম করার দিকে প্রথম সার্থক পদক্ষেপ। সেই সমাজতন্ত্র যতো দৃঢ়মূল হবে গণতন্ত্রের পরিমাণ ততোই বাড়বে, এটাই তো প্রত্যাশিত। কিন্তু বাস্তবে ফল হয়েছে উল্টো। গণতন্ত্রের পরিমাপ বাড়েনি বরং কমে গেছে। বেইজিঙে গণবিক্ষোভে, সোভিয়েত ও পোল্যাণ্ডের নির্বাচনে এবং পরবর্তী পরিস্থিতিতে সেটাই প্রকাশ পেয়েছে।

অতিপরিচিত কথা পুনরুক্তির দায়ে অভিযুক্ত হওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বলা দরকার, সময় বিশেষে মানুষ স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হলেও, দীর্ঘস্থায়ী ভিত্তিতে পরিচালিত হতে চায় না। সেটা মনুষ্যত্বের অপমান বলেই মনে করে। সব মানুষ নিশ্চয়ই সমাজের পরিচালক হতে চায় না। কিন্তু কোন মানুষই চিরকাল পরিচালিত হতেও চায় না। কিছুটা ভুল বোঝার ঝুঁকি নিয়েও বলা যায়, মানুষ স্বেচ্ছায় ভুল করার ক্ষমতা ও অধিকার পেতে চায় এই বিশ্বাস থেকে যে সে সামাজিক প্রাণী বলে সামাজিকতার নিরিখে নিজের ভুল শুধরে নিতে পারবে। অন্যের নিয়ন্ত্রণে, পরিচালনায় থেকে চিরকাল সব কাজ ঠিকভাবে করার মধ্যে যে যান্ত্রিকতা আছে, তাকে মানুষ মনুষ্যত্বের অপমান বলেই মনে করে। এই স্বেচ্ছামূলক সক্রিয়তার অধিকারই হলো গণতান্ত্রিকতার মৌল বৈশিষ্ট্য।

কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজ যে সামাজিকতার মাপকাঠিতে অনেক উন্নত মানের ব্যবস্থা—মার্কসবাদের সেটি প্রথম পাঠ। সেই উন্নত সামাজিকতা বোধই হলো মানুষের স্বেচ্ছামূলক সক্রিয়তার পরিসীমা। সেখানেই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র মিশে যায়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অধিকাংশ নেতার কাছেই বিষয়টি গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। সমাজ শোষণহীন হলেই মানুষের সব মুস্কিল আসান হয়ে যায় না. পোল্যাণ্ডের পোজনানে খাবারের জন্য দাঙ্গা থেকে (১৯৫৬) সাম্প্রতিক তিয়েতনানমেন স্কোয়ারে গণতন্ত্রের জন্য গণসমাবেশে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। মহত্তর মানবিকতার প্রতিষ্ঠা, যাকে সমাজতন্ত্র তাত্ত্বিকভাবে তার লক্ষ্যমাত্রা বলে স্বীকার করে, সেটা কেবল রুটির লড়াইয়ে সফল সমাপ্তিতে ঘটে না। চীনের দেঙ নেতৃত্ব মর্মান্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন শুধু রুটিতে সন্তুষ্ট নয়তো বন্দুক, আপাততঃ এছাড়া কোন তৃতীয় বিকল্প নেই।

চীনে গণতান্ত্রিক দাবীতে সমবেত জনতা, সোভিয়েতে গ্লাসনোস্তের সোচ্চার সমর্থকরা, পোল্যাণ্ডে যারা সলিডারিটিকে ভোট দিয়েছেন তাঁদের দেশপ্রেমে ঘাটতি আছে. তাঁরা নির্বোধ, অন্যের হাতের পুতুল মাত্র কিম্বা প্রতিবিপ্লবী—এই সব কথাই হলো স্থিতাবস্থার পক্ষে ওকালতি। মতাদর্শগত শিক্ষায় ঘাটতি পড়েছে বলে মানুষ বেহিসেবী দাবী করেছে, এই মতও মানা যায় না। মার্কস যে মানবমুক্তির কথা বলেছিলেন সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে তার দিকে দু'চার কদম এগিয়ে যাওয়া যাবে না, এই যুক্তি অশ্রদ্ধেয়। বরং ক্ষমতায় বসে থেকে গণদাবীর প্রতি এই চরম বিরুদ্ধতা প্রমাণ করে যে, পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক ক্ষমতার চূড়ান্ত কেন্দ্রীভবন মানুষের মনে যে alienation-এর জন্ম দেয়, সমাজতন্ত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার চরম কেন্দ্রিকতা হয়তো বা একইভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে মানুষকে alienated করে দেয়।

চীন, সোভিয়েত, পোল্যাণ্ডে নেতৃত্বের বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা কতো বড়ো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে তার আভাস পাওয়া যায় পশ্চিমী ধাঁচের ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবীতে। সমাজতন্ত্রের রাজনৈতিক কাঠামো পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্রকে কতোটা আত্মস্থ করতে পারবে, সেটাই অবশ্য তর্ক সাপেক্ষ। নয়তো স্বীকার করতে হবে গণতন্ত্র গণতন্ত্রই। একটি আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলি তার ওপরে আরোপ করে বলেই কোথাও তাকে বুর্জোয়া আবার কোথাও সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র বলা হয়। যদি এই ধারণাই সঠিক হয়, তাহলে মানতে হবে অন্ততঃ আপাততঃ এই সব

দেশে সাধারণ মানুষের কাছে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের চেয়ে পশ্চিমী ধাঁচের গণতন্ত্র অনেক বেশি কাম্য মনে হয়েছে। রাষ্ট্রতত্ত্বের র‍্যাডিকাল উদারনৈতিক অধ্যাপক বার্কার তাঁর জীবনের শেষ গ্রন্থে অভিজ্ঞতার সার সংকলন করতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন, Core of democracy is choice, not what is chosen নিজে বাছাই করতে, পছন্দ করতে পারবো এটাই হলো গণতন্ত্রের মর্মবস্তু। কি বাছাই করা হল তাতে ভালো বা মন্দ, কে কতোটা হবে সেটা পরে বিবেচ্য। বাছাইয়ে ভুল যদি হয়েই যায় পরে শোধরানোর চেষ্টা করা যাবে। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে চলতি কাঠামোর ত্রুটি-বিচ্যুতিতে এই রকম একটা মানসিকতা থেকে কাজ করছে বলেই পুরোনো মানসিকতায় আবদ্ধ নেতৃত্বের সঙ্গে দ্বন্দ্ব। আর এটা বেঠিক হলে যা সঠিক হবে সেটা কোনো মতেই কম বিপর্যয়কারী হবে না।

সর্বশেষে বলা দরকার, চীনের নেতারা অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশে তাঁদের সহযোগী নেতৃত্বের মতোই বোধহয় মনে করেন, বিপ্লবের পরে রাষ্ট্রও ব্যক্তির মধ্যে সব দ্বন্দ্বেরই অবসান ঘটে। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্ণধাররা মানুষের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। তাই পশ্চিমী গণতন্ত্রে শ্রেণীশাসন বজায় রেখে জনগণের কাছে বারবার যাওয়ার মধ্যে periodic renewal of faith এর যে ব্যাপক আয়োজন চলে, সমাজতন্ত্রে তার দরকার নেই। বহুদল ব্যবস্থা, অনিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, প্রতিবাদ মিছিল, সভা, শোভাযাত্রার কমবেশি অধিকার এখানে দরকার নেই। মানুষের বেঁচে থাকার, হাত পা ছড়িয়ে বেঁচে থাকার ব্যবস্থা যখন হয়েই গেছে, তখন গণতন্ত্রের এই পশ্চিমী অনুষঙ্গ বাদ দিয়েই সমাজতন্ত্র চলতে পারবে।

গ্লাসনোস্ত, তিয়েতনামেন স্কোয়ার ও পোল্যাণ্ড সেই ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে দিয়েছে। সমাজতন্ত্রই গণতন্ত্র নয়, গণতন্ত্র প্রকৃত অর্থে আরো কিছু দাবী করে সেটি সম্ভবতঃ আজ আর তর্কের অপেক্ষা রাখে না। এখন দরকার হলো গণতন্ত্রকে সমাজতন্ত্রের সঙ্গে মেলাবার ব্যবস্থা করা। নয়তো একটি ছাড়তে হবে। কোনটি বাদ পড়বে সেই চিন্তাও দুঃসহ।

শিক্ষা-অশিক্ষা

সুধীর চক্রবর্তী

গ্রামের নাম হরিদাসপুর, বাস রাস্তার কিনারে। সমস্ত গ্রামের ধ্যানস্তব্ধতা ভেঙে ভট ভট ভট ভট শব্দে ডিপ টিউবওয়েলের মেশিন চলছে। মাটির বুকের ভিতর বন্দী যে জল লুকিয়ে থাকে, যন্ত্রের শোষণে তা অনর্গলিত ধারে ভূমিত্রীর বুকে ঝ'রে পড়ছে। এখন আর উদ্যমী মানুষের গ্রামে আচট বা পতিত জমি তেমন নেই। সব জমিই এখন দোফলা তো বটেই, তেফলাও। জলের ব্যবস্থা পর্যাপ্ত, ট্র্যাক্টর সচল, বিছন আর সারের জোগানে কোনো ঘাটতি নেই। গ্রামীণ ব্যাঙ্ক কৃষিঋণ দিতে সদাসর্বদা উদারহস্ত। তার ফলে বাস থেকে নেমে হরিদাসপুরের একটা দুটো মানুষ চোখে পড়ার আগে চোখ ছুটে যায় আদিগন্ত বিস্তৃত ধানখেতে আর পাটখেতে। লক লক ক'রে বেড়ে উঠছে প্রবর্ধমান চারা। চারিদিকে এক ম ম করা সৃজনের গন্ধ আর শ্যামলিমা ব লে একটা কাব্যিক শব্দের দৃষ্টিকাড়া বিস্তার। মন ভ'রে যায়।

দশবিশ বিঘের এক লপ্ত জমি পেরিয়ে গ্রামের জনমনিষ্যির মুখ দেখা গেল। আর একটু হেঁটে তবে গ্রামের বা এ-দিগন্তের একমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় চোখে পড়লো। কত যে বয়স হয়েছে, কী যে হতশ্রী, কেমন যে জীর্ণ। ঘরের জানলা নেই. ফোকর চাপা হয়েছে ভেতর থেকে টেবিল দিয়ে। ইঁট দাঁত খিঁচোচ্ছে, ছাদ পড়ো-পড়ো। একটু দূরের গ্রামের একমাত্র মন্দিরটারও একই দশা। হাঁসকল লাগানো দরজা খুলতে গেলে ক্যাঁচ ক্যাঁচর শব্দে

সচকিত হয়ে ওঠে। সারা মন্দিরের গায়ে কত বর্ষ যাপনের ম্লানিমা ভরা ছ্যাতলা। মন্দিরের শীর্ষেভিতে অশথের চারা। এ মন্দিরের মধ্যে চামচিকে আর ছুঁচোর সঙ্গে শ্রীশ্রীমদনগোপাল জিউ বসবাস করেন। নিমকাঠের বিগ্রহে আততি ও আবেদনহীন দুখানি টানা টানা চোখ। চলমান জীবনপ্রবাহের মাঝখানে অসহায় দারুভূত অচল দেবতা। এহেন দেবতারও একজন পূজারী আছেন। নোংরা একটা জলেকাচা পট্টবস্ত্র প'রে তিনি রোজ সকালে নটা দশটায় একবার সন্তর্পনে দরজা খুলে 'হুস হুস যা ঃ' আওয়াজ তুলে অনভিপ্রেত জীবজন্তু তাড়িয়ে অভিমানী মূকবধির দেবতাকে নিয়মরক্ষার ফুল বেলপাতা চড়ান, সঙ্গে গলা ব'সে যাওয়া খানদুই বাতাসা।

গ্রামের একমাত্র বিদ্যামন্দিরেরও একজন প্রধান পুরোহিত আছেন এবং আছেন তাঁর জন দুই সহকারী সহকারিনী। এক্ষেত্রে প্রধান পুরোহিতের গ্রাম্যনাম হেডমাস্টের, অন্যরা শুধু মাস্টের। তো সকালে দশটা নাগাদ হেডমাস্টের ঐ পুরোহিতের মত ক্যাঁচ ক্যাঁচর ক'রে বিদ্যামন্দির খোলেন আর মন্ত্রজপের মত আওড়ান ঃ

বিদ্যালোভীর নাহি হ'লো ভীড়
শূন্য তোমার অঙ্গনে,
দীর্ণ হে তুমি জীর্ণ বিদ্যালয়।

শূন্য বিদ্যাভবনের সামনে বকুলগাছের চত্বরে তিনি বসেন দু'দণ্ড। একস্টেনশন চলছে। বয়স ষাট পেরিয়েছে। আর ক'বছর আছেন। ভয় হয় তাঁর অবসরগ্রহণের আগেই বুঝিবা স্কুল ধ্বসে পড়ে। সমগ্র হেডমাস্টার-জীবনে, তা বিশবছর হ'লো, তিনি তাঁর বিদ্যালয়কে সংস্কার করাতে পারেননি। ডি আই অফিসের বদান্যতা আর নেকনজরের কৃপা হরিদাসপুরের মত গহীন গ্রামে পৌঁছোয় কি?

এসব কথাই ভাবছিলেন সহদেব পাল বকুলগাছ তলায় ব'সে আর চোখ মেলে রাখছিলেন বটগাছের আড়ে। কান পাতা ছিল রাসরাস্তায় কোনো বাস থামে কিনা তার আওয়াজ শোনার জন্যে। কেননা বাসে ক'রে আসবেন তাঁর দুই সহকারী শিক্ষক আর এক দিদিমনি। সহদেব একটু পুরোনো কালের মানুষ তো তাই সব তাতেই তড়িঘড়ি। এখন তো মোটে দশটা। ইস্কুল বসবে এগারোটায়। ছেলেপিলে আসতে আসতে প্রায় এগারোটাই বাজে। মাস্টারমশাইদের পৌঁছোতে বারোটা। কোনোদিন বাস ফেল করেন তাঁরা, কোনোদিন নাকি রাস্তায় বাস খারাপ হয়। শেষপর্যন্ত এলেন তো সহদেববাবুর

বাপের ভাগ্যি। আর কি মেজাজ সব। দিদিমণি নাকি তলে তলে কোন্ ইনস্যুরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট। দুই সহকারীর একজন সকালে জনা পঞ্চাশেক ছাত্র দুই শিফ্‌টে পড়িয়ে তবে আসেন। আর একজন অঞ্চলপ্রধান। তিনি এলে কৃতার্থ হয়ে যেতে হয়। সহকারীরা আড়ালে সহদেববাবুর কর্মপ্রীতি আর কর্তব্যনিষ্ঠা নিয়ে হাসাহাসি করেন। তাঁরা তাঁকে এইচ, এম ব'লে উল্লেখ করেন। এইচ-এম মানে হেডমাস্টার। তাঁদের মতে এইচ এম একটা হার্‌লা। আদর্শবাদী আর নিবেট। আরে সাতসকালে এলে কি গবমেণ্ট বেশি মাইনে দেবে?

সহদেব আদর্শবাদী, তবে নিবেট নন। সেইজন্যই সহকারীদের সঙ্গে কোনো বিরোধ-বিতণ্ডায় যান না। ইস্কুলটা চালানোই তাঁর লক্ষ্য। সেটা অবশ্য ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে। সরকার ঠিক সময়মত বেতন দেন। বেতনও আগের চেয়ে অনেক ভালো। কিন্তু পড়াশুনোর আবহাওয়াটা কেমন যেন নষ্ট হয়ে গেছে। অথচ স্বাধীনতার পরে পরেই সহদেব শুনতে পেতেন স্বাধীনদেশে শিক্ষাব্যবস্থা আমূল পাল্‌টে যাবে। অবসরগ্রহণের মুখে এসেও অবশ্য সেই পাল্টানোর কোনো স্পষ্ট দিশে তিনি দেখছেন না। তাঁরা নিজেরা প্রথম প্রথম প্রাইমারি শিক্ষাকে ঠাট্টা ক'রে বলতেন 'পায়ে মারি' শিক্ষা। অর্থাৎ প্রথমেই পায়ে এমনভাবে গুঁতো মারা হচ্ছে যাতে সে দাঁড়াতে না পারে।

রাস্তা দিয়ে একজন স্বচ্ছল চাষী, চারুপদ হালসানা, যাচ্ছিল। এসে বসলো দুদণ্ড। সহদেবকে মান্য করে। কিন্তু সহদেব লক্ষ্য করেছেন তাঁর সহকারী বিজন কিংবা সোমনাথকে এই চারুপদ কেমন অনায়াসে বলে, 'কি মাস্টের, একটা বিড়ি খাবে নাকি?' তারাও খায়। আশ্চর্য এ ব্যাপারটা আগে ছিল না। আগে গ্রামের সবাই তাঁদের বলতো মাস্টারমশাই। কবে থেকে যে মশাই কথাটা টিকটিকির লেজের মত খসে গেল কে জানে। এই চারুপদই সেবারে, যখন প্রাইমারিতে পাশফেল ছিল, তখন ইস্কুলে এসে সহদেবকে বলেছিলে, 'বুঝলে মাস্টের আমার খোঁকা, আরে তোমাদের ঐ থিরি কেলাসের ছিরিপদ হালসানা, ছোঁড়া এবারেও তো ফেল দিয়েচে'।

'হ্যাঁ। খুবই খারাপ করেচে।' সহদেব বলেছিলো।

ঃ সেতো করবেই। আরে সে সুন্মুদি পড়ে টা কখন? কেবল তো মাঠে ঘাটে ঘোরে আর বিড়ি টানে। তো তাতেই ফেল দিয়েচে। তা মাস্টের এখন কি হবে?

ঃ কি আর হবে? আরেক বছর পড়বে।

ঃ কেন ? একটা ব্যবস্থা কিছু হয়না ?

ঃ কি ব্যবস্থা ?

ঃ এই ধরো মাস্টের, একটা মোটা টাকা লাও। টাকা লিয়ে ছোঁড়াটাকে ফোর কেলাসে তুলে দাও না কেনে। ধরো কেনে, ও থিরি কেলাসও যা ফোরও তাই। চাষার পোর আবার ল্যাকাপড়া। শোনো মাস্টের, পাশ দেবা তো দাও নইলে ও ইস্কুলের গুষ্টিতুষ্টি করে ছেড়ে দুবো।

তা অবশ্য হয়নি। তবে সহদেব তখন থেকেই বুঝে গেছেন যে গ্রামীন শিক্ষায় অশিক্ষিতদের দাপট ক্রমেই বাড়বে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যে এ অবস্থাটা কিন্তু ছিল না। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, চারুপদরা এখন স্কুলের চত্বরে এসে বসে। সহদেবকে বলে, 'আপনার সেইসব সুয়ো ছেলেমেয়ে কই ? বিজন মাস্টের, সোমনাথ আর কেপটিচার লক্ষ্মী দিদিমনি ? ইস্কুলে দেরি ক'রে এলে পরে হাড় গুঁড়ো ক'রে দেবো বুঝলেন ?'

সহদেব পালের মন বকুলবিছানো শিক্ষাপ্রাঙ্গনের দিকে চেয়ে একটু স্মৃতিচারী হ'লো। মনে পড়লো এ গ্রামে প্রথম আসার ঘটনা। এতো তাঁর বাস্তুগ্রাম নয়। স্বাধীনতার আগে পরে তাঁদের ডেরা ছিলো ইব্রাহিমপুর। বাবা জাতব্যবসা অর্থাৎ কিনা হাঁড়িপাতিল গড়তেন। অবরে সয়ে একটা শীতলা বা রক্ষেকালীর মূর্ত্তি। হঠাৎই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মা তো কোন্ কালে গিয়েছিলেন। মাত্র ষোলোবছরেই সহদেব একেবারে যাকে বলে সহায়সম্বলহীন অনাথ। সবে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ভাবছেন কি ক'রে দূর শহরে গিয়ে কলেজে পড়বেন।

এ সময়ে তাঁর একটা বড় নেশা ছিল। যাত্রা করবার নেশা। গ্রামের যাত্রাদলে ফিমেল পার্টে তিনি ছিলেন খুব জনপ্রিয়। ছোটখাট পুতুল পুতুল চেহারা ছিল। গলার স্বর চিরকালই চিকন। সেবারে 'চন্দ্রহাস' পালার বিষয়ার বোলে তাঁর খুব নাম হয়। কয়েকটা গ্রামে বায়না হয়েছিলো যাত্রাগানের। তেমনই একগ্রামের মোড়ল মুরুব্বি ছিলেন ফরমান আলি খাঁ। যাত্রাপাগল মানুষ। স্বাধীনতার পরে পরে তখন কংগ্রেসের যুব রবরবা। ফরমান খাঁ বরাবরই উদারপন্থী মুসলমান। তাই মুসলীম লীগ করেননি কোনোদিন। দেশ স্বাধীন হ'তে ক্ষমতা আর নেতৃত্ব তাঁর হাতের মুঠোয় এসে গেল। ফরমানের গ্রামের নাম ছিল মুকুন্দপুর। সেখানে 'চন্দ্রহাস' যাত্রা হ'লো একরাত। যাত্রায় শেষে ফরমানের বাড়ি ভোজ। ভোজের পর সহদেবকে

ঘরে ডেকে ফরমান সব খোঁজখবর নিয়ে বলেন, 'মাস্টারি করবা? এ গাঁয়ে? তুমি তো মাট্রিক পাশ'।

: ইস্কুল আছে গাঁয়ে?

: এখন নেই। তবে হবে। আমিই করবো। আমার ভিটের পাশেই জমি দেব। সরকারী টাকা আনবো।

ফরমান আলি খাঁ এবারে মিটিমিটি হেসে বললেন, 'ইস্কুল করাটা বাহ্। আসলে তোমাকে আমি এ গাঁয়ে বেঁধে ফেলতে চাই। কেন জানতে চাইছো? আসলে আমি যাত্রাগানে পাগল। আমার গ্রামের যাত্রাদলে সবই আছে, কেবল ফিমেল পার্ট করার মত লোক নেই। তোমার এলেম আছে, বিদ্যেও আছে। ব্যাস। মাস্টারি করো আর যাত্রাদলটাকে চাঙ্গা করো। রাজি?'

রাজি হয়েছিলেন। তার ফলেই ইব্রাহিমপুরের বাস্তুত্যাগ আর মুকুন্দপুরে বসত। জোতজমি আর ভিটে সেও তো ফরমান আলির দান। মানুষটা তাঁকে চিরকালের বন্ধনে বেঁধে শুধু মোহব্বতের স্মৃতি রেখে কোথায় মাটির তলায় লুকিয়েছেন।

কে বলবে সহদেব পালের বাড়ি মুকুন্দপুরে নয়। এখানেই তাঁর বাস্তু, এখানেই বিয়ে, সন্তানজন্ম, জীবিকা। কেবল বছর কুড়ি আগে পাশের গ্রাম হরিদাসপুরে হেডমাষ্টারি পেয়ে রোজ পড়াতে যাওয়া। মুকুন্দপুরেই তাঁর হেডমাস্টারি হবার কথা। কিন্তু গ্রাম্য ক্যাঁচালে সে আর হলো কই? তাই বলে এই হরিদাসপুরের জীর্ণ দীর্ণ বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষাজীবনটি কেটে যাবে? এটা কি একটা ইস্কুল না খোঁয়াড়?

শিক্ষকজীবনে দারুণ অতৃপ্ত সহদেব পালকে আমার চেনার কথা নয়। কেননা আমি থাকি শহরে। কিন্তু আমাদের সরকারি কলেজে আই, এ পড়তে এসেছিলো সহদেববাবুর ছেলে নিমাই। তার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়। গভীর উৎসুক দুটি চোখ নিমাইয়ের। আমি তখন গ্রামে গ্রামে বাউল-ফকিরদের হদিশ ক'রে বেড়াচ্ছি। কথায় কথায় নিমাই একদিন বলে বসলো, 'স্যার, একদিন আমাদের গাঁয়ে যাবেন? মুকুন্দপুরে? আমার বাবা অনেক ফকিরদের খবর রাখেন। শব্দগানের সংগ্রহ আছে তাঁর।'

আমাকে আর কে ধরে রাখে? অচিরে নিমাইয়ের সঙ্গে মুকুন্দপুরে পৌঁছেছি। তখন সাতের দশক। সহদেব বাবু মানুষটা বেঁটেখাটো, আত্মমগ্ন। কি একটা বই পড়ছিলেন মন দিয়ে। লুঙ্গি গেঞ্জি পরনে। লাজুক হাসিতে

অভ্যর্থনা করলেন। 'কি বই পড়ছিলেন?' আমার এই প্রশ্নে কুণ্ঠিত ভাবে বললেন, 'ঐ ছেলের একখানা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বই'।

: রাষ্ট্রবিজ্ঞানে খুব উৎসাহ বুঝি?

: না না। এমনই দেখছিলাম। সময় কাটানো আর কি।

নিমাই গর্বিতভাবে বলে, 'বাবা সঙ্কল্প করেছেন আমার সঙ্গে প'ড়ে প্রাইভেটে আই, এ দেবেন'।

'তাই নাকি?' আমি উৎসাহিত হয়ে জানতে চাই।

: না, মানে সেই কোন্‌কালে ম্যাট্রিক পাশ করেছি তো। মূর্খই হয়ে থাকলাম। তাই ভাবছি নিমাইয়ের সঙ্গে যদি পরীক্ষাটা দিয়ে দেওয়া যায়। দিতে পারবো কিনা কে জানে। দিলেও এই বয়সে কি পাশ করবো?

স্বল্পশিক্ষিত বিনয়ী মানুষটি কিন্তু থেমে থাকেননি। শিক্ষা বাড়িয়েই চলেন। আমি ধারাবাহিকভাবে জানতে পারি সহদেববাবু নিমাইয়ের সঙ্গে আই এ আর বি এ পাশ করেন। নিমাই স্কান্ত দিয়ে চাকরি নেয়। সহদেব কিন্তু প্রাইভেটে পরীক্ষা দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে এম এ হন।

প্রবীনবয়সের এই উদ্যমী বিদ্যাচর্চা কিন্তু শেষপর্যন্ত সহদেবের কাজে এলো না। কারণ সবে যখন এম, এ পাশ ক'রে ভাবছেন হাইস্কুলে যাবার উদ্যোগ নেবেন তখন হঠাৎ তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হ'লো। নিমাই যা একটু সাকু হয়েছে তখন, তার পরের তিনভাই নাবালক। নিমাই বাইরে চাকরি করে। সংসার কে দেখে? ছোটছেলেটা তো শিশু। খবর পেয়ে যাই একদিন শোক সান্ত্বনা জানাতে। জ্ঞানী বুদ্ধিমান মানুষকে কীই বা সান্ত্বনা দেবো? গিয়ে দেখি শিশুটিকে কোলে নিয়ে রান্না করছেন। অনভ্যস্থ গৃহস্থালীর চিহ্ন সারাবাড়ির সর্বাঙ্গে। নিজেই বলেন, 'পায়ে-মারি টিচারই রয়ে গেলাম বুঝলেন? ছোটবেলায় একবার উঠে দাঁড়াতে গেলাম, বাবার মৃত্যু বসিয়ে দিলে। এবারে ভাবলাম উচ্চশিক্ষার ডিগ্রি হ'লো, একবার জাতে ওঠা যাক। সবে খোঁজখবর নিয়ে কথাবার্তা চলছে পুঁটিমারি উচ্চ বিদ্যালয়ে, তো আবার পায়ে মারি হ'লো। কী, করি বলুন তো?'

: কেন? পুঁটিমারি কি অনেক দূর?

: তা ধরুন বাসে চেপে একঘণ্টা, তার আগে বাসরাস্তা যেতে আরো আধ ঘণ্টা, সঙ্গে এদিক ওদিক ধরে আরো আধঘণ্টা। মোট দুঘণ্টা যেতে দুঘণ্টা আসতে। তা বাদে স্কুল আওয়ার। বাড়িতে অপোগণ্ড শিশু। তন্ময়।

: ওর নাম তন্ময় বুঝি?

: হ্যাঁ, মা মারা যেতে নাম রেখেছি তন্ময়।

: কেন?

: বড়টার নাম নিমাইপদ, মেজ বলাইপদ, সেজ কানাইপদ, ছোটটার নাম রেখেছিলাম মুক্তিপদ। কিন্তু এত শিশু যে দেখলাম জননীর মৃত্যুশোকই পেলো না। অবোধ তন্ময় হয়ে রইলো। তাই নাম দিয়েছি তন্ময়।

: এখন কীভাবে স্কুল করছেন?

: বাড়ির লাগোয়া স্কুল তো। চালাচ্ছি, কোনোমতে। দেখি তন্ময় তো খানিকটা বড় হয়ে উঠুক। তখন না হয় আরেকবার চেষ্টা করবো উচ্চ বিদ্যালয়ে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য দেশের পট পাল্টে যায়। সহদেব পাল চেষ্টা চরিত্র ক'রে পাসের গ্রামে হরিদাসপুরের প্রাইমারি স্কুলে হেডমাস্টারি পান। সেখানেই গত বিশবছরে সাইকেল ঠেঙিয়ে যাওয়া-আসা। সে ইস্কুলের কোনো ভবিষ্যৎ নেই।

ভবিষ্যৎ নেই কেননা গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ অশিক্ষিত চাষী। গ্রামের বিদ্যালয় তাদের পক্ষে উৎপাতস্বরূপ। কেননা চাষের যা বরবরা আর মজুর মুনিষের যা আকাল তাতে বাড়ির ছোঁড়াগুলো চাষের কাজে লাগলে সুবিধে কত। তা কি হবার জো আছে? মাস্টেরগুলোর চাকরি রাখতে হবে তো, তাই নড়া ধরে ধরে ছোঁড়াগুলোকে ইস্কুলে নিয়ে যায় জোর করে। এই হলো সাধারণ গ্রামবাসীর মতামত। বাকি কজন সদাই রক্তচক্ষু। তাঁদের মতে সহদেব মাস্টের বাদে আর সকলেই ফাঁকিবাজ না হয় ধান্দাবাজ। সবসময়, মাগীমিন্‌সেতে বসে বসে অত কীসের গুজুর গুজুর ফুস্থর ফুস্থর?

স্বাধীনদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় আর তার পরিবেশ সম্পর্কে সহদেব প্রায়ই তাঁর হতাশা পেশ করেন। বলেন, 'আচ্ছা শিক্ষার পরিবেশের কি উন্নতি হবে না? মানুষ কি ক্রমশ অমানুষই হয়ে যাবে?'

শেষের প্রশ্নটার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা। তাঁর কাজেই জানতে পারি বড়ছেলে চাকরিস্থলে নিজের পছন্দ মত বিয়ে করে বরাবরের জন্যে মুকুন্দপুর থেকে সরে পড়েছে। মেজ বলাইপদ নকশাল হয়ে সাতের দশকে খুন হয়েছে। এসবেরই অবশ্যম্ভাবী ফলে কানাইপদ বখে গেছে। সে এখন ক্বচিৎ বাড়ি আসে। এলে বাপের ওপর হম্বিতম্বি করে। মারাত্মক ড্রাগের নেশাড়ে। ব্যাপার স্যাপার দেখে সহদেবের শেষ আশ্রয় হলো তন্ময়। আমাকে বলেন, 'আমার এখন দুটো চিন্তা, বুঝলেন। একনম্বর হলো, রিটায়ার করা পর্যন্ত ইস্কুল বাড়িটা খাড়া থাকে কিনা। আর দুনম্বর হলো,

বেঁচে থাকতে থাকতে তন্ময় লেখাপড়া শেষ করে কোনো কাজ পায় কিনা। তবে তো ভিটেটায় পিদিম জ্বলবে?'

তাঁর দুটো চিন্তারই সদুত্তর পাওয়া হয়নি। হঠাৎ সেরিব্রাল স্ট্রোকে ওপারে ডাক আসে। খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি যাই। অপরাধীর মত মুখে নিমাই এসে দাঁড়ায়। কানাই কোথায় কোন্ ড্রাগের আসরে খবর মেলেনি। তন্ময় কলেজ-পড়ুয়া সবে। সে শোকে অনিশ্চয়তায় হতাশায় একেবারে পাথর। নিমাই আমাকে বলে, 'বাবা ছিলেন আদর্শবাদী। খানিকটা ভাববাদী বলতে পারেন। হিসেবনিকেশ করে দেখছি কিছুই রেখে যাননি। এত বিদ্যা জ্ঞান কি কাজে এলো বলুন তো? অথচ চার চারখানা সন্তান।

আমি বললাম, 'ছি নিমাই, মৃতমানুষের নিন্দে করতে নেই। আর তোমার বাবা কী রেখে গেছেন তা কি তুমি বুঝবে কোনদিন?'

দুপুরবেলা শ্মশানে যাবার পথে হরিদাসপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে যখন কিছুক্ষণের জন্য মৃতদেহ এনে রাখা হলো তখন সারাগ্রাম শ্রদ্ধায় আবেগে অনুতাপে এসে ভেঙে পড়লো যেন। শিক্ষাহীনতার রুদ্ধ পরিবেশে এই প্রবীন মানুষটি তো রোজই নিয়ম করে এসে দরজা খুলেছেন। উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষায় চেয়ে থেকেছেন বাস রাস্তার দিকে। অসাড় গ্রাম্য চাষীদের বুঝিয়েছেন ক্ষেতশ্রমের চেয়ে বড় হলো শিক্ষা। নড়া ধরে ধরে ছেলেদের এনে জোর করে পড়িয়েছেন। এঁদের কথা খবরের কাগজে বেরোয় না কোনদিন। জাতীয় শিক্ষকের সম্মান কখনই সহদেবের মত মানুষ পাননা। তিনি যেন হরিদাসপুরের গ্রাম্য পুরোহিত। প্রতিদিন যত প্রতিকূলতাই থাক তবু সামান্য উপকার তুলে দিয়েছেন শিক্ষাসত্রে।

মৃতদেহ ঘিরে বিপুল জনস্রোত থেকে দূরে একটা কাঁঠাল গাছের তলায় বসে নানা কথা ভাবছিলাম। তন্ময়ের কান্নাভেজা অসহায় মুখখানা মনে পড়ছিলো এমন সময় এক বৃদ্ধ মুসলমান চাষী হুঁকো হাতে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দিনের বেলায় যেন খুব আঁধার নেমে এলো বাবু। মাস্টারমশাই চলে গেলেন। বিশ বছর ছিলেন। রোদে জলে একদিনের তরেও কামাই ছিলনি কাজে। হরদিন ঐ বকুল গাছটার তলায় বসে বাসরাস্তার পানে তেকিয়ে থাকতেন—কি না কখন মাস্টারবাবুরা আসেন। শেষ হয়ে গেল। আমাদের গাঁয়েরও শিক্ষে-দিক্ষে শেষ।

আমি বললাম, 'কেন? শেষ বলচেন কেন? অন্য মাস্টারমশাইরা তো রইলেন। নতুন হেডমাস্টারও একজন আসবেন বেকি।'

: তা আসবে ঠিকই। কারুর স্থান কি ফাঁকা থাকে? তবে কি জানেন বাবু, ঐ সহদেব মাস্টার আর একটা হবে না।

চারদিকে কৌতূহলী শোকাহত গ্রামবাসী। অদূরে লক লক করছে প্রবর্ধমান পাটের চারা। আকাশ থেকে ঝরে পড়ছে খররৌদ্র। হঠাৎ বৃদ্ধ চাষী বলে উঠলেন, 'কি জানেন বাবু, বহুদিন এইসব জমিজিরেৎ চাষ-বাস নিয়ে কাটলো। এখন সবদিকের হালচাল দেখে, বিশেষ করে শিক্ষে-দিক্ষের ব্যাপারে একটা কথা মনে হয় খুব।'

: কি সেই কথা?

: আগে সম্পর্ক ছিল গুরু আর শিষ্যের। এখন দাঁড়িয়েছে গরু আর শস্য। সব দেখবেন মুড়িয়ে খাবে।

যেন সপাং করে মুখে একটা চাবুক পড়লো, কেননা আমিও তো একজন শিক্ষাজীবী। 'গরু আর শস্য' এমন ঝকঝকে এপিগ্রামটা মাঝেমাঝেই মনে আসে। চাষবাসের মধ্যে থেকে উঠে-আসা এই চিত্রকল্প তৈরি করেছেন একজন নিরক্ষর চাষা। তাতে ব্যক্ত হয়েছে শিক্ষা আর শিক্ষক সম্পর্কে একজন তৃণমূল মানুষের তিক্ত অভিজ্ঞতা। পথে-ঘাটে, ট্রেনে-বাসে সবস্তরেই কি এমনধারা তিক্ত কথাবার্তাই শুনতে পাই না? প্রায় সবলোকেরই বক্তব্য হলো: আজকাল মাস্টারদের মাইনিকড়ি সুবিধেসুযোগ অনেক বেড়েছে কিন্তু সেইসঙ্গে বেড়েছে ফাঁকিবাজি। দুয়েকজন বাদে প্রায় সবাই অর্থলোলুপ আর ধান্দাবাজ। ইস্কুল কলেজে ভালো করে পড়ায় না কিন্তু টিউশুনীর দিকে খুব নজর। সেইসঙ্গে এই কথাটাও ব্যক্ত হয় যে আগেকার সব শিক্ষকই ছিলেন আদর্শবাদী, দরিদ্র কিন্তু সৎ, কর্তব্যনিষ্ঠ ও ছাত্রদরদী। তাঁদের দেখলেই নাকি প্রণাম করতে ইচ্ছে করে।

মুস্কিল যে জনমত সবসময়েই একটু প্রান্তবাদী হয়ে থাকে। আমাদের পুরোনো কালের গল্প-উপন্যাসে শিক্ষক শ্রেণীর বড় বীভৎস চিত্রায়ন দেখি। শিক্ষক মানেই রক্তচক্ষু, প্রহারপ্রবণ এবং প্রচণ্ড রাগী একজন ব্যক্তি। আমার নিজেরও তো অনেকটাই বয়স হলো, স্বাধীনতার আগে পরে বিদ্যালয় জীবনে যাঁদের কাছে পাঠ নিয়েছিলাম তাঁদের সবাইকে প্রাতঃস্মরণীয় মহিমময় ব্যক্তি বলে মনে হয়নি। একজন সুদী কারবার করতেন, একজন ছিলেন নেশাগ্রস্ত, আরেকজন ছাত্রদের সঙ্গে সমকামী অভ্যাসে রপ্ত ছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিত বিশুদ্ধ সংস্কৃত উচ্চারণ জানতেন না। খদ্দরধারী জাতীয়তাবাদী শিক্ষকদের ত্যাগ তিতিক্ষার যতটা প্রশংসা ছিল, ততটা জ্ঞানগরিমার পরিচয় পাইনি।

সবচেয়ে বড় কথা, তখন শিক্ষাবিভাগে যে-সব লোক নিযুক্ত ছিলেন তাঁরা এখনকার নিরিখে খুব আনকোয়ালিফায়েড ছিলেন। যৎসামান্য মানুষই স্বেচ্ছায় শিক্ষক হতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অর্থনৈতিক মন্দা আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে প্রচণ্ড বেকারী ঠেকাতে অনেকে শিক্ষকতা নেন। সিলেবাস ছিল সহজসরল, বিজ্ঞানবিষয়ে পঠনপাঠন আন্তর্জাতিক মানে পৌঁছোয় নি, সাহিত্যপাঠে সমাজইতিহাসের প্রয়োগ ছিল অজ্ঞাত, ছাত্রদের মধ্যে এখনকার মত হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতা শুরু হয়নি, অভিভাবকরা ছিলেন নিশ্চিন্ত, উদাসীন। তখন স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিকে সবচেয়ে বিদ্বান মনে করা হতো, সৌম্যকান্তি শিক্ষকের প্রতি সম্ভ্রম দেখানো হতো, ছাত্রীদের মনে করা হতো মেধার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর।

তাই বলে এখন যেমন যদু-মধু রাম-শ্যাম শিক্ষা বা শিক্ষকবিষয়ে অনায়াসে মত ও মন্তব্য পেশ করেন, প্রশ্ন উঠতে পারে সে যোগ্যতা তাদের আছে কিনা। সেদিন ট্রেনে নিত্যযাত্রীরা একযোগে শিক্ষকদের আদ্যশ্রাদ্ধ করে হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে জিভ কেটে বললেন, 'কিছু মনে করবেন না স্যার, আপনাদের মানে প্রোফেসারদের আমরা কিছু বলিনি।'

আমি মন্তব্য না করে নিত্যযাত্রীদের পরিচয় জানতে চাই। একজন কারখানার ফিটার, একজন তৃতীয়বর্গের কেরানী, একজন ছাপাখানার কম্পোজিটার, একজন বিদ্যুৎপর্ষদের কর্মী যাঁর কাজ পেলে উঠে তার সারানো, একজন বইয়ের দোকানে সেলসম্যান, একজন লটারির টিকিট বিক্রেতা। আমি তাঁদের সবিনয়ে বললাম, 'আপনারা যে বললেন প্রাইভেট টিউটররা দেশের সর্বনাশ করে দিলো, তা এখনকার যা সিলেবাস তা আপনারা নিজেরা পড়াতে পারবেন তো? তাছাড়া পড়াবেনই বা কখন? চলেছেন তো সারাদিনের মতো রুজিরোজগারে। দেখুন, আমি তো অধ্যাপক কিন্তু নিজের মেয়ের জন্যে টিউটর রেখেছি। কেন বলুন তো? কারণ আমাদের কালের সিলেবাস আর নেই। গণিত, জীবনবিজ্ঞান আর ভৌতবিজ্ঞান পড়ানো আর আমাদের সাধ্যে নেই। সেটা ভেবেছেন কি? এসব বিষয়ে তাহলে পড়াবেন কে? ঐসব বিষয়ের শিক্ষকরাই যে যোগ্য শিক্ষক, তাই নয় কি?'

কথা হলো এসব কথা বলে কে, রুখে দাঁড়ায়ই বা কে? ফলে চলেছে নিন্দার প্রবাহ, চরিত্রহননের অবাধ স্বচ্ছলতা। কে অধিকার দিয়েছে অযোগ্য মূর্খ ব্যক্তিদের শিক্ষাবিষয়ে মন্তব্য করবার? একি জনপ্রতিনিধি নির্বাচন যে সকলেরই সমঅধিকার? কে বলেছে যে সব শিক্ষকই এখন ফাঁকিবাজ?

কর্তব্যনিষ্ঠ ছাত্রদরদী প্রগাঢ় পণ্ডিত শিক্ষকদের কি অভাব আছে? চোর জোচ্চোর ঘুষখোর মদ্যপ ব্রতহীন আদর্শহীন সব মানুষই এখন শিক্ষকদের নামে যা খুশি বলে যান, ব্যাপারখানা কি?

বিদেশে কি শিক্ষকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষদের এতখানি সরব দেখা যায়? যায় না, কারণ সেসব দেশ কর্মের বেড়াজালে সদাচঞ্চল। দেশের সাধারণ মানুষ সাধারণের মতই থাকতে সেখানে অভ্যস্ত। আর এদেশে সকলেই বিশেষজ্ঞের মতো মন্তব্য দিতে তৎপর। দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে যাঁরা প্রকাশ্যে গালাগাল দেন তাঁদের আত্মসমালোচনা কতটুকু আছে? এদেশের খেলোয়াড়, অভিনেতা রাজনীতিক, উপাচার্য, মন্ত্রী বা সম্পাদক সম্পর্কে যতটা স্ক্যাণ্ডাল আমরা জানি ততটা তথ্য জানি না। আমরা স্বভাবে শ্রদ্ধালু নই, নিন্দাপ্রবণ।

তবু চোখ-কান খোলা রাখলে অনেককিছু দেখা বোঝা যায়। আমাদের পাড়ায় একজন সফল প্রাথমিক শিক্ষক আছেন। তিনি সরকারি স্কুলে পড়ান। স্কুলটি শহরের সেরা। ফলে সেখানে ক্লাশ ফাইভে ভর্তি-পরীক্ষার জন্য সব ছাত্র আর অভিভাবক অতি তৎপর। আমাদের পাড়ার শিক্ষক মহাশয়ের কোচিঙে সন্তানকে কোনোপ্রকারে পড়াবার একটু ব্যবস্থা করতে অভিভাবকদের ছোটাছুটি করতে দেখি। দেখা গেছে, ভদ্রলোকের শিক্ষাদানের পদ্ধতিগত গুণে তাঁর কোচিংক্লাশের ছাত্ররা ভর্তি-পরীক্ষায় সফল হয়। তাই এত ভিড়, এত আকুলতা। বলাবাহুল্য, ভদ্রলোক নিজে যেচে কাউকে ডাকেন না বরং সবাই তাঁকে অনুনয় বিনয় করে। তাঁর ঘরের ছোট বারান্দায় বাচ্চাদের ছোট ছোট জুতো উপচে পড়ে। এ কি তাঁর দোষ? তাঁর বাড়ির সামনে সর্বদাই অপেক্ষমান জনক-জননীদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। একবার নববর্ষের বিকালে আমার এক প্রতিবেশী ব্যঙ্গ ক'রে শিক্ষক মশাইকে বললেন, 'কি স্যার, বাড়ির সামনে প্যাণ্ডেল ক'রে গার্জেনদের একটু সরবৎ-মিষ্টি খাইয়ে শুভ নববর্ষ করুন। সারাবছর ওদেরই তো টাকা পিটছেন।'

ভদ্রলোকের এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মাথা পেতে নিতে হয়, যদিও তা নেবার কথা নয় তাঁর। কিন্তু তিনি পেশায় শিক্ষক তাই স্বভাবনম্র আর ক্ষমাশীল হতে হয় তাঁকে। তাঁর অবশ্য মনে থাকে যে প্রতিবেশী ভদ্রলোক মদ্যপ ও লম্পট।

ব্যতিক্রমও আছে বৈকি। একবার বছর কয় আগে আমাদের শহরের গৌতম মণ্ডল নামে একটি ছেলে মাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনলক্ষ পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয়। তাতে শহরে হৈ চৈ পড়ে যায়। ছেলেটিকে সম্বর্ধনার ঢেউ ওঠে।

তবে তার এই অসামান্য সাফল্যে শিক্ষকদের অবদান বিষয়ে তেমন কোনো উচ্ছ্বাস বা স্বীকৃতি শুনিনি। সে যাইহোক, তার অনেক সম্বর্ধনার মধ্যে একটি সভায় আমি ছিলাম। সে সভার সভাপতি শহরের সবচেয়ে প্রবীণ মানুষ ব্যবহারজীবী নন্দকিশোর সান্যাল ভারী চমৎকার একটা ভাষণ দিয়ে বলেছিলেনঃ 'এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষায় আমাদের এখানকার একটা পুঁচকে ছেলে সকলের মধ্যে ফার্স্ট হয়েছে শুনে তো আমি অবাক। সে আবার আমাদের সামনে ব'সে আছে ভাবলে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমি আমার এই নব্বই বছরের জীবনে ভালো ছাত্র অনেক দেখেছি, ফার্স্ট বয়ও কম দেখিনি। কিন্তু মাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে এমন ছেলে এই প্রথম দেখলাম। তাই ভাবছি, ভাগ্যিস এতদিন বেঁচে আছি তাই তো শ্রীমান গৌতমের মুখখানা দেখলাম। তুমি দীর্ঘজীবী হও।'

নন্দকিশোর বাবু এরপর বললেন, 'এখন যাকে বলে মাধ্যমিক, আগে তাকে বলতো ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা। আমিও চুয়াত্তর বছর আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছিলাম। তখন দেশ ভাগ হয়নি। তবু সারাদেশে পুব-পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে মাত্র হাজার ত্রিশেক ছাত্র ম্যাট্রিক দিয়েছিলো। আর এখন এবারে এই পশ্চিমবঙ্গেই তিনলক্ষ ছেলেমেয়ে মাধ্যমিক দিয়েছে। ভাবতেই পারিনা কী বিশাল এই ব্যাপার, কতটা প্রতিযোগিতা। তার মধ্যে এই ছেলে একেবারে ফার্স্ট? বলিহারি যাই।

'আর একটা কথাও আমি বোলবো। আমি সভা আরম্ভের আগে গৌতমের বাবা-মার সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পারলাম ছেলেটা যে কেবল বই মুখে গুঁজে থাকে তা নয়। বিতর্ক করে, খেলে, সারাপৃথিবীর খেলার খবর রাখে, গল্প-উপন্যাস পড়ে, প্রবন্ধ-গল্প লেখেও। বাপরে, আমাদের সময় এসব তো ভাবাই যেত না। তখন গুড বয়রা ছিলো বুক ওয়ার্ম। খেলার মাঠে তাদের দেখাই যেত না। আসলে এখন পৃথিবী তো অনেক বড় হয়ে গেছে। স্বাধীন দেশ। বিশ্বের সবদেশের সঙ্গে আমাদের এখন লড়ে জায়গা করে নিতে হবে। আধুনিক সব জ্ঞানবিজ্ঞানের খবর রাখতে হবে। নতুন নতুন প্রযুক্তি আর কৃৎকৌশলের হদিশ নিতে হবে। তারপর এখন যাকে বলে কম্পিউটার, স্ট্যাটিস্টিকস আর ইলেকট্রনিক্সের যুগ। এখন কি আর ম্যাদামারা গুড বয়ের যুগ আছে? আমার নাতি নাতনিদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দেখি তো, কত কীই জানে তারা। তাই সবশেষে বলছি শ্রীমান গৌতম, তোমার সামনে বিরাট বিশ্ব। তুমি মেধাবী আর বুদ্ধিমান। সারাবিশ্বের মানচিত্রে তোমাকে ভবিষ্যতে

আমরা চাই। আর এই নব্বই বছরের বৃদ্ধের একটি আবদার আছে তোমার কাছে। ছাখো, বেশিদিন বেঁচে থাকলেই দুঃখতাপ শোকবেদনা একটু বেশি পেতে হয়। তা তোমাকে বাপু একটাই বলবার কথা আমার। যে কদিন বাঁচি যেন শুনতে পাই তুমি সব পরীক্ষায় কেবল ফার্স্ট হয়ে চলেছ, সেকেণ্ড কোনদিন হবে না। এই বৃদ্ধ বয়সে সেই দুঃখটুকু আমাকে দিও না। আমি তা সইতে পারবো না।'

আজো মনে পড়ে চমৎকার সেই সভার স্মৃতি। মনে থাকে সেই প্রবৃদ্ধের গভীর সরস সমঝদারি। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে সেই উদারতা, উচ্চমনের প্রতিফলন দেখি কই? বেশির ভাগই তো সমালোচনাপ্রবণ, নিন্দামুখর। এখনকার শিক্ষক আর শিক্ষার্থী সকলের কাছেই তো নিন্দিত হচ্ছেন। ভেবে দেখার সময় হয়েছে দেশের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক অবক্ষয়ের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন লড়াইটা কাদের?

আজ থেকে বিশ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলার কোনো এক গ্রামে গড়ে উঠেছে একটি কলেজ। যে-অঞ্চলে কলেজটি হয়েছে সেখানে ছিল অসার গহীন জঙ্গল। মনুষ্য-বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। দেশভাগের পর একদল কর্মঠ আর সাহসী নমঃশূদ্র সেখানে জঙ্গল কেটে বসত বানিয়ে নেয়। নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর যখন তারা প্রতিষ্ঠিত হলো অনেকটা তখন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা ঘটলো প্রথমে এক প্রাথমিক বিদ্যালয়, ক্রমে আরেক উচ্চবিদ্যালয়। পরে দেখা গেল, উচ্চবিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক পাশ-করা ছেলেমেয়েগুলি অবর্ণনীয় কষ্টে পড়ছে শহরে গিয়ে উচ্চশিক্ষা নিতে। উদ্যমী আর উচ্চাশাভরা একজন অঞ্চলনেতা তখন স্বপ্ন দেখলেন একটা কলেজ খোলার। রাজনৈতিক দল এককাট্টা হয়ে মহাকরণের শিক্ষাদপ্তর থেকে কলেজ খোলার অনুমতি আদায় করলেন। তপসিলী ও অনুন্নত শ্রেণীর জন্যে সংরক্ষিত কেন্দ্রীয় যোজনার সূত্রে একটা মোটা অনুদান পাওয়া গেল। অনেক স্থানীয় মানুষ ভূমিদান করলেন। সেই জমি বেচে অনেক টাকা হলো। কলেজ শুরু হয়ে গেল এক পরিত্যক্ত নীলকুঠিতে। তখন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ সার্ভিস কমিশন হয়নি। অধ্যাপক নিয়োগে প্রাইভেট কলেজের পরিচালকমণ্ডলীর অনেকটা অবাধ স্বাধীনতা ছিল। সেই সুবাদে কলেজে একটি সুবিধাজনক অধ্যাপকমণ্ডলী গড়ে উঠলো। তাঁরা জ্ঞানবৃদ্ধিতে কেমন, তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল কোন্ পর্যায়ের সেসব তো আমার জানার কথা নয়। কেননা আমি থাকি দূরে। জায়গাটার নামটাই কেবল জানতাম। জানতাম আরো যে সেখানে একটা কলেজ চালু হয়েছে। ভালোই তো।

ভালো যে ততটা নয় তা অবশ্য বুঝতে পারি বছরখানেক পরে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারভাঙা হলে বি এ পরীক্ষকদের এক সভা হচ্ছিল সেদিন। প্রধান পরীক্ষক নির্দেশ দিচ্ছেলেন খাতা দেখার বিষয়ে আমাদের সকলকে। সভার শেষে সবে করিডরে একটু দাঁড়িয়ে বহুদিন বিগত বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের স্মৃতির তাপ নিচ্ছি এমন সময় অকলংক শুভ্রবস্ত্রধারী একজন আমাকে প্রণাম করলো। তার কাঁধ ধরে তুলে দেখলাম আমার অনার্সের প্রাক্তন ছাত্র দেবল মণ্ডল। বললাম, 'তুমি এখানে?'

দেবল বললো, 'পরীক্ষার খাতা নিতে এসেছি স্যার। আপনার সঙ্গেই তো মিটিং করছিলাম।'

ঃ তুমি কলেজে পড়াচ্ছো নাকি? কোন্ কলেজে?

দেবল সেই নবনির্মিত কলেজের নামটা বললো। কিন্তু আমি পড়লাম ধন্দে।

ধন্দ এই যে, আমার স্মৃতি জানান দিচ্ছিলো দেবল ছাত্রজীবনে ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বানান ছিল অশুদ্ধিতে ভরা, বাক্যগঠনের দুর্বলতার জন্য তিরস্কৃত হতো। শেষপর্যন্ত অনার্সও পায়নি। পরে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ পাশ করে বলে জেনেছিলাম। কিন্তু সে যে কোনোভাবেই অধ্যাপনার কাজে উপযুক্ত এমন ভাবার কারণ নেই। ছেলেটির মুখে কিন্তু গর্বিত আত্মপ্রত্যয়ের ছাপ। একবছর অধ্যাপনা করেই হাতে অধ্যাপকসুলভ চামড়ার ব্যাগ নেওয়া রপ্ত করেছে, পোষাকও পরেছে যাকে বলে অধ্যাপক-শোভন। অর্থাৎ ছাপা বাঁধাই ভালো, প্রচ্ছদও দৃষ্টিনন্দন। চিন্তা সেখান থেকেই শুরু হলো।

ফেরবার পথে ট্রেনে দেবলেরই সহপাঠী রাজেনের সঙ্গে দেখা। রাজেন বেশ মেধাবী ছিল। রাইটার্সে কাজও করে ভালো। তার কাছে আমি সারাদিনের জমিয়ে-রাখা বিস্ময় আর মর্মবেদনা উজাড় করে ফেললাম। প্রশ্নও করলাম, 'আচ্ছা দেবল ঐ কলেজে কাজ পেলো কী করে?'

রাজেন সংক্ষেপে বললো, 'ডোনেশন স্যার'।

ঃ তার মানে?

ঃ তার মানে কলেজ ফাণ্ডে ও পঁচিশহাজার টাকা দিয়েছে জমি বেচে। সেটাই কর্তৃপক্ষের শর্ত ছিল। ওর যুক্তি হলো সারাজীবন তো বেকারই থাকতে হতো। তার বদলে অধ্যাপনা। সোজা কথা। ইনসিয়াল ইনভেস্টমেন্ট পঁচিশ হাজার। একবছর বেতন পেলেই শোধবোধ। ও বললো, 'ধরে নিয়েছি

P, 5416

যেন একবছব আমি বেতন পাইনি। পবেব বছব থেকে তো মোটা বেতন প্লাস সামাজিক সম্মান।'

: বাঃ, ছোকবার বুদ্ধি আছে তো? পডাতে পাবে?

: পডাবে কী কবে? ঐ নোটস্ দেয়, কোশ্চেন বলে দেয। খুব অনুন্নত কলেজ, খুব লো স্ট্যাণ্ডার্ড তো, চলে যাচ্ছে। তবে দেবল আরেকটা দাঁও খুব জোব মেবেছে।

: সেটা কী বকম?

: ও তো তপসিলীভুক্ত, তাই ওদেব সমাজে খুব মান্যগণ্য ব্যক্তি। বিযে করেছে খুব ধনাঢ্য পরিবারে। একলাখ টাকা নগদ নিযেছে। ও আমাদেব কিনতে পাবে।

বুঝলাম, বেশিবভাগ অধ্যাপকদেব কঠিন লডাই এই জাযগাতেও। অযোগ্যদেব পাশে সৎ কর্তব্যপ্রবণ, বিবেকী আব মেধাবীদেব আত্মসম্মান বাখাব লডাই।

মনে পডলো অচিন্ত্যবাবুব কথাও। ম্যাট্রিক থেকে আই এস-সি দ্বিতীয আব প্রথম স্থান পেযে পাশ করেছিলেন। বি এ এবং এম এ পবীক্ষাতে হযেছিলেন প্রথমশ্রেণীতে প্রথম। তাবপবে জলপানি পেযে ইংলণ্ড যান। কেম্‌ব্রিজের ডিগ্রি নিযে ফেবেন। প্রথমে অধ্যাপক, পবে কলকাতায় নামজাদা এক কলেজেব অধ্যক্ষতাব গৌবব। কিন্তু সত্যিই গৌরবের কি? তাব সঠিক মূল্য নির্ধাবণেব জন্যে হবিচরণ দত্তেব কাহিনীটাও জানতে হবে।

স্বাধীনতাব পবে অনেক অপ্রধান জনপদ ক্রমে জমজমাট হযে উঠেছে। নানা বর্গেব জনবিস্ফোবণেব চাপে স্কুল-কলেজেব প্রযোজনীযতা বেডে গেছে। ফলে, যে-যেখানে যেভাবে পেবেছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গডে তুলেছে। একেক জাযগায় এমন হযেছে যে হযত সেখানে প্রথম এক শিক্ষিত প্রজন্ম তৈরি হযেছে যাবা কলেজেব মুখ দেখলেন। অশিক্ষিত অভিভাবক আব হঠাৎ-ছাত্রগোষ্ঠীব আচাব ব্যবহাব হযতো তেমন নম্র সহনশীল বা অ্যাকাডেমিক নয। যেমন কবে তাবা জমি হাঁসিল কবেছে তেমনই জোরসত্বে শিক্ষা ও শিক্ষকদের কব্‌জা কবতে অভ্যস্ত। উদ্ধত, জেদী, জঙ্গী—সেইসঙ্গে কোনো-না-কোনো বাজনৈতিক দলেব মদত এ সব শিক্ষার্থীদেব বেপবোয়া কবে দিযেছে। কল্যাণপুব এমনই এক কাল্পনিক নাম যেখানে এমন একটি কলেজ আছে যাব ছাত্রবা ঐ ধরনেব। সেখানে আইন মোতাবেক বিজ্ঞাপন দিযে অধ্যক্ষ নিযোগ করা হয়েছিল। সেই অধ্যক্ষ কলেজ চালাতে পাবেননি। পববর্তী বিধিসম্মত

অধ্যক্ষরাও অপমানিত হয়ে বিদায় নিয়েছেন। অপমান ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে দেখা গেল একজন স্থানীয় অধ্যাপককে (ধরা যাক তাঁর নাম হরিচরণ দত্ত) ছাত্ররা খুব পছন্দ করে। হরিচরণের অবশ্য অধ্যক্ষ হবার মতো যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই কিন্তু কলেজ চালাতে তিনি দক্ষ। কেননা অমন ভয়ংকর জঙ্গী ছাত্ররাও তাঁকে মানে। তিনি তাদের পিঠে হাত রেখে কথা বলেন, পরীক্ষায় অসদুপায় নিলে সেদিকে তাকান না। শোনা যায়, আড়ালে নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতো ধূমপানও করেন। তাঁর জনপ্রিয়তা অবাধ। হরিচরণ স্যার একজন সর্বজনমান্য ব্যক্তি। যাহোক কলেজের গভর্নিং বডি, যার সভাপতি একজন এস ডি ও, ভেবে দেখলেন বাইরে থেকে অধ্যক্ষ এনে কিছুতেই কলেজ চালানো যাবে না ঐ লোকালয়ে। অগত্যা তাঁরা একমত হয়ে হরিচরণ দত্তকে কলেজের অফিসার-ইন-চার্জ করে দেন। এরপরে যাকে বলে স্মুথলি কলেজ চলতে থাকে। বছর বছর স্থায়ী অধ্যক্ষের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় কিন্তু হরিচরণ নানা কৌশলে তাতে প্রতিবন্ধ ঘটান। মোটকথা, সেই ইনটারভিউটা হতে পারে না। কখনও প্রার্থীদের কাছে ভয় দেখিয়ে গোপন চিঠি যায়, কখনও কলেজ গৃহে অধ্যক্ষ পদপ্রার্থীদের আসবার পথে হরিচরণ সমর্থক ছাত্ররা সারি সারি শুয়ে পড়ে। ধ্বনি দেয়ঃ 'চাই না, চাই না। বাইরের অধ্যক্ষ চাই না।'

হরিচরণের অধ্যক্ষ হবার পথে কাঁটা ছিল দুটো। এক, তাঁর কেরিয়ার খুব সাধারণ মাপের। দুই, তাঁর শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা ছিল কম। কিন্তু দেখতে দেখতে সাতটা বছর কাটলো। হরিচরণের একসপিরিয়ান্সের ঘরটা বেশ নধর হয়ে উঠলো। এবারে সবরকমের যোগাযোগ করে, সব জায়গায় পূজো চড়িয়ে তিনি পাকাপাকি অধ্যক্ষ পদে বসে পড়লেন। অচিরে তিনি পশ্চিমবঙ্গ অধ্যক্ষ সমিতির একজন গণনীয় সদস্য হলেন। গণতান্ত্রিক সংস্থার সদস্যপদ এক অক্ষয় রক্ষাকবচ।

তা না হয় হলো, কিন্তু মুড়িমিছরির একই দর হয়ে গেল এই যা দুঃখ। কেননা উজ্জ্বল মেধাবী ডিগ্রিধারী অচিন্ত্যবাবুও প্রিন্সিপ্যাল, হরিচরণও প্রিন্সিপ্যাল। দুজনেরই এক বেতনক্রম, একই সুযোগ। এর বিরোধী ফলাফল ক্রমেই বোঝা যাবে। কেননা অচিন্ত্যবাবুরা এসব দেখে কেবলই গুটিয়ে যান আর হরিচরণবাবুরা শুধুই নিজেদের মেলে ধরেন। এদেশে সত্যিই এমন ঘটনা আছে যে, সর্বৈবভাবে ব্যর্থ অধ্যাপক হয়েছেন উপাচার্য, আঞ্চলিক রাজনৈতিক দলবাজির জোরে অযোগ্য ব্যক্তি হয়েছেন প্রধানশিক্ষক। এ ঘটনাও সত্য,

কলেজ সার্ভিস কমিশনের নিযমে যাঁর কলেজে পডাবার যোগ্যতা নেই তিনি সরাসরি বিশ্ববিদ্যালযের অধ্যাপক হযে জেঁকে বসেছেন।

এসব শুনে আমাব আমলা বন্ধু একজন বললেন, 'আসল প্রবলেমটা কি জানো? প্রবলেমটা হলো নিউমাবিকাল।

'তাব মানে?' আমি জানতে চাই।

: তাব মানে সবটাই সংখ্যায বেডে গেছে। আগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল এখন হযেছে আটটা। আগে একটা ইউনিভার্সিটি ছিল তাই তার একজন ডাকসাইটে ভাইস চ্যান্সেলব ছিলেন। কে? না বাংলার বাঘ। এখন আটটা ইউনিভার্সিটিতে আটজন ডাকসাইটে লোক কোথায় পাবেন? তাই বাঘেব বদলে বেডাল।

পাশেব বন্ধু টিপ্পনী কাটলেন, 'সেই বেডালও কেবল ফাঁচ ফ্যাঁচ করেন আর দেওযালে পিঠ ঠেকিযে লেজ মোটা কবেন। কেননা একদল ইঁদুর জোট পাকিযে বেডালেব লাইফ হেল কবে দেয। তারপব একদিন বেডাল পালালে ইঁদুর-দৌড শুরু হয। ঠিক কিনা।'

: একেবাবে সঠিক। এইভাবেই দেখবে কলেজের সংখ্যা আগের চেয়ে বেডেছে বিশগুণ, স্কুল বেডেছে পঞ্চাশগুণ। একটা জেলায় প্রাইমাবি স্কুল আডাই হাজার। ভাবা যায়? এতসব পোস্টে লোক চাই। নিশ্চয়ই সবাই যোগ্য নয, সবাই উইলিং নয। আমি নিজেব চোখে দেখেছি কলেজের ভর্তির আবেদনপত্রে লেখা আছে 'ছাত্র বা ছাত্রীর অভিভাবকের পেশা'—অভিভাবক একজন স্কুলটিচার হযে নিজে হাতে ফর্ম পূবণ করে লিখেছেন 'টিচারী'। টিচারী কিবকম ইংরাজি মশাই?

আমি বললাম, 'ও এতেই আপনি চমকে যাচ্ছেন? সাবা দেশে এক অল্পবিদ্যাব ভযংকবী কি এক ইংবাজি চালু হযেছে সে আপনি ম্যাগাজিন করতে পাববেন না। ডু ইউ আণ্ডাবপ্যাণ্ট।

বন্ধু ঘাবডে গিযে বললেন, 'সে আবাব কি?'

: ম্যাগাজিন মানে ইমাজিন, আণ্ডাবপ্যাণ্ট বলতে আসলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।

: হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রেনে শুনেছি লোকে বলে 'সিংগ্‌ল্' হয়েছে কিন্তু এখনও ট্রেন ছাডার কথা মাইকে 'অ্যালাউন্স' কবেনি।

: এ সবই ক্রমে চলবে এবং শুদ্ধতা বিদায় নেবে। জানেন কি আমাদের ইংবাজির সহকর্মী শ্যামলবাবুব কীরকম অভিজ্ঞতা হযেছিল? তিনি গিযে-ছিলেন গ্রামেব এক জুনিযব হাইস্কুলেব শিক্ষক নির্বাচনেব ইণ্টারভিউ নিতে।

প্রার্থীরা পাশ গ্র্যাজুয়েট, সেটাই প্রার্থিত। তিনি একজন প্রার্থীকে জিগ্যেস করলেন, 'বি এ-তে আপনার কোন ইংরাজি নাটক পাঠ্য ছিল?' প্রার্থী জবাব দিলেন, 'মার্চেন্ট অফ ভিনিস'। শ্যামলবাবু বললেন, 'মার্চেন্ট অফ ভিনিসে'র কোন্ চরিত্রটা আপনার বিশিষ্ট বলে মনে হয়েছিল?' প্রার্থী নীরব। এবারে শ্যামলবাবু জানতে চান, 'মার্চেন্ট অফ ভিনিস কার লেখা জানেন?' হাস্য-উদ্ভাসিত মুখে প্রার্থী বললেন, 'সে আর জানবোনা স্যার? লিখেছেন—ডি এন ঘোষ।'

এ ঘটনা শুনে দুজন বন্ধুই হো হো করে ঘর ফাটিয়ে হেসে উঠলেন, আর আমার মনে হলো আসলে তাঁরা কাঁদছেন।

শিক্ষাজগতের সঙ্গে জড়িত থাকবার সুবাদে সারাজীবনে কতবার দেখেছি যোগ্য ব্যক্তি তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা বা সমাদর পাননি, উল্‌টোটাও দেখেছি। অর্থাৎ অযোগ্য ব্যক্তি দাপিয়ে গেলেন শুধু ঠিক ঠিক লাইন ধ'রে। এর ফলে শিক্ষাজগতে আজকাল একরকম দালাল শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে, যেমন সব বৃত্তিতেই হয়েছে। এসব দালাল এমনই কানকাটা যে শিক্ষক হয়ে আরেক শিক্ষককে বলেন, 'কেসটা দেখবেন দাদা, ওটা আমার কেস।' এক্ষেত্রে কেস বলতে বুঝতে হবে কখনও অ্যাডমিশন কেস, কখনও প্রোমোশনের কেস, কখনও নম্বর বাড়ানোর কেস।

এইভাবেই পাওয়া যাবে টিউশনী বাগাবার কেস, এগজামিনারশিপ তদুপরি স্ক্রুটিনিয়ার হবার জন্য উমেদারির কেস, ইউনিভার্সিটিতে পার্টটাইম পাবার জন্যে তাঁবেদারির কেস। এঁরা একজন শিক্ষককে খুশি করার জন্যে আরেকজন শিক্ষককে গালিগালাজ করেন। সহকর্মীকে হেনস্থা করবার অন্য সহকর্মীদের নিয়ে দল পাকান। এঁরা ইন্টারভিউয়ের আগে এক্সপার্টের নাম জেনে তাঁর বাড়ি ধাওয়া করেন। অন্যকে দিয়ে বড় মানুষের কাছে পৌঁছে যান। বেনামীতে নোট লেখেন বা অন্যের লেখা নোটস্ ক্লাসে নিজের বলে চালান। সংখ্যায় এঁরাই বেড়ে চলেছেন। আশ্চর্য কি যে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ জাতীয় শিক্ষক বলে সম্মান ও প্রশংসাপত্র পান। অনেকে হয়তো জানেন না যে, এই আজব দেশে জাতীয় শিক্ষক হবার জন্যে সুপারিশসহ লিখিত আবেদন করতে হয়। কোনো আত্মসম্মানসম্পন্ন শিক্ষক কি তা করবেন? এ সবের ফলে হীনতা, দালালি আর উমেদারি যেমন বেড়ে চলেছে, তেমনই স্টাফরুমে শিক্ষকদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে বিদ্যাদান বা সেই অনুষঙ্গী কিছু নয়, বরং পে-কমিশন কিংবা মেহরোত্রা কমিশন, অ্যাসোসিয়েশন কিংবা মিনিস্টার।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

প্রসঙ্গ ঃ কথাশিল্পী ননী ভৌমিক

ধনঞ্জয় দাশ

কথাশিল্পী ননী ভৌমিক তাঁর উপন্যাস 'ধুলোমাটি'-র জন্য এ বছর বঙ্কিম-পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনে শ্রীযুক্ত ভৌমিক-এর অতীত ভূমিকা এবং ১৯৪৩-৪৪ সাল থেকে ১৯৫৭-৫৮ সাল পর্যন্ত কথাসাহিত্যে তাঁর সৃজনশীল অবদান সম্পর্কে যাঁরা কিঞ্চিৎ অবহিত, এই পুরস্কার-প্রাপ্তিতে নিঃসন্দেহে তাঁরা সবাই আনন্দিত। আর, 'পরিচয়' পত্রিকার প্রবীণ ও নবীন লেখকবন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ীদের খুশির মাত্রা যে আরও অধিক, তা বলাই বাহুল্য। কারণ, চল্লিশের দশকের মধ্যভাগ থেকে ননী ভৌমিকই ছিলেন 'পরিচয়'-এর অন্যতম প্রধান লেখক। যতদূর মনে পড়ে, ১৯৫৮ সালে বাংলা ভাষায় অনুবাদকের কর্মভার গ্রহণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নে যাওয়ার প্রাক্‌মুহূর্ত পর্যন্ত বেশ কয়েক বছর ধরে তিনিই যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছিলেন 'পরিচয়' পত্রিকা সম্পাদনার দায়-দায়িত্ব। ঠিক এই সময়ে, পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে, এই পত্রিকার পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সৃজনশীল মনের অনবদ্য ফসল 'ধুলোমাটি' উপন্যাসখানি।

এই নিবন্ধ লিখতে বসে অতীতের অনেক স্মৃতিই আজ মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। প্রায় তিরিশ বছর ননী ভৌমিক মস্কোবাসী। তিনি এখন সোভিয়েত-নাগরিক। এই তিরিশ বছরে বাঙালী পাঠকেরা মস্কোর বিদেশী প্রকাশনালয় থেকে প্রকাশিত বাংলা ভাষায়-অনূদিত অসংখ্য গ্রন্থের সুদক্ষ অনুবাদক রূপে

ননী ভৌমিক-এর সঙ্গে পরিচিত হলেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে তাঁর লেখা কোনো মৌলিক সৃজনশীল রচনা আর পাঠ করার সুযোগ পাননি। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এ যেমন এক অপূরণীয় ক্ষতি, তেমনি নতুন প্রজন্মের পাঠক এবং লেখকদের কাছেও ননী ভৌমিক আজ প্রায় এক বিস্মৃত ব্যক্তিত্ব। দুঃখের হলেও কথাটা সত্যি।

অথচ এই ননী ভৌমিক তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই ছিলেন ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গী। বীরভূম জেলার সিউড়িতে ১৯২১ সালে জন্ম গ্রহণ করলেও তাঁর কলেজ-জীবন কেটেছে রংপুরের কারমাইকেল কলেজে। যতদূর স্মরণে আছে, ১৯৩৮-৪০ সালে তিনি ছিলেন ঐ কলেজে ছাত্রফেডারেশনের অন্যতম নেতা। কমরেড বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন কলেজে ছাত্র ইউনিয়ন গঠনের দাবিতে যে প্রবল ছাত্র-আন্দোলন গড়ে ওঠে, কারমাইকেল কলেজ ছিল তারই একটি প্রধান কেন্দ্র। স্মৃতি যদি প্রতারণা না করে তাহলে বলা যায়, ছাত্র-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে ননীবাবু হয়েছিলেন অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের কোপদৃষ্টির শিকার। সম্ভবত এই সময় ননীবাবুর বিরুদ্ধে কিছু শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও অবলম্বিত হয়েছিল। শুনেছি, এই কলেজের ম্যাগাজিনেই প্রকাশিত হয় ননী ভৌমিক-এর প্রথম রচনা।

বি এস সি পাশ করার পর চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে ননী ভৌমিক চলে আসেন কলকাতায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দুঃসময়ে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের উজাড় গ্রাম-বাঙলার হাহাকার আর শহরে বুভুক্ষু-নিরন্ন ও কঙ্কালসার মানুষের বুকফাটা কান্না শুনতে শুনতে ননী ভৌমিক-এর সাহিত্য-প্রতিভা ক্রমশ বিকশিত হতে থাকে। এই সময়, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি—জগৎ দাশ, সন্তোষ ঘোষ, গিরিশঙ্কর এবং ননী ভৌমিক—এই চারজন তরুণ সাহিত্যিক-বন্ধু মিলে প্রকাশ করেন 'শেষ ট্রেন' নামে একটি কাব্য-পুস্তিকা। নাট্যকার-বন্ধু গিরিশঙ্কর-এর কাছে ১৯৪৮-৪৯ সালে এই কাব্যপুস্তিকা দেখার সুযোগ আমার ঘটেছিল। সুতরাং বলতে পারি, কথাসাহিত্যিক রূপে ননী ভৌমিক-এর আত্মপ্রকাশের আগে কবি রূপেই ঘটে বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম অভিষেক।

ছাত্রজীবনে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট ননী ভৌমিক কলকাতায় এসে ক্রমশই জড়িয়ে পড়েন কমিউনিস্ট পার্টির আন্দোলনে, যুদ্ধ আর মন্বন্তরের পটভূমিকায় তাঁর দেখা মারী আর মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম-বাঙলার নীচুতলার অসহায় নর-নারী—গয়লা বৌ, এন্তাজ, গাঁয়ের গুনীন, সুচাঁদ, বানসর, ময়ালী, আধাক আর শহরের শ্রমজীবী মানুষ জলিল, রহিম, বারেয়া এবং মধ্যবিত্ত

পরিবারের ভগ্নপ্রায় জীবনের দারিদ্র্য-পীড়িত গৃহস্থ-বধূ মিনতির ব্যথা-বেদনা, ক্ষোভ এবং আক্রোশের মানবিক চেতনাদীপ্ত রেখাচিত্র ছোটগল্পের আকারে টান টান ঋজু গদ্যে একে একে বের হতে থাকে ননী ভৌমিক-এর হাত দিয়ে। এগুলিকে হয়তো নিটোল ছোটগল্প রূপে অনেকেই অভিহিত করবেন না। কিন্তু ছোটগল্পের আদলে রিপোর্টাজধর্মী এই সব রচনায় আশ্চর্যভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল যুদ্ধ ও মন্বন্তরে বিধ্বস্ত তৎকালীন সমাজ-বাস্তবতার এক নিখুঁত তথ্যচিত্র। ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে রচিত এইসব লেখা নিয়েই ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় ননী ভৌমিক-এর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'ধানকানা'। এই গল্পগ্রন্থের মাধ্যমেই পাঠকসমাজের কাছে ননীবাবু এক সম্ভাবনাময় শক্তিশালী কথাশিল্পী রূপে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

এরপর ননী ভৌমিক আর থমকে দাঁড়ান নি। ১৯৪৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর প্রয়াত কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর সম্পাদনায় কমিউনিস্ট পার্টির দৈনিক মুখপত্র 'স্বাধীনতা' প্রকাশিত হলে তিনি ঐ পত্রিকার সর্বক্ষণের কর্মী রূপে সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বসূরি কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৪২-৪৩ সাল থেকে 'জনযুদ্ধ'-র পৃষ্ঠায় কমিউনিস্ট নেতা সোমনাথ লাহিড়ীর প্রেরণায় ও পরামর্শে সংগ্রামী মানুষের আন্দোলন ও যন্ত্রণাজর্জর জীবনকে তুলে ধরার জন্য নীরস সাংবাদিক প্রতিবেদনের পরিবর্তে সাহিত্যধর্মী অথচ বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টাজ রচনার যে-দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় তাঁরই সহকর্মী হিসেবে কথাশিল্পী ননী ভৌমিক এবং কবি গোলাম কুদ্দুস মিলিত হয়ে যুদ্ধোত্তর বাঙলার সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্তবাদ-বিরোধী গণসংগ্রামকে ভিত্তি করে সেই ধারা অনুসরণে এমন সব আশ্চর্য রিপোর্টাজ প্রকাশ করতে থাকেন সংবাদপত্রের ইতিহাসে যা এক নতুন সংযোজন।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন, একচেটিয়া মালিকানাধীন বৃহৎ সংবাদপত্র-গোষ্ঠীতে কর্মরত অধিকাংশ সাংবাদিক আজ যে আরাম-আয়াস এবং আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে থেকে তাঁদের সাংবাদিক কর্তব্য সম্পাদন করেন ননীবাবু, সুভাষ মুখার্জি প্রমুখ পদাতিক কমিউনিস্ট সাংবাদিকদের জীবনে তা ছিল দুর্লভ এবং কল্পনাতীত ব্যাপার। তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার এবং কায়েমী স্বার্থবাদীদের দমন-পীড়ন এবং রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে, জীবনের ঝুঁকি নিয়েই এঁদের ছুটে যেতে হতো কল-কারখানা, ক্ষেত-খামারে, কখনো কখনো দূর-দূরান্তরে সংগ্রামরত মেহনতী মানুষের কাছে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে

সারা বাঙলা জুড়ে লক্ষ লক্ষ ভাগচাষীর তেভাগা সংগ্রাম শুরু হলে তাই 'স্বাধীনতা' পত্রিকার পক্ষ থেকে ননী ভৌমিককে ছুটে যেতে হয় উত্তরবঙ্গের তরাই আর ডুয়ার্স অঞ্চল প্রকম্পিত করা তেভাগা আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য, আর গোলাম কুদ্দুস চলে যান দিনাজপুর ও রংপুর জেলার তেভাগা আন্দোলনে উত্তাল গ্রামাঞ্চলের ঘাঁটিগুলিতে। সুভাষদা কোথায় গিয়েছিলেন তা ঠিক জানিনে, কিন্তু তিনি যে চুপ করে বসে ছিলেন না সেটা অনুমান করতে পারি। এই সময় ডুয়ার্সে অবস্থানকালে উত্তরবঙ্গের রেল-শ্রমিক ও চা-শ্রমিকদের প্রিয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ ঘোষ (পটল ঘোষ নামেই সমধিক পরিচিত)-এর সঙ্গে ননী ভৌমিককেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

সাংবাদিক জীবনে ননী ভৌমিক অবিভক্ত বাঙলার বিভিন্ন শ্রেণীর, বিশেষ করে সাধারণ শ্রমিক-কৃষকের নিপীড়িত আত্মার যে-কান্না খুব কাছে থেকে শুনেছিলেন, শোষণ এবং অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে তাদের রুখে দাঁড়াবার যে-দুর্জয় সাহস প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ১৯৪৬-৪৮ সালের মধ্যে রচিত গল্পে আমরা দেখতে পাই তারই নান্দনিক প্রতিফলন। ১৯৪৬ সালের মার্চ-এপ্রিল সংখ্যা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'সলিমের মা' গল্পটি এর একটি সার্থক উদাহরণ। এবার আর 'ধানকানা'-য় সংকলিত রিপোর্টাজধর্মী রেখাচিত্র নয়, আঙ্গিক বিচারে সর্বঅর্থেই তা নিটোল এক ছোট গল্প। ১৯৪৭ সালে 'স্বাধীনতা'-র শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'অহল্যা' গল্পে সদ্য-স্বাধীন ভারতের আনন্দ-উৎসবের মধ্যে দাঙ্গা-পীড়িত ভাঙা-বাঙলার এক দরিদ্র নিম্নবিত্ত মেয়ের নিরানন্দ মনের বোবা কান্নাও ননীবাবু আশ্চর্য শিল্পনৈপুণ্যে সঞ্চারিত করে দিলেন পাঠক-চিত্তে।

উদাহরণ না বাড়িয়েও বলা যায়, চল্লিশের দশক শেষ না হতেই ননী ভৌমিক তাঁর সৃজনশীল প্রতিভার পরিচয় দিয়ে বাঙলার প্রগতিশীল পাঠকদের কাছে তখন থেকেই সার্থক ছোটগল্পের স্রষ্টারূপে একটি স্বীকৃত নাম।

যাহোক, ননী ভৌমিক সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে প্রাসঙ্গিক রাজনীতির দু একটি কথা বলতেই হয়। আমরা জানি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ফ্যাসিবাদের পতনের মধ্য দিয়ে। বিশ্বের মানচিত্রেও ঘটে যায় বিপুল পরিবর্তন। এই সময় পরাধীন ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী যে-আন্দোলন দুর্বার হয়ে ওঠে তা প্রতিহত করার জন্য চতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ আমাদের দেশের আপসকামী নেতাদের হাতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তর

করে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। আর কংগ্রেস ও লীগ নেতারা ভারতবর্ষকে দু' টুকরো করেই শোধ করেন সাম্রাজ্যবাদী স্থিত স্বার্থের ঋণ।

যেহেতু দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধোত্তর কাল থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি তাদের অনুসৃত জনযুদ্ধকালীন নীতি পরিত্যাগ করে ক্রমশই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী গণআন্দোলনে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকে, সেইহেতু খণ্ডিত দেশে কোটি কোটি মানুষকে ছিন্নমূল করে, সব কিছু শোষণ-ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রেখে, যেভাবে স্বাধীনতা এলো তা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলো না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টি যে-রণনীতি গ্রহণ করে তার মূল কথা ছিল: "মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা সাম্রাজ্য-বাদের পশ্চাদপসরণ বোঝায় না, মাউন্ট ব্যাটন পরিকল্পনা জনগণকে যা দিয়েছে তা প্রকৃত স্বাধীনতা নয়, তা হচ্ছে ঝুটা স্বাধীনতা।" ঐ রাজনৈতিক থিসিসে স্পষ্টভাবেই বলা হয়:" ভারতবর্ষের বুর্জোয়ারা, বা অন্য কথায় তাদের প্রতিনিধি কংগ্রেস-নেতৃত্ব, তার বিরোধী ভূমিকা পরিত্যাগ করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছে, সুতরাং তারা প্রতিক্রিয়াশীল।"

কমিউনিস্ট পার্টির পূর্বোক্ত রাজনীতি কার্যকর করার জন্য রণকৌশল-সংক্রান্ত দলিলে পলিটব্যুরো ব্যাখ্যা করে জানালেন, "বুর্জোয়ারা এবং তার সরকার শুধুমাত্র আপসকারী ও সহযোগীই নয়, তারা প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলোর অগ্রবাহিনী।" সুতরাং " জনগণের চেতনায় ও বাস্তবে বিপ্লবের জন্য সংগ্রামের অর্থ হচ্ছে কংগ্রেস সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার সংগ্রাম।"

পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত এই 'বাম-সংকীর্ণতাবাদী, মতান্ধ হটকারী' নীতি কার্যকর করার জন্য অতএব কমিউনিস্ট পার্টি এবং তাদের গণসংগঠনগুলি মুখে 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' স্লোগান তুলে সশস্ত্র সংগ্রামের পথকেই বরণ করে নিল।

ফলে, কংগ্রেস-সরকারও কমিউনিস্ট পার্টির উপর আঘাত হানতে খুব বেশি দেরি করল না। ১৯৪৮ সালের ২৬ মার্চ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। বেআইনী ঘোষিত হলো দৈনিক 'স্বাধনতা' পত্রিকাসহ আরও অনেকগুলো গণসংগঠন। গ্রেপ্তার হলেন হাজার হাজার নেতা ও কর্মী। সাংস্কৃতিক ফ্রন্টও এই আঘাতের হাত থেকে রেহাই পেল না। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রণী নেতা ও লেখক গোপাল হালদার, হীরেন্দ্রনাথ

মুখোপাধ্যায়, সুধী প্রধান, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ আরও অনেকেই নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারের অন্তরালে।

ননী ভৌমিক এই সময় কি অবস্থায় ছিলেন জানিনে। কিন্তু ১৯৪৮ সালের অক্টোবর মাসে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে কলকাতায় এসে আবার যখন ছাত্র ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সেই দমন-পীড়নের মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছি তখন দেখেছি, ননীবাবু বাইরেই আছেন। সেই সময় তাঁকে প্রায়শই লক্ষ্য করেছি সভা-সমিতি কিংবা মিছিলের আশেপাশে, কিন্তু আধা-আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মীদের মতোই যেন সন্তর্পিত তাঁর চলাফেরা। এরি মধ্যে তিনি প্রায়-নিয়মিতভাবেই যেতেন ৪৬ ধর্মতলা স্ট্রীটের প্রগতি লেখক সংঘের অফিসে, সাহিত্য-সভাতেও অংশ গ্রহণ করতে কসুর করতেন-না।

এইভাবে চলাফেরা করা আমাদের পক্ষে বেশি দিন সম্ভব হলো না। ১৯৫০ সালে ৩ জানুয়ারির এক বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের লনে একটি ছাত্রসভায় সভাপতিত্ব করে মিছিল নিয়ে বেরিয়ে আসার পর কলেজ স্ট্রীট আর ভবানী দত্ত লেনের মুখেই ঘটলো পুলিশের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ। বিস্ফোরিত বোমা ও কাঁদানে গ্যাসের ধোঁয়ার মধ্যে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল মিছিল। অতঃপর কলাবাগান বস্তির মধ্যে একজন ছাত্র ও দুইজন ছাত্রীকর্মীসহ পুনর্বার গ্রেপ্তার হলাম আমি। জোড়াসাঁকো থানা থেকে রাত এগারোটার পরে আমাদের সরিয়ে নিয়ে পুলিশ আটক রাখলো লালবাজার সেন্ট্রাল লকআপে।

সারাদিনের ধকলে শরীর ছিল ক্লান্ত, অবসন্ন। সুতরাং আমার সহবন্দী মনোজ চ্যাটার্জী এবং আমি মেঝেয় একটা কম্বল বিছিয়ে অচিরেই ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। গভীর রাতে লকআপে ঢোকার ফলে ভালো করে প্রায় কিছুই দেখিনি। ভোরে উঠে তাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করছিলাম সেন্ট্রাল লকআপের কাণ্ডকারখানা। হঠাৎ উপরে ব্যালকনির দিকে চোখ পড়তেই প্রায় আঁৎকে উঠলাম। অকস্মাৎই আমার মুখ ফস্‌কে একটা বিস্ময়-মিশ্রিত শব্দ বেরিয়ে গেল—'ননীবাবু যে, কখন—'! কথা শেষ করার আগেই হাত-ইশারায় ননীবাবু চুপ করতে বললেন। বুঝলাম, আত্মপরিচয় গোপনের চেষ্টা করছেন তিনি। তারপর কোনো এক ফাঁকে জানতে পারলাম, তিনিও গ্রেপ্তার হয়েছেন ৩ জানুয়ারি সকালে।

দুপুরে আমাদের নিয়ে গেল লর্ড সিংহ রোডে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের অফিসে। তারপর নানা জিজ্ঞাসাবাদ, টিপছাপ, ফটো তোলা ইত্যাদি শেষ করে পাঠিয়ে

দিল প্রেসিডেন্সি জেলে। ননীবাবুকে কোন জেলে নিয়ে গিয়েছিল জানতে পারিনি সে-সময়।

এই সময় পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলেই চলছিল বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন ধর্মঘট। আমাদের ভাগ্য ভালো, তাই 'সদাশয়' কংগ্রেস-সরকার আমাদের দু'জনকে বিনাবিচারে আটক না করে নির্দিষ্ট অভিযোগে বিচারাধীন বন্দী রূপেই আটকে রেখেছিল প্রেসিডেন্সি জেলের 'কুইনিন ওয়ার্ডে'। পরে জেনেছি, ননী ভৌমিক ছিলেন প্রথমাবধি বিনা-বিচারেই আটক রাজনৈতিক বন্দী।

যাহোক, বিচারাধীন কিংবা বিনাবিচারে বন্দী—যাই-ই হোন না কেন, জেলের অভ্যন্তরে এই দুইয়ের মধ্যে তখন বিশেষ কোনো প্রভেদ ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টির 'অতিবামপন্থী হঠকারী' নীতি অনুসরণ করে জেলের অভ্যন্তরেও বন্দী কমিউনিস্ট নেতারা একের পর এক পরিচালনা করেছিলেন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামী নীতি। এই অনশন ধর্মঘট ছিল তারই অঙ্গ।

সুতরাং ৫ অথবা ৬ জানুয়ারি পার্টির জেল-কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের কাছে নির্দেশ এলো অনশন ধর্মঘটে শামিল হওয়ার জন্য। অনুমান করি, ননীবাবুর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

বিচারাধীন বন্দীদের মধ্যে আমরা পাঁচ-ছয় জন ৭ অথবা ৮ জানুয়ারি অনশন ধর্মঘটে যোগ দিলাম এবং পাগলা গারদে লোহার খাঁচায় আবদ্ধ অবস্থায় অনশন চালিয়ে গেলাম ধর্মঘটের অবসান না-ঘটা পর্যন্ত। ননী ভৌমিকও অন্যত্র শামিল হয়েছিলেন এই অনশন ধর্মঘটে।

পূর্বেই বলেছি, আমরা কয়েকজন ছিলাম বিচারাধীন বন্দী। তাই পুলিশ মাস তিনেক আদালতে আমাদের নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া করল। কিন্তু আমাদের বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ পেশ করতে না পারায় আদালত থেকে আমরা বিনাশর্তেই মুক্তির আদেশ পেলাম। কারাগারের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলাম মুক্ত আলো-হাওয়ার রাজ্যে।

কিন্তু নিরাপত্তা আইনে বিনাবিচারে বন্দী ননী ভৌমিক কিংবা তাঁর সহযাত্রী অন্যান্য বন্দীদের জীবনে এই ঘটনা ঘটেনি। অনশন ধর্মঘট শেষ হওয়ার কিছুকাল পরেই কংগ্রেস-সরকার তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার জন্য বিনাবিচারে বন্দী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এক বিরাট অংশকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে সমতলের কারাগার থেকে পাঠাতে শুরু করে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স ও ভুটান-সীমান্তে অবস্থিত বনজঙ্গল আর পাহাড়ঘেরা কুখ্যাত বকসা-

দুর্গের বন্দীনিবাসে। এইভাবেই প্রগতি-সংস্কৃতি আন্দোলনের নেতা চিন্মোহন সেহানবিশ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সহকর্মীদের সঙ্গে ননী ভৌমিককেও পাঠানো হয়েছিল বক্সা-র বন্দীশালায়।

বিনাবিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবিতে বাইরে তখন আন্দোলন বেশ সোচ্চার। আর, প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতির অভিজ্ঞতায় কমিউনিস্ট পার্টির অনুসৃত রাজনৈতিক লাইন নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতেও শুরু করেছে। বিশেষ করে ১৯৫০ সালের ২৭ জানুয়ারি, কমিনফর্ম-এর মুখপত্র 'লাস্টিং পীস'-এ ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে যে-সম্পাদকীয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাকে ভিত্তি করে শুরু হয়ে যায় আন্তঃপার্টি সংগ্রাম। এই পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস-সরকারও তাদের দমননীতি কিঞ্চিৎ শিথিল করে এবং ১৯৫০ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে রাজবন্দীরাও ধীরে ধীরে কারাগারের বাইরে আসতে থাকেন।

ফলে, কুখ্যাত বক্সা-দুর্গে রাজবন্দীদের দুর্ভোগের কালও খুব বেশি প্রলম্বিত হয়নি। যতদূর মনে পড়ে, সেপ্টেম্বরের মধ্যে চিনুদা মুক্তিলাভ করেন। আর, সুভাষদা, ননীবাবু প্রমুখ আরও কিছু বন্দী ঐ বছরের মধ্যেই মুক্তজীবনে ফিরে আসেন।

দুর্ভাগ্য আমার, ১৯৫১ সালের প্রথম দিকে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের হাতে আবার আমি বন্দী হই।

এই সময় ঢাকা জেলে বন্দী থাকাকালে কলকাতা থেকে যেসব পত্র-পত্রিকা সেন্সরশীপের বেড়াজাল ডিঙিয়ে কিংবা গুপ্তপথে আমাদের কাছে পৌঁছাতো তার কোনো কোনোটায় থাকতো ননী ভৌমিক-এর ছোটগল্প। দারুণ আগ্রহ নিয়েই পড়তাম সেগুলো। লক্ষ্য করতাম, ননীবাবুর গল্পের নতুন পালাবদল। তাঁর গল্পের জীবনধর্মিতা এবং আরো পরিণত ও পরিশীলিত শিল্পনৈপুণ্যে সত্যিই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। মনে হতো, ননীবাবুর গল্প যেন প্রচলিত গল্পধারার থেকে ক্রমশ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে, নিপীড়িত নর-নারীর জীবনকাহিনীর মধ্যে তিনি যেন সঞ্চারিত করে দিচ্ছেন গভীরতর প্রতীকী-ব্যঞ্জনা। ১৯৫২-৫৩ সালে সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সত্যযুগ' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত ননীবাবুর এমনি একটি গল্পের প্রতীকী-ব্যঞ্জনা এখনো আমার মনে আছে। গল্পের নামটি মনে নেই। কিন্তু হলধর নামে এক ক্ষেতমজুর আর দারিদ্র্য-পীড়িত তার বৌ অহল্যার জীবনসংগ্রামের কথাই ননীবাবু আশ্চর্য দরদী মন আর শৈল্পিক নিষ্ঠায় তুলে ধরেছিলেন ঐ

গল্পে। না, ননীবাবু হলধরকে জীবনসংগ্রামে জয়ী করেননি, তার মৃত্যুর মধ্যেই শেষ হয়েছিল গল্পটি। মনে পড়ছে গল্পের শেষ পংক্তিটি ছিল : 'হলধর মরেছে, অহল্যা কাঁদছে।'

এই মৃত্যু সেদিন আমার মনে সৃষ্টি করেছিল নতুনতর সংগ্রামী প্রেরণা। মনে হয়েছিল, হলধর এবং অহল্যা শুধু কোনো ব্যক্তিবাচক নাম নয়। যারা কর্ষণ করে অথচ নিরন্ন, তাদের সকলের প্রতীক ঐ হলধর এবং যে-মাটি বা জমির তারা মালিক নয়, তারই প্রতীকী নাম ঐ অহল্যা।

এই সময়কালে, অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে, বন্ধুদের প্রেরিত চিঠির মারফৎ এবং সম্ভবত কোনো একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে জানতে পারলাম, রামমোহন লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রগতি লেখক সংঘের পঞ্চম রাজ্য সম্মেলন এবং ননী ভৌমিক আর মণীন্দ্র রায় নির্বাচিত হয়েছেন সংঘের যুগ্ম-সম্পাদক রূপে। আরও জানলাম, এই সময়পর্বেই ননীবাবু গ্রহণ করেছেন 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্বভার।

দুটি সংবাদেই উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল আমার মন। কারণ, ১৯৪৯ সালের এপ্রিল মাসে প্রগতি লেখক সংঘের চতুর্থ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল দমন-পীড়নের অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যে। এছাড়া ঐ সম্মেলনে গৃহীত হয়েছিল সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট পরিচালনার ক্ষেত্রেও এক হঠকারী নীতি। এর অনিবার্য পরিণামে সংঘের কর্মী ও প্রগতি-সাহিত্য শিবিরে ঘটেছিল নানা বিভেদ, দেখা দিয়েছিল সাংগঠনিক বিপর্যয়। সেই সংকট কাটিয়ে নতুনভাবে সংগঠনকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে নতুনতর চিন্তা-ভাবনায় সঞ্জীবিত করার এই প্রচেষ্টা আমার কাছে ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'পরিচয়' সম্পাদনার অদল-বদল ঘটানোর মধ্যেও আমি দেখতে পেয়েছিলাম ঐ ঈপ্সিত পথে চলারই এক শুভ ইঙ্গিত। আর, যেহেতু এই দুই কর্মকাণ্ডের প্রধান কর্ণধার ননী ভৌমিক, সেইহেতু গভীর আস্থা থেকেই তাঁর উপর ছিল আমার অনেক বেশি প্রত্যাশা।

১৯৫৫ সালে আবু হোসেন সরকার যখন পূর্বপাকিস্তানের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী-সভার মুখ্যমন্ত্রী তখন রাজবন্দীরা মুক্তি পেতে শুরু করেন। রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আমাকেও মুক্তি দেওয়া হয়। কিছুকাল অন্তরীণ থাকার পর ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে আমি পূর্ববাংলা ছেড়ে চিরদিনের মতো আবার চলে আসি কলকাতায়।

ননীবাবু তখনো 'পরিচয়'-এর সম্পাদক। ধর্মতলা স্ট্রীটের (বর্তমান লেনিন সরণি) যে-বাড়িতে বাস করতেন আমাদের পুরনো বন্ধু চিত্ত বিশ্বাস এবং তাঁর স্ত্রী সাহিত্যিক সুলেখা বিশ্বাস (সান্যাল), সেই বাড়িরই একটা ঘরে অবস্থিত ছিল 'পরিচয়'-এর অফিস। সুতরাং পকেটে কবিতা নিয়ে দু-চার দিন পরেই এক বিকেলে হাজির হলাম সেই অফিসে। উপস্থিত হয়ে দেখি অফিসে বসে আছেন ননীবাবু এবং আমার অগ্রজ কবি মণীন্দ্র রায়। দীর্ঘকাল পরেই দেখলাম তাঁকে কিন্তু অত্যন্ত সহজ আন্তরিকতায় তিনি গ্রহণ করলেন আমাকে এবং কবিতাও প্রকাশ করলেন পরবর্তী সংখ্যায়।

সম্ভবত, এর অল্পকাল পরেই 'পরিচয়'-এর অফিস উঠে এসেছিল আজকের এই ঠিকানায়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোডে। বেশ মনে পড়ছে, এই অফিসেই ডিসেম্বর মাসের কোনো একদিন ননীবাবু আমার হাতে তুলে দিলেন টাইপ করা একটা কাগজ। বর্তমান মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির শীর্ষনেতা এবং তৎকালীন 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদক কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায় চিঠিটি লিখেছিলেন ননী ভৌমিককে। তাতে লেখা ছিল : "Release comrade Dhananjoy Das immediately for 'Swadhinata'," সরোজদার হয়তো ধারণা হয়েছিল আমি কলকাতায় ফিরে এসে 'পরিচয়' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এবং যেহেতু ননীবাবুই ছিলেন 'পরিচয়'-এর পার্টি-মনোনীত কর্মকর্তা সেইহেতু 'স্বাধীনতা'-র এককালের কর্মী হিসেবে আমাকে ফেরৎ পাঠাবার জন্য ননীবাবুকেই তিনি অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ননীবাবু সেদিন 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় যোগ দেওয়ার জন্যই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু এর কয়েকদিনের মধ্যেই আমার হাতে এসে পৌঁছায় একটি সরকারী চাকরির নিয়োগপত্র।

এই অবস্থায় দ্বিধান্বিত মন নিয়ে আমি কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য যাই 'স্বাধীনতা' পত্রিকার অফিসে। দুর্ভাগ্য আমার, সেসময় সরোজদা অফিসে উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু অফিসে দেখা হয়ে যায় আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত নেতা কবি-সাংবাদিক কমরেড সরোজ দত্ত-র সঙ্গে। তাঁকেই খুলে বলি সব কথা। সব শুনে তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমাকে সরকারী চাকরি গ্রহণের পরামর্শ দেন। মনের সংশয় তবু কাটে না। আলিমুদ্দিন স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে তাই সোজা চলে যাই আমার রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা প্রমথ ভৌমিক-এর পার্কসার্কাসের বাসায়। প্রমথদাও সব কথা শুনে সেই পরিস্থিতিতে বিপ্লব যখন আসন্ন নয়

তখন সরকারী চাকরি গ্রহণের পক্ষেই তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন। ফলে, কমরেড সরোজ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বান এবং ননীবাবুর পরামর্শ গ্রহণ না করে আমি শেষ পর্যন্ত সরকারী চাকরিতেই যোগ দিই।

যাহোক, আমরা যে-যেখানেই কাজ করিনা কেন; আমাদের সমবয়সী লেখক-বন্ধুদের অনেকেরই তখন প্রায় নিত্য সান্ধ্য-আড্ডা জমে উঠত মহাত্মা গান্ধী রোডের এই 'পরিচয়' অফিসেই। ননীবাবুর অমায়িক ব্যবহার, তাঁর থেকে তরুণতর কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের প্রতিভাকে স্বীকৃতি প্রদান ও পরিচর্যা করার মানসিকতা, প্রগতি সাহিত্যের ধারাকে পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। দেখেছি, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের অগ্রজ নেতা প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার, হিরণকুমার সান্যাল, অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ প্রায়শই এসে মিলিত হচ্ছেন প্রদ্যোৎ গুহ, রাম বসু, বিমল ভৌমিক, প্রমোদ মুখোপাধ্যায়, অসীম রায়, সিদ্ধেশ্বর সেন, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, মিহির সেন সহ আরও অনেক লেখকবন্ধুদের সঙ্গে। এই সময়কালেই 'পরিচয়'-এর পৃষ্ঠায় বন্ধুবর সমরেশ বসু-র কয়েকটি স্মরণীয় গল্প প্রকাশের কৃতিত্ব অবশ্যই ননীবাবুর প্রাপ্য। এই প্রসঙ্গে ননী ভৌমিক-এর আর একটি অবদানের কথা স্মরণ না করলে অন্যায় হবে। ১৯৫৫-৫৬ সাল থেকে তাঁর মস্কোযাত্রার আগেই তিনি সদ্য ছাত্রজীবন শেষ করা কিংবা তখনো ছাত্র এমন এক ঝাঁক উজ্জ্বল তরুণতম সাহিত্যিক-প্রতিভার বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন 'পরিচয়'-পত্রিকায়। কবি শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, যুগান্তর চক্রবর্তী, তরুণ সান্যাল, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শিবশম্ভু পাল, কথাশিল্পী দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি নন্দী, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অমলেন্দু চক্রবর্তী, তপোবিজয় ঘোষ সেই দীর্ঘ তালিকারই কয়েকটি মাত্র নাম। আজ এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের স্বীকৃত ব্যক্তিত্ব। সুতরাং আমরা বলতে পারি, 'পরিচয়'-এর সম্পাদক রূপে ননীবাবু তাঁর দায়িত্ব যথাসাধ্য যোগ্যতার সঙ্গেই পালন করেছিলেন।

এই পর্বে সৃষ্টিশীল ভূমিকা পালনে ননীবাবু কিন্তু যথেষ্ট সজীব ছিলেন। বরং বলা যায়, ননীবাবুর গল্পে এই সময় আরো এক নতুন শৈল্পিক মাত্রা সংযোজিত হয়। ১৯৪৭ সালে 'ধানকানা' গল্পগ্রন্থ প্রকাশের বেশ কিছুকাল পরে পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই একে একে প্রকাশিত হয় 'আগন্তুক', 'পূর্বক্ষণ' এবং 'চৈত্রদিন' নামে তাঁর রচিত গল্প নিয়ে তিনটি সংকলন গ্রন্থ।

একটু প্রবীণ পাঠকদের নিশ্চয় স্মরণে আছে, ষাটের দশকে ছোটগল্পে 'নতুনরীতি' নিয়ে একটা হৈচৈ শুরু হয়েছিল। প্রবীণ বিমল কর থেকে তৎকালে নবীন দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায় প্রমুখ আরও কয়েকজন কথাশিল্পী 'জটায়ু', 'পা' কিংবা 'দুপুর' প্রভৃতি গল্প লিখে পাঠকমনে সাড়াও জাগিয়ে-

ছিলেন। পরবর্তীকালে কোনো কোনো সমালোচক এবং ব্যাখ্যাকার ঐ ধারার গল্পকে চিহ্নিত করেছিলেন 'চেতনাপ্রবাহের গল্প' নামে। আমার ধারণা, এর পূর্বসূরি ছিলেন নিঃসন্দেহে ননী ভৌমিক। 'পূর্বক্ষণ'-এর বেশ কিছু গল্প বিচার-বিশ্লেষণ করে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। আর, এগুলি রচিত হয়েছিল মূলত পঞ্চাশের দশকেই। ননীবাবুর গল্পে বাস্তবচেতনা আর ঋজু ভাষাভঙ্গি প্রথমাবধিই ছিল যথেষ্ট লক্ষণীয়। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি ছোটগল্পের প্রকরণ-পদ্ধতি নিয়েও বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। ছোটগল্প যে নিছক একটি কাহিনী এবং সেই কাহিনীসূত্রে জড়িত দু-একটি নর-নারীর খণ্ডিত জীবন-সংঘাতের উপস্থাপনা মাত্র নয়, এর অন্তরালে লুকিয়ে থাকতে পারে যে গীতিকবিতার মতো ব্যঞ্জনাময় সুষমা, আর তা প্রকাশ করার জন্য কবির মতো যে কল্পনা-প্রতিভা একান্ত অপরিহার্য, 'পূর্বক্ষণ'-এর কিছু গল্পে সেই নান্দনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাও সার্থকভাবে করেছিলেন ননী ভৌমিক। দুঃখের কথা, সম্প্রতি দীর্ঘকাল পরে একমাত্র 'ধ'নকানা' গল্পগ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ ছাড়া ননীবাবুর অন্য কোনো গল্পগ্রন্থ আর বইয়ের বাজারে লভ্য নয়।

ননী ভৌমিক তাঁর সমগ্র সাহিত্য-জীবনে একটি মাত্রই উপন্যাস লিখেছেন। 'ধুলোমাটি' নামে সেই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৭ সালে, তাঁর মস্কোযাত্রার প্রাকমুহূর্তে। এর প্রথম সংস্করণ দীর্ঘকাল আগেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তারপর ১৯৮৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে এর দ্বিতীয় মুদ্রণ। সেই 'ধুলোমাটি'-উপন্যাসখানির জন্যই এবার ননী ভৌমিককে বঙ্কিম-পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

প্রথম প্রকাশের পর বিদগ্ধ সমালোচকেরা 'ধুলোমাটি'র স্রষ্টা উপন্যাসিক ননী ভৌমিককে তাঁর অনুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং তা প্রকাশের শৈল্পিক দক্ষতার জন্য অকুণ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। আমি এই উপন্যাসের কোনো পর্যালোচনায় এখন প্রবৃত্ত হচ্ছি না। শুধু বলতে পারি, এই উপন্যাসে ননীবাবু জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস আন্দোলন, সহিংস বিপ্লববাদী আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিকতাবাদী কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রে জড়িত তিন প্রজন্মের অসংখ্য নর-নারীর দ্বন্দ্ব সংঘাত ও উত্তরণের যে অনুপুঙ্খ চিত্র উদ্ঘাটন করেছেন তৃতীয় প্রজন্মের সন্তান বীরুর মাধ্যমে, তা এপিকধর্মী উপন্যাসেরই লক্ষণাক্রান্ত।

এত শক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে ছিল যে-সৃজনশীল লেখকের মধ্যে, তিনি তিরিশ বছরেরও অধিককাল কেন যে নীরব, তা আমার কাছে সত্যিই রহস্যাবৃত। এই তিরিশ বছরে ননী বাবু অনেক চমৎকার অনুবাদ-কর্ম আমাদের উপহার দিয়েছেন একথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেন পাইনি আমরা তাঁর নিজস্ব সৃজনশীলতার কোনো নিদর্শন? এই প্রশ্ন মাঝে মাঝে আমাকে এবং হয়তো তাঁর অনুরাগী আরো অনেক পাঠককে ব্যাকুল করে তোলে।

ভোর আকাশের তারা

চন্দন সেন

সাহিত্য, সংস্কৃতির আঙিনায় 'গ্লাসনস্ত' বা মুক্ত হাওয়ার তুফান সোভিয়েত দেশে কি শুধুই অবিমিশ্র ইতিবাচক ভাঙাগড়া সংঘটিত করছে? সেখানে অবশ্য মৃদু মন্দ মলয় বাতাস বইছিল অনেকদিন, কিন্তু মুক্ত হাওয়ার প্রবল বেগ বা তুফান বইছে বড় জোর ৩-৪ বছর। সাহিত্য বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের মূল্যায়ণ করার জন্য মাত্র ৩-৪ বছরের সময়সীমা বড় সংক্ষিপ্ত কাল। কিছুটা অনির্ভরযোগ্যও বটে। তবে ট্রানজিসন পিরিয়ডে বা পরিবৃত্তিকালে অনেক সময়ই মাত্র দু তিনটি যুগান্তকারী লেখা বা নাটককে সামনে রেখে হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে তা আঁচ করার চেষ্টা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই সোভিয়েত দেশের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলোকে অনুধাবন করতে এমন অসংখ্য চেষ্টা সারা দুনিয়ার পত্র পত্রিকায় এখন দেখা যাচ্ছে। হয়তো এসব চেষ্টার উদ্দেশ্য সবটা সৎ নয়, চেষ্টা যাঁরা করছেন তাদের অনেকেরই দৃষ্টিভঙ্গী হয়তো উদার বা নিরপেক্ষ নয়।—তবু সোভিয়েতের সমাজ জীবনে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা যে বহুব্যাপ্ত পরিবর্তন আনছে, যার ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটো দিকই সোভিয়েত পত্র-পত্রিকার এবং সোভিয়েতের বাইরের অসংখ্য পত্র-পত্রিকার অজস্র লেখার সংবাদ হিসাবে প্রকাশিত বা নিবন্ধ হিসাবে আলোচিত হচ্ছে তার থেকে ঘটমান বর্তমান বা ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছুটা আঁচ পাওয়ার সুযোগ বা প্রয়োজন আছে বৈকি।

সাহিত্যের বিষয়টি থাক, আমরা এই নিবন্ধে শুধু সংস্কৃতির ক্ষেত্রে গ্লাসনস্ত-এর উথালপাথাল পরিবর্তনের রূপরেখাটি অনুধাবনের সূত্রে দু-একটি নাটকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করব, যার মধ্যে একটি নাটক লেনিনগ্রাদ ম্যালিড্রামা থিয়েটারে অভিনীত হয়ে চলতি সময়ে অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়েছে, এবং সোভিয়েতে ও সোভিয়েতের বাইরে তুমুল বাদপ্রতিবাদের সৃষ্টি করেছে। তার আগে বলে নেওয়া দরকার, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীই স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করছে যে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামান্যতম সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা চাপ এখন আর সোভিয়েত দেশে নেই। অথচ বিপুল গণমানসে নাটকের প্রভাব (বিশেষ করে সোভিয়েত দেশে) এখনও প্রবল বলে বুলগাকভ, এল জোরিণ, শাতরভ, এ. সালিন্স্কি প্রমুখ অনেকেরই বহু নাটক ব্রেজনেভ-জামানায় মঞ্চস্থ হতে পারে নি। মাত্র ক'বছরের মধ্যেই মঞ্চের দরজা এদের সবার জন্য খুলে তো গেলই, সঙ্গে এলেন নভোকভ, প্লাতোনভ, গ্রসমানরা- যাঁরা একসময় সমাজতান্ত্রিক সাহিত্য-সংস্কৃতির পক্ষে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছিলেন। সলোঝেনিৎসিন প্রবাসের নিরাপদ স্বেচ্ছা নির্বাসিত ডেরায় বসে এখন লেনিন-বিরোধী বিশাল উপন্যাস রচনায় রত। বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যেই সোভিয়েতের নাট্যমঞ্চে সলোঝেনিৎসিন-কেও রূপায়ণের প্রস্তুতি চলছে।

তবুও নাট্যকার নাট্যস্রষ্টাদের মধ্যে এই খোলা হাওয়া, এই অবাধ সবপেয়েছির আনন্দ কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি প্রত্যাশিত সুফল আনতে পারে নি। দায়বদ্ধতা না থাকার দায় থেকেই সম্ভবতঃ তাঁরা এমন সব বিষয়বস্তু মঞ্চায়নের জন্য ভাবছেন যা বহিরঙ্গে আকর্ষণীয়, কিছুটা "দুঃসাহসিক", কিছুটা "বৈপ্লবিক" হলেও আসলে অন্তরংগে সরল ও অগভীর। গভীরতার ছাপ নামকরণে বা বিষয়বস্তু নির্বাচনেই, কিন্তু সব মিলিয়ে সেখানেও ধূসর পৌনঃ-পুনিকতা, কিছুটা একঘেয়েমি, যা দ্রুত ক্লান্তি ও অবসাদ বয়ে আনছে।

সম্প্রতি 'আশির দশকের নাট্য-পরিস্থিতি' নিবন্ধে প্রখ্যাত সমালোচক ই, ভিশেনস্কায়া তাঁর 'ক্রুদ্ধ চিন্তাবলী' প্রকাশ করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন— "গ্লাসনস্ত-এর প্রভাব নাটকের ক্ষেত্রে খুব একটা শুভ হয় নি।"

ভিশেনস্কায়ার সাম্প্রতিকতম এই লেখাটির অনুবাদ এখনো আমাদের দেশে প্রকাশিত হয় নি। তাঁর মতে নাট্যক্ষেত্রে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে যেখানে সকলেই সমবেতভাবে প্রায় একই বিষয় যেমন স্তালিনের আমলের অত্যাচার অনাচার-বৃত্তান্ত নিয়েই ব্যস্ত। "এ সব লেখার মধ্যে পদ্ধতির বৈচিত্র্য নেই, নেই অতি সরলীকরণের ঝোঁক এড়ানোর চেষ্টা। সেই সময়ে

মানুষে মানুষে পরিবারে পরিবারে যে মনস্তাত্ত্বিক সংঘাত, শহীদ আর হত্যাকারীর পারস্পরিক স্থান পরিবর্তনের যে মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া—এসব ঘটনা নাটকের মধ্যে অনুপস্থিত। বর্তমানে রচিত অধিকাংশ নাটকেরই তথ্যগত ভিত্তি হচ্ছে সংবাদপত্র ও বহু রকম পত্র-পত্রিকা,—যেমন দুর্নীতি, বেশ্যাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, কালোবাজারী ইত্যাদি তথ্য। তথ্যের ভূমিকা নাটক রচনার ক্ষেত্রে মূল্যবান সন্দেহ নেই, তবে শুধুমাত্র তথ্যই কোন একটি নাটকের প্রয়োজন মেটাতে পারে না।" (ই ভিশেনস্কায়া—"আশির দশকের শেষে নাট্য পরিস্থিতি) যেমন স্তালিনের উত্তর যৌবনকালের প্রেম (?) ও স্তালিন-নাদেঝদা সম্পর্ক বিষয়ক ওল্গা কুচ্‌কিনার মত খ্যাতনামা নাট্যকার-এর লেখা 'ক্রেমলিন থিয়েটার' বা 'জোশেফ ও নাদেঝদা" নাটকটির কথা ধরা যেতে পারে। চমৎকার সংলাপ, ৪০ বছরের স্তালিন ও ষোড়শী নাদেঝদার মধ্যে অসম মনস্তাত্ত্বিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার আপ্লুত কাল্পনিক বিবরণ, স্তালিনের অতি-আবেগ যা প্রায়ই তাঁর হৃদয়হীনতা বা নিষ্ঠুরতাকে উন্মত্ততার পর্যায়ে নিয়ে যায়, আর এরই বিপ্রতীপে নাদেঝদার আপাপবিদ্ধ কিশোরী আবেগ, ভয়ংকর এক ব্যক্তিত্বের প্রতি ভীতি আর ভালবাসা—সব মিলিয়ে একটি জমাট চমৎকার নাটকের সম্ভাবনাকে আমাদের সামনে তুলে ধরে। কিন্তু পরিণতিতে স্তালিনকে নিষ্ঠুর দানব সাজাবার সরলীকৃত ঝোঁক এক ভয়ংকর সস্তা পরিণতির দিকে আমাদের নিয়ে যায়, কিশোরী নাদেঝদা স্তালিনের বিভলভার দিয়েই অকস্মাৎ আত্মহত্যা করে এবং প্রমাণ করে দিয়ে যায়, সোভিয়েত রাশিয়ার এই সাম্প্রতিক চাঁদমারিটি আগলে মানবতার সামান্যতম গুণবর্জিত একটি নির্ভেজাল দানবমাত্র (তাই ব্যক্তিগত প্রেমের ক্ষেত্রেও তাঁর ভিলেনি আপোষহীন।

তুলনায় আমাদের আলোচ্য "ভোর আকাশের তারা" অনেক পরিণত নাটক, কারণ নাটকটির মধ্যে কিছু গভীর কথা উচ্চারণের প্রয়াস আছে। নাট্যকার আলেকজান্দার গালিন,—বর্তমান সোভিয়েত নাট্যজগতের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব—সব চাইতে জনপ্রিয় নাট্যকার। কিন্তু নাটকটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যত ভয়াবহ ও চাঞ্চল্যকর সত্যের সামনে আমাদের দাঁড় করায়, পরিবেশনার দৃষ্টিভঙ্গীতে তার চাইতেও বেশি বেদনাক্ষুব্ধ অস্বস্তির জন্ম দেয়। সত্তরোর্দ্ধ বয়সের একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গোপনে দেহব্যবসার রমরমা বাজার চালাতো যে মস্কোবাসিনীরা, ৮০-র অলিম্পিকের প্রাক্কালে "শহর পরিচ্ছন্নতার" প্রয়োজনে তাদের শহরের বাইরে বার করে দেওয়া হয়। সেখানে আরো সব অসামাজিক নরনারীর মুখোমুখি হয় তারা। এদের মধ্যে

সবচাইতে উল্লেখ্য আনা নামক মেয়েটি, সে একজন প্রাক্তন কমশোমল কর্মী এবং জীবনে সদর্থক কিছু খুঁজে পাবার প্রয়াস যাকে শেষ পর্যন্ত সুরার বোতলের প্রতি একমুখী দুর্বলতার শিকার করে তুলেছে। মস্কোর সেই "পাপী" মেয়েদের মধ্যে লরা আর মারিয়া অকস্মাৎ সেই নতুন পরিবেশে প্রেমের খোঁজ পেয়ে যায়,—একজন, অলিম্পিকের মশাল যাত্রা পাহারা দেবার ভারপ্রাপ্ত এক পুলিশের সঙ্গে আর একজন, কিছুটা চন্দ্রাহত এক তরুণ চিকিৎসকের সঙ্গে গভীরতর সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাদের প্রেম পবিত্র হলেও, থিয়েটারের নিয়ম অনুযায়ী তা সার্থকতা পায় না। পুলিশের প্রেমিকাটি শেষ পর্যন্ত একদল তরুণ প্লেবয়-বেপিস্টের হাতে ধর্ষিতা হয় নিষ্ঠুরভাবে, আর স্বপ্নদর্শী চিকিৎসক তার প্রেমিকার আসল পরিচয় জানতে পেরে ভেঙে পড়েন। ঐ প্লেবয় বেপিস্টের দলও এখন সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার এক পরিচিত অংশ —যারা দামী ভদ্‌কা, আমদানীকরা সিগারেট এবং বিদেশী গাড়িতে হৈ-হৈ করে শিকার ধরে বেড়ায়। নাটকের উপান্তে ধর্ষিতা মেয়েটির প্রসঙ্গে আনা মত্ত আবেগে চীৎকার করে ওঠে, সে ধর্ষিতা হল সে তো ভার্জিন মেরী নয়, মারিয়া,—মেরীকে তো এমন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়নি, মারিয়াকে হয়েছে। শেষে অনেকটা দার্শনিকের ভঙ্গীতে নিজের পতনের ইতিহাস বলতে বলতে বিপথগামিনী মেয়েটি বলে ওঠে, সবকারের কাছে সে কৃতজ্ঞ সবকার তাকে বিনামূল্যে শিক্ষা দিয়েছে, এবং সে এই অন্ধকারে নেমে আসার পরও তার সন্তানকেও দেখাশোনা করছে সবকার। কোন ক্ষোভ নয়, বিষোদ্গার নয়, একটা অদ্ভুত অন্তর্শীল আত্মজিজ্ঞাসায় মেয়েটি বার বার বলতে থাকে— "দোষ দেব কাকে? বলতে পার কাকে?"

দীর্ঘদিন সাহিত্যে ও মঞ্চে আমরা ইতিবাচক গুণসম্পন্না দেহজীবিনীর সাক্ষাৎ পাইনি। দস্তয়েভস্কির সোনিয়া, তলস্তয়ের কাতিয়া মাস্‌লোভা কিম্বা হেমিংওয়ে, সার্ত্র, বেমার্ক বা মার্কুইস্-এর সৃষ্ট দেহজীবিনী চরিত্রের সমান্তরাল কোন চরিত্র অনেকদিনই আমরা দেখতে পাইনি। অন্ততঃ সোভিয়েত সাহিত্যে বা মঞ্চে তো নয়ই। কারণ ধরে নেওয়া হয়েছিল, সোভিয়েত সমাজব্যবস্থায় এসবের কোন অস্তিত্বই নেই। গ্যালিনের "ভোর আকাশের তারা"—এসব ধারণার বেলুনকে পিনবিদ্ধ করছে,—পাশাপাশি চেকভের "তিন বোন"-এর মতই এক চরম দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায় আমাদের— "কেন আমরা বাঁচি, কেনই বা যন্ত্রণা পাই?"—যদি জানতে পারতাম, হায়, যদি একবার এর উত্তর জানতে পারতাম!"

সোভিয়েত সমাজব্যবস্থার ফাটলগুলোকে বা মুখোশের তলায় আসল মুখগুলোকে উন্মোচন করা প্রবলভাবে সুরু করেছে গ্লাসনস্তের হাওয়ার ফসল এইসব নাটক। এই উন্মোচন একদিকে প্রতিসরণী-করনের জন্ম দিচ্ছে, অন্যদিকে কিছু বিব্রতকর প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করাচ্ছে সমাজতন্ত্রের সমর্থক ও তাত্ত্বিকদের। গ্যালিনের নাটক শুধুই বেশ কিছু প্রচলিত ধারণাকে নস্যাৎ করেনি, শুধুই পরম গম্ভীর এক জীবনজিজ্ঞাসার সামনে দর্শকদের দাঁড় করায়নি, পাশাপাশি উপস্থাপনা, সংলাপ ও দৃশ্যপ্রকল্পে এমন কিছু অভিনবত্ব দেখিয়েছে, যাকে কেন্দ্র করে পূর্ব গোলার্ধের এই প্রান্তে আমরা যথেষ্ট আশঙ্কা আর উদ্বেগ বোধ করতে পারি।

সোভিয়েত মঞ্চে এই প্রথম চরিত্রগুলো কখনো প্রায় বিবস্ত্র কখনো পুরো বিবস্ত্র হয়ে অভিনয় করছে, রেড লাইট্ এলাকার নিজস্ব ভাষা, আচরণ এবং ঝগড়া—ইত্যাদির অতি-বাস্তব উপস্থাপনা গালিনের নাটকটিকে রাতারাতি খ্যাত ও বিতর্কিত করে তুলেছে। সব ছাপিয়ে এখন যে প্রশ্ন প্রবল হয়ে উঠছে তা হোল পপ-রক-পাংক কালচারের এই আকস্মিক প্লাবনে নিমজ্জিত যুবসমাজের একটা বড় অংশের শৃংখল কিম্বা শৃংখলাভাঙা প্রমত্ততার কাছে তবে কি গ্যালিনের মত নাট্যকারকেও নতজানু হতে হচ্ছে আজ? এখন তবে সুইডিশ হট্-থিয়েটারের কিম্বা আমেরিকান লিভিং থিয়েটারের পুরনো পরিত্যক্ত চটিগুলোতে চেকভ-স্তানিস্লাভস্কি মায়াকোভস্কি-আরবুজভের উত্তরসূরিদের পা গলাবার পালা। থিয়েটারে এধরণের ন্যুডিটি কোন্ রিয়ালিজমের তকমা এটে দর্শক আকর্ষণের অব্যর্থ উপায় হয়ে দাঁড়ায় তা আমাদের জানা আছে। যা জানা নেই তা হোল এমন অতি-উষ্ণ নাট্য-উপস্থাপনা শেষ পর্যন্ত কোন গভীরতর গাড্ডায় সোভিয়েত থিয়েটারকে টেনে নিয়ে যাবে কিম্বা সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতির তত্ত্বে কিভাবে উচ্চ দার্শনিকতার মোড়কে ঢাকা এমন বে-আব্রু উপস্থাপনা সমর্থন পেতে পারে? কিম্বা কে জানে সমাজতন্ত্রের নিজস্ব কোন সংস্কৃতিতত্ত্ব হয় কিনা তাই নিয়েই হয়তো এখন প্রশ্ন ওঠার পালা!

পেরেস্ত্রোইকার পূর্বাপর

অনিশ্চয় চক্রবর্তী

৮৭ সালের গরমের সময় গর্বাচভ যখন তাঁর 'পেরেস্ত্রোইকা ও নতুন চিন্তা' লিখছিলেন সেসময় বেশ কিছুদিন তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায় নি। তখন ইওরোপ ও আমেরিকার সোভিয়েত বিশেষজ্ঞরা গবেষণা করেছিলেন যে গর্বাচভকে গোপনে নেতৃত্বের লড়াই লড়তে হচ্ছে। বইটি বেরবার পর জানা গিয়েছিল গর্বাচভ গরমের সময় এই বইটিই লিখছিলেন। এবার বার্ষিক অবকাশ যাপনের পর প্রথম প্রকাশ্য কথাবার্তায় গর্বাচভ পেরেস্ত্রোইকার পক্ষে এক কঠিন সময়পর্বের কথাই বেশি বেশি করে বলেছেন যা, সমস্ত কাগজপত্রে, প্রায় স্বীকারোক্তির ঢঙে, বেরনোর পর পেরেস্ত্রোইকার সংকট নিয়ে আলোচনা এখন তুঙ্গে। অনেকেই প্রথম রাউণ্ডে গর্বাচভের পরাজয়কে স্কোরশিটে তুলে ফেলেছেন।

বিপদ কোনদিক থেকে আসতে পারে তা ভালভাবেই টের পাওয়া গিয়েছিল এপ্রিল-মে মাসে, সোভিয়েত ইউনিয়নের এবারের ভোটের ফলাফলে। বোঝা যাচ্ছিল, পেরেস্ত্রোইকা বা পুনর্গঠনের গতির মাত্রাবৃদ্ধির চাহিদার ভিতরেই নিহিত আছে আশঙ্কার নতুনতর ক্ষেত্র। সেই ভোটে পার্টি হারেনি, হেরেছিল পার্টির ভিতরের রক্ষণশীলরা, যারা পেরেস্ত্রোইকার বিরুদ্ধে। যারা পেরেস্ত্রোইকার আরো গতি চায় সেই অতি উৎসাহীদের সঙ্গে পেরেস্ত্রোইকার স্বাভাবিক গতির একটা ভারসাম্য রাখার কাজই ভোটের অব্যবহিতে

গর্বাচভকে কঠিন পবীক্ষাব সামনে ফেলবে, এটা ভোটের ফলাফলেই স্পষ্ট ছিল। এখন, তাব সঙ্গে যুক্ত হযেছে বক্ষণশীলদের অসহযোগ। একদিকে পেবে-স্ত্রোইকার প্রতি অনীহা ও অপছন্দেব শক্তি, অন্যদিকে পেবেস্ত্রোইকাকে প্রযোজনেব চেযেও আবো গতিময কবে তোলার প্রবোচক শক্তি—এই দুযের ভিতব এক গভীব মাত্রাবোধ বক্ষা কবে যাবার কঠিন লডাইযেব দায, গর্বাচভেব। গর্বাচভ পেবেস্ত্রোইকাব নেতা, অথচ এখন, এই দুই বিপবীতমুখী সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য।

৮৮-ব জুলাইতে ১৯তম পার্টি সম্মিলনের প্রস্তাবে গর্বাচভ 'নির্বাচিত ডেপুটিদেব বাস্তব বাজনৈতিক প্রভাব', এবং 'নির্বাচকদেব ইচ্ছাব সজীব এবং অবাধ প্রতিফলন'-এর কথা বলেছিলেন। তাব আগে, 'পেবেস্ত্রোইকা ও নতুন চিন্তা'-ব দ্বিতীয অধ্যায়ে একটা বড অংশ জুডে গর্বাচভ গণতন্ত্রেব কথা লিখেছিলেন, যা সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনের কাজে মূল অবলম্বন। ওই একই জাযগায গর্বাচভ উল্লেখ কবেছিলেন, 'এক ধরণেব বিচ্ছিন্নতাব এক অস্বস্তিকর প্রভাব' সম্পর্কে, যা তৈরি হয বাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির মধ্যে, যৌথ কর্মক্ষেত্র আব সাধাবণ শ্রমিকদেব মধ্যে সম্পর্ক দুর্বল হযে গেলে, সমাজতান্ত্রিক সমাজেব বিকাশে তাদেব ভূমিকা ছোট কবে দেখলে।

সোভিযেত ইউনিযন থেকে এক অন্য গণতন্ত্রের হাওযা আমরা কিছুদিন ধবেই পাচ্ছি। গর্বাচভ আসাব পব থেকে ব্যক্তি ও গণতন্ত্রেব প্রশ্নকে পাশ কাটিযে না গিযে তাব মুখোমুখি দাঁডানোর চেষ্টা শুরু হয়। বোঝা যাচ্ছিল, গর্বাচভ একজন সোভিযেত নাগরিকেব ব্যক্তিত্ব ফুটিযে তোলার মত সামাজিক পবিবেশ তৈবি কবতে চান। তিনি সেই ব্যক্তিকে দিতে চান গণতন্ত্রের স্বভাব আযত্ত কবে নেবার বাস্তব সামাজিক সুযোগ। গণতন্ত্র ঘোষণা আব গণতন্ত্রের স্বভাব আযত্ত কবা ত এক জিনিশ নয। এতদিন সোভিযেতেব একজন নাগরিককে বাষ্ট্র ও পার্টি যেভাবে চিনত তাতে সে কোন রাষ্ট্রীয খামারেব বা সমবাযেব বা কাবখানাব কর্মী, সামাজিক কাঠামোব কোথায তার অবস্থান, সেই পরিচযটাই প্রধান ছিল। এতে সেই ব্যক্তি মানুষটাই যেত হাবিয়ে। গর্বাচভ সেই হাবানো ব্যক্তিত্বেব পুনরুদ্ধার চাইছিলেন, গত ৭০ বছরে সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ গডে তোলাব ইতিহাসের নানাপর্বে কেন্দ্রিকতাব বাডাবাডি, হুকুমনামায প্রশাসন চালানো, এবং আরো নানা আমলাতান্ত্রিকতার চাপে যে হাবিযে যেতে বসেছিল। শুধু যে ব্যক্তি-ই হাবিযে যাচ্ছিল তা নয়। বাজনৈতিক প্রযোজনীযতা, আন্তর্জাতিক উত্তেজনা বা দেশেব শ্রেণীসংগ্রামের

বাড়াবাড়ির মত বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে সমস্ত স্তরেই সমালোচনার গুরুত্বকে অস্বীকার করা হতে থাকলে, তা লেনিনবাদী পার্টির মূল ভিত্তিকেও গ্রাস করে। তাতে পার্টির ভিতরের গণতান্ত্রিক অভ্যাস যায় নষ্ট হয়ে, সমাজতান্ত্রিক অগ্রগতি থেমে থাকে আর সমাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রকে সরিয়ে নিলে তা ত মানুষের শরীর থেকে ফুসফুস বাদ দেওয়ার সমান। সোভিয়েত ইউনিয়নে দশকের পর দশক ধরে গণতন্ত্রের সেই অভ্যাস যেন নষ্টই করে দেখা হয়েছে। বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক অসমাপ্ত কাজ, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরে শেষ করতে হয়। তাতেও ন্যূনতম গণতান্ত্রিক পরিবেশের দরকার, সোভিয়েত থেকে আসা বেশ কিছু ঘটনার খবরে, এখন, মনে হতে পারে, সেটুকুও ছিল না। এই না-থাকাটা কখনো সমাজতন্ত্রকে এমন কী পুঁজিবাদের চেয়েও কঠিন সংকটের কিনারায় এনে ফেলতে পারে। গর্বাচভ সেই বিপদের, সংকটের আঁচ পাচ্ছিলেন। আর পাচ্ছিলেন সাহস, আত্মসমালোচনার, প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের।

আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা যেমন বেড়ে গিয়েছিল সমাজে, তেমনই তা পার্টিকেও গ্রাস করেছিল সঙ্গত কারণেই। এমনও হতে পারে, পার্টি থেকেই এই প্রবনতা সমাজে ছড়িয়ে ছিল। প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বে পার্টির যে ভূমিকা, তার কোনো ধরণের চ্যুতিই ত সামাজিক প্রভাব তৈরি করতে পারে, নেতিবাচক। যা হয়, জনসাধারণ থেকে পার্টির নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা চিন্তাভাবনার শরিক হওয়ার ক্ষেত্রে পার্টির ব্যর্থতা সমাজকে ভুল পথে নিয়ে যায়, আপাত অবৈর দ্বন্দ্ব কালে-দিনে বিস্ফোরক হয়ে ওঠে। সংকট থেকে ক্রমশ সংঘর্ষের দিকে যায়। সমাজতন্ত্রবিরোধী শক্তিগুলো সেসবের সুযোগ নিতে জেগে ওঠে। এটা ত আমাদের জানা হয়ে গেছে যে সমাজতান্ত্রিক সমাজেও দ্বন্দ্ব থাকে, যার চরিত্র অবিশ্যি কখনই পুঁজিবাদী সমাজের মত নয়। এই দ্বন্দ্বের নিরসন সঠিক পথে হবে কিনা তা প্রধানত পার্টি নেতৃত্বের বিচক্ষণতা, জনগণের সঙ্গে পার্টি নেতৃত্বের যোগাযোগের সেতু তৈরি ও সমস্যা উপলব্ধি করার কাজে পার্টি নেতৃত্বের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে।

পার্টিকে মায়াকভস্কি দেখেছিলেন দিকনির্দেশক কম্পাসের মত, তাঁর কবিতায়। পার্টি সেই কম্পাস হয়ে উঠতে পারে একমাত্র জনগণের সঙ্গে জীবন্ত সংযোগ সংলাপের মধ্য দিয়েই। পার্টিতে আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা আটকানোর একমাত্র উপায় হিশেবেই লেনিন জনসংযোগের কথা বারবার

বলেছেন, তাঁর বিপ্লবোত্তর লেখাপত্রে। মানুষের কাছে সরাসরি গিয়ে মানুষের, নতুন চিন্তা ও আশাআকাঙ্ক্ষার স্রোত অব্যাহত রেখেই পার্টিকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে বাঁচানো যায়, আমলাতান্ত্রিক প্রবণতা হঠানো যায়। এসব লেনিনের অভিজ্ঞতার সত্য। কর্মসূচিও সেখান থেকেই উৎসারিত। গর্বাচভ সেই সংযোগটাই নতুন করে তৈরি করতে চাইছিলেন। এতদিনে সোভিয়েত ইউনিয়নের মানুষের মধ্যেও অনীহা এসে গিয়েছিল, রাজনৈতিক-সামাজিক, তাদের জীবনে গণতান্ত্রিক অভ্যাসের ক্রমাগত অনুপস্থিতিতে। গর্বাচভ প্রথমে সেটাই ফিরিয়ে দিতে চাইলেন। সে দেশের সমাজ নতুন করে গড়ে তোলার পদ্ধতি ও তার প্রকাশ্যতা নিয়ে তর্কবিতর্ক সোভিয়েত পার্টির সিদ্ধান্তেই আন্তর্জাতিক বিতর্ক হয়ে উঠেছে। সেইসব তর্কের বিষয়আশয় এবারের ভোটে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, পার্টি আমলাদের কানাঘুসো থেকে মুক্ত করে। এভাবেই আমলাদের স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত হতে পারে পার্টি। সমাজতন্ত্র তার মানবিক চেহারায় উজ্জ্বল হয়, ব্যক্তিমানুষের অংশগ্রহণে, স্বীকৃতিতে। নিজেদের ভোট গোপন থাকছে, সেই ভোটে দেশের নীতি নির্ধারিত হচ্ছে—ঠিক এমন ভোট ত এর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নে হয় নি। ভোটারেরা তাই এবার উচ্ছ্বাসে প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন।

পার্টি ও জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করাটাই ছিল গর্বাচভের প্রধান কাজ। গর্বাচভ তা অনেকটাই করতে পেরেছেন। পার্টি, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র—সবটাই এক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের বিন্যাসে বাঁধা হয়ে আছে, লেনিনের তত্ত্বে, কর্মে, ভাষায়। সে বিন্যাসের কোথাও কোনো শিথিলতা এলে ক্ষতিটা সামগ্রিক। পার্টি ত এক সর্বগ্রাসী সত্ত্বা, পৃথিবীতে যে আগ্রাসনের কোনো সমতুল নেই। মেদ-মজ্জা-হৃদয়-মগজ সবই সে গ্রাস করে নেয়। আমাদের দেশের পার্টি এখনো বিপ্লব সংগঠিত করার কাজেই ব্যস্ত, সেই পার্টিও তার হাজার দুর্বলতা নিয়েও বুকের মধ্যে কি রক্তটান তৈরি করতে পারে, সে ত আমাদের নিজেদের জীবন দিয়েই বুঝি। সেই টান একমাত্র পার্টিই পারে তৈরি করতে। সমাজতন্ত্রে তা আরো ছড়ানো। সেখানে ত পার্টি আকাশে, বাতাসেও ছড়িয়ে থাকে, যেন। থাকার ত কথা। সেইখানে সংকোচনের পরিণতি বড় সাংঘাতিক। গণতন্ত্র সেখানে পার্টির ভিতরে, বাইরে, যৌথ নেতৃত্বে—সবখানেই ফিরিয়ে আনতে হয়, অনিবার্য। নাহলে ব্যক্তির প্রতি উপেক্ষায়, উদাসীনতায়, গণতান্ত্রিক অভ্যাসের অনুপস্থিতিতে এক বিকার নেমে আসে সর্বত্র। সেই বিকার গর্বাচভ টের পাচ্ছিলেন, তাই সমাজতন্ত্রের

প্রাণবায়ু হিশেবে গণতন্ত্রকে ফেরাতে চাইছিলেন তার যথাযথ মহিমায়। যেন প্রাণসখার কাছেই নূতন প্রাণ না চেয়ে তার উপায় থাকে না। পার্টি-নিরপেক্ষভাবে কোনো গণতান্ত্রিক অভ্যাসই যখন সমাজতান্ত্রিক দেশে হতে পারে না, উদাসীনতা বা কৃতিত্ব কোনোদিক থেকেই নয়, তখন জনগণই পার্টির একমাত্র রক্ষক। পার্টিই যদি সব কৃতিত্ব দাবি করে, শুষে নেয়, তাহলে সেই ব্যক্তির জন্য কী রইল যে দেশ ও সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রম, সময়, কখনো জীবনও দেয়? ব্যক্তির সঙ্গে পার্টির, সংগঠনের সম্পর্ককে পারস্পরিকতা না দিতে পারলে ব্যক্তির মুক্তি অসম্ভব। এটা লেনিন জানতেন। গর্বাচভও জানেন, তাই পেরেস্ত্রোইকাকে তিনি বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় দেখেন, দেখান। লেনিনীয় ধারণাকেই রক্তে, মাংসে, তত্ত্বে ও পদ্ধতিতে রূপ দেয়ার কাজে হাত লাগান।

এই পর্বকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ভিতরে গণতন্ত্রের ব্যবস্থা তৈরির সন্ধিক্ষণ হিশেবে চেনা যেতে পারে। পশ্চিমের গণতান্ত্রিক কায়দাকানুনের যে অংশ গ্রাহ্য হয়ে উঠতে পারে সমাজতন্ত্রেও, তার গনমুখীনতার নিরিখে, তাকে নিজেদের অভিজ্ঞতায় কাজে লাগানো যায়। তাতে কোনো পরাজয় ঘটে না। ব্যক্তির মুক্তি আর সমাজের গণতন্ত্র এতদিন ইওরোপীয় রেনেসাঁসের সঙ্গেই অন্বিত হয়েছিল, থাকলেও গণতন্ত্রের মর্মবস্তু সেখানে স্বীকৃতি পায় নি। ইতিহাসের সাময়িক সেই সীমাবদ্ধতা থেকে গণতন্ত্রকে মুক্তি দিতে পারে সমাজতন্ত্র-ই, একমাত্র। অবিকল্প সেই বাস্তবতার দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। পারত, সোভিয়েতের বিপ্লব। পার্টির কাজ-কর্মেই সেই অবিকল্প তৈরি হওয়া থমকে গেছে, অন্যগামী হতে বসেছে। পার্টির আত্মমগ্ন উদাসীনতায়। আবার, পৃথিবীতে কমিউনিস্ট পার্টিরও ত কোনো বিকল্প নেই। এখন পার্টিরই দায় নিজেকে যথাস্থিত করা, স্ব-মহিমায় নেয়া। গর্বাচভের পার্টি সেই কঠিন কাজেই ব্যস্ত। তাৎক্ষণিক জয়পরাজয় নিরপেক্ষ ভাবেই ব্যস্ত।

তাই, আরো সমাজতন্ত্র মানে আরো গণতন্ত্র, দৈনন্দিন জীবনে খোলামেলা আর যৌথ উদ্যোগ, উৎপাদনে আরো নিপুনতা ও মানবিকতা, জনগণের মধ্যে সামাজিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রসার, ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরো মর্যাদা আর আত্মসম্মান। মানে, আরো মানুষ, আরো মন, আরো প্রাণ। গণতন্ত্রকে ব্যক্তির মনের দুয়ার অবধি নিয়ে যাওয়া শুধু নয়, তার সঙ্গে মতাদর্শকেও জড়িয়ে দেয়া। বিষয়ীগত উপাদানকে দূরে সরানো। মানুষের প্রতিদিনের

বেঁচে থাকার সঙ্গে গণতন্ত্র ও ব্যক্তির মুক্তির প্রক্রিয়াকে মিশিয়ে দেয়া। নাহলে ক্ষতি বিপ্লবের, তার চলমানতার।

ব্যক্তির আরেক মুক্তি অপেক্ষায় থাকে সমাজতন্ত্রের। সেই মুক্তি বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে। পুরনো মানুষই ত নতুন সমাজ গড়ে, তার যাবতীয় ইতি সত্ত্বেও, কিছু বিচ্ছিন্নতা থেকে যায়। কিন্তু তার বাইরেও সমাজতন্ত্রে এক অন্য বিচ্ছিন্নতা নেমে আসে। সামাজিক শক্তি আর নেতৃত্বের সামর্থ, দুয়ের তফাতরেখা ঘুলিয়ে গেলে জনগণের কৃতিত্ব নেতার ঘাড়ে এসে চাপে। নেতা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় জনগণ থেকে। আবার, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিকে বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বে, কারখানার পরিচালনায়, সমাজ গড়ে তোলার কাছে যেভাবে সংলগ্নতা দিতে পারে, তাতে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে। কিন্তু তা না পারলে এক নতুন বিচ্ছিন্নতা চেপে বসে, পুরনোর সঙ্গে। এই বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রের একাত্মতার অভাব থেকে আসে, ইতিহাসে যা এক নতুন। ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের আরো কাছে না টানলে, কেন্দ্রিকতার গুলির সুতো না ছাড়লে, রাষ্ট্রের সর্বময়তার ভেতরে ত ব্যক্তির কোনো মুক্তি নেই। সামাজিকতায় যে মুক্তি সম্ভব, সেই মুক্তি আনতে হলে রাষ্ট্রের অবসান চাই। আবার, রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলার অর্থ সবসময়, রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের এলাকাবৃদ্ধি নাও হতে পারে। পথরুদ্ধ হয়েছিল যে বিকেন্দ্রীকরণের অভাবে, গর্বাচভ সেই পথ আবার খুলে দিচ্ছেন। সমাজতন্ত্র যে নতুন বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, দিতে পারে, গর্বাচভ সে প্রক্রিয়াও চিনে উঠতে পেরেছেন। সেই বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্তি সম্ভব একমাত্র তখনই, যখন প্রতিটি ব্যক্তি সামাজিক শক্তি হিশেবে নিজের প্রয়োজনকে আত্মোপলব্ধির স্তরে নিয়ে গিয়ে তার সংগঠিত চেহারা দিতে পারে। মার্কসই জানিয়ে গিয়েছিলেন সংকটের এই সম্ভাব্যতা ও নিরসনের কথা। সমাজতন্ত্রে-ই ত মানুষের প্রাক-ইতিহাসের অবসান, নতুন সৃজনী ইতিহাসের শুরু। সেই প্রাক-ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় গর্বাচভ রচনা করেছেন। গণতন্ত্র ও ব্যক্তির মুক্তির সমস্ত অর্থে। এক সমগ্রতায়। জয়পরাজয়ের কথা সেখানে গৌন। ইতিহাসে জয়পরাজয়ের নিস্পত্তি এত দ্রুত হয় না।

কাঁচা মাংস

কার্তিক লাহিড়ী

ঘুম না আসার কারণ বোধ হয় জায়গাটা নতুন

এই হোটেল জরাজীর্ণ, তার দেয়ালে অজস্র ফাঁক ফোকর, সেখানে থেকে যেতে পারে আরশোলা টিকটিকি বিছে পর্যন্ত এমনকী সাপও, এতেও তত ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না ঘুমের। কারণ এ-সবের সঙ্গেই তো সহবাস তাদের 'আ—' মহকুমা শহরের মজা পানা ভর্তি ডোবার একেবারে লাগোয়া ভাঙা বেড়ার ঘরে

ঘুম আসছে না হয়ত আলো আসার জন্য ঐ ফাঁক ফোকর দিয়ে, দরজার পাল্লা ফাটা ফাটা, দরজা-দেয়ালের জোড়ে ফাটল—এ সবের মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দে বেশ ঢুকে পড়ছে বারান্দার জিরো-পাওয়ারের আলো,—ক্ষীণ তবু, সেই আলো ফাটিয়ে দিচ্ছে ঘরের অন্ধকারের গুহ্য, অন্ধকার আলোর মেশাল এক কিম্ভুত আবছা ঘের চোখের পাতার উপর চাপ দিচ্ছে দারুণ, চোখ বুজলেও যার আঁচ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না এখন খুব

পরমেশ ছটফট করছে বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ একটু ঘুমের জন্য শুধু। কিন্তু ঘুম কি আসে ঐ বিছানায় দু-চারটে ছারপোকার জ্বালায় তবু, নাইলনের মশারির এতটুকু ফুটো দিয়ে মাত্র একটা মশা কানের মুখের কাছে পিনপিনিয়ে চলে যায় নিরীহ ভাবে খুব, এব্‌ড়ো-খেব্‌ড়ো তোষকের উপরে চাদরটা পাট-ভাঙা হলেও কোথা থেকে এসে মিশে গেছে ওতে তোষাকে আরশোলার নাদির ছুঁচোর গন্ধ, ফলে এ-পাশ ও-পাশ করলেও উপুড় হতে পারছে না

কিছুতেই, উপুড় হয়ে শোয়া তার প্রিয় ভঙ্গি ঘুমের আগে, কিন্তু এখন চিত হয়েই থাকতে হচ্ছে, উপুড় না হয়ে শুলেও ঐ চিমসে ভোটকা গন্ধ নাকে ঢুকছে মধ্যে মধ্যে তবু। লুঙ্গির কষি আলগা করে দিলেও এখন ও-সব ফন্দি ঘুম আসার অকেজো হয়ে গেছে যেন

পরমেশকে চিত হয়ে শুয়ে থাকতে হচ্ছে তাই। সাদা মেঘ ভেড়া এক থেকে একশো গোনা ইত্যাদি সব দেখা গোনা হয়ে গেছে কখন

ঘুম আসবে না এবং সে ছটফটায় খুব, তবু তত বিরক্ত বা বিমর্ষ কিছুই হচ্ছে না এখন, ঐ অসুবিধের মধ্যে থেকে চোরা একটা সুখের অনুভূতি কেমন তাজা টাটকা ফুল্ল করে দিচ্ছে শুধু

ইন্টারভিউ-টা ভালোই দিয়েছি বেশ,

নড়ে চড়ে থিতু হতে চাইছে না কথাটা তবু, কাউকে জানাতে পারলে বেশ হতো, এই আধো আলো ছায়ার কিম্ভূত কিমাকার নিশ্চুপ নির্জনতার মধ্যে কাকে জানাবে একথা এখন, আর চিত হয়ে কেবল অ-ঘুমের মধ্যে থেকে গেলে কী করবে আর

এই নিয়ে ক-বার হলো এমন ভালো ইন্টারভিউ দেওয়া

এক দুই তিন চার ক'রে গুনে শেষমেশ গোনাই ছেড়ে দেয়, কী হবে গুনে, কত বারই তো দিয়েছে ভালো, আর প্রত্যেকবার তার চেয়ে বাবার চোখ মুখ আশায় জ্বলে উঠেছে খুব, পরমেশ বুঝতে পারে বাবার উদ্বেগ—রিটায়ার করেছেন, পেনশন আদৌ পাবেন কিনা এখনো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, আশা আছে পাবার এই মাত্র

আর প্রতিবার ব্যর্থ হলে চাকরি না-পাবার চেয়ে বাবার দুঃখ কষ্ট বাড়ছে টের পেয়ে সে মুষড়ে পড়ে, তবে এরপরে পাবোই এমন আশায় বুক বেঁধে বাবাকে অন্যভাবে তাজা রাখতে চেষ্টা করে খুব বাবার প্রতি কি একটা আলাদা মমতা আছে তার? সে চেষ্টা করে, কিন্তু সফল হচ্ছে না, যেমন এখন ঘুম আসছে না, আসবে না হয়ত আর, সে বিছানায় উঠে বসতে চায় তখন, আর খাটে এমন মচ্ মচ্ শব্দ হয় যে শুয়ে পড়া ছাড়া উপায় থাকে না কোনো, এই রাতে খাট ভেঙে পড়লে কী বিশ্রী কাণ্ড-ই না হবে, হোটেলমালিক খাটের দাম চেয়ে বসবে, এবং তা না মেটানো অব্দি তাকে ছাড়বে না কিছুতেই, এখানেই থেকে যেতে হবে তাহ'লে—ফার্স্ট বাস ধরা হবে না, এমন কী লাস্ট বাস-ও বাড়ি ফেরার

অথচ বাবা তো চেয়ে আছেন তার আসার দিকে, পৌঁছুতেই তিনি কি কি

জিজ্ঞেস করবেন, মাকে কীভাবে ডাকবেন, তারপর আবার জিজ্ঞেস করবেন তার ইন্টারভিউ-এর কথা—এসব সে পরিষ্কার বেশ দেখতে পায় এখান থেকেই এখন,

পরমেশ বাবার সেই কাণ্ড কারখানা থেকে মনের চোখ ফিরিয়ে নেয় এবার, তারপর শ্বাস প্রশ্বাস দীর্ঘ দীর্ঘতর করতে থাকে, এভাবে শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যায়াম করলে নাকি ঘুম আসে খুব, আর তা করতে থাকলে ইন্টারভিউটা ভালোই দিয়েছি বেশ—এমন সুখকর কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় প্রায় পিছলে হঠাৎ, ভীষণ খুশি হচ্ছে, লোম সব ফুলে ফুলে উঠছে

তখন সিনেমায় যেমন হয় হোটেল ঘরটা লহমায় মুছে গিয়ে ঐ মোছার মধ্যে থেকে পট্ ক'রে হয়ে যায় ইন্টারভিউয়ের ঘর

হল্ ঘর সদৃশ সেই ঘরে একটি মাত্র এক-পাল্লার দরজা, দরজা দিয়ে ঢুকলেই পা ডেবে যাবে পুরো কার্পেটের মধ্যে খুব, সেদিকে নজর দিতে না দিতেই কড়া সিগ্রেট সিগারের গন্ধে চোখ গিয়ে পড়বে দরজার সামনের দেয়ালে ঈষৎ তেরছা করে পাতা ঢাউস অর্ধচন্দ্রকার টেবিলের উপর, তার ওদিকে বসে আছে এক দুই ধোঁয়ার মধ্যে তারা হারিয়ে আছে বলে গোনাও যায় না তাদের

এবং আন্দাজে নমস্কার করতে না করতেই 'সিট্‌ডাউন্' ঘোষণা হলেও তাকে কাঁপাতে পারে না আর, যেমন কেঁপেছিলো তার বুক নাম ডাকা হতেই, মনে হয়েছিল হৃদপিণ্ড ফুসফুস বুকের খাঁচা পাঁজর ছিঁড়ে ভেঙে লাফিয়ে পড়ে ঝুলে থাকবে নাভির উপর, কিংবা আরো নীচে দুই হাঁটুর মধ্যিখানে

পরমেশ ঝপ্ করে বসে পড়তেই শুরু হয়ে যায় প্রশ্ন—ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেটের মতো যেন, একটা শেষ না হতেই আরো গাদা গাদা—

নাম? বাবার নাম? মাধ্যমিক? হায়ার সেকেণ্ডারী? গ্রাজুয়েশন? এস্ সি? এস্ টি ইয়েস্,

প্রশ্নের উত্তর দিতে না দিতেই যিনি মধ্যমণি—বাঁ এবং ডান দু-দিক থেকে তৃতীয়, তিনি কাগজ দেখতে দেখতে সিগ্রেটের ধোঁয়ার ভিতর থেকে ইয়েস্ ইয়েস্ করতে করতে পরমেশের বলার সঙ্গে সঙ্গে থেমে পড়েন তবু

সেখানে ঝপ্ করে নেমে পড়ে নৈঃশব্দ তারপর

খুব থেমে থাকে সবকিছু কতক্ষণ, আবার ধোঁয়ার কুয়াশা সরে যেতে থাকলে দুম-দাম্ প্রশ্নের গোলা ছুটে আসতে থাকে অবিরল শুধু

কোন্ পাখি পেছন দিকে উড়তে পারে? আলপাকা কি? রামচন্দ্র কোন্ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন? হেলিকপ্টার কে আবিষ্কার করেন? লিভার কোথায়

কোন্ দিকে থাকে? ভুটানের রাজধানী কি? জুলে রিমে কি? কোন্ ভারতীয় ক্রিকেটার প্রথম ইংল্যাণ্ডের পক্ষে টেস্ট ম্যাচ খেলেন? কোন্ জিনিস কাটলে বড় হয়? পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্লেয়ারের নাম? ইত্যাদি ইত্যাদি, আর সে টকাটক বলে যায় না থেমে প্রায়

হামিং বার্ড, দক্ষিণ আমেরিকার একরকম লোমশ জন্তু—ভেঁড়ার মতো, ইক্ষ্বাকু বা সূর্যবংশে, সিকরঙ্কি, পেটের মধ্যে ডান দিকে, থিম্পু, ফুটবলের কাপ সোনার তৈরী পৃথিবীর সেরা দল পায়, বণজিৎ সিং, পুকুর, পেলে· · ইত্যাদি

কেবল একটি প্রশ্নের উত্তরে এসে আটকে যায় এবং অসহায় ভাবে তাকায় প্রশ্নকর্তার দিকে তখন তিনি হাসছেন, অথচ ঘর থেকে বেরুতেই মনে পড়ে গিয়েছিল উত্তরটা, কিন্তু তখন ফেরার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আর একজন প্রার্থীর নাম ডাকা হয়ে গেছে এবং সে ঢুকে পড়েছে ঘরে

আপসোস হতে থাকে খুব, কপালও চাপড়ায়, এহে বলতে পারলাম না! বাঁদরের তো একটাও পা নেই সবগুলোই হাত, কথাটা মনে পড়তে চমকায় সে তবু, হাসি পেয়ে যায়, দেখে মনে হয় পা অথচ সেগুলো পা নয়, ভারি মজা তো?

ততক্ষণে অপেক্ষমান প্রার্থীরা তাকে ছেঁকে ধরেছে খুব, অক্ কষতে দিয়েছে? সায়েন্স থেকে কোশ্চেন করেছে বেশি নাকি··? ক্রিকেট ফুটবলের প্রশ্ন? বার্‌বা কতক্ষণ জিজ্ঞেস করল তোমাকে, ইতিহাস থেকে, চাকরিটা ওরই হচ্ছে দেখ্‌গে, মামা জামাইবাবু আছে কেউ ইত্যাদি ইত্যাদি ফুট কাটেও কেউ কেউ প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তখন

বিরক্তি থেকে রাগ ছেয়ে যাচ্ছিলো সারা শরীরে, অন্যবারও এমন হয়েছে, ইণ্টারভিউ হল থেকে বেরিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তারা ছেঁকে ধরে, কিন্তু তখন কিছু হয়নি, এবার হচ্ছে কেন?

তবে কি চাকরিটা হয়ে যাবে! হবে বলেই বিরক্ত হচ্ছি?

লাফিয়ে ওঠে মন, চাকরি পেলে !

দারুণ ব্যাপার সব হয়ে যেতে পারে, তবু ঠিক ঠিক কি হবে কি হতে পারে তা ধরতে পারে না, তবে হবে অনেক অনেক কিছু, লাল নীল সবুজ হলুদ রঙের বৃত্ত পাক দিতে দিতে চলে যায় কেবলই, আর সে উড়ে উড়ে আসতে থাকে হোটেলের দিকে তাই

বাবা উদ্বিগ্ন হবেন না আর, একজন বাঁধুনি রাখা যাবে, মা বাড়ি বাড়ি বলে

বেড়াবেন খোকা চাকরি পেয়েছে, অন্তর জন্য মাষ্টার রাখা হবে অঙ্কের, আর খাওয়া-দাওয়া হবে খুব, দুধের রোজ হবে, মাংস হপ্তায় অন্তত দু-দিন, আর ডিম · , তারপর

এতো খুশি বহু বহুদিন হয়নি পরমেশ, সে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে আসছে, আর যত হোটেলের দিকে আসছে আশা যেন বাড়ছে তত

অথচ কী চিন্তা হচ্ছিল ইণ্টারভিউ চিঠি পাবার পর, বাবা মা সে ও অন্ত ক্ষণে ক্ষণে আলোচনা করছে, একবার ঠিক হচ্ছে যাবে ইণ্টারভিউতে আর বার না, এই ভাবে কত কত বার · পরমেশ নিজের উপরই বিরক্ত হয়ে যাচ্ছিল এজন্য, কিন্তু করবে কী.' সে তো এই মহকুমা শহর ছেড়ে বাইরে কোথাও যায় নি একবারও, পড়েছে বাবার স্কুলে, কলেজের পড়াশুনোও এখানে, ইচ্ছে ছিল বাইরে পড়াব, কিন্তু সংসারের দিকে তাকিয়ে সে-ইচ্ছা চেপে যেতে হয়

আর যে-কটা ইণ্টারভিউ দিয়েছে সব এখানেই, তাই সদরে যেতে হবে ইণ্টারভিউ দিতে, এতে নিজেও কেমন ভরসা পাচ্ছিল না, উপরন্তু বাবারও উদ্বেগ ছিল—সদরের '—' শহরে কোথায় গিয়ে উঠবে কী খাবে কী পরে যাবে ইণ্টারভিউ দিতে ইত্যাদি

তবু চাকরির ব্যাপার, বয়েস হু হু করে বেড়ে চলেছে, আর ক-বছরের মধ্যে সরকারী চাকরিতে ঢোকার বয়েস চলে যাবে, তাই যেতে হবে—চাকরি হোক চাই না হোক, দিতেই হবে ইণ্টারভিউ, তাছাড়া এখানে ইণ্টারভিউ দিতে দিতে হদ্দ হয়ে গেছে, এই ছোট্ট শহরে বাড়তি চাকরির সুযোগটাই বা কোথায়, সে তো প্রায় জায়গায় হাজির হয়েছে—একবার তো মারামারির মুখেই পড়ে যায়, ভাগ্যিস সে ভীড়ের অনেক পিছনে ছিল, নইলে পুলিশের লাঠি তার পিঠ, হাত, পা ভেঙে দিতে পারতো যখন তখন --

এক একবার ভেবেছে শাসক দলে নাম লেখায়, অনেকে বলে চাকরি পাবার সেটাই নাকি সোজা রাস্তা সবচেয়ে, অনেক দ্বিধা সংকোচ কাটিয়ে সে গিয়েওছিলো অবনীপ্রসাদের কাছে। কুণ্ঠিত হয়ে বলেছিলো নিজের সাংসারিক অনটন অবস্থার কথা, অবনীবাবু মন দিয়ে শুনে হেসেছিলেন মৃদু এবং বলেছিলেন যা তার মর্ম হচ্ছে—এ কাহিনী আজ ঘরে ঘরে, কাকে ছেড়ে কাকে দেওয়া যায়, তাছাড়া দলে এলেই হচ্ছে না, দলের বহু কর্মী সমর্থক আছে যাদের ব্যবস্থা হয় নি এখনো কোনো, তাকেও অপেক্ষা করতে হবে, তবে প্রথমেই হচ্ছে তিনি তারপর কয়েক জনের নাম বলেছিলেন তাদের কাছে যাওয়া ও তাদের নির্দেশে দলের বা ঐ সংক্রান্ত কাজ করা,

তারপর আস্তে আস্তে একদিন পরমেশের দফা আসবে তখন হয়ত চেষ্টা করলে ইত্যাদি

অথচ অবনীবাবু পরমেশের বাবার ছাত্র এবং তিনি নানা ভাবে উপকৃতও হয়েছেন ক্ষেত্রবাবু অর্থাৎ তার বাবার কাছে, কিন্তু নিয়মের বাইরে দলের শৃঙ্খলার বাইরে কিছু করা যাবে না এখন প্রভৃতি বললেন খুব, তা শুনে পরমেশের মুখে চলে এসেছিলো বিমলের নাম, অবনীবাবুর ভাইপো যে ঐ নিয়ম কেন সব কিছু নিয়ম তছনছ করে এখন বহাল তবিয়তে চাকরি করছে তাঁরই ইচ্ছায় এরকম আরো দুটি নাম কেশব ও রণধীরের, কিন্তু বলতে সাহস পায়নি, কী জানি ইন্টারভিউ দিয়ে চাকরি পেলেও যদি অবনীবাবু রাগডা দন, আর তাতে চাকরিটা যদি ফসকে যায়, অতএব তাই বাইরে যাবার ভয়কে তুচ্ছ করতেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে বাবার উদ্বেগকে অনেক তরল, আর ইন্টারভিউ-এর জন্য সে মনপ্রাণ দিয়ে তৈরী হতে থাকে, তার কেন জানি মনে হয়—এবার হয়ত হয়ে যাবে, মনের ভিতর থেকে উঠে আসছে আশাটা

হঠাৎ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ে লেগে যাওয়া বোধের মত ঐ আশা কিন্তু পরমেশকে তাড়িয়ে নিয়ে চলে লক্ষ্যের দিকে কেবলই, পরীক্ষার সময় যেভাবে রাত জেগে পড়া তৈরী করতো, এখন সে সেই ভাবে নিজেকে তৈরী করতে থাকে

বাবার মুখ ছবি দেখতে পায় তখন স্পষ্ট, সেই মুখে আশঙ্কার আলতো ছোঁয়া চিন্তার রেখা সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছুতেই সেটা সহাস্য হতে পারছে না, পরমেশ জানে—এই উদ্বেগ তাঁর কিছুতেই যাবে না, কারণ পরমেশ যাচ্ছে নিজের পরিচিত শহর ছেড়ে দূরে, অথচ তেমন দূরে তো নয়—একই জেলায়, তবু বাবা-কে বোঝানো যাবে না কিছুতেই

পরমেশ সেদিকে খেয়াল না করে তৈরী হতে থাকে ইন্টারভিউ-এর জন্য শুধু, এখন তার এক মুহূর্ত সময় নেই নষ্ট করার, পড়ে চলেছে বই—সাধারণ জ্ঞানের, কুইজ, কেরিয়ার কোর্সেস ইত্যাদি, গিয়ে গিয়ে পড়ছে পত্র-পত্রিকা, একে তাকে জিজ্ঞেস করছে ইন্টারভিউয়ে কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে উত্তরের ধরন কেমন হবে, কীভাবে দাঁড়াবে, কোথায় বসবে, ইত্যাদি ইত্যাদি

এই ভাবে সে সব আটঘাট বাঁধতে থাকে খুব, কোনমতেই হাত থেকে ফসকে যেতে দেবে না সুযোগটা, এক একবার মনে হচ্ছিল হরিশ্চন্দ্র জ্যোতিষের কাছে হাতটা দেখিয়ে আসবে, মা-র কথায় উৎসাহও বেশ পায়, কিন্তু পড়ার ব্যস্ততায় যাওয়া হয়ে ওঠে না, মনটা খচ্ খচ্ করতে থাকে, মা তাড়া লাগান, কিন্তু জ্যোতিষের বাড়িতে ভীড় বেশ লেগে থাকে, গেলে ঘণ্টা দুই সময় নিশ্চয়

নষ্ট হবে, ততক্ষণে পড়ে নিতে পারবে কিছু আরো, সেই পড়া কাজে লাগবে বেশি যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও যাওয়া হয় না অতএব

মার মুখ ভার হয় না যাওয়ার জন্য, কারণ মা ভেবে বসে আছেন—চাকরিটা হবেই, যদি না হয় তাহলে ঐ গোঁয়ার্তুমি করার জন্য হবে না অর্থাৎ জ্যোতিষের কাছে যে গেল না—সেইজন্য। পরমেশ হাসে মনে মনে খুব, মা যে কেন ভাবছেন যে ইন্টারভিউ দিলেই চাকরিটা পেয়ে যাবে সে, ওরা যেন হাত বাড়িয়েই আছে ওকে চাকরি দেবার জন্য

কেন এতো আশা করছেন মা? সাংসারিক কষ্টইকি এই আশা উসকে দিচ্ছে? একেই কি বলে শুভ কামনা—মা, বাবার, যার শক্তিতে অসম্ভবও সম্ভব হয়ে ওঠে?

পরমেশরও বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে, তবু কিন্তু থেকে যায়, যখন তাকায় দিকে দিকে বা হঠাৎ মনে পড়ে যায় সেই বচনার কথা—ভারতের বেকার সমস্যা, সে কি বাবা-মাকে বলতে পারবে এইসব কথা—

প্রথম পঞ্চমবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হবার পর বেকারের সংখ্যা আরও দশ লক্ষ বেড়ে যায়, তারপর আরও দুটি পরিকল্পনায় বেকারের সংখ্যা তো কমে না বরং বেড়েই চলে, তৃতীয় ও চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়ও একই হাল হয়, পুরণো বেকারের সংখ্যা ছিল ১ ২০ কোটি, এখন নাকি প্রতিবছর ভারতে ২৫ লক্ষ বেকার তৈরী হচ্ছে, গোটা পশ্চিমবঙ্গে নাকি প্রায় ৪০ লক্ষ বেকার এমপ্লয়মেন্ট একচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করেছে, এর মধ্যে ২০ লক্ষ হচ্ছে স্কুল ফাইনাল এবং গ্রাজুয়েট, ১৯৮০-৮৫ সালের পরিকল্পনার সময় নতুন কর্ম প্রার্থীর সংখ্যা হতে পারে ৩ ৪২ কোটি, তাহলে মোট বেকারের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াচ্ছে

এ-সব অবশ্য সমর্থিত তথ্য কিনা কে বলতে পারে? তবে বেকারের সংখ্যা এর চেয়ে কম কিছুতেই হতে পারে না, এ-বিষয়ে সে স্থির নিশ্চিত, মা-কে বললে কী বুঝবেন যে এরপর চাকরি পাবার আশা করা হাতে চাঁদ পাবার মতো অসম্ভব ব্যাপার

সাধেই কি ছেলেরা ভাঙচুর করে, ডাকাত হয়, চুরি ছিনতাই করে, এমনকী ধাঙড় ঝাড়ুদারের চাকরি নিতে প্রার্থী হয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ইত্যাদি গোপন করে?

মা বুঝবেন না, বাবাওকি বোঝেন? তাঁর মনে মনে ক্ষোভ আছে, সে টের পায় ঠারে ঠোরে কখনো—বিমানের চাকরি হলো, অসীমের, কেশবের,

বিমলের, বাবার দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তার মানে—তোর কেন হচ্ছে না, তুই বোধহয় গা লাগাচ্ছিস না ইত্যাদি, বাবাকে সে-ও আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়েছে যে এখন চাকরি পেতে গেলে হয় মামা কাকা দাদার জোর লাগে, না হয় টাকার, খুব হলে দলের·· তার কোনটাই নেই অতএব

বাবা অবুঝ তবু। আমিই কি বুঝি ছাই, না হ'লে এত আশা করছি কেন এখন, এরকম ইণ্টারভিউ অনেকেই দিয়েছে, তাহলে পরমেশ উপুড় হতে গিয়ে তোষক বালিশ চাদরের বিদঘুটে গন্ধের কথা খেয়াল করতেই উপুড় হয় না আর

ইণ্টারভিউটা ভালোই দিয়েছি বেশ, শুধু এক জায়গায় হোঁচট খেয়েছি মাত্র, তা বোর্ডের মেম্বাররা দু-দুবার তারিফ করেছেন—গুড্ মাই বয়, ব্রেভো এগুলো কি খামকা তারিফ করা ?

নিশ্চয় উত্তর শুনে খুশি হয়েছেন তাই আর তারা খুশি হলে চোখের উপর ভাসতে থাকে রঙিন ছবি অনেক

চাকরি হলে আহ্! বলতে পারবো—নিজের জোরে পেয়েছি, কাউকে ধরিনি, মামা কাকা দাদাকে নয়, ঘুষও দিই নি আর দলেও নাম লেখাই নি হাঁ

এতক্ষণে পরমেশ বুঝতে পারছে এই চোরা উত্তেজনাই তার ঘুম কেড়ে নিচ্ছে তবু, এসব ভাববো না ভাববো না ভাবতে ভাবতেই আবার সেই সবই ভাবতে থাকে, যা তাকে তলে তলে উসকে দিচ্ছে আশায়

এরকম আশায় তো সকলেই জাগছে—একটা চাকরি, আহ বাবা এখন কী করছেন ? তিনিও ঘুমোন নি নিশ্চয়, ঘর-বার করছেন, মধ্যে মধ্যে মশারির ফাঁক দিয়ে দেখছেন মা-কে, হয়ত বলেও উঠছেন, শুনছো···আর মা চুপ করে শুয়ে আছেন, বাবাকে বুঝতেও দিচ্ছেন না যে তাঁর ঘুম আসে নি, তিনি অপেক্ষা করে আছেন আমার জন্য কেবল

পরমেশ তখন প্রার্থনা করতে থাকে, একটু ঘুমের জন্য শুধু, এখন কত রাত কে জানে, ঘুম এলেই রাত কাবার হয়ে যাবে, আর সে উঠেই দৌড় লাগাবে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের দিকে ফার্স্ট বাস ধরার জন্য,

ফার্স্টটা কি ধরতে পারবো ? আশঙ্কাটা কাঁপাচ্ছে শরীর তবু, সে ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে তা, তবু তবু মাথা চাড়া দিচ্ছে সেটা, ফার্স্ট বাসটা না ধরতে পারলে সে বুঝতে পারে, বাবা আরো কত অধীর হয়ে উঠবেন, হয়ত বাস-স্ট্যাণ্ডে চলে আসবেন ··

সে এখুনি আরো বিনীত ভাবে প্রার্থনা করতে থাকে ঘুমের জন্য তাই যেন মনে হচ্ছে, অনেক অনেক দিন বাড়ি ছেড়ে এসেছে, কাল ফার্স্ট বাসে বাড়ি না গেলেই নয়, অথচ কত দূরেইবা এসেছে সে—পঞ্চাশ কি বাহান্ন কিলোমিটার দূরে বাড়ি থেকে জেলার সদরে

আহ্, বাড়ি কি এতই মধুর যে

চোখের পাতা ভারি হয়ে আসছে এখন, কিন্তু খুলে যাচ্ছে কেবলই,

আবার ফের. নাহ্ ! আজ বুঝি ঘুম আসবে না

চোখের পাতা ভারি হচ্ছে, খুলে যাচ্ছে ফের

এইভাবে চলতে থাকছে কত কত বার

হে ভগবান ! একটু ঘুম দাও, কাল তো আমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে, যত তাড়াতাড়ি, ফার্স্ট বাস না হলে পরেরটায, চোখের পাতা ভারি হচ্ছে এবং খুলে যাচ্ছে

আব তার মধ্যে কড়ানাড়ার শব্দ হয়, এই ঘরের কড়া না অন্য কোনো ঘরের, সে বুঝতে পারে না, নাকি স্বপ্নের মধ্যে হয়ে যাচ্ছে কড়ানাড়া ? চোখেব পাতা গাঢ় হয়ে যাচ্ছে তবু, মেলতে পাবছে না কিছুতেই, কাল সকাল হলে আহ্

ভোর এই কথা স্ফুট হয়ে গেলেও কড়া নাড়ার শব্দ হয, পরমেশ চোখের পাতা মেলতে পাবছে না কিছুতেই, ঘুম বন্ধ কবে দিচ্ছে চোখের কপাট কেবল

সে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে কড়া নাড়াচ্ছে কেবল, বাবার হাতে দেবে না, মা-কে দেবে মিষ্টিব প্যাকেট-টা

তখন জোরে কড়া নাড়ার শব্দ হয়

কেউ দরজা খুলছে না, মাও নয় বাবা নয়, হলো কি তবে, ঘুমোচ্ছেন এখনও তবে

খোলো খোলো, এই আদেশ না অনুরোধে আবার কড়া নাড়ার শব্দ হয তখন, বেশ শব্দ হচ্ছে

কেউ খোলে না দরজা তখন না বাবা না মা, দুজনেই ঘুমোচ্ছেন এখনও তখন আবো জোরে কড়া নাড়ায কে বা কাবা যেন, খোলো, খুলুন, খোল্ এইভাবে এবার ধাক্কা দিচ্ছে শব্দ তবে পবমেশেব কানে, পরমেশেব ঘুম ভাঙে যেন···

এত রাতে ? নাকি ভোর হয়ে গেছে, আমাকে জাগাতে এসেছে কেউ

বাস ধরার জন্য, পরমেশ উঠতে গিয়ে দেখে—ফাঁক ফোকর দিয়ে বারান্দার আলো ঢুকেই আছে এঘরে, সে এধার ওধার তাকায় কান পাতে—নাহ্, পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে না তো

কড়া নাড়ছে, আর বলছে—খোলো খোলো

এত রাতে। কড়া নাড়ছে আমার ঘরে! পরমেশ ধরতে পারে না কিছুতেই কে হতে পারে, আর কেউ হলে এত রাতে কেন? এই সদর জেলা শহরে তার জানা-শোনা কেউ নেই একজনও, এক বংশী মামা ছিলেন দূর সম্পর্কের, তিনি তো বহুদিন হলো চলে গেছেন দিল্লী, তিনি থাকলে তো আমাকে এত চিন্তাই করতে হতো না ওঠা নিয়ে, বাবা ভাবতেন না এতো,

তাহ'লে কে? কেউ বিপদে পড়েছে নাকি? পাশের ঘরের, নাকি হোটেলের অন্য কেউ? তা আমাকেই বা ডাকবে কেন?

পরমেশ কান পাতে শোনার জন্য আবার। তার ঘড়ি নেই, এ শহরে পেটা ঘণ্টা আছে কিনা তা সে জানে না, এখন রাতই বা কত? কাকে জিগ্যেস করবে সে, আর এই ঘরের যা হাল ঐ আলো-ছায়াময় কিম্ভুত কিমাকার ঘরে সময় ঠাহর করা চলে না নাড়ির স্পন্দন বোধ করে তবু, বা রাত্রির শব্দ টের পেয়ে পেয়ে, দূরে পেঁচাও ডাকছে না বা বাদুড়ের ঝাপট শোনা যায় না কোনো ডালে; পাখিরা কিচিরমিচির করছে না দূরে বা কাছে

কখন শুরু এসব তাহলে? পরমেশ কান পাতে আর তখন খোলো খোলো এবং কড়ানাড়ার শব্দ প্রচণ্ড হয় শুধু, কে? কে? পরমেশ চমকায় ঐ দ্রুত শব্দের ঝনঝনায় সে বুঝতে পারে, কড়ানাড়া খোলো স্বপ্নের মধ্যে ঘটছে না, ঐ শব্দ ও কথা বাস্তবে খুবই, এবং তার দরজার বাইরে

কে? কে? বলতে বলতে সে উঠে বসে খাটে, খাটে মচ্ মচ্ শব্দ হয় আরো পরমেশ উত্তর শোনার অপেক্ষায় আছে শুধু

খোলো, খোলো

এবার যেন ঐ স্বরে বিপদে পড়ার অসহায়তা, পরমেশ লুঙ্গির কষি আঁট করেই বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তখন কড়ানাড়া হয়েই চলে ভীষণ, সে কে কে বলতে বলতে উত্তরে শুধু খোলো খোলো শুনেই দরজা খুলে দেয় আলো না জ্বালিয়ে

সঙ্গে সঙ্গে কে একজন ঢুকে পড়ে ঘরে, সে একপল সুস্থির হয়েই জিজ্ঞেস করে, ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি

না মানে, পরমেশ হাসতে চেষ্টা করে

তোমার নাম তো পরমেশ বিশ্বাস ?

হ্যাঁ, পরমেশ একটু অবাক হয়, আপনি জানলেন কি করে ?

জানতে হয়, বলতে বলতে আর একটী যুবক ঢুকে পড়ে ঘরে

পরমেশ দুই যুবকের চেহারা দেখতে চেষ্টা করে, কিন্তু ঐ আধা আলো আধা ছায়ায় তাদের মুখ পরিলেখ হয়ে গেছে যেন, কিছু বোঝা যায় না।

লিস্টিতে তোমার নাম ফার্স্ট, আর একজন যুবকও এসে পড়ে তখন, পরমেশ বুঝতে পারছে না আর কে কে আসবে, আর বুঝলেই বা কী হবে, কাউকে চেনে না সে, মুখ দেখবে সে তারও উপায় নেই, সকলে এখন এক এই ঘরে তখন—সিল্যুট্

লিস্টে নাম আছে মানে, পরমেশ খুশির আবেগ চাপতে গিয়ে পারছে না ঐ অচেনাদের কাছে, লিস্টে আমার নাম ফার্স্ট

হাঁ, বলে চুপ করে যায় সে

সত্যি ?

মিথ্যে খবর দেবার জন্য তো আসি নি আমরা এই রাতে

না-না, মানে এটা কি সম্ভব যে আমার নাম আছে

হাঁ সম্ভব, সম্ভব হয়েছে, আমরা খোঁজ পেয়েছি খোদ লোকের কাছ থেকে, তিনিই বলেছেন, অবশ্য তার জন্য বেশ খরচ হয়েছে আমাদের

আপনাদের যে কী বলে ধন্যবাদ জানাবো, মানে মানে

ধন্যবাদ তুলে রাখো আপাতত, পরে দিও, খরচটা আগে তুলে নি

পরমেশ সেই যুবকের স্বরে কিসের যেন আভাস পায়—সেটা ভালো নয়, তা তার স্বরক্ষেপণে বোঝা যাচ্ছে অন্তত শেষ বাক্যে কতদিন বেকার ছিলে ? খুব শান্ত সংযত সেই প্রশ্ন এখন

মানে, এখন তো আছি, পরমেশ হাসতে চেষ্টা করছে, তবু সে মনে করতে চায়, এই ধরুন চার বছর, বলতে গিয়ে কথা আটকে যায় তার, বি এ. পাশ করে

আমি হিস্ট্রিতে এম এ , ছ-বছর, আর এ

আমি স্যান্‌স্‌ক্রিটে অনার্স প্লাস কাব্যতীর্থ, ছবছর

আর আমি সাতবছর বি এ -র পর বাংলায়

এই সিল্যুটদের গলার স্বরও একরকম, পরমেশ এই মুহূর্তে বলতে পারবে না কে হিস্ট্রির বাংলার না সংস্কৃতের, আর আজ তো ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল উচ্চ মাধ্যমিক

তুমি তো আ—থেকে এসেছো ?

হাঁ

কেন এসেছো ? সোজা সরল প্রশ্ন, কোনো ফাঁক নেই

মানে, ইন্টারভিউ লেটার পেলাম, তাই

তাই চলে এলে আমাদেব এলাকায়

মানে, চিঠিতে তেমন কিছু লেখা ছিল না, তাছাড়া আমি তো আমার ঠিকানা গোপন করিনি, তা সত্ত্বেও, তাছাড়া আমি জানবো কী করে যে·

এখন জানতে পারলে তো এলাকাটা আমাদের, শুধু এলাকাটাই নয় এই অফিসটা যে পাড়ায়, আমবা সেই পাড়ার বাসিন্দা, সেখানে থাকি

পরমেশ অবাক হযে যাচ্ছে এদের কথা শুনে, সে বুঝতেই পারছে না এলাকা পাড়ার বাসিন্দার সঙ্গে চাকবিব সম্পর্কটা কি

আমাদেব ভাত মারতে তুমি এলে নিজের শহর এলাকা ছেড়ে এখানে ?

কিন্তু এখনো তো পবমেশ বলতে বলতে থেমে যায়, সব কেমন ঝিম্ মেরে ওঠে

সেই ঝিমুনির মধ্যে থেকে একজন বলে, কুকুরদের দেখেছো তো ?

পবমেশ চুপ করেই থাকে, চমকায, কুকুব !

হাঁ, এক এলাকাব কুকুর অন্য এলাকায ঢুকে পডলে কি করে সেই এলাকার কুকুব ?

মানে, মানে—আমরা তো মানুষ, ফস কবে বলে ওঠে পরমেশ

হাঁ মানুষ, কুকুর তিন এলাকাব কুকুরকে তাডিযে দেয নিজেদের এলাকা থেকে, কিন্তু মানুষ

তার স্বরে ঘাতকের ঘোষ যেন, তবু শান্ত থাকে খুব

মানুষ শুধু তাডায না, শিক্ষাও দেয তাছাডা

শিক্ষা ? মুখ ফসকে বেরয পরমেশের

হাঁ, সামান্য শিক্ষা, কিন্তু মনে রাখাব মতো

পরমেশ ঢোক গেলে, বুঝতে পারলাম না আপনার কথা

সেই আলো-ছায়ায ভাসন্ত ছাযায় ঘরটা ঝকমক কবে উঠলো তাদের সামান্য হাসিতে যেন, পরমেশ তাতে কেমন নার্ভাস হযে যেতে থাকে

তবে কি আমি চলে যাবো আপনাদের এলাকা থেকে ? সে ঐ অবস্থায় প্রশ্নটা ছুঁডে চুপ করে যায খুব

চলে গেলে কি শিক্ষাটা হবে? পাল্টা প্রশ্ন করলে পরমেশ কী বলবে ভেবে পায় না তবু, সে চুপ করেই থাকে

শিক্ষাটা তো শুধু তোমাকেই দেবো না, একটা উদাহরণ হয়ে থাকবে সকলের কাছে, জানলে আর সাহস করবে না এমন করতে

পরমেশ ধরতে পারছে না কে বলছে—হিস্ট্রির না সংস্কৃতের না বাংলার কে? কে আর তা জেনেই বা কী হবে? 'তারা তো বেশ ঠাণ্ডা মাথায় বলছে সব, একজনই নয় নিশ্চয়, উপস্থিত তিনজনই, তাহলে ?

সে আরো দিশেহারা হতে থাকে, কারণ বুঝতে পারছে না—এদের মতলব কি, কি করতে চায়, কি শিক্ষা দেবে

বেড়ি হও তাহ'লে, একজন শান্ত ঠাণ্ডা গলায় বলে ওঠে

পরমেশ কী করবে বুঝতে পারে না, সে দাঁড়িয়েই থাকে

কুইক্—ওয়ান টু, দ্বিতীয় জন বলল একটু দ্রুত লয়ে আর পরমেশকে পলক ফেলতে না দিয়ে তৃতীয় জন গর্জায়, থ্রি বলার সঙ্গে সঙ্গে কে যেন পরমেশের লুঙ্গি ধরে জোরে টান মারে, সেই টানে সরাৎ করে তার লুঙ্গি লুটিয়ে পড়ে পায়ের কাছে একেবারে

সঙ্গে সঙ্গে সে নত হয় লুঙ্গি তোলার জন্য, সে তখন উদম নেংটো, সেই লজ্জা ঢেকে ফেলতে হবে তৎক্ষণাৎ, সে যত নত হয় লুঙ্গি তোলার জন্য, লুঙ্গি তত দূরে চলে যেতে থাকে তবু

পরমেশ পিঠ বুক ধনুকের মত নুইয়ে ঢেকে ফেলতে চাইছে তার অসম্ভব উদোম লজ্জাকে, অন্ধকার-আলোয় যদিও ঘর ভাসন্ত তবু, ছি-ছি, একী লজ্জার ব্যাপার

পরমেশ একেবারে মাথা ঠেকিয়ে দিতে চায় পায়ের আঙুলের উপর। কিন্তু ততক্ষণে একটা রদ্দা এসে ঘা মারলে সে মশারি নিয়েই বিছানার উপর উপুড় হয়ে পড়ে ঘায় একেবারে

ধুম উদম সে তখন বিছানার উপর, একেবারে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে, এই তার প্রিয় ভঙ্গি শোবার ঘুম আসার আগে

সেই অবস্থায় তার প্রিয় ভঙ্গিকে এতটুকু বিঘ্ন না করে দু-জন তার দুটি ঠ্যাং ধরে ফেলে, আর আস্তে আস্তে ছিতড়ে সমদ্বিবাহু করার জন্য শেষে হেঁচকা টান মারে একটা বেশ

তাতে কুঁকিয়ে ওঠে পরমেশ যন্ত্রণায়, যেন চিরে গেছে তার পায়ু আর চাপা

সম্মিলিত হাসি একটা তখন ঘরময় ঘুরে এসে তার শরীরের উপর আছড়ে পড়ে, সে টের পায়

কে একজন সটান সওয়ার হয়েছে তার শরীরের উপর, পরমেশ নড়তে চেষ্টা করে, কিন্তু সওয়ারীর দলনে মর্দনে দুই দেহের ঘামের ঘর্ষণে তখন আওয়াজ উঠতে থাকলে সে তীব্র যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ওঠে, তার মলের খোলের মধ্যে সজীব এক শক্ত দণ্ড যেন ঢুকছে বেরিয়ে আসছে খুব

তীব্র যন্ত্রণা শরীর ছিঁড়ে ফেলতে চাইলে তার চেয়ে বড় একটা যন্ত্রণা লজ্জা তাকে পিষে পিষে শেষ করতে থাকে, সে তোষক চাদর বালিশের সেই চিমসে ভোটকা গন্ধের মধ্যে লজ্জা যন্ত্রণাকে গুঁজে দিতে দিতে কান্নায় কান্নায় ভেঙে পড়তে থাকে

আর না পেরে উপায় না দেখে লজ্জা যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চোখ বুজে ফেলে যেন চোখ বন্ধ করলে কেউ দেখবে না, জানবে না এসব

তারপর কিছুই মনে পড়ে না পরমেশের আর

যখন চোখ মেলে, দেখে অন্য এক বিছানায় শুয়ে আছে সে তীব্র গন্ধ চারধারে. হোটেলের মতো পুতি গন্ধময় নয় তবু, বোধহয় ঝাঁঝালো এই গন্ধে পোকা-মাকড় মরে, দুষ্ট বায়ু পরিশুদ্ধ হয়, অন্তত বদ গন্ধ কাবু করে ফেলে না নাক

বালিশ থেকে মাথা তুলে দেখতে চায় সার সার খাট, একটা আর একটার ঘাড়ে এসে পড়ছে যেন, আর চারদিক স্তব্ধ হলেও কেমন গোঙানির শব্দ হয় মধ্যে মধ্যে—হয়ত যন্ত্রণার

নড়তে গিয়ে টের পায়, কোমর থেকে হাঁটু শরীরের সামান্য নাড়ায় ব্যথায় দীর্ণ হয়ে যাচ্ছে

আহ্, ব্যথার এই অব্যয়সূচক শব্দটি বোধহয় সচকিত করে চারধার ঐ চাপা গোঙানির মধ্যেও, তখন কে একজন মৃদু শব্দ তুলতে তুলতে এগিয়ে আসে খাটের দিকে তার—একজন নারী, সেবিকার বেশে শান্ত নম্র বেশ, চোখ জুড়িয়ে যায় তাতে

ব্যথা করছে বুঝি, সেবিকার সেই বিনম্র অনুচ্চ জিজ্ঞাসা তাকে কেমন বিহ্বল করে দিতে থাকে, সে তার দিকে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়

তাতেই তার জিজ্ঞাসা যেন স্ফুট হয়

সেবিকা বলে, এতো মানুষের কাণ্ড নয়, আপনি উঠবেন না প্লিজ, যত

জানোয়ারের কাণ্ড , মানুষ যদি পশু হয়ে যায়, তবে তো, আটটা স্টীচ্ লেগেছে

সব কথা কানে যাবার আগেই পরমেশ মাথার তলা থেকে বালিশ তুলে নিয়ে চোখ মুখ ঢেকে ফেলে বালিশ চাপা দিয়ে তবু, তার সমস্ত শরীর তখন কান্নায় লজ্জায় তোলপাড় করছে খুব, এ কোন্ রাস্তা বেছে নিচ্ছে তারা ?

পরমেশ তাদের আমূল ঘেন্না করতে গিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে যেতে থাকে এখন ঐ বালিশের তলায়, ওরাই তো খবরটা দেয় প্রথম, লিস্টে আমার নাম ফার্স্টে আছে

সে তত উত্তেজিত হয় না আর, আস্তে আস্তে বালিশটা চোখ মুখের উপর সরাতে গিয়ে থমকায় অথচ

এত কাণ্ডের পর চাকরির অফারটা কি শেষমেশ আমি পাবো ?

প্রশ্নটা তাকে আবার অস্থির করে তোলে, সে তাড়াতাড়ি বালিশটা রেখে দেয় চোখ মুখের উপর আলতো ভাবে তখন

আর ফোঁপাতে থাকে কেবল

র‍্যাংক্ নম্বর ২১

সাধন চট্টোপাধ্যায়

তারপর সময় চলে গেল কত দূরে! দিন-মাস-বছরের চিহ্নে, অমোঘ স্রোত একদণ্ড দাঁড়াল না কারও জন্য। ছুটল অব্যর্থ নিশানায়।

অতীত: রেডি, স্টেডি এ্যাণ্ড গো। স্টারটার সবে রেডি বলে ব্রিজ। সাতজন প্রতিবেশী ঝুঁকে সজাগ পেশিতে প্রস্তুত। একশো মিটারের চূণের সরল রেখাগুলো সবুজ মাঠে ফিনিশিংয়ের কাছে যেন বেঁকে তালগোল পাকানো, সমান্তরাল নেই—পাঁচনম্বর প্রতিযোগী সুমনের ঠিক তাই মনে হচ্ছে। যদি তিননম্বর ট্র্যাকের প্রদীপের সঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে যায় ওখানে? চরমমুহূর্তে ধাক্কা লাগে? আর প্রথম না হতে পারলে, অন্তত প্রদীপের আগে প্লেস না পেলে বাবা দারুণ গম্ভীর হয়ে যাবেন। রাতে ঘুমোবেন না পর্যন্ত। অফিস ছুটি নিয়ে উত্তেজনায় মাঠে উপস্থিত। ট্র্যাকে দাঁড়াবার মুহূর্তেও সুমন দেখছিল মাঠের ধারে বাবা দাঁড়িয়ে, উৎসাহদানের সামান্য হাত নাড়া। সাদা ট্রাউজার, ঘিয়ে বুশশার্ট এবং কালো বুটজুতো। বাবার চুল সামান্য পাতলা হয়ে আসছে বটে, স্মার্ট লাগে চেহারায়।

এবার স্টেডি বলেই স্টারটার এমন ভঙ্গিতে তর্জনি শূন্যে তুললেন, যে কোন মুহূর্তে 'গো' বলেই নেমে আসবে ওটা। সুমনের পনেরো বছরের হৃৎপিণ্ড কাঠ, ফুসফুস বন্ধ। সমস্ত পেশি এখন কান খাঁড়া। লক্ষ্যভেদের বিহঙ্গচক্ষুর মত সমস্ত পৃথিবী মানে ফিনিসিংএর সাদা সুতো। সারা দেহে ফেটে পড়া

অস্থিরতা। উঁচোনো আঙুলটির মাথায় 'স্টেডি' ও 'গো'-এর চূড়ান্ত সময়টুকু ঝুলে আছে। কি দীর্ঘ! হঠাৎ ঘোরের মধ্যে তিন প্রতিযোগী সহ সুমন ছুট দিতেই স্টার্টার টেনে এনে যথাস্থানে দাঁড় করিয়ে দিল। সূচনার লজ্জা নাকের ঘামে মেশার মধ্যেই হঠাৎ 'গো'!

বর্তমান: একতলা থেকে দোতলায় উঠতেই অসম্ভব যন্ত্রণা বোধ হচ্ছিল সমরেন্দ্রনাথের। পুরো ফুসফুস টেনেও কফের চাপে বাতাস নিতে পারছিল না যথেষ্ট। গোল তেলের দাগ ধরা ইজিচেয়ারটায় চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল, স্বাভাবিক শ্বাস ফেলা না পর্যন্ত। নাকের হাড়ে চশমাটি গড়িয়ে এসেছে, চোপসানো গালে কাঁচা-পাকা দাড়ি, কপালে বলিরেখার ফাট-ফাটল এবং টাকে খুশকি চুলকোনো নখের সাদা দাগ।

অনুরাধা জিজ্ঞেস করল—দর কত দিল?

—এক গ্লাস জল! সমরেন্দ্রনাথ উঠে বসে। শুকনো ঠোঁটজোড়ায় সম্পূর্ণ গ্লাসটি শুষে, লোমে গড়ানো জল টোকা দিয়ে বলে—চল্লিশ।

—মোটে? অনুরাধা উদ্বিগ্ন।

—গরজটা যে আমার ধরতে পেরেছে। সাধে বলে দালাল!

—রাজি হয়েছ?

—সময় চেয়েছি। বলল ভাড়াটে সমেতই কিনবে।

—তাই বলে চল্লিশ? লাখের একপয়সা কমে ছাড়বে না তুমি।

সমরেন্দ্রনাথের ঠোঁটে দুঃখের হাসি মিলিয়ে গেল মুহূর্তে। উঠে পাশের ঘরে কৌটো থেকে সিগারেট নিয়ে দুর্বল হাতে দু-দুটো কাঠিতে জ্বালিয়ে স্ত্রীকে বলে এ বাড়ির ইট মানে আমার এক ফোঁটা রক্ত! তুমি তো জানো অনু! এখন ত্যাজ্য বাপ-মা হয়ে আমরা .

থেমে গেল। বলতে চেয়েছিল, লাখ টাকা পেলেও বা কি এসে যায়। না বলা কথাংশ, সমরেন্দ্রনাথের, অভ্যাসে বুঝে নেয় অনুরাধা। কি ভীষণ এই উহ্যশক্তি! বহুদূর ভেতরটা পুড়ে গেল অনুরাধার। নিঃশব্দ দহনে কিছুক্ষণ থমকে রইল বটে, স্বামীকে বুঝতে না দেয়ার ছলনায় গোপনে শাড়ীর আঁচলে চোখের কোণা মুছে, স্বাভাবিক অভিনয়ে বলল—আর তো কিছু থাকল না আমাদের? লাখ খানেকও যদি না পাই, দুজনের ভবিষ্যত? হাত পাতবে কার কাছে?

অতীত : স্পোর্টসের মাঠ থেকে বাড়ি—বাবা গম্ভীর, শুধু একটি কথাই শোনালেন ছেলেকে—প্রেস্টিজ ডাউন করে দিলে? তখন সুমনের কান্না পেল। এই যে মাঠ, লেখাপড়ার চাপবিহীন শীতের মনোরম একটি দিন, বর্ণাঢ্য পরিবেশ, লাইনে দাঁড়িয়ে খাবারের প্যাকেট নেয়া সবার সঙ্গে মিশে, প্রাণবন্ত খেলোয়াড়ী মনোভাব, মন খুলে আড্ডা, বিভিন্ন ইভেন্টে দর্শক হিসেবে পাশে দাঁড়ানো—কোনোকিছুর রসই সে সংগ্রহ করতে পারেনি। জীবনের মূল ঢালাই করা। ফার্স্ট হতেই হবে, অন্তত প্রদীপের আগে স্থান বাড়ি থেকেই বাবার মন্ত্রগুলো সুমনের কোষে কোষে টেনশনের কংক্রীট ঢালছিল। মাঠেও সুমনের স্বাধীনতা ছিল না—খালি উপদেশ। ট্রাকে দাঁড়ানো পর্যন্ত বাবা হাত নাড়িয়ে স্মরণ করিয়েছিলেন, মনে আছে তো কথাগুলো? সমরেন্দ্রনাথ আকৈশোর শারিরীক রুগ্নতায় ভুগেছিল। খেলাধুলো, দৌড়ঝাঁপ সম্ভব ছিল না, অথচ বিজয়মঞ্চে দাঁড়ানো, প্রাইজ পাওয়ার বাসনা ছিল প্রবল। তাই ছেলের মধ্যে ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায় এখন।

বাড়িতে অনুরাধাও যখন হতাশায় মৃদু ভৎর্সনা করছিল, সুমন গরম ম্যাগির বাটি হাতে বলে—প্রদীপ প্রাইজ পাবেই তো, বড়ি কত ফিট্ ওর! —তোর হবে না কেন? আমিতো মাসে একশো টাকা দিয়ে গেমমাস্টার রেখেছিলাম?

বাবা ও-ঘরে কফি পান সেরে সকালের কাগজটায় ডুবে নিজের পরাজয় হজম করছিল। অনুরাধা পাশে বসে টি ভি চালিয়ে প্রদীপের প্রথম হওয়ার পেছনে কোনো পক্ষপাতিত্ব ছিল কিনা, স্বামীর কাছে খোঁজ নিচ্ছিল। ইতিমধ্যে অফিসের সান্যালবাবু সস্ত্রীক হাজির হতেই পাল্টে যায় আবহাওয়া। ওরা জানে সমরেন্দ্রনাথ ছেলের জন্য কামাই দিয়েছে। ঢুকেই প্রথম জিজ্ঞাসা—রেজাল্ট? স্বামীকে সাইডে ফেলে অনুরাধা হেসে বলে—হানড্রেড মিটারে সেকেণ্ড। স্টার্টারের দোষ না থাকলে ফার্স্ট হয়ে যেত।

—বাঃ। ও কোথায়?

অনুরাধা ছুটে এল সুমনের পড়ার ঘরে। ক্লান্তিতে ফেটে পড়লেও, কাল ভোরেই এক নম্বর টিউটরের টাস্ক সারছিল। কানে-কানে মায়ের সাজানো গোছানোর পর গেঞ্জিটা গলিয়ে এ ঘরে পা দিতেই সান্যাল দু-হাত টেনে বলে—কন্‌গ্র্যাচুলেশন। সুমন সামান্য হাসির জোরে অভ্যর্থনার জবাবে মাথা নুইয়ে রাখে। মায়ের সাজানো নির্দেশ, সান্যালের প্রশংসা—অম্বলে সুমনের গলা জ্বালা করল। তখনই ঈর্ষার যন্ত্রণা গ্রাস করতে ছুটল প্রদীপকে।

সান্যাল-স্ত্রী হেসে বলে অনুরাধাকে—আপনার ছেলে তো চৌখোস! তারপর যথারীতি স্বামীর ওপর অনুযোগের পশলা—হবে না কেন, বোস দা তোমার মত নয়, ছেলে-মেয়ের পেছনে

—এই খেয়েছে।

—চুপ করো। এক ধমকে সান্যাল বেচারা চুপ। রেবা বলে—অমন আলসে বাপের ছেলে-মেয়ে মানুষ হয় না। এবার জায়ন্টে বড ছেলেটা চান্স পেল না শুদ্ধু তোমার জন্য! বললাম পই-পই করে অঙ্কে তিনজন মাস্টার লাগাও, উনি ধরে রইলেন এক প্রফেসরকে নিয়ে! তিনশোটি টাকা নিয়েছে মাসে মাসে, আসল উপকার ঢু ঢু। কেন চুপ করবো অনুরাধা দি, আজকাল সে যুগ নেই, ছেলে তোমার এমনি-এমনি জুয়েল হয়েছে?

সমরেন্দ্রনাথ বলে—যুগটা এরকমই। স্পোর্টস-এর ব্যাপারেও আমি একজন গেম টিচার লাগিয়েছিলাম।

—তুমি আর বড গলা কর না। অনুরাধা বলে—আমি পেছন না লাগলে কিছুই হত না।

সান্যাল দম্পতী চলে গেলে অনুরাধা ও সমরেন্দ্রনাথের মধ্যে নীরবতা বড্ড অস্বস্তি তৈরি করে, কেবল টি ভি-র মধ্যে লুকোনো ছাড়া। সুমন লঘু মেজাজে বলে—মাঝ মাঠ অবধি যা দৌড়েছিলাম, পাশের বন্ধুটা গোলমাল না করলে···। প্রদীপ মারলো তো তখনই!

বিচারকের কণ্ঠে সমরেন্দ্রনাথ—গোলমাল মানে?

—পড়ে কাৎরাচ্ছিল ভাবলাম পা-টা বোধ হয়

কথা শেষ হয় না। সমরেন্দ্রনাথ অসহিষ্ণু হয়ে বলে—আর সময় পেলে না? জীবনে কে কার বন্ধু?

সুমন চুপ। নিজের ভুলটুকু শুধরে নেবার জন্য বাবার দিকে চেয়ে রইল। ক্রোধের প্রথম ধাক্কা সামলে, সমরেন্দ্রনাথ উপদেশ দেয় থেমে থেমে—যেমন ভাবে ছোটবেলা থেকে গড়ে তুলেছিল সুমনকে।

—জীবনটা কম্পিটিশন। সেখানে কেবল তুই স্বয়ং। বাকি সব মিথ্যে। এ যুগে তা যদি না বুঝিস, মার খাবি। দয়া-মায়া দেখাবার অনেক সময় পাবে জীবনে, ও জন্য নিজের ক্যারিয়ার বিসর্জন দিতে হয় না।

বর্তমান: বাড়িটার দর সত্তরে তুলে সমরেন্দ্রনাথ মোটামুটি যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে বেচার, সায় না থাকলেও বাধা দেবার ক্ষমতা যখন চাপা দিতে

বাধ্য হয়েছে অনুরাধা, ক্রমাগত কিছুদিন দুজনের অর্ধসুপ্ত রাত কাটল। নীচে ভাড়াটেদের প্রতিদিনের উৎপাত-চেঁচামেচি, অথচ ওপরের অংশে দুটি পুরোনো সম্পর্কের কাছে অষ্টপ্রহর কি একঘেয়ে দীর্ঘ! শেষ হতে চায় না। কাঠের দেরাজ, আলমারি, আয়না, খাট, দেয়ালঘড়ি—যাবতীয় অস্থাবর আসবাবপত্র, বাসন-কোসন খুব আলগা মনে হয়, অথচ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত এককালে এগুলোও সংসারের অচ্ছেদ্য ছিল সমরেন্দ্রনাথ ও অনুরাধার। কি আদিম আকর্ষণ ও সম্পর্কের—বিক্রির সিদ্ধান্ত ক্রমাগত রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে।

অনুরাধা বলে—ঘুমোও নি? প্রেসার খেয়াল আছে?

—মরব না। তারও ভাগ্য লাগে।

—দেখো, ভাগ্য যার-যার, তার-তার। ভগবান না করুক, এর ফল ওকে ভুগতে হবে। ছেলেতো আর চিরকাল ছোট থাকবে না, দেখব সবই।

সমরেন্দ্রনাথ নীরব। কপালের জোড়া রগ সামান্য দপ্‌দপ্‌ করছিল যা, দেয়াল ঘড়িটার একটানা আওয়াজে ক্রমাগত ঘা খেয়ে জ্বালাময় প্রলেপ সৃষ্টি করছে চোখে। মৃদু ধমক দিয়ে উঠল অনুরাধাকে—কাঁদছ কেন? কান্নার কি হয়েছে? সত্তর হাজারে দিব্যি কাটিয়ে দিতে পারব দুজনে। বুকে হিক্কা তুলে জড়ানো কিছু কথা উথলে পড়ল—কত বছর বিজয়ার মা বলে প্রণামটুকুও পাইনা! পেটে ধরে এতই অপরাধ করেছি?

—ভাগ্য! কাকে বলবে!

বড় মেয়ে মৃত্তিকা এল দুদিন পর, সঙ্গে জামাই বিমল। বিষয়সংক্রান্ত কিছু কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ মেয়ে বলে—সুমনকে জানিয়েছ?

—কেন? কে সুমন?

—ওর কিছু মতামত থাকতে পারে!

—বাপ মাকে চিনতে চায়না যে, কিসের মতামত?

—দোতলা বানাতে হাজার পঁচিশ, শুনেছি দিয়েছিল?

—ওকে তৈরি করতে দ্বিগুণ যে খরচ করেছি? আমার তো জমানো সম্পত্তি ছিল না, অনেক ঝক্কি নিয়ে আয় করতে হয়েছে। কতটুকু জানো তোমরা?

অনুরাধা অভিমানে বলে—কেন পুরোনো কাসুন্দি ঘাটছ আর।

অতীত: হাতে গ্রাস বানিয়ে মুখে পুরতে সময় খরচ, তাই খাবার টেবিলেও সুমনের চোখ বইয়ের পাতায়, অনুরাধা চামচ তুলে দেয় মুখে।

কোনো বিশেষ ব্যাজন বা মাছ-মাংসের স্বাদে জিভের কোষে কোষে তৃপ্তিকর অনুভূতিতে সুমন যদি বলে 'বাঃ। দা-রুন।', অসহিষ্ণু অনুরাধা বাধা দেয়, —হ্যাঁ হয়েছে, তুমি পড়ো। জয়েন্ট এনট্র্যান্সে ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে চান্স পেতে গেলে র‍্যাংক্ খুব উঁচু হওয়া দরকার। প্রতি ক্লাশে, মাধ্যমিকে—বাজির ঘোড়ার মত চাবকে ছুটিয়ে বাপ-মা ছেলেকে দিয়ে পেয়েছে পজিসন, ষ্টার, ডিভিশন এবং সার্থক পিতা-মাতার সন্মান, তবু মন পুরো ভরেনি—কোথায় যেন অসাফল্যের গ্লানি! জ্যাকপট জিততে পারেনি। কোনো যুদ্ধেই সম্ভব হয়নি প্রদীপকে হারানো। তাই জয়েন্ট পরীক্ষাটাই বাপ মায়ের শেষ ভরসা। সমরেন্দ্রনাথ লেখাপড়ায় মাঝারি, ঘষে ঘষে গ্রাজুয়েট, তিন দাঁড়ির এম এ।

শৈশব, কৈশোর—জীবনের ভিত্তিভূমির গড়নপর্বে, সুমনের জীবনে, চারপাশে ফাঁকা কোনো অবসর, কল্পনা, মায়া-মমতার সুযোগ ছিলনা। জীবন কোনো মাত্রা পায়নি। যদি কখনও বাজির ঘোড়া সামান্য আনমনা হয়ে গেলেই সমরেন্দ্রনাথ সচেতন।

—বিকেলে অলোকবাবুর কোচিংটা নষ্ট হবে না?

—এক দিন তো। বড় মামা অসুস্থ ··দেখতে চাইছে আমায়।

—আমার ইচ্ছে নয়।

বাবার মুখ দেখে সুমনের ইচ্ছেটুকু নিভে যায়। সমরেন্দ্রনাথ তখন বোঝাতে থাকে—মাধ্যমিকে উনিশটা নম্বর কম পেয়ে টপ্ স্কুলে চান্স পেলে না, প্রদীপের রেজাল্টতো দেখলে। এই জয়েন্টে তোমার রিভেঞ্জ নেয়ার শেষ সুযোগ। তাছাড়া, মামা, কাকা, দাদার পেছনে সময় নষ্ট করে কেউ এখন? ওরা তো চলে যাচ্ছে না!

—মামা যদি কিছু মনে করে, তাই··

—রেখে দেন! সংসারে তোমার কিছু ভাবতে হবে না। এ দিকটা দেখো, বাকি সবের জন্য আমি, তোমার মা তো আছি।

ভোর পাঁচটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত পাঁচটি কোচিং এবং বাড়িতে লেখাপড়ার চাপে সময় কাটে সুমনের। চারপাশের উত্তাপ, উত্তেজনার বহুদূরে প্রশংসার খোলসে সুমন ক্রমশ উপ্ত হয়। কেমন অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে ভেতরে ভেতরে। কেউ প্রদীপের প্রসঙ্গ তুললেই সুমনের ইগোতে বাঁধে, মনে করে উদ্দেশ্যমূলক, তখন সেই 'কেউ'-টিকে অবজ্ঞা অপমানে প্রদীপকেই ঈর্ষাবিদ্ধ করে মনে মনে।

আড়াই বছর থেকেই যখন সুমনের পিঠে ব্যাগ চেপেছিল, রুগ্ন শিশুমাত্র সে। সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে জোর করে তুলে সাজিয়েগুছিয়ে অনুবাধা টেনে নিয়ে চলত স্কুলে। পাঁচ কে জি ব্যাগের ভারে ঐটুকু রুগ্নশিশু সামান্য ঘাড় কুঁজিয়ে থপথপ হেঁটে যেত পশুশাবকের মত। ভয়ে স্বপ্ন দেখতনা, কেঁদে উঠত, পাছে স্কুলে দেরি হয়ে যায়, মা শাসন করে। বাবা-মায়ের ইচ্ছে লেখাপড়া, স্পোর্টস, ছবি আঁকা, আবৃত্তি—সব ব্যাপারেই ছেলেকে নিংড়ে প্রথমস্থান লাভ করে। আর ফার্স্ট হতে না পারলেই সব বৃথা জলাঞ্জলি—শিশুকে তোতাপাখির মত পড়ানো হত। ফুল-পাতা, স্বপ্ন মেঘ-আকাশ কৌতূহল, এই পৃথিবীর গন্ধ-বর্ণ—স্কুল সিলেবাসের বাইরের কোনো কিছুতেই বাবা-মায়ের প্রশ্রয় ছিলনা। তবে খাওয়া-পোশাকের আবদারে এরা কৃপণতা করেনি। মুখ ফসকালেই হল! পাঁচ বছর বয়সেই—মৃত্তিকার যখন দশ—সুমনের বোধ জন্মেছিল সংসারে দিদিটা ওর পুরো পাওনায় ভাগ বসাচ্ছে।

এই ভাবে বাজির ঘোড়া ছুটিয়ে, খ্যাত থেকে খ্যাততর স্কুলে ভর্তির কঠিন পরীক্ষা উতরে-উতরে, সমরেন্দ্র-অনুবাধা পেয়েছে যোগ্য পিতা-মাতার সম্মান, স্টার ডিভিসন ইত্যাকার সাফল্য, জীবনের অপূর্ণ বাসনার সার্থকতা!

—যুগটাই এই, বাপ-মায়ের সংযম দরকার। কেউ ওদের ঈর্ষা করলে সমরেন্দ্রনাথ হাসতে হাসতে উপদেশ দিত।

বর্তমান: খবর পৌঁছনর তিনদিন পর মৃত্তিকা ঘণ্টাখানেকের জন্য এল এ বাড়িতে। ছেলে-পুলে নিয়ে সংসারে হুটহাট আসা হয়না বাপ-মাকে দেখতে। সমরেন্দ্রনাথ ইজিচেয়ারে শুয়েছিল তখন। কোটরে ডুবন্ত চোখ, সারা মুখে ক্লান্তির ছাপ। আঙুলে সিগরেট যদিও, কষ্ট হচ্ছিল টানতে। তিন দিন ধরে অদ্ভুত ব্যথাটা বুকের বামপ্রান্ত থেকে বাহুমূল ধরে নেমে আসছিল—কব্জি, আঙুল পর্যন্ত।

—তুমি ডাক্তার দেখাবে না?

—ধুর পাগলী! কিছু হয়নি আমায়॥

—কার জন্য অভিমান, বাবা? নিজেকে ধ্বংস করে কি লাভ?

—খুব হয়েছে। ছাখ মা কি করছে! শুনছো, মিতু এস।

আটক শেষ বর্ণে, কণ্ঠস্বরে গোঙানি ফুটতেই, মৃত্তিকা চিৎকার দিল।

অতীত: জয়েন্টে, অবশেষে, জ্যাকপট পেয়ে সমরেন্দ্রনাথের মনে হল কতদিন ধরে এই শৃঙ্গটায় ওঠার চেষ্টা! হঠাৎ সাফল্য, অবশেষে! আর

এখানে দাঁড়িয়ে, কত বাবা-মায়ের দৃষ্টিতে এরা অনন্য। সুমনের ব্যাংক হয়েছে ২১। প্রদীপের ১০৩। ২১ মানে, ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে—কত অভিভাবকের কাছে সর্বস্ব খুইয়েও যা মরিচীকা। এ বাড়িতে সেদিন ছোটখাট উৎসব। আপ্যায়িত, সস্ত্রীক অফিস কলিগদের মাঝে অনুরাধাই ছিল বেশি প্রগলভ, সমরেন্দ্রনাথের মুখে গর্বিত হাসির সাইনবোর্ড। ছেলে একটু গম্ভীর —নিজের অসাধারণ মেধার ব্যাপারে সচেতন যেন। বাবার আহ্বানে সবার দৃষ্টিনন্দিত হয়ে, মিনিট দুয়ের মতো, ফিরে গেল নিজের আশ্রয়ে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে বাবা শুধু সামান্য উপদেশ দিলেন—হস্টেলে যাচ্ছ, জীবনে প্রথম বাইরে থাকা। ভুলে যেওনা, সারভাইবাল অব দি ফিটেস্ট! সারাজীবন তোমাকে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হবে। ক্লাব, ইউনিয়ন যাই কর ওখানে নিজের স্বার্থ ভুলে যেও না।

অনুরাধার হাসিতে খুশির চটুলতা।

—প্রেম-ট্রেম যদি করে বসো, আমাকে জানাবে। হেজি-পেচি, হাভাতে ঘর যেন না হয়। সুমন জবাব দিল—অর্ধেক রাজত্ব আর বাকি অর্ধেক রাজকন্যা? তোমরা থাকবে কোথায়?

বর্তমান: মৃত্তিকার তরফ থেকে পরপর তিনটি পত্রাঘাত এবং শেষে টেলিগ্রামের পর সুমন উপস্থিত। মাত্র দু-দিনের সময়। কলকাতা পৌঁছেই যে ফিরতি প্লেনের টিকিট হাতে পা দিয়েছে এ বাড়িতে। স্ত্রী আসেনি, সঙ্গে আট বছরের ছেলে দীপ। প্রতিযোগিতার রণক্ষেত্র থেকে দুটি দিন টেনে বার করা যে কত হাঙ্গামার, বোঝায় কাকে? ঠিকই করেছিল, পাল্টা টেলিগ্রামে মৃত্তিকাকে জানিয়ে দেবে এখন অসম্ভব! স্ত্রী লগ্নারও তাই মত। প্রমোশনের ক্ষেত্রে অফিসে সূক্ষ্ম আমলাতান্ত্রিক ঘোঁট চলছে। দাবার চালে সামান্য ত্রুটি হলেই কত পিছিয়ে যেতে হবে। সুমন সাত-পাঁচ ভেবে বাধ্য হল আসতে, বাপ যদি মরেই যায়, পিণ্ডদান তো করতে হবে, আফটার অল হিন্দু তো!

তিনবছর ব্যবধানে এ বাড়িতে সুমনের উপস্থিতি। দিল্লী থাকতে লাষ্ট এসেছিল, বম্বে ট্রান্সফার হয়ে সময়ে কুলোয় নি। চাকরি আর সংসার নিয়েই দিন-রাত ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিছু ভাবার সময় নেই।

এ পাড়ার উঠতি প্রজন্ম কেউ চেনেনা, সুমনেরও পুরোনো জীবন ক্ষেত্রের প্রতি কোনো কৌতূহল নেই। ভাবে, পরিচয় ঝালাতে গেলেই ঝামেলা। চাকরি, ডোনেসন, নানান সুবিধের জন্য অনুরোধ, সামান্য দুটো দিন কেবলই

উৎপাত সৃষ্টি করবে। সব মানুষের মধ্যে একজন ভিখিরি বাস করে—উঁচুতে কেউ উঠলেই হাত পেতে কাঙালপনা শুরু করে দেয়।

এ বাড়িতে ঘণ্টা চল্লিশের মধ্যে চার পাঁচটির বেশি কথা বলেনি। দু একবার দোতলায় গ্রীল গাঁথুনি সামান্য পরীক্ষা করছে, নিচে ভাড়াটে বসবার শর্তাবলী জেনেছে, মা-বাবার শারীরিক কুশল জিজ্ঞেস করেছে মামুলি ঢংয়ে, বাকি সময় নতুন পরিবেশে দীপের প্রতিটি পা ফেলায় অনুশাসন করেছে মৃদু কণ্ঠে। রাতের দিকে শুধু সমরেন্দ্রনাথকে বলল, পুরো বাড়িটা? পাকাপাকি হয়ে গেছে?

—মোটামুটি। বাপের জবাবে, সুমন পাঁচ মিনিট উদাস থেকে বলল—আমাকে ইনকম করলে ভালো হত না?

—কেন?

তাচ্ছিল্যের হাসিতে 'এমনি!' বলেই সুমন বিষয়টা ঝেড়ে ফেলে।

সকালে বাথরুম সেরে, এ ঘরে ছেলের ব্রাসে পেস্ট মাখাতে-মাখাতে দেখল চা হাতে অনুরাধা। বাতে দেহটা ফুলো।

—রাখো।

—কটায় বেরোবি তোরা?

—কেন?

—সেই বুঝে রান্না চাপাবো।

—না, না। কলকাতায় কাজ সেরে ওখানেই খেয়ে নেবো। ঝামেলা করতে হবে না।

—সে কি হয়? অন্তত মাছের ঝোলভাত বাচ্চাটা না খেয়ে এ বাড়ি থেকে বেরোবে?

—তা মব। এখানে ট্যাক্সি-ফ্যাক্সির ঝামেলা· স্ট্রেট হোটেলে খেয়ে এয়ারপোর্টে!

অনুরাধা চলে যায়, শোনেনা। হাঁপাতে-হাঁপাতে ভাত চড়াবার ব্যবস্থা করে।

চায়ের কাপটি নিয়ে, ব্রিফ কেসটা খোজার চেষ্টায় হঠাৎ সুমন দেখতে পেল টেবিল আর আলমারির ফাঁকে একটা বিবর্ন চিঠি—ধুলোয় মাখামাখি। সে চিনতে পারে।

গত তিন বছর সুমন এখানে পা ফেলার সময় পায়নি বটে, এক বছর বাবার সঙ্গে পত্রযুদ্ধ চলেছে। ঠাণ্ডা লড়াই। সেই প্রথম রিক্রুটমেন্টের পর সুমন ধাপে ধাপে জীবনে যতই উন্নতির শীর্ষে উঠেছে, উপলব্ধি করেছে বাবার রক্তে

ভিখিরিপনা খুবই নগ্ন, প্রকট। চতুর ভাষায়, চিঠিতে ফুটে উঠত টাকা-কড়ি পাঠাবার ইঙ্গিত। এ সংসারকে সুমন কম দেয়নি। দোতলা তৈরির সময়ও বিশ হাজারের ড্রাফট্ পাঠিয়েছিল। সব হিসেব আছে সুমনের। অনেকবার মার্জিত ভাষায় ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করলেও, সমরেন্দ্রনাথ নির্লজ্জের মত চায়নি তা বুঝতে। পিতার এই অবুঝ আবদারের মধ্যে সুমন খুঁজে পায় প্রচ্ছন্ন দাবির সুর।

ওটাই ছিল সুমনের শেষ চিঠি। পাঁচ হাজারের ড্রাফট্ চেয়ে সমরেন্দ্র নাথ খোলাখুলি খোঁচা দিয়েছিল তোমার উন্নতি ও সাফল্যে বাপ-মায়ের কোন ইনভেস্টমেন্ট নেই, বলতে চাও? তোমাকে তৈরি করতে আমি মাঝেমাঝে নিচে নেমে অর্থ রোজগার করেছি। অস্বীকার করতে পারো? ভুলে যেওনা, একজনের উন্নতির পেছনে সংসারের অনেক মানুষের দান থাকে।

সুমনেরও উত্তর ছিল প্রত্যক্ষ, সরাসরি।

—সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে লাভ নেই বাবা। ভবিষ্যৎ আমার শেষ হয়নি এখনও, তুমি করে দেবে তা? আমাকেই দেখতে হবে। আমার ক্যালিবার অস্বীকার করতে চাও আজ—সে তোমার রুচি। আমি মনে করি, জীবন কারও ঋণের মুখাপেক্ষি নয়। সবটুকুই আমার মেধা এবং শ্রমের। দায়বদ্ধতা নেই কারো কাছে আমার।

এরপর পিতাপুত্রের পত্রযুদ্ধের ক্ষান্তি। জীবনের মূলে ঝাঁকুনি খেয়ে, বুড়ো বয়সে সমরেন্দ্র-অনুরাধা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাড়িটা বেচে ক্ষুৎপিপাসার ব্যবস্থা করবে।

ওদের বেরোবার ঠিক ঘণ্টাখানেক আগে হঠাৎ বৃদ্ধ ও অসুস্থ সমরেন্দ্রনাথ রক্ত চাপে জ্ঞানহারা—বিকৃত মুখে নির্বাক। অনুরাধার আকুল কান্নায় ভাড়াটেরা ছুটে আসে। খবর যায় মৃত্তিকা বিমলের কাছে। ডাক্তার আসে।

কি করবে সুমন? প্লেনের টিকিট বাতিল? এ অবস্থায় চলে যাওয়া কি ভীষণ দৃষ্টিকটু। বিমল শুকনো গলায় বলে—পারলে থেকে যাও সমু। শেষ ঘটে যেতে পারে!

সুমন নিরুত্তর। বিপদে সিদ্ধান্ত গোলমাল হয়ে যায়। দীপ ক্ষুব্ধ। এ ঘরে বাবাকে ডেকে বলে—আমাকে ফিরতেই হবে ড্যাডি।

—কেন?

—কাল আর স্কুল মিস করব না।

—আমার অবস্থাটা বোঝো দীপ!

দীপ ঠোঁঠ ফুলিয়ে জবাব দিল—আমারটা?

সুমন সামান্য রুক্ষ হয়ে বলে—বুঝছ না কেন, হি ইজ মাই ফাদার!

ভবিষ্যৎ: অবসরের পর আপন স্মৃতিকোঠা ছাড়া যখন র‍্যাংক্‌টুকুর কোথাও অস্তিত্ব থাকে না, সুমনের মনে হয় পৃথিবীটা সম্পূর্ণ অপরিচিত। নতজানু হয়েও ফিরবার উপায় নেই। কে যেন ক্রমাগত টেনে নিচ্ছে অন্ধকার বধ্যভূমিতে।

হাল মাহিন্দার

অশোককুমার সেনগুপ্ত

'তাহালে হালমান্দেরে তোর সঙ্গে কি কডাব আছে সাগরা?'

সাগবা হাল মাহিন্দার, আঠাব বছব বযস, কালো, বেঁটে কাঠামোটায দৃঢ বাঁধুনি, তার ব্যাযামচর্চিত পেশী, বাহু, দাবনা, মাথায কোঁকডান চুল, কোমরে হাফপ্যাণ্টেব উপব স্যাণ্ডো মযলা ছোপ গেঞ্জি, উদোম প্রশস্ত লোম ঘন বুক, কামানো মুখে প্রাণশক্তিব সজীব ঔজ্জ্বল্য, খাডা নাক। সে নিখিলের দিকে তাকায়।

নিখিল পাজামার উপর একটা লগবগে পাঞ্জাবি, মাথাব চুল উডন্ত, প্রচণ্ড ব্যস্ততাব ছাপ বোগা কালো মুখমণ্ডলে, দু'চোখ তীক্ষ্ণ। উচ্চ মাধ্যমিক দেওযাব পব পডাশুনা কবেনি। গ্রাম পঞ্চায়েতেব সদস্য গোবর্ধনেব পবিচালক। রাস্তায মাটিফেলা, পুকুবকাটা, বনসৃজন, ডি আর ডি এ ইস্তক সব কাজে আছে। বাডির মেজ ছেলে। বাপ নেই। বডদার মুদির দোকান। ছোটটি কলেজে পডে। গ্রামীন রাজনৈতিক চাতুর্য নিখিলেব করাযত্ত। সে চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে।

হাল মাহিন্দাব কথাটাব অর্থ হল চাষেব মাহিন্দার বা বাগাল। গরুবাছুব দেখভাল কববে। কিন্তু মূল কাজ হল ওই হাল অর্থাৎ লাঙল চষা, জমি চষা, কিষানের মত দাযিত্ব। তবে কিষানেব মত উৎপাদনেব ভাগেব অধিকাবী নয়। মাস মাইনে। মাইনেটা এখানে ধানে ধার্য। পুবোন প্রথায় সলিতে।

দশ সেরে এক সলি। ওজনে হবে সাড়ে সাত কে জি'র মত। দশ সলি থেকে চোদ্দ সলি সাধারণ হাল মাহিন্দারের মাসিক শ্রমমূল্য ধার্য। চাষের কাজ না থাকলেও গেরস্ত ঘরে তার নিয়মিত উপস্থিতি চাই।

নিখিলের প্রশ্নটার উত্তর দিতে সময়পাত নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু কেন জিজ্ঞাসা সাগরার মস্তিষ্কে বেজে উঠতেই সে থমকে যায়। বাবুর মতলব কি! ডি আর ডি এ-র জন্যে সার্ভে হয়েছে। তার নাম চারশ তেপান্ন নম্বরে লেখা আছে। পর পর সকলে পাবে। অনুদানমিশ্রিত ঋণ। ছোট ব্যবসা, গরু কেনা, ছাগল কেনা, মুদি ভাজা ইত্যাদি ইত্যাদি। সাগরা গাই কিনবে। তাহলে কি তার নাম এসে গিয়েছে। সে কথা কি পাড়তেই নিখিলের হাল মান্দেরির কথা তোলা। টাকা চাইবে তার কাছে?

বাতাসে ঢলা দুপুরের ঝড়জলের আরামী আবেশ। সূর্য পশ্চিমের ঢালুতে রক্তিম রৌদ্রছটা নমনীয় করে ফেলেছে। বৃষ্টিস্নাত শেষ বিকেলের আলো। জলের চেয়ে ঝড়ের আস্ফালন ঢের বেশি ছিল। রোশেখের তৃষ্ণাতুর মাটির পিপাসা মেটেনি। ফলে ওগরানি নেই। জল দাঁড়ায়নি কোথাও। সিক্ত ধরিত্রী গুমোট তুলবে এখনই।

সাগরার স্কুলবিদ্যে নেই। পঞ্চায়েত আলোড়িত গাঁ নিপাট সারল্যকে খেয়ে ফেলেছে। প্রচণ্ড হিসেবী ধারা জীবনযাপনে। এন্তার টাকা আসছে। গ্রাম উন্নয়ন কাজও হচ্ছে কিছু কিছু। সঙ্গে সঙ্গে স্ফীত হচ্ছে একশ্রেণী। চোখ কান সবার সজাগ। বাপ ধনার মাথায় প্রশ্ন আছে। তবে নিরুচ্চার। সাগরা সরব। তার মস্তিষ্কে জটিলতা ঢের বেশি। তাকে পা ফেলতে সজাগ করে দেয় অভিজ্ঞতা।

সাগরা গেরস্তর বাছুর খুঁজতে বেরিয়েছে। সাদা শিং ভাঙা গাইটা বাছুর ফেলে পালিয়ে এসেছে ঝড়ের এলোমেলোয়। গাইটার গ্রাহ্য নেই। খড় চিবুতে ব্যস্ত। হামলে কোথায় বাছুর আনবে—তা নয়।

মুচিপাড়ার বাঁশ ঝাড়গুলো পেরিয়ে ডাঙায় উঠেছে। মাঝ চিরে মাটির সড়ক। দু'পাশে গরুর গাড়ির চাকায় গর্ত, মাঝ উঁচু সড়ক সোজা পূবে গাঁ ছাড়িয়ে। সড়কের ওদিকে বাউরিপাড়া। এদিকটা দেখে সড়কে উঠেছে—নিখিল।

'কি রে বলছিস না?'

'বার সলি!'

নিখিল দ্রুত বলে ওঠে, 'ঠকছিস। তোরা বুঝেও বুঝিস না। নায্য দাবি ছাড়বি কেন?'

সাগরার চোখ এবং কান বকনা অন্বেষণে। বাউরিপাড়া থেকে কোমরে ঝুড়িপদব বৌ না! হুঁ। জাল নিয়ে খোঁড়াও বেরিয়েছে। একটা লালচে গাই দাঁড়িয়ে। কোথায় একটা গরু ডাকছে। বাছুরটা যে কোথায় গেল। হুজ্জোত বটে। এখন ঢুঁড়ে বেড়াও তল্লাট।

'সেদিন আর নাই। আমরা থাকতে অন্যায় কখনও মেনে নেব'না। খাটিস—খাস। গেরস্ত ভগবান নয়—তোকে দান করছে না!'

সাগরার ভ্রূক্ষেপ নেই। বলে, 'বাছুর পেছি না!'

'সন্ধেবেলাতে একবার খামার ঘরে আয়।'

নিখিল দাঁড়ায় না। চেঁচিয়ে ডাকে, 'এই পেনে—দাঁড়া। তোর সঙ্গে কথা আছে।'

সাগরা জানে, সন্ধেবেলাতে না গেলেও চলবে। ভুলে যাবে তাকে মানুষটা। বিস্তর কাজ, অজস্র মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। সন্ধেবেলাতে কতজনকে যে যেতে বলেছে তার ঠিক কি! মানুষের বড্ড দাম। নিখিল শুধু সংগ্রহ করে বেড়ায়।

কিন্তু বকনাটা গেল কোথায় রে বাবা। গরু তাকে চরাতে হয় না। সকালে গোয়াল পরিষ্কার, খেতে দেওয়া, বিকেলে বাঁধা, খড়পাত দেওয়া। সারাদিন চরায় প্রহ্লাদ। গাঁয়ে গাংঠিপাল করে সে। দশ ঘরের গরু নিয়ে চরায়। গরু পিছু মাসিক চার টাকা। প্রহ্লাদ বলেছে, ঝড়ের আগে গাইবাছুর একসঙ্গে ছিল। প্রহ্লাদও খুঁজছে। এটাও তার দায়িত্বের সঙ্গে পড়ে। তবে ঝড়ের আগে গাইবাছুর এক সঙ্গে যখন ছিল, তখন নির্ঘাত দুধ খেয়েছে। বাছুর কি মায়ের তাই এখন চাড় নেই। এরকম ভাবনার মধ্যে সাগরার নিখিল খোঁচা দেয়। দরদ সহজ প্রাপ্য নয়। মূল্য কতটা দিতে হবে।

পশ্চিমের রোদ আরও ঝিমিয়ে এল। ঝোপঝাড় আদাড়বাদাড় কত ঘুরবে রে বাবা। সন্তোষ আসছিল। জিজ্ঞাসা করতে বলল, দেখ গা হেডমাষ্টারদের ঘরের উদিকে একটা বাছুর রইছে। সাদাপারাই বটে। তুমাদের কিনা জানি না।

বাছুর আনা সহজ কথা নয়। খেদড়ে গেলে ছুট লাগায়। বাঁছুর বেঁধে চা রুটি খেয়ে ঘরের পথে আবার মনে পড়ল, হাল মান্দেরিতে তোর কত্ত কড়ার সাগরা?

বাপ ধনা মুনিষগিরিতে চুল পাকাল, মাংসপেশী শ্লথ করল, হাঁপানি রোগের বাসা বাঁধল বুকে। ঘরে বসে থাকে না। হাফমিস্ত্রির কাজ জানে। লাঙ্গল বাঁধা কাঠের ছোটখাট কাজ, রাজমিস্ত্রির অল্পসল্প কাজ। কাজ প্রায়ই পায়।

সাগরা দাওয়া বরাবর আসতেই বলে ওঠে, 'ধান আনলি নাই ?'

'আজ বুধবার। জান না। বুধবারে কেউ ধান দেয় ?'

মা দাওয়ার এক ধারে ভাতের হাঁড়িতে কাঠের জ্বাল দিচ্ছে। ঘাড় ঘোরায় না।

ধনা চুপ করে গেল না। বলে, 'ইদিকে আয়। নিখিল গেরস্ত এসেছিল। তা লুকটা ভাল বটে।' ধনা মাথা নাচায়। সিদ্ধান্তেতে সে যেন মজবুত। বলে, 'তুর লিষ্টিতে নাম উঠেছে গাই কিনার। বলছিল—।'

'পাঁচু গেরস্তকে বলতে বলছিল হাল মান্দেরিতে ধান বাড়াও।'

সাগরা উঠোনের অন্ধকার মাখে। টান টান হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

ধনা ঘাড় তোলে। বিস্ময় নয়, সে বেটার উচ্চারণে ক্ষুব্ধতা টের পায়। সাগরার ধান বাড়ানর কথাতে আপত্তি স্পষ্ট। বলে, 'তুকে তাহালে বলেছে! দেখা হল। তা অন্যায় কি বলছে। ইতেই চলে না। তুর কজগার বাড়ান চাই। বৌটকে বাপের ঘরে ক'দিন ফেলে রাখবি।'

বৌয়ের নাম শুনে গা ছমছম করে ওঠে। রক্ত নাড়া খায়। শাড়ি মোড়া বালিকাটির ভীরু চাউনির ঢলঢলে কোমল মুখখানা মনে পড়ে। ফিক্ করে হেসে ফেললে জলতরঙ্গ বেজে ওঠে যেন। সাগরা মধ্যে মধ্যে প্রবল আকুলতা অনুভব করে। একবছর বিয়ে হয়েছে। রোগা গড়ন। নিতান্তই বালিকা। শরীরে পুষ্টতা নেই। তা এক বছরে ডাগরটি হয়েছে।

'বৌ এলে খরচা বাড়বে নাই।'

সাগরা যেন ধান বাড়ানর কথা পাঁচু গেরস্তকে বলবে। বলে ওঠে, 'যদি বলে বাড়াতে পারব না। ছেড়ে দে—কি করব।'

'ছেড়ে দিবি।'

'তারাদে করব কি ?'

'মুনিষ খাটবি।'

'রুজ রুজ কাজ পাব মুনিষের। ই ত তবু বাঁধা বটেক।'

ধনা চুপ করে যায়। কাজের বড় অভাব এই রুখু ভুঁইয়ে। জমির চেয়ে উঁচু ডাঙা বেশি। জলের বন্দোবস্ত নেই। ভাল বর্ষার নির্ভরতা। সে দেখে অন্ধকারে শব্দহীন ঘনত্বে বেটা সাগরা হারিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন ধানের বস্তা গেরস্ত ঘর থেকে আনার পথে নিখিল আবার ধরে। সাইকেল পাশাপাশি হাঁটিয়ে বলে, 'কিরে ধান আনলি—চল—তোর ঘরেই যাব। কাল সন্ধেবেলা এলি না? সন্ধেবেলা ছাড়া বসে দুটো কথা হয়? সারাদিন ত দেখছিস্।'

সাগরার পিঠে বস্তা, ঝোঁকা শরীর, একটাও শব্দ করে না। ভাবে, নিখিল-বাবুটি উপকার তার করবেই। বেহাই দাও, বলবারও জো নেই। গাইটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। সাগরা দ্রুত ভেবে নেয়, পাঁচু গেরস্তর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি আছে নাকি? তাকে লড়িয়ে লোকটাকে জব্দ করবে! তা ঝগড়াঝাটি তেমন থাকলে শুনতে পেত।

পাঁচু ঘোষের চাষই নির্ভর। বিঘে বিশেক জমি। দশ বিঘে সরস জমি চাষ করে শ্যাম। বর্গায় নাম লিখিয়েছে। পাঁচুরই বলদ লাঙল। তার ঘামারেই ধান তোলে। বাকি দশের মধ্যে তিন বিঘে পতিত। সাতবিঘে চাষ করে হাল মান্দেরিতে সাগরা। নীরস শুকো জমি। প্রচুর বৃষ্টিপাতেই একমাত্র উৎপাদন।

ধনা লাঙলের কাঠ কাটছিল। ঘরের সামনে উঠোন। তারপর ডোবা। ডোবায় একটা শ্যাওড়া গাছ ঝুঁকে আছে। পাশে জোড়া খেজুরের ঝোপ। ডাইনে ভাইয়ের ঘর। মুরগী চরছে উঠোনে। তেজী রোদের সকাল থেকেই তাপ শাসন। জ্বালানি পোড়ানির আর একটা দিন। বৃষ্টিটা কাল আর একটু চেপে হলে সুসার হত চাষের। জমি লাঙলযোগ্য হত।

'কি করছ? লাঙল? কার জন্যে?' নিখিল সাইকেল ধরে বলে, 'একবার গোবিন্দর কাছে যাব। ওরই নাম উঠেছে।'

'তাই নাকি?' ধনা কৃতজ্ঞচোখে তাকায়। হাতের বাটালি নামিয়ে রাখে।

সাগরা বস্তা নামিয়ে গামছায় হাওয়া খায়। বস্তাটা দাওয়ায় কাৎ হয়ে থাকে। ঘেমে উঠেছে সারা শরীর।

'কি রে সাগরা, ধান নেবার সময় পাঁচুকে বললি?'

সাগরা বোকার মত চোখ তুলে থাকে। ধনা বলে, 'দেখ কেনে হদ্দবুকা বলে কি না ধান বাড়ানোর কথা বললে ছাড়িন দিবে।'

'ইয়ার্কি।' ধনার কথার উপর নিখিল চাপান দেয়। হাতের সাইকেল নড়ে ওঠে 'আমরা কি ঘুমুতে আছি? ছাড়লেই হল। শোষিত হচ্ছিস্ তবু রুখে দাঁড়াবি না। কত আর বোঝাব তোদের? যাক্ গে যা খুশী কর।' ও

দিকে শীর্ণ রাস্তা ধরে চণ্ডীকে দেখে হাঁক পাড়ে, 'এই চণ্ডী গোবিন্দকে একবার ডাক তো।' সাইকেল নিয়ে ঘুরে পড়া চণ্ডীর দিকেই এগিয়ে যায়।

ধনা সাগরাকে দেখে। বেটার উপর খুবই রাগ হয়ে যায়। ছোঠটি তো আর নেই। নিজের ভালমন্দ না বুঝলে সে কি করবে? বাটালি চালাতে থাকে সে।

কিন্তু সাগরা না বলতে চাইলে কি হবে, নিখিল ছাড়বে কেন? চেতনা জাগাতে হবে না, সেটাই তো কৃত্য। পাঁচু সুবিধা করে নিচ্ছে। বঞ্চিত করছে সাগরাকে? তা মুখ্যু সাগরা। কুঁই কুঁই করছে। বাঘের মত গর্জানি তুলতেই হবে ওর। আসলে ওকে স্বার্থ সম্পর্কে সজাগ করে দিতে হবে। দুনিয়া তো ওতেই চলছে। সে লোকের স্বার্থ দেখে যাচ্ছে বলেই তার দাম। সুযোগ করে নিজের স্বার্থও পূরণ হচ্ছে তার তবে নিখিলের কাজ অনেক। হরিপদ গোকুলদের মুনিষ খাটান, মাটি কাটাতে, বাউরীপাড়ায় সব কিছুতে মিলে আগামী ভোট যাতে পক্ষে যায়, তার তোয়াজ করে রাখা, আপন হওয়া, পঞ্চায়েত অফিস, ব্যাঙ্ক, মিনিকিট, ডি আর ডি এ—এন্তার ঝঞ্ঝাট। সাগরাকে নিয়ে থাকলে হবে কেন!

ফলে ক'দিন আর এ নিয়ে কথা থাকে না। সাগরাও নিশ্চিন্ত হয়। যাক্ বাবা রেহাই পেল সে। কিন্তু একটা কাণ্ড যে বেধে বসবে কে জানত! এর এটা যে একটা মওকা তাই বা ভেবেছিল নাকি সাগরা। গোয়ালঘরের মাচায় খড় নামাতে গিয়ে ভেঙে পড়ল মাচা। কপালেই একটা কাঠের বাড়ি। ফেটে রক্তারক্তি কাণ্ড। সাবাসডারি হেলথ সেন্টার, ওষুধ ব্যাণ্ডেজ। পাঁচু তো ভয়ে কাঁপে।

নিখিল সংবাদ পেয়েই চলে আসে। বলে, 'ওষুধ পথ্যি দিয়েছে তো?'

হ্যাঁ। দশটা টাকা দিলেক।' সাগরা বলে, 'তবে দুষ আমারই। কে জানে ঘুন ধরেচে। মাচা ত আমিই করেছিলম।'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তোরই দোষ। হুঁ।' নিখিল ঝেড়ে ফেলে দেয়। বলে, 'বুঝলি, অত ভালমানুষ সাজলে হয় না। নিজের আখের গুছুতে শেখ।'

সাগরার রাগ হয়ে যায়, 'তা কি করব আমি?'

মুখ্যু আর কাকে বলে! সুযোগ হাতে পেয়েও তুই ছেড়ে দিবি! এখন ধান বাড়াতে বল। বাপ বাপ বলে বাড়াবে। তোকে ছাড়াতেও সাহস পাবে না

কথাটা ধনার ভারি পছন্দ হয়ে যায়। বলে, 'আচ্ছা বুদ্ধি দিলে—ইটিই সময়।'

নিখিল নিচু স্বরে বলে, 'তোদের কথা ভাবি বুঝলি। ভাল বৈ মন্দ বুদ্ধি দেব না। জানি লোকে নানা কথা বলে আমার সম্পর্কে। কাজ করতে গেলে কথা তো শুনতেই হবে।' নিখিল আশপাশ দেখে নেয়। ডোবাতে এক বৌ মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

পূব আকাশে সূর্য চাপা দিয়ে ঘন কালো মেঘ উঠছে। জোর ঝরাবে। বর্ষা কি তাড়াতাড়ি এসে গেল! মেঘলা সকালের পরিমণ্ডল গুমোট ধরে রেখেছে। কিন্তু সাগরা গুম হয়েই থাকে। একটাও শব্দ করে না!

'কি রে সাগরা, রা চুকার নাই তুর। ব্যাপারখান কি বল দেখি।'

'ব্যাপার আবার কি? পাঁচু গেরস্তকে বলব নাই?'

নিখিলের চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়। পলক পড়ে না। বলে, 'কেন? কেন বলবি না?' তারপর কুটিল গলাতে বিদ্রূপের ঢঙে বলে ওঠে, 'তাহালে বল ও ঘর থেকে অন্য কিছু লাভ পাস্।'

'তা পাই।'

ধনা যেন আকাশ থেকে পড়ে, 'কি লাভ পাসরে। ওই তো ধান বাড়তি ভুকে আবার কি দেয়?'

সাগরা বলে, 'সি আমি বলতে লারব।'

ধনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কেনে বলবি নাই?'

নিখিল সাইকেল ধরে দাঁড়িয়ে। বলে, 'বেটার মাথাটা খেয়েছে পাঁচু, দুটো মিষ্টি কথা বলে। দেখছ না, মাথা ফাটল কাজ করতে গিয়ে, বলে কি না আমারই দোষ। কি শেখাবে।'

সাগরা দাঁড়ায় না। গেরস্ত ঘর যেছি বলে বেরিয়ে পড়ে। অত বুদ্ধু সে নয়। নিখিলকে বলবে কেন? কাউকেই বলবে না। ভাঙা জমি চাষ করে যে হালমান্দেরিতে যা পায় তা উৎপাদনের আশি কেন নব্বই ভাগই হবে। মাস মাস ধানের হিসাব করে সে দেখে নিয়েছে। পাঁচু গেরস্ত কি হিসাব করে নি? নাকি অন্য জমির শ্যামের কাছে ভাগ থেকে পূরণ হয়ে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে বলে, অত হিসাব করে না? নাকি করে? অন্য লাভ দেখছে? বর্গা হয়নি, জমি তো তারই আছে, এই আহ্লাদে যাই হোক চলে যাচ্ছে। নিখিলকে বলাটা সত্য কথা, ঝামেলা পাকাতে পারে! কে জানে হয়ত উসকে

দেবে পাঁচু গেরস্তকে। পাঁচু গেরস্ত আর তার মধ্যে তৃতীয় পক্ষ থাকবে কেন? তা কথাটা তো বলা যায় না নিখিলকে। তাকে বোকা ভাবছে—হুঁ।

হাঁটতে হাঁটতে সাগরা ভাবে, চলে না এই ধানে—যথার্থ। তবে কি না দায়ী কে? রুখু ডাঙা জমি—মাটি। ধুৎ, মাটি আবাব দাযী হয় নাকি? মাটির দোষ নাকি? বৃষ্টি হলেই তো জমি সরস, উৎপাদন বেশি। তা কৃষিই দাযী? কেন ঝরে না সমযমত? কেন জলেব ব্যবস্থা নেই? দায়ীটা কে? নিখিলকে জিজ্ঞাসা করলে হত!

জহন্নামে যাক্। মাথার উপর মেঘ আসছে। আসুক—বৃষ্টি নামুক।

ওদিকে ধনাব কাছ থেকে সাইকেল ঘুরিযে নিখিল ভাবে, ব্রেণ একেবারে নেই। কি যে বুঝেছে মুখ্যুটা! হদ্দবোকা।

টোপ

চণ্ডী মণ্ডল

ভোরের অনেক আগেই ঘুম ভেঙে গেল অনিলের, অনিমারও।

ঘুম এসেছিল মাঝরাতের পর। চাঁদটা তখন মাটি ছেড়ে উঠছে। বাইরে মৃদু জ্যোৎস্নার মায়া ফুটছে। কথা বলতে বলতে, কল্পনার পরিকল্পনার স্বপ্নের প্রাসাদ গড়তে গড়তে, গড়া শেষ হয় নি, ক্লান্ত হয়ে তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। ভোরের অনেক আগেই কেউ তাদের ঘুম ভাঙিয়ে দিল।

অনিল বুঝতে পারল অনিমার ঘুম ভেঙে গেছে। অনিমা বুঝতে পারল অনিলের ঘুম ভেঙে গেছে। কেউ তবু সাড়া দিল না।

অনিল নিঃশব্দে দেখতে লাগল আকাশের চাঁদ—সেই যেদিন প্রথম অনিমা ঘন সবুজে ঘেরা স্বপ্নের একটা বাড়ির স্বপ্ন দেখেছিল, অনিলকে দেখিয়েছিল আর একটা প্রমোশনের—দুরাশার স্বপ্ন, সেই রাতের মতোই চাঁদটা আকাশ থেকে তাদের জানালার কাছে এগিয়ে আসছে। হয়তো সে রাতের সেই চাঁদটাই। শুধু তার অনেকটা ক্ষয় হয়ে গেছে। আলো অনেকটাই ম্লান, পাণ্ডুর। অনেক অনেক রাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকার জন্যে হয়তো।

অনিমা ক্লান্ত শিথিল অবশ শরীর নিয়ে বিছানায় ভেঙে পড়ে আছে। ঘুমটা হঠাৎ ভেঙে গেল, তার মনে হচ্ছে যেন সে ঘুমোয়নি। মাথার মধ্যে একটা যন্ত্রণা। সাড়া দিতে, কথা বলতে, কথা শুনতে—চোখ মেলে তাকাতেও

তার ইচ্ছা করছে না। ভোর থেকেই শুরু হবে যুদ্ধ। কখন সেটা শেষ হবে জানে না। শেষ তবু করতেই হবে। কদিন থেকে একটা চাপা উত্তেজনা, একটা ভয়, একটা গভীর অশান্তি যতক্ষণ জেগে থাকে। ঘুমোতেও পারে না।

অনিল সাড়া দিল। বলল, জেগে আছো!

অনিমা সাড়া দিল। বলল, এখনো ভোর হতে অনেক দেরি—ঘুমোও।

অনিল বলল, ঘুমোনোর দিন অনেক অনেক আসবে, আজ ভোরের পর যে দিনটা আসবে একবারের বেশী আর আসবে না!

অনিমা বলল, নতুন কথা যদি কিছু বলার থাকে বল।

অনেকবার বলা পুরোনো কথাগুলোই নতুন ভাবে নতুন উদ্দীপনার অদ্ভুত উন্মাদনায় অনিল বলতে থাকে। কেমন করে এই ফ্ল্যাটটা দুবছর আগে যে দামে কিনেছিল তার ডবলেরও বেশী দামে বিক্রি করবে। অফিসের লোনের বাকীটুকু শোধ করার পর দু'-লাখেরও বেশী হাতে থাকবে। সেই টাকায় জমি কিনবে সল্টলেকেই। তার আগেই অনেক বড় একটা ফ্ল্যাটে গিয়ে উঠবে—দু'হাজার আড়াই হাজার ভাড়া যাই লাগুক, কোম্পানী দেবে। দুবছরের মধ্যেই বাড়িটা শুরু করবে। চারদিকে বাগান থাকবে। বাড়িটা একতলাই হবে। অসাধারণ সুন্দর হবে দেখতে। যেই দেখবে চোখ ফেরাতে পারবে না। কম করেও সাত লাখ টাকা তো লাগবেই। দুটো বাথরুম সাজাতেই লাগবে এক লাখেরও বেশী। গোটা বাড়িটাকেই সাজাতে হবে। দামী ফার্নিচার লাগবে অনেক—খাট, ডিভান, ডাইনিং টেবিল, সোফাসেট, আলমারি, ওয়ারড্রোব। নতুন ফ্রিজ, নতুন রঙীন টি ভি, ভিসি আর—আরো অনেক অনেক কিছুই। কোম্পানী তাকে সারাক্ষণের জন্যে একটা গাড়ি দেবে। তবু বাড়ির জন্যে, অনিমার জন্যে একটা গাড়ি কিনতে হবে। টিঙ্কু গাড়িতেই স্কুলে যাবে। টিঙ্কুকে আমেরিকা পাঠাবে নিশ্চয়ই!

অনিমা বলল, আমার কিরকম ভয় করছে।

সে কি! কেন?

কি জানি, খুব ভয় করছে।

আগে ভাবলে না কেন! এখন তো আর ভদ্রলোককে আসতে বারণ করা যায় না। নিজেই নিমন্ত্রণ করেছি। তুমি মত দিলে—রাজী হলে বলেই।

অনিমা প্রতিবাদ করে না। কোন কথা বলে না। নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে ওঠে।

অনিল বলল, এখনই উঠছো, ভোর হতে এখনো দেরি আছে।

অনিমা বলল, পাকা দেখার খাওয়ার আয়োজন—দশটা পদ রাঁধতে হবে।

উত্তেজনায় অনিলও উঠে পড়ে।

বড় সাইজের টাটকা পারশে মাছ এখানকার বাজারে পাওয়া যাবে না জেনেই ভোরেই চার কিলোমিটার দূরে মাণিকতলা বাজারে ছুটে যায় ট্যাক্সি নিয়ে।

বেছে বেছে এক একটা প্রায় একশ গ্রাম ওজনের পেটে ডিম ভর্তি এক কিলো পারশে মাছ নিয়ে ট্যাক্সিতেই ফেরে সাতটার আগেই।

বাজার করা শুরু করেছিল পরশু বিকেল থেকে। কোথায় ভাল ইলিশ পাওয়া যায়, কোথায় ভাল তপসে মাছ পাওয়া যায়, কোথায় ভাল কাটা পনা, সবচেয়ে টাটকা সবজী কোথায়। ছোটাছুটি, উত্তেজনা, উদ্বেগ। পারশে মাছের পরিকল্পনা কাল রাতে অনিমার মাথায় আসে। কাল সন্ধেয়ও যদি আসত কালই যেখান থেকে হোক অনিমা যে রকম চেয়েছিল সেই রকম পারশেই ঠিক এনে দিত। আজ আর কোথাও বেরোবে না ভেবেছিল। ভেবেছিল সারা সকালটা বিশ্রাম করবে। কদিন থেকেই রাতে ঘুম নেই।

পারশে মাছ খুব পছন্দ হল অনিমার।

অনিল বলল, এবার আমাকে এক কাপ চা দাও তাড়াতাড়ি।

দুমিনিটেই চা দিয়ে দিল অনিমা।

অনিল কাপে একটা চুমুক দিয়েছে, মনে পড়ল, ফুল—ফুল তো আনা হয় নি।

চা পড়ে রইল টেবিলে।

একটা ট্যাক্সি সঙ্গে সঙ্গেই পেয়ে গেল অনিল। নিউমার্কেট কম দূর নয়। ট্যাক্সি দাঁড় করিয়েই ফুল কিনে ফিরতে দেড় ঘণ্টারও বেশী লেগে গেল।

এক ডজন গোলাপের দাম নিল দশ টাকা। ট্যাক্সিভাড়া চল্লিশ।

অবশ্য গোলাপটা খুবই ভাল পেয়েছে। তাজা সজীব রক্তবর্ণ কুঁড়িগুলো যেন উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়বে এখনই।

অনিমাও মুগ্ধ হয়ে বলল, কারো বাগান থেকে তুলে আনলে নাকি!

অনিমাই নিজের হাতে বসার ঘরের মাঝখানে সেন্টার টেবিলের ওপর কাট গ্লাসের ফুলদানীতে ফুলগুলো সাজাল। রান্না ঘরে আবার যাওয়ার আগে বলল, তোমাকে চা করে দিই।

অনিল বলল, না চা খাব না আর।

অনিল উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে একটা বীয়ারের বোতল বার করে বলল, ইলিশ মাছ ভেজেছ নাকি।

ইলিশ মাছ তো ভাজব না। পনা মাছ ভেজেছি।

তাই দাও এক পিস।

অনিমা বড় দুপিস ভাজা মাছ দিয়ে গেল।

ঠাণ্ডা বীয়ার এক চুমুক খেয়েই অনিলের মনে হল বাড়িটা হলে বসার ঘরে আর তাদের শোওয়ার ঘরে নিশ্চয়ই এয়ার কণ্ডিসন মেসিন বসাবে।

আরো খানিকটা ঠাণ্ডা বীয়াল ঢালে গলায়। একটু পরে আরো খানিকটা।

তারপর দুঃস্বপ্নের মতো অনিলের মনে উঁকি দেয় অভয় ঘোষাল লেনের দুরুমের সেই ফেলে আসা ফ্ল্যাট—পায়রার খোপ। জীর্ণ, পলেস্তারা খসে যাওয়া ড্যাম্পধরা দেয়াল। আলোহীন বাতাসহীন জীবনের উত্তাপ থেকে বিচ্ছিন্ন, আশা, স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন, কীট পতঙ্গ পোকা মাকড়ের বাসা. তার মধ্যে কেটেছে তাদের দশ বছর। দশ বছর ধরে লড়াই করেছে গলিটার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। গলিটার একদিকে একটা বাড়ির দেয়াল উঠে গেছে সোজা ষাট ফুট একদিকের আকাশ আড়াল করে। আর একদিকে অনিলদের ঘরের সামনের সরু বারান্দার সামনে থেকে আর একটা বাড়ির দেয়াল উঠে গেছে সোজা ষাট ফুট বাকী আকাশটাকে আড়াল করে। বাইরে ঝড় উঠলেও ঘরের মধ্যে বাতাস ঢোকে না। প্রখর রোদের দুপুরেও ঘরের মধ্যে আলো আসে না। তিনশ টাকার মাইনের চাকরিতে ঢুকে এর চেয়ে ভালো বাসার ব্যবস্থা করার উপায় ছিল না অনিলের। এক টাকা পকেটে নিয়ে প্রাইভেট বাসে ঝুলতে ঝুলতে অফিস গেছে, অফিস থেকে ফিরেছে শরীরে শুধুই ক্লান্তি আর অবসাদ নিয়ে। ইচ্ছা করলেও দুটো মিষ্টি কি একটা কোন ফল কিনে আনতে পারে নি। কারো অসুখ না হলে ফল মিষ্টি কেনার কথা ভাবার উপায় ছিল না। মাছ সপ্তায় দুদিনের বেশী নয়, তাও একবেলা। মাংস মাসে একদিন। মাখন নয় ডিম নয় শস্তা জেলিও নয় শুধুই শুকনো পাঁউরুটি জলখাবারে। বছরে বছরে মাইনে বেড়েছে, তিনশ থেকে চারশ, চারশ থেকে পাঁচশ, পাঁচশ থেকে ছশ, সাতশ—হাজার—বারোশ। বাসের ভাড়া, পাঁউরুটির দাম, সবজীর দাম, মাংসের দাম সমস্ত জিনিসের দাম বেড়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী হারে। তাদের সন্তানের

বযেস বেড়েছে। তাকে স্কুলে ভর্তি করতে হযেছে। স্কুলেব মাইনে মাসে ষাট টাকা, স্কুলবাসেব ভাড়া মাসে একশ টাকা, একজন টিউটর—তাঁর মাইনে একশ ষাট টাকা। বারোশ টাকা মাইনেতেও সপ্তায তুদিন একবেলা মাছ, মাংস মাসে একদিন। অনিল নিজেও পায নি প্রযোজনীয প্রটিন ভিটামিন, কাউকে দিতেও পারে নি। টিঙ্কুব ওজন বাড়ে না, নবম ত্বকে লাবণ্য আসে না। অনিমাব শরীর অনেক আগেই নষ্ট হযে যায। লাবণ্য নষ্ট হযে যায সকলেব আগে। ত্বক শুকনো বিবর্ণ হযে যায। ত্বকের বাঁধন আলগা হযে যায। পুষ্টিব অভাবে ভেঙে যায় তাব অমন সুন্দব গডন। বত্রিশেই অনিমা বিগতযৌবনা হযে যায।

তাবপব ম্যাজিকেব মতো, যেন সব কিছু বদলে যায। অনিলেব একটা প্রমোশনেই।

বারোশ থেকে হঠাৎ তিন হাজার। বাড়িভাড়া ভাতা, গাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসাভাতা তাব ওপব। তার ওপব কিছু উপবি। সব মিলিয়ে চার হাজাবেব ওপব।

তুদিনেই তাব হারানো যৌবন, যৌবনের সব কিছুই অনিমা ফিরে পেল। টিঙ্কু তাব স্বাভাবিক ওজন পেল, প্রস্ফুটিত কিশোবীব সবটুকু লাবণ্য পেল। আত্মবিশ্বাস যা তাব অনেকদিন আগেই নষ্ট হযে গিয়েছিল অনিল সেটা আবার নতুন করে ফিবে পেল।

অনিমা বলল, একটা ফ্রিজ কেনো আগে।

টিঙ্কু বলল, টি ভি।

অনিল বলল, এই গলিটা থেকে বেবোতে হবে, আগে বাতাস চাই—অক্সিজেন। সল্টলেটে একটা ফ্ল্যাট। তাবপব সব হবে।

তিন মাসের মধ্যেই এক লাখ পঞ্চাশ হাজারে অনিল ফ্ল্যাটটা কিনে ফেলে। প্রায পুবো টাকাটাই লোন পেযে যায অফিস থেকে। সাতশ পঞ্চাশ স্কোযাব ফুট। বাইরেব ভেতবের নিযে মোট আটটা দবজা, দশটা জানালা। গোটা স্পেস জুড়ে বিশুদ্ধ হাওযা খেলে বেড়ায চব্বিশ ঘণ্টা।

কিন্তু শুধু বাতাস হলেই হয না, স্পেসটাকে চেযাব টেবিল, খাট আলমারি শো-কেশ সোফাসেট দিযে ভবাতে হয। নতুন ফ্ল্যাটে রঙীন টিভি না হলে মানায না তাই নামী কোম্পানীব রঙীন টিভি কিনতে হয। ডাইনিং স্পেস ডাইনিং টেবিলের জন্যেই—ডাইনিং টেবিল কিনতে হয। একটা ফ্রিজ হলে অনিলকে বোজ বাজারে যেতে হবে না, অনিমাকেও বোজ বান্না করতে হবে না

—ফ্রিজ এসে যায়। এবং ফ্রিজ খালি রাখা যায় না তাই ডিম মাখন টাটকা সবজী মাছ মাংস দুচার রকমের ফল সব সময়ই ফ্রিজে জমিয়ে রাখতে হয়। আটটা দরজা আর দশটা জানালার একসেট পর্দাতেই লেগে যায় দেড় হাজার টাকা। পর্দার কাপড় তেমন পছন্দ হয় নি অনিমার। বসার ঘরের মেঝেয় কার্পেট পাততে চায় সে। নিজেই পছন্দ করে আড়াই হাজার টাকায় একটা চার বাই পাঁচ ফুট কার্পেট কিনে আনে। টাকা মানুষের রুচি রাতারাতি কত বদলে দেয় অনিমাকে দেখলেই বোঝা যায়।

প্লেটে করে দুটো পারশে মাছ ভাজা নিয়ে এসে টেবিলে রেখে অনিমা দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখের গলার ঘাম মোছে।

অনিমার ফর্সা রঙ উজ্জ্বল সোনালী বর্ণ পেয়েছে। ভোর থেকে আগুনের আঁচে সোনা যেন আরো উজ্জ্বল হয়েছে।

অনিল হেসে বলল, তোমার সব মাছ আমাকেই খাইবে দেবে নাকি।

অনিমা হেসে বলল, তোমার সাহেব তো বুড়ো মানুষ কত আর খাবে।

অনিল হেসে বলল, বুড়োকে তুমি দেখো নি।

দেখা যাবে। বলে অনিমা রান্না ঘরে আবার ফিরে যাচ্ছে, অনিল ডাকে —শোনো।

অনিমা ফেরে না। দাঁড়ায়ও না। যেতে যেতেই বলে, এখন শোনা যাবে না, পারশের ঝালটা সবে চাপিয়েছি, তারপর তপসের ফ্রাই হবে, ভাত চাপাতে হবে।

বোতলের বাকী বীয়ারটুকু অনিল গ্লাসে ঢেলে নেয়। একটা চুমুক দেয়। একটা পারশে মাছ ভেঙে ডিমটা প্রথমে মুখে নেয়।

দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে, সামান্য বিলাসিতাকেও প্রশ্রয় না দিয়ে, দশ বছর ধরে কৃচ্ছ সাধন করে তার কি মহত্ত্ব লাভ হয়েছে। কিছু না। সামান্য আত্মপ্রসাদও লাভ করতে পারে নি। জীবনীশক্তি শুধু ক্ষয় হয়েছে। দিন রাত হীনমন্যতায় ভুগেছে। সামান্য সম্মানও পায় নি কোন আত্মীয়স্বজনের কাছে। নিজের স্ত্রীর কাছেও অনিল যোগ্য স্বামীর সম্মান পায় নি। নিজের সন্তানের কাছে পায় সি যোগ্য পিতার সম্মান। অনিমা মুখে কোনদিন কিছু বলে নি। কিন্তু অনিমা তো জানে দশ বছরে অনিল তাকে একটা ভাল শাড়ি একটুকরো সোনা, ভালো সাবান, সেন্ট ক্রীম পাউডার মেয়েদের স্বাভাবিক চাহিদার কিছুই দিতে পারে নি। টিঙ্কুর কাছেও অনিল ছিল পিতা হিসাবে অক্ষম। অনিল তাকে খুব ভাল স্কুলে ভর্তি করতে পারে নি, বড

হওয়ার জন্যে তার যা যা দরকার তার কিছুই দিতে পারে নি। অনিমার সমস্ত যোগ্যতা ছিল অধিকার ছিল তার প্রয়োজনের অনেক বেশী অনেক কিছু পাওয়ার, ভোগের, বিলাসের উপকরণের মধ্যে ডুবে থাকার। টিঙ্কুরও অধিকার ছিল অনেক শিশুর মতোই সুনিশ্চিতভাবে বড় হয়ে ওঠার। কারো জন্যে কিছুই করতে পারে নি অনিল। আত্মগ্লানিতে, হতাশায়, অনুশোচনায় দিন কেটেছে রাত কেটেছে। তবু অনিল চেষ্টা করে গেছে। হার না মেনে লড়াই করে গেছে। . শেষ দেখার আগে শেষ হয়ে যেতে চায় নি। শেষপর্যন্ত একটা প্রমোশন সে পেয়েছে। প্রমোশনটাকে সে প্রায় জয় করে নিয়েছে। পাঁচজন কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাস্ত করে প্রমোশনটা জয় ক'রে তার নষ্ট হয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাস আবার উদ্ধার করেছে।

তারপর বাঁচার মতো করে বাঁচতে অভয় ঘোষাল লেন থেকে বেরিয়ে আসা এই অফুরন্ত বিশুদ্ধ বাতাসে।

বিশুদ্ধ বাতাসে দুদিনেই খিদে বেড়ে যায় দ্বিগুণ।

একদিন রাতে শোওয়ার ঘরের জানালার সামনে নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে একটা চাঁদ। খানিকটা ক্ষয়ে গেছে তবু তার অনাবিল হাসি এসে উপচে পড়েছে বিছানায়। অনিমা আগেই তার দশ বছর আগের শরীর ফিরে পেয়েছে তারপর আরো সুন্দর হয়েছে, আরো পরিপূর্ণ। ত্বকে মৃদু মিষ্টি সুবাস। সবচেয়ে দামী সুগন্ধি সাবান ব্যবহারের অভ্যেস করেছে অনিমা। গলার স্বরও আরো মিষ্টি, মোহময় হয়েছে। বালিশে কনুই রেখে করতলে মাথা রেখে অন্য হাতের এজটা আঙুল দিয়ে অনিলের বুকে অদৃশ্য নক্সা তুলতে তুলতে বলল, শোনো, ফ্ল্যাট আমার আর ভাল লাগছে না। আমি সোনা চাই না, কিছু চাই না—একটা বাড়ি চাই শুধু সল্টলেকে।

অনিমার আঙুলে বিদ্যুত ছিল, অনিলের ভেতরটা ভয়ংকর চমকে ওঠে। হঠাৎ বিস্ময়ে ভয়ে অভিভূত হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় অনিল।

অনিমা অনিলের বুকে চাপ দেয়।—কি হল, কিছু বলছ না।

অনিল বলল, বাড়ি করতে কত টাকা লাগে জানো।

অনিমা বলল, জানি, অনেক টাকা লাগে।

অনিল বলল, এখানে জমির দামই এক কাঠা এক লাখ, ব্ল্যাকে। ব্ল্যাকে ছাড়া জমি পাওয়ারও উপায় নেই। দুকাঠা জমির দামই দুলাখ, তারপর বাড়ি—।

অনিমা বলল, তোমার আর প্রমোশোন হবে না।

আবার বিদ্যুত খেলে যায় অনিলের বুকের মধ্যে।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ধাক্কায়, তীব্র একটা ঝাঁকুনিতে অনিল ভীষণভাবে আলোড়িত আন্দোলিত হয়। একটা দারুণ ঝড়। ঝড়টা থামে না।

চাঁদ যেন জানালার আরো কাছে চলে এসেছিল। হাত বাড়িয়ে ধরা যায়।

ধরা হয় না। অনিলের চোখের সামনে দিয়ে চাঁদটা জানালার সামনে থেকে সরে যায়।

কাল আবার নিশ্চয়ই আসবে। তবু নিশ্চিন্ত হয় না অনিল। সারারাত ঘুমোতে পারে না।

তার পরেও অনেক রাত ভাল করে ঘুমোতে পারেনি অনিল।

বাড়ি তৈরীর জন্যেই নয় শুধু, এই ফ্ল্যাটের সংসার ভদ্রভাবে চালাতে গেলেও এখনই আর একটা প্রমোশোন তার অত্যন্ত জরুরী।

তিন জনের সংসারে কাপড় কাচার আর গায়ে মাথার সাবানে, লিকুইড সোপ আর শ্যাম্পুতে দেড়শ টাকা লাগে মাসে। দুধ দুশ পঁচিশ টাকা। একদিন অন্তর বাজারে যায় একশ টাকার একটা নোট নিয়ে, খুচরো কয়েকটা পয়সা ছাড়া কিছুই ফেরে না। টিঙ্কুর স্কুলের মাইনে, স্কুল বাসের ভাড়া, টিউটরের মাইনে সব মিলিয়ে মাসে চারশ টাকা। ইলেকট্রিক চার্জ তিনমাস অন্তর চারশ থেকে পাঁচশ। খবরের কাগজ-ম্যাগাজিন মাসে একশ। অতিথি আপ্যায়ণ এবং অন্যান্য আরো খরচের জন্যে মাসে আরো পাঁচশ। তাছাড়াও আরো খরচ আছে, অনিমার হাত খরচা, অনিলের নিজের ব্যক্তিগত কিছু খরচা। মাসে চার হাজার টাকা চাইই। তার ওপর অসুখ বিসুখ আছে, ডাক্তারের ফি, ওষুধের দাম। হঠাৎ যদি কারো কোন বড় অসুখ হয়, যদি নার্সিংহোমে ভর্তি করার দরকার হয়, বা হঠাৎ যদি বড় রকমের কোন অ্যাক্সিডেন্ট ঘটে যায়। মাসের শেষ সপ্তায় অনিলের হাতে একটা পয়সাও থাকে না—প্রত্যেক মাসেই দু চারশ করে ধার করতে হয়। কুড়ি হাজার টাকা ধার করেছিল বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে ফ্ল্যাটটা সাজাবার সময়, সেই ধার শোধ হয়ে গেছে, কিন্তু অফিসের লোন শোধ হতে এখনো অনেক দেরি এখনো অনেক কিছুই তাদের ফ্ল্যাটে নেই—টেলিফোন নেই, রঙিন টিভি আছে কিন্তু ভিসি আর নেই—আরো অনেক কিছুই নেই। একটা গাড়ি হলে ভাল হয়, মিনিবাসে অনিল অফিসে যায় কিন্তু বসার জায়গা পায় না, ফেরার সময় আরো কষ্ট হয়। গাড়ি হলে অনিমারও সুবিধা হয়, ইচ্ছা হলে

একটু বেড়াতে যেতে পারে। পাঁচ হাজার টাকারও একটা ফিক্সড্ ডিপোজিট নেই ব্যাঙ্কে। ব্যাঙ্কে তাদের একটা লকার নেই। কোন নিরাপত্তা নেই জীবনে। পায়ের নিচে শক্ত মাটি নেই—কোন মাটিই নেই। কিছু নেই। শূন্য, শূন্যতা শুধু। অদ্ভুত একটা বিপন্নতা।

কপালে ঘাম, সারা মুখে ঘাম, ঘামে ভিজে গেছে গায়ের পাঞ্জাবী, একটা অদ্ভুত ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে অনিল বসে আছে। যেন কারো অপেক্ষায় বসে আছে, কেউ এসে তাকে উদ্ধার করবে।

অনিমা ঘরে ঢুকে আঁচলে মুখ গলা মুছতে মুছতে মুছতে বলল, বসো আছো এখনো, স্নান করে এসো—এগারটা বেজে গেছে।

অনিল বলল, মেয়েটা বাড়িতে নেই, ভাল লাগছে না।

অনিমা বলল, দাদা কাল সকালেই পৌঁছে দিয়ে যাবে।

অনিল বলল, আমাদের ছেড়ে একা ও তো কোনদিন থাকে নি।

অনিমা বলল, তুমিই তো বললে অনেকদিন মামার বাড়ি যায় নি—।

অনিল বলল, তুমিও রাজী হয়ে গেলে—।

অনিমা বলল, রাজী না হলে তুমি শুনতে। ঝগড়া করে আমাকে তুমি বাধ্য করতে—।

অনিল বলল, তুমি আমাকে একটুও বোঝো না।

অনিল বলল তোমাকে বুঝি না। কেন তুমি টিঙ্কুকে হঠাৎ মামার বাড়িতে পাঠাতে চাইলে আমি বুঝতে পারি না।

বোঝো না কিছুই বোঝোনা, তুমি কিছুই বুঝতে পারো না, বোঝার কোন ক্ষমতাই নেই তোমার।

অনিল হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে পড়ে।

তারপর দ্রুত বাথরুমে ঢুকে গিয়ে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে।

শাওয়ারটা খুলে দেয়। ক্লেশ, ময়লা, গ্লানি সমস্ত ধুয়ে ফেলবে।

শীতল জলের ধারায় দাঁড়িয়ে অনিল দুচোখ বন্ধ করে শান্তি অনুভব করে। শান্তিতে শরীর মন প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে।

একটা কুকুরের মুখ হঠাৎ ভেসে ওঠে

বিরাট গহ্বরের মত মুখের ভেতরটা, লক্‌লকে জিভ। তীক্ষ্ণ দাঁত, তীব্র চোখে চেয়ে আছে অনিলের চোখের দিকে। যেন অনিলের মতলবের কিছুটা টের পেয়েছে, ভেতর থেকে সেটা টেনে বার করে আনবে।

গত রবিবার সকাল দশটায় সেন সাহেবের নিউ আলিপুরের ফ্ল্যাটে

গিয়েছিল অনিল তাঁকে নিমন্ত্রণ করার জন্যে। বেয়ারা অনিলকে বিরাট ড্রয়িংরুমে যেন একটা মিউজিয়ামে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে যায়। অনিল চেয়ারে বসতে বসতে কুকুরটা ঘরে এসে ঢোকে। কুকুর নয়, বাঘ।

ট্রেন্‌ড্‌ আশা করা যায়, মনিবের নির্দেশ ছাড়া নিশ্চয়ই কিছু করে না।

তার মনিব তাড়াতাড়িই এসে যান।—আরে মুখার্জী তুমি।

নমস্কার স্যার।

বোসো বোসো।—টাইগার ভেতরে যাও।

সঙ্গে সঙ্গে জন্তুটা ভেতরে চলে গেল।

সত্যিই বাঘ নাকি স্যার।

আরে না না। তবে ব্যাটা একটা বাঘের খাবারই প্রায় খায়। রোজ আড়াই কে জি মাংস।

আড়াই কে জি।

যে কোন মাংস, আমি বীফ দিই।—বল কি ব্যাপার?

আপনার শরীর ভাল স্যার?

আমার শরীর তো কখনো খারাপ হয় না। কোন অসুবিধা নেই, নো হাই ব্লাড প্রেসার, নো সুগার—নাথিং। তবে বয়েস নিশ্চয়ই হয়েছে। তোমাদের মত ইয়াং আমাকে কেউ বলবে না নিশ্চয়ই।

আপনাকে কিন্তু প্রায় ইয়াংই দেখায়।

থ্যাঙ্কয়্যু।—মুখার্জী তুমি সেল্‌স্‌ এবং পারচেজ্‌-এর কাজকর্ম বোঝো?

বুঝে নিতে দুতিন দিনের বেশী সময় লাগবে না।

মিসলিনিয়াস ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে তুমি কত দিন আছো।

প্রায় দু বছর।

আচ্ছা। সেল্‌স্‌ অ্যাণ্ড পারচেজ্‌ কিন্তু অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট। অবশ্য রেম্যুনারেসনও অনেক বেশী। গুণ্ডুরাও বম্বে চলে যাওয়ার পর গত চার পাঁচ মাস ডিপার্টমেন্টটা আমাকেই সামলাতে হচ্ছে। ওদিকে আমার অন্যান্য কাজের চাপও বাড়ছে। চারদিকে এত কম্পলিকেসান্‌স্‌। একজন সুইটেবল্‌ লোক পাচ্ছি না যারওপর সেল্‌স্‌ অ্যাণ্ড্‌ পারচেজ্‌-এর দায়িত্বটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারি। একসময় দাশগুপ্তর কথা ভেবেছিলাম, রায়চৌধুরীর কথাও একসময় ভেবেছিলাম। দুজনেই আমাকে হতাশ করেছে। তুমি বিয়ে করেছ মুখার্জী?

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

ওয়াইফ কি করেন ?

হাউস ওয়াইফ স্যার।

ভেরী গুড !—চাইল্ড ?

এখনো স্যার—।

স্টিল এনজয়িং ! হেসে ওঠেন সেন সাহেব।

অনিল সাহস করে বলেই ফেলে, স্যার আগামী রবিবার দুপুরে আপনি আমার বাড়িতে খাবেন।

কি ব্যাপার—বিবাহ-বার্ষিকী নাকি !

না স্যার, এমনি—। আপনি আমাদের ফ্ল্যাটে একদিন গেলে ভাল লাগবে, তাই—!

তুমি সল্টলেকে থাকো তো। সল্টলেকের কথা অনেক শুনি, যাওয়া হয়নি। কি খাওয়াবে ?

কি খাবেন বলুন।

বিরিয়ানী কালিয়া কাবাব তন্দুরী খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে বুঝলে। জিভে আর ওসব খাবারের স্বাদ পাই না। তেল মশলা কম অথচ সুস্বাদু ঘরোয়া রান্নার স্বাদ পেতে খুব ইচ্ছা করে। খাওয়াতে যদি পারো তাহলে নিশ্চই যাব।

অনিল বলল, অফিসে আপনাকে আমার ফ্ল্যাটের নাম্বার লোকেশান সব জানিয়ে দোব স্যার। আপনি রবিবার বারোটার আগেই চলে আসবেন। সকালেও আসতে পারেন।

না বারোটা নাগাদ যাব। রবিবার আমার ঘুম ভাঙেই নটার পর।

অনিল উঠতে যাচ্ছিল, সেন সাহেব বললেন—বসো বসো। আমার এখনো ব্রেকফাস্ট হয় নি—আমাকে কমপ্যানি দাও।

বেয়ারা ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায়। দুটো প্লেটে দুপিস করে স্যাঁকা পাঁউরুটি, মাখন, দুটো করে সেদ্ধডিম, দুপিস করে মাছ ভাজা, একটা করে বড় আপেল। একটা প্লেটে প্রায় আড়াইশ কাজুবাদাম। দুটো বীয়ার মগ, চার বোতল বীয়ার।

অনিল বাথরুম থেকে বেরিয়ে বলল—শুনছো।

রান্নাঘর থেকে অনিমা উত্তর দিল—বল শুনতে পাচ্ছি।

দাশগুপ্ত গো—আমাদের দাশগুপ্ত, তোমাকে বলা হয় নি, সেন সাহেবকে দাশগুপ্ত পুরীতে পাঠিয়েছিল। পার ডে পাঁচশ টাকা একটা কটেজ বুক করে

রেখেছিল তিন দিনের জন্যে। সেন সাহেবকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে যাওয়ার দিন তাঁর এয়ার কণ্ডিসন কুপে খুব সুন্দরী একটা মেয়েকে তুলে দিয়েছিল।

তারপর?

তিন দিন পরে হাওড়া স্টেশনে দাশগুপ্ত সেন সাহেব আর সেই মেয়েটিকে রিসিভ করে।

দাশগুপ্তর লাভ তো কিছুই হয় নি।

কিছু না। দাশগুপ্তই নয়, রায়চৌধুরীও অনেকরকম ভাবে চেষ্টা করেছিল —লাভ হয় নি।

অনিমা বলল, ঘড়িতে কটা বাজে বল দেখি।

বারোটা বাজতে চলল প্রায়! অনিল ব্যস্ত হয়ে পড়ল।—তোমার আর কত দেরি!

হয়ে গেছে, ভাত চাপাব এবার।

ভাত চাপিয়ে দিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।

আমি আবার কি তৈরী হব!

একটু সাজবে না।

সেন সাহেবের গাড়ি নিচে এসে দাঁড়াল। হর্ণ দিচ্ছে।

অনিল তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এল।

গাড়ি পার্ক করে অতগুলো সিঁড়ি ভেঙে চারতলায় উঠে আসতে পাঁচ মিনিটও লাগলও না সেন সাহেবের।

বসার ঘরে ঢুকেই সেন সাহেব টেবিলের ফুলদানী থেকে একটা গোলাপ তুলে নিলেন। নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রাণ নিলেন।

অনিমা ঘরে ঢুকল।

অনিল আলাপ করিয়ে দিল।

হেসে নমস্কার করে সেন সাহেব বললেন—বসুন।

অনিমা হেসে বলল, এখন বসা যাবে না—।

সেন সাহেব বললেন, একটু অন্তত বসুন—সারা সকালটা মনে হচ্ছে আপনাকে রান্নাঘরে কাটাতে হয়েছে। মুখার্জী অফিসে আপনার রান্নার হাতের খুব সুখ্যাতি করে।

অনিমার মুখের রক্তাভ ত্বকে রক্তের প্রবল উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠে।

তাড়াতাড়িতে সাজতে সময় পায় নি অনিমা। শাড়িটাই শুধু বদলাতে

পেরেছে। গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে লাল পাড় সোনালী হলুদ একটা সিল্কের শাড়ি পরেছে।

দুমিনিটও দাঁড়ায়নি অনিমা। সেই সময়টুকু সারাক্ষণই সেন সাহেবের চোখ অনিমার বুকে কোমরের খাঁজে বার বার ঘোরাফেরা করে।

অনিমা হেসে বলল—বসুন আপনারা।

অনিমা চলে গেলে অনিল বলল, স্যার একটু বীয়ার বা অন্য কিছু খাবেন?

সেন সাহেব বললেন, মুখার্জী তোমরা ভাবো আমি মদ খেতে খুব ভালবাসি। মোটেই তা কিন্তু নয়।

অনিল বলল—না স্যার—।

সেন সাহেব বললেন, মুখার্জী আমার খুব ভাল লাগছে তোমাদের এই সুন্দর সংসার। সব কিছু কেমন নিখুঁত সুন্দর করে সাজানো। তোমরা যে কত সুখী সে আমি ঘরে ঢুকেই বুঝেছি। তোমাদের এই সুখের স্বাদ একটু পেতে আমার খুব লোভ হচ্ছে। আমি জানি না কেন হঠাৎ এত ইমোশনাল হয়ে পড়ছি আমি।

খুব আগ্রহের সঙ্গে সমস্ত পদ খেলেন সেন সাহেব। তিনটে তপসে ফ্রাই খেলেন। দুটো পাবদে মাছ খেলেন। ইলিশ মাছও খেলেন দুপিস। রসগোল্লার পায়েস পুরো এক বাটিই খেলেন পরিতৃপ্তির সঙ্গে। চোখ মুখ দেখে বুঝতে কোন অসুবিধাই হল না খুবই তৃপ্ত হয়েছেন খেয়ে।

তিন ঘণ্টার বেশী বিশ্রাম করে চা খেয়ে সন্ধের আগে সেন সাহেব চলে গেলেন।

অনিল নিচে গিয়েছিল সেন সাহেবকে এগিয়ে দিতে। গাড়ি চলে গেলে অনিল ওপরে উঠে আসে।

অনিমা বলল, বেশ তো ভদ্রলোকই গো।

অনিল বলল, তুমি কি অন্যরকম দেখবে আশা করেছিলে?

অনিমা বলল, ওঁরা যেরকম শুনেছি দেখে তো কিছু মনে হল না। বরং বেশ ভালই মনে হল। দেখে বয়েসও খুব বেশী মনে হল না। প্রথম দেখলাম বলে কিনা জানি না একটু যেন লাজুক মনে হল। আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকতে পারলেন না একবারও।

অনিল বলল, যা দেখার কিন্তু ঠিক দেখে নিয়েছেন। তুমি যে অসাধারণ সুন্দরী—।

উনি তোমাকে কি বললেন তাই বল।

তোমার হাতের রান্নার খুব প্রশংসা করলেন বারবার।

কি বললেন ?

বললেন অনেকদিন পরে খুব ভাল খেলাম। বললেন, মুখার্জী তোমার বউ খুব গুণী রমণী। আরো অনেক প্রশংসা করলেন তোমার।

অনিমা বলল, তাতে তোমার কি লাভ হল তাই বল।

অনিল বলল, তোমার হাতের রান্না খেতে উনি আবার আসবেন বললেন।

কবে আসবেন বললেন ?

তা বললেন না। তবে উচ্ছ্বাস দেখে মনে হল খুব শিগগিরই হয়তো আসবেন। হয়তো আগামী রবিবারেই, বা তার আগেই।

তাতে তোমার লাভ হবে কি ? অনিমা অনিলের মুখের দিকে তাকাল।

অনিল অনিমার চোখের দিকে চেয়ে হাসল।

অনিমা বলল, হাসছ—বল !

অনিল বলল, এখনো বলার সময় আসে নি, তবে মনে হচ্ছে বুড়োটাকে চারে আনতে পেরেছি।

এবার অনিমা অনিলের চোখের দিকে চেয়ে হাসে।

হলফনামা

ঋতেশ্বর চট্টোপাধ্যায়

বটিতে ঝিঙে কুটছিল মমতা।

পাকা রাস্তায় গাড়ির শব্দটা কানে আসতেই বাচ্চাটা কোলে তুলে বাইরে আসে। এক নিঃশ্বাসে ছুটে গেলে পাকা রাস্তা। লরির শব্দটা এখন দূরে। ক্রমশ কাছে আসতে শব্দটা আরও ঘন হয়। জোরে হয়। লরির ড্রাইভারের বসার জায়গা, তার উপর উঁচু চৌখুপি। ভীষণ আড়াল। ওদিকে ডালায় যে কেউ আছে, তেমন স্পষ্ট নয়। সুতরাং অপেক্ষা। অপলক উৎকণ্ঠা।

তীব্র শব্দ করে মাছের খালি ঝাঁকা নিয়ে লরিটা বেরিয়ে গেল পাকা রাস্তা দিয়ে। দাঁড়িয়ে লরির যাওয়া দেখে মমতা। তিন বছরের উদোম বাচ্চাটা মুখে আঙুল চোষা ছেড়ে আধো স্বরে বলে, হু-ই যা-হ্

তখন পিছনের দুই দুই চার চাকায় ধুলো পাক খেয়ে উকিলের মোড়ের বাঁকে মিলিয়ে যায়। চোখে পড়ে রাস্তার গা ঘেঁসে পাঁচিল ঘেরা পুরোনো কাছারি বাড়ি। আম জাম লিচু হরেক ফলের গাছের মধ্যে রঙচটা শ্যাওলা ভেজা বাড়ি। বড় উঠোনে খড়ের উঁচু গাদা। বাবুরা কলকাতায় থাকে।

পাশ চালার কুন্তলা মাসি পালা-ঘেরা ঢেঁড়স গাছে আঁতি পাতি খোঁজে। দু-চারটে ফুল ধরেছে। একটাও ভাঙবার মতো ফল নেই। তবু আফশোস নেই কুন্তলার, আজ না হোক দুদিন পরে তো কচি ভেণ্ডি পাবো। ভাবতে ভাবতে ওপাশে সুদামদের ঘর উঠোন দেখে। সুদামটা নতুন কাঠ চেরাই

কলে মেসিন চালানো শিখে বেশ রোজগেরে। ঘর দারা পরিষ্কার। গবমেণ্টের খরচায় ছিটে বেড়া খড় ছাউনির চালাটা এখন একেবারে টকটকে খোলা বিছিয়ে হাওদা-খানা ঘর। বড় দাওয়া। মনেই হয় না গবমেণ্ট ঘর দিয়েছিল, পাঁচ শতক করে জায়গা দিয়েছিল। শুধু জায়গাটা আছে। আর সব বদলে ফেলেছে সুদাম। পুরুষমানুষ বটে।

কাকদ্বীপ থেকে নামখানা প্যাসেঞ্জারি বাসটা দেখতে পায় মমতা। বাসটার মাথায় কিছু মানুষ। চমকে ওঠে! মমতার মনে পড়ে, ঠিক অমন ভাবে তো গোটা ময়নাপাড়ার আট দশ জন লোক গেছিল এখেন থেকে। হৈ হল্লা করে ও এন. জি সি'র মাটি কাটা রাস্তা গড়ার কাজে সেই অন্ধ্রে না মাদ্রাজে! বাসের মাথায় ওঠার সময় নিজের মানুষটা বলেছিল, মমতা খুকিটাকে একটু সামলাস। দরকার হলে, সুবল ডাক্তারের কাছি যাবি—মাস তিনেক। মাত্র মাস তিনেক কষ্ট কর। রোজগার পাতি করে ফিরতেছি। বাসটা এসে পড়ে। বেশ ক'জন পুরুষ মাটি কাটা ঝুড়া আর কোদাল সামলে বসে আছে। চোখে মুখে তাদের ঘরে ফেরার আনন্দ।

মমতা বাচ্চাটাকে হাত বেড় দিয়ে কাঁখে রেখে আলগা হয়ে দাঁড়ায়। শাড়ির ভাঁজে ডান পায়ের হাঁটু ভেঙে বিশেষ মেয়েলি ঢং। এমন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকা মমতাকে আরও উদাসী করে তোলে। বাচ্চাটার গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে ভাবে, সেদিন খুকির বয়েস কত হবে? দু-বছর ঘুরে নতুন বছরে পড়েছিল! এখন পাক্কা তিন। তিন ঘুরে আরও দু মাস!

বাসের মাথায় প্যাসেঞ্জার নিয়ে বাসটা এগিয়ে আসে। ইঞ্জিনের শব্দ। আশপাশ চিরে ইলেকট্রিক হর্নে বিকট আওয়াজ। বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে একটা ক্ষণিক আকাঙ্ক্ষা···হতে পারে নে ওদের মধ্যে কেউ একজন নিজের মানুষটা।

বাসের মাথায় প্যাসেঞ্জারদের একজন গোটা ময়নাপাড়া ডিঙিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলে, হুই রে শ্রীবাস ওই যে জাহাজ দিশাক দেখছ্যু?

—হাঁ গো খুড়া

—হাই ওদিকে গাঙ পাড়। অউখানে তে-ভাগার সময় কলিকাতার ডাক্তার ছোকরা নামছিল

—হুঁ। বাপ যে কয় বাঙা ডাক্তার

—তাই তো কইতিছিরে। লম্ফো জ্বালি অপাশান করাচ্ছিলো তোর বাপ্‌কে।

শ্রীবাস শুধু দেখে জাহাজ দিশারা শাদা স্তম্ভটাকে। আন্দাজ করে, নদী তাহলে বেশ দূর। এই বাস রাস্তা আর ক'বছর বা হয়েছে? আমরা দেখেছি রাস্তা হ'তে। খোয়া ফেলে রোলার গাড়ির গুড গুড শব্দ। তে-ভাগার কাণ্ড! সে তো জন্মেরও আগে।

হুস করে বাসটা বেরিয়ে যায়। জায়গাটা পিছনে পড়ে থাকে। শ্রীবাস শুধোয়, হ্যাঁগো খুড়া—পুলিস মিল্‌টারি আসতো কোন বরাবর?

—সে তোর বাপরা জানতো। আমি তো তখন মেদিনীপুরে—অতীতের টুকরো কথায় মনটা ভারি শ্রীবাসের। সে বাপ্ তো আর বেঁচে নেই। এখন যারা বেঁচে আছে বুড়া বুড়ি গুলা পেনসান পায়। বাপটা থুরথুড়ে বুড়ো হয়েও যদি বেঁচে থাকতো!

বাসটা বেরিয়ে যেতেই আবার ফাঁকা। আগের মতই। পিচ মোড়া রাস্তাটা এঁকেবেঁকে উধাও। রোদ পড়ে স্থানে স্থানে চিকমিকি। দো-চালার এক ফালি দাওয়া থেকে মুখ বাড়ায় বুড়ি শাশুড়ি, ও বউ ভাত বসাবি নি,।

ঘর ছেড়ে, ঘরের চৌহদ্দি ছেড়ে পায়ে পায়ে খানিক এগিয়ে গেছিল রাস্তার দিকে। বে-খেয়ালে! পিছন ফিরে খানিক লজ্জা। ঘরে উঠতে উঠতে বললো কত দেশের লোক ফিরে এল মমতার কথায় ঘোলা চোখে চেয়ে থাকে বউয়ের মুখের দিকে। কোলে খুকিটাও চুপচাপ। জোরে নিঃশ্বাস ফেলে বুড়ি। কার জন্যে যে!

ফরসা গোল মুখে কোঁকড়ানো চুল মমতার। অপরিচর্যায় চিকনহীন রমণী। আঁচলে মুখ ঢাকতে গিয়ে দু-চোখ ভিজে ভারি।

বুড়ি বলে, হ্যাঁরে বউ

মুখ তুলে তাকায় শাশুড়ির দিকে।

—অন্ধ্র মাদ্রাজ পায়ে হাঁটলে কত্ দিন লাগবে রে?

গ্রামের টালি ছাউনি বুনিয়াদী বিদ্যালয়টা ডিঙিয়েছিল মমতা। মাইল দুয়েক হেঁটে তিন বছর হাই ইস্কুল। তার বছর দুই পরেই তো বিয়ে। ললিত গিরি সাং-ময়নাপাড়া। এটাই ঠিকানা। শাশুড়ির কথায় ভিজে চোখে ফোঁটা পাড়ে।

বুড়ির গলায় অভিমান ঝরে, যা কিছু কই যদি কাঁদিস, বলতে বলতে কথা ফুরিয়ে যায়।

মমতা এক পাও নড়ে না। চালার ছোট দাওয়ায় মাঠের হাওয়া। ফাঁকা মাঠ।

—তুই শুধু জলে পড়েছিস। আমি পড়ি নি ?

মমতা কোন কথা বলে না। নীরব চোখে তাকিয়ে শাশুড়ির খেদ শোনে। অবহেলা নেই।

—গাঙ বুজে চড়ায় দু-বিঘে আর প্রধান তো বলেছে এবারের মিটিংয়ে পাস হলে এক বিঘে দেবে। তিনটে প্রাণী করে কম্মে বাঁচতে পারবু নি ?

দিনে দিনে মমতা গড়ে নিয়েছে, তেমন কিছু বললে কইলে বুড়িটা অভিমান ভরে একলা হয়ে যায়। কাঁদে। তাই নিজের কাছে কেমন জানতে ইচ্ছে করে, এমন ভাবে চাইলে না হয় চেষ্টা করতে তো হবে। কিন্তু সে মানুষটা সঙ্গে থাকলে কেমন ভাবে কী হত? সেটা দেখা। উপায় থাকলো কই।

দুই

প্রায় মাঝখানে দীনবন্ধুর উঠোন। এখান থেকে ডাইনে বাঁয়ে মিলিয়েই মযনাপাড়ার পঞ্চাশঘর। পঁচাত্তরের জরুরি অবস্থার সময় বেশ দফার এক দফা বাস্তুহীনকে বাস্তু করে দাও। বি ডি ও সাহেব বাঁশ খড়ের ছাউনি দিয়ে ছিটেবেড়ার ঘর করে দিয়েছিল। জলের জন্যে টিউকলটা দীনবন্ধুর উঠোনো। তাই একবার অন্তত কলতলায় তো কলসি কাঁখে আসতেই হয়।

টলমলে পায়ে খুকিটা গুট গুট করে হাঁটে মায়ের হাত ধরে। খুকিটার বদলে মমতার কাঁখে কলসি। প্রায় সন্ধের মুখ। দীনবন্ধুর বউ বললো, ও মমতা এট্টু আগে এলে পারিস। বাচ্চাটার পায়ে কিছু ফুটে গেলে ?

—গেলে, আর কী করি বলতো রূপা ?

—তোর যেমন শুয়োরের গোঁ—

কিসের জন্যে যে কী বলতে চায়! হাঁ-করে তাকিয়ে থাকে রূপার দিকে। ধরতে পারে না মমতা।

রূপা বললো, বেশি হারা হলে মরবি। তোর বরটা কি আর তোর আছে রে। দেখ সে দেশে কাকে বউ করে মজে আছে। তুই? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতেছিস তো ?

বেশ ধাঁধাঁয় পড়ে মমতা। জল নিতে ভুলে যায়। খুকিটা ঢালা উঠোনে খেলে।

রূপা তার টানা চোখে লম্বা করে চায়। বলে, যা জল নে গে—

এখন কলসিটা ভাবি। ভাবি মনটা। বাচ্চা মেয়েটার হাত ধরে গুট গুট করে হাঁটে। কাঁখের কলসিতে জলের মৃদু ছলক।

রূপা চাপা গলায় বলে, ধরতে গেলে বেঁধে ফেলবি রে বোকা মেয়ে, গুঞ্জরিত হয় কথাটা মনের মধ্যে। বাঁধতে গেলে দড়িদড়া চাই। সেটা যে কেমন দড়ি! বাঁধিনি কি খুকিটার বাপকে! তবু ছিঁড়ে গেল কি সে··!

হ্যারিকেনের বাতি জোর। গোটা ঘর আলো করে বাওয়ায় এক ঝলক আলো। অন্ধকার রাস্তায় হেডলাইটের তীব্র আলো ঢেলে ঢেলে চলে যায় দুরন্ত বাস। এগিয়ে উঠোন। উঠোনে যেন মানুষের গন্ধ। চমকায় না মমতা। বরং ভাবে নিশিদা এসে গেছে তাহলে?

পায়ের শব্দে শাশুড়ি কাছে আসে। বলে, ও বউ, নিশিকান্ত কত কাগজ পত্তর নিয়ে বসে—

—কতক্ষণ গো নিশিদা, শাশুড়িকে ডিঙিয়ে সরাসরি অন্দরের মানুষটাকে ছোঁয় প্রশ্নটা।

বরের বন্ধু। ব্যাঙ্ক লোন পেয়ে সমবায় ট্রলার। বিং লিডার নিজেই। কর্তা ব্যক্তি অত বড় মাছ মারা যন্তরটার। নিশিকান্ত বললো, প্রধান তো কয়ে দিছে—ললিতের বউ কাগজটায় সই করে দিক। সেলাই মেসিন পাইয়ে দিচ্ছি—হ্যারিকেনের আলোয় মমতার মুখটা উজ্জ্বল। মমতা বলে, সই না হয় করে দিলুম। তারপর।

—কী তারপর? নিশিকান্ত তাকিয়ে মমতার মুখের দিকে। এক তক্তপোশে পাশাপাশি বসে দু-জনে।

নিশির চোখে নম্র কৌতূহল। মমতা আন্তরিক গলায় বলার সময় ফরসা মুখ গম্ভীর। কেমন নিরীহ রমণী। আস্তে করে বলে, ঘরে বসে সেলাই করলে কটা খরিদ্দার? কটা পয়সা? লোন শোধ দিতে পারবো!

—ধুস্। এই আবার কথা? উকিলের বাজারে গরমেন্টের জায়গায় দোকান ঘর করে দুবো। একটা পয়সাও ভাড়া দিতে লাগবে নি। নিতে হয় গরমেন্ট লিবে—কোন মামুর দাঁত ফুটাবার যো নেই—

নিশির কথায় মমতা একটু একটু করে জোর পায়। নিজের মধ্যে জমা ঝুল কালি ঝেড়ে মুছে ফেলতে সাধ হয়। মমতার মনে হয়, নিশি কত জানে। কত শক্তপোক্ত নিরাপদ আশ্রয়! এতক্ষণে চমকে ওঠে! রূপার কথা আঁচড় কাটে বুকের মধ্যে।

বাচ্চাটা বাটিতে মুড়ি নিয়ে একবার বলে, মা খাবি?

—তুমি খাও, বলতে থাপুস থুপুস হেঁটে ঠাকুমার গা ঘাসতে চলে আসে।

পা অব্দি প্যাণ্ট ফুলহাতা জামার পকেট থেকে দামী পেন বার করে দিয়ে বলে, নাও। সই করো—

হ্যারিকেনের আলো সস্তা তক্তাপোশের বিছানা। মেলে ধরা দরখাস্তে আলো। এক নম্বর দুনম্বর কলম লিখে লিখে ভরে দেয়। পাঁচ নম্বরে স্বামীর নাম লিখতে গিয়ে কলম আটকে যায়। পাশাপাশি মুখ ঝুঁকিয়ে নিশিকান্ত। দামী পেনটা ফরসা হাতের রুগ্ন আঙুলে বেশ জ্বলছে।

নিশিকান্ত কনুই দিয়ে মৃদু ধাক্কা দেয়, কী হ'ল?

একটুও না সরে গিয়ে বরং স্থির হয়ে বলে, কী হবে লোকটার নাম লিখে?

নিশিকান্তর চটপটে ভাব কেটে একদম জল। অবাক চোখে তাকায় মমতার দু-চোখে। গম্ভীর মুখে হ্যারিকেনের আলো। আলোয় খুব কাছাকাছি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চিক চিক করে ঘামের মুখ।

আস্তে করে বলে নিশি, একজন গার্জেনের নাম তো দিতে হবে। মুখ ঝুঁকে গায়ের কাছে এসে মমতা হাতটা মুঠির মধ্যে ধরে বলে, এখন এখন তো তুমি নিশিদা।

নিশিকান্ত সোজা উঠে দাঁড়ায়।

মুখ ঝুঁকিয়ে কাত করে দেখে গোটা নিশিকান্তকে। নিশিকান্ত নামে পুরুষমানুষটাকে।

অমন খর দৃষ্টির সামনে মর্যাদা হারাতেও মনে লাগে নিশির। তাই খানিক থিতিয়ে বলে, আমার নামে লোকে মানবে?

যেন খানিক কুল পেয়েছে মমতা। সোজা দাঁড়িয়ে বলে, আর এমন কেই বা আছে, দু-চোখ বেয়ে টপে কয়েক ফোঁটা জল।

নিশিকান্ত যেন মাঝ সমুদ্রে ট্রলার ভাসিয়ে মাছ মারতে এসে আচমকা ভীষণ ঝড়ের মুখে। বললো, দাও বর্তমান গার্জেন শ্রী নিশি

সেই ছেলেবেলার যত্নে রুগ্ন আঙুলে ধরে ধরে লেখে গোটা গোটা বর্ণে মমতা।

নিশিকান্ত দেখে কেমন করে ফুটে উঠছে নিজের নামটা।

দশটাকার স্ট্যাম্পের কথা বুঝিয়ে বলতে বলতে পা ফেলে নিশিকান্ত জানা। উঠোন পেরিয়ে বাসরাস্তা-মুখো। পায়ে পায়ে হাঁটে দু-জন। পাশাপাশি। রাত ঘন হয়েছে। ওপাশের গাছ গাছালির উপর আকাশ।

ঝোপ-ঝাপে অন্ধকার জমাট। পাকা রাস্তার কালো পিচে রাতটা লম্বা হয়ে দিকবিদিক।

—মমতা যাও। এবার আমি যেতে পারবো

—আমি পারি কই

থমকে দাঁড়ায়! নিশিকান্তর কেমন মনে হয়, মমতাটা যেন, বড্ড একলা! খুব বেশিতো মুখ পাত্‌লা, গা-ঘেঁষা নয়। তবুও কেন যে ছাড়তে চায় না! কোথায় যেন ভয়। বললুম ললিতটাকে, চল আমার ট্রলারে। কি ও, এন, জি, সি, টিসির কাজে যাবি? বলে, গাঙ আর ভালো লাগেনা। একটু দেশ দেখে আসি—

মমতা গায়ের কাছে এসে বলে, তোমার বন্ধু তো! বোঝ কেমন ধারা তারা, বলতে বলতে হাতটা ধরে। অসহায় গলায় বলে, তুমি তুমি একটু দেখবে নে!

—আমারও তো সংসার আছে।

—থাকবে নে কেন? থাকলেই বা—

—লোকে দশ কথা বলতে লেগেছে যে?

—বলুক গ্যে, এতো করে কে?

মফস্বলের ফাঁকা রাস্তা। চারদিকে অন্ধকারে মহাশূন্যতা। নিশিকান্তর দু-কানে 'কে' কথাটায় দূরের বাতাসে একলা পাখির ডাক। পথ হারিয়ে বাসার খোঁজে আকুল আর্তি।

তিন

অবাক হয়ে কাগজটা দেখছিল মমতা। তিন সিংহের মূর্তি। সবুজ রঙের জমিনের জলছবি। উপরের দিকটা। ছবির নিচে দু-ধারে ইংরেজিতে লেখা টেন রুপিজ। ডান দিকে হিন্দিতে লেখা দশ রুপয়া। লাইনের ঠিক মাঝখানে ভারত গবমেণ্টের নাম। এর মধ্যে যা লেখা হবে সবটা সত্যি।

কালো কোট-পরা ছোকরা উকিলবাবু পড়ে দেখতে দেখতে বললেন মুহুরিকে, ও রীতেন, কে টাইপ করেছে রে?

মুহুরি রীতেনের পাশে দাঁড়িয়ে নিশিকান্ত। নিশিকান্তের গায়ের কাছে লতানে গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে মমতা। কোলে বাচ্চা খুকিটা। গোলাপী ফ্রক গায়ে বিস্কুট চিবোচ্ছে কচি দাঁতে।

রীতেন বললো, বাবু। মোহিতের মেসিনে।

—পাশ করা ছেলে তো! সোলেমনলি টাইপ করতে ভুল করলো?

মমতা মুহুরির কাছ ঘেঁসে ফিস ফিস করে বলে, হ্যাঁ মুহুরিবাবু।

এতে কাজ আটকে যাবে নি তো?

ছোকরা উকিল তাকায় মমতার মুখের দিকে। তারপর চোখ যায় পাশে নিশিকান্তর ঝাঁকড়া চুল মাথায়। বললো, তুমি তাহলে নিশিকান্ত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ওকে তাহলে দেখা শোনা করবে তো? নাকি রঙ চটে গেলে চামড়া ঢিলে হয়ে গেলে মন ভেঙে যাবে?

মমতা কথা ধরে বলে, বাবু। স্বামী থেকেও নেই। কত মানুষের মধ্যে যে হারিয়ে গেছে। নিশিকান্তর জামার হাতাটা ধরে। বলে, এ তবু কাছের, একটু ঢোঁক গিলে নেয়, দেশের মানুষ। দেশ ছাড়া তো হয় নি ·, তারপর যে কী বলবে ভেবে পায় না মমতা।

ছোকরা উকিলের জানতে ইচ্ছে করে। নিশিকান্তর দিকে চোখ ফিরে বলে, ওর নিজের সংসারে ও তো থেকে গেল?

—ছিঃ। বাবু ওর সংসার ভাঙতে যাবো কেন? ওকি আমার সংসার ভেঙেছে? ওকে বিশ্বাস করি নির্ভর করি, লোকে যাতে দোষ দিতে না পারে —সেই কাগজটুকু করে দিন।

আইনের জোব্বা পরা ছোকরা উকিল বাবু একটু ধন্দে পড়েন। ঠিক করতে সময় লাগে, এটা আইনে হবে নাকি অন্য কোন । থাক গ্যে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব হলফনামার সময় যা জিজ্ঞেস করার করবেন।

আটখানা পিলারের উপর টিন চাপিয়ে চার চালা সেরেস্তা ঘর। ছোট ছোট তক্তাপোশে একখানা করে স্যুটকেসে কাগজপত্র রেখে খাতা কলম নিয়ে এক একজন মুহুরি। ওপাশে বাঁখারি বেড়ার মধ্যে কাঠের বড় ক্যাশবাক্স নিয়ে বসে আছে ভেণ্ডার। ডান দিকে ডেমি নীল কাগজ নানা দামের স্ট্যাম্প পেপার আলাদা স্যুটকেসে গুছিয়ে নিয়ে গ্যাঁট হয়ে বসে। লোকজন মক্কেলের গুন গুন শব্দ চারচালার মধ্যে।

উকিলবাবু বললেন, বীতেন লোনের এফিডেবিটটা রেডি?

—টাইপ কপিটা যে অধীরের চা-দোকানে তখন দেখিয়ে নিলুম?

—ও ভিলেজ মযনা পাড়া?

বীতেন পানের রসে লালচে দাঁত মেলে আকর্ণ হাসে।

মমতা বা-কাঁখ থেকে খুকিটাকে ডান কাঁখে নিতে নিতে ভাবে, ভাগ্যিস

রূপার বর বলেছিল। মমতা—লোনের এফিডেবিটের সঙ্গে ওটাও করে নিস। লোকমুখ থেকে বাঁচবি। অযথা পুলিস থানা, গ্রাম সালিস্থি কিছু করতে পারবে নি। লোকে জোর একদিন দু-পয়সা ভিক্ষে দেবে। দু-দিন তো টানা খেতে দেবার কেউ নেই? কথাটা কথাটা সত্যি। বড্ড সত্যি।

—দাও। কিছু টাকা পয়সা দাও—। পেশকারকে জিজ্ঞেস করে আসি হাকিম কখন কোর্টে বসবে।

নিশিকান্ত তাকায় মমতার দিকে। চার দিকে অতো ভিড। একটু পেছন ফিরে পেট কাপড়ের খুঁটে বাঁধা তিনখানা কুড়িটাকার নোট বের করে। তারপর কাপড়টা সামান্য গুছিয়ে নেয়। সেদিকেও লোকের ভিড। যেন মেলা বসেছে। শুধু মুহুরি আর উকিলবাবুর অলক্ষে কাজটা সারার দরকার। অন্যজনকে আড়াল করতে-চাইলে তো সম্ভব নয়। নিশিকান্ত কাপড়ের খুঁট খোলা টাকা তিনটে, অতি সন্তর্পণের ভাঁজ, আস্তে করে ভাঁজ খোলা পরে কাপড়ের খুঁট আবার শায়ার দড়ির বাঁধনের মধ্যে গুঁজে দেওয়া—সব দেখে। কোন আড়ষ্টতা নেই। নিশিকান্ত আর পরপুরুষ নয়। কাগজটায় হাকিমের সই ছাপ পড়লে একরক্তের মানুষ না হলেও তো নিশি নিজেদের হয়ে যাবে।

নিশিকান্ত দেখলো, মাত্র তিনটে কুড়িটাকার নোট মমতার সম্বল। সেগুলো সব কেমন সহজ ভাবে হাতে তুলে দিচ্ছে। আর আছে মমতার কাছে?

চা খাচ্ছিলো দু-জনে। দুটো বিস্কুট খুকিটার হাতে। একটা করে আস্ত পাঁউরুটি চায়ের গেলাসে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খায় মমতা আর নিশিকান্ত।

হাঁক-পাঁক করে ছুটে এসে বীতেন মুহুরি বলে, কই? তোমাদের খেতে কত দেবি?

—বললেই উঠে পড়ি, নিশিকান্ত উত্তর যোগান দেয়।

—নাও তাড়াতাড়ি। হাকিম বসে গেছে উকিলবাবু দাঁড়িয়ে। বড্ড ভিড বেকার লোনের এফিডেবিট অনেকগুলো—

দেওয়ালের মধ্যিখানে বড় চেয়ারে বোগা ফরসা হাকিম। গোল গোল বড় চশমা। সামনে লাল শালুর পার্টিশন। তারপর একগাদা কাগজপত্রের ঢিপির পাশে ছোট পেশকার। এবার বড় করে লাল শালুর বেড়া। হেলান দেওয়া সিট বেঞ্চ। উকিল মুহুরি গিজ গিজ করছে। বেকার ছেলে-মেয়েদের ভিড।

নাম—ডাকে, এগিয়ে যায় দরখাস্তকারী। উকিলবাবু বলেন, আমায় ক্লায়েন্ট সার—

নাম জিজ্ঞেস করে কি মুহূর্ত তাকান মুখের দিকে। ঘ্যাস ঘ্যাস সই করেন হাকিম।

পেশকার ডাকছেন, মমতা গিরি? এগিয়ে দেয় স্ট্যাম্প দুটো সংলগ্ন কাগজপত্র টেবিলে।

—উপস্থিত, বলে খানিক লজ্জা পেয়ে ভাবে মমতা, ছেলেবেলায় ইস্কুলে এমন ভাবে তো সাড়া দিতুম। এটা তো আইন কানুনের জায়গা। ঠিক-করলুম? একপলক তাকিয়ে সই করেন হাকিম। মাথার উপর লাঠি হাতে খালি গায়ে বুড়োর বাঁধানো ছবি। ডান হাতে অভয় মুদ্রা। বেশ হৃষ্ট মুখ। মমতা হঠাৎ মনে জোর পায়। ভাবে, একটা যখন হয়ে গেছে ওটা হতে আর কতক্ষণ।

গোল চশমায় হাকিম সাহেবের চোখ কুঁচকে এতটুকু। মমতার বুক কাঁপে। মুহুরি একবার তাকায় মমতা নিশিকান্তর মুখের দিকে। এবার মুখ তুলে তাকান ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। চশমা খুলতে মুখ চেনা ভার। দাঁতের মধ্যে চশমার ডাঁটি আলতো করে নিয়ে বলেন, উকিল কে আছেন মমতা গিরির?

ছোকরা উকিলবাবু একটু মুখ বাড়িয়ে বলেন, আমি স্যার।

—কে কাকে বিশ্বাস করে—নির্ভর করে তারজন্যে আমি কেন?

—না—স্যার। ওরা হলফ করবে পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করছে। ওদের ওদের কেউ কারুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। বা জীবনহানির ভয় নেই

—এটারই বা গ্যারান্টি কোথায়? উকিলবাবু প্রাণপণে বোঝান, এটাই তো ওরা স্বীকার করে যাচ্ছেন মহামান্য আদালতের কাছে।

একবারে মমতার দিকে তাকান হাকিম। পরক্ষণেই জিজ্ঞেস করেন, নিশিকান্ত জানা কে?

—আমি সার। এগিয়ে এসে নিজেকে জানায় নিশিকান্ত।

—আপনার কে কে আছেন? স্ত্রী পুত্র?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

আর কিছু জিজ্ঞেস না করে একটু চুপ করে থাকেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। হাকিম সাহেব।

বাঁ-হাতে কাগজটা ফিরিয়ে দেন পেশকারকে। পেশকার এক নজরে দেখে নেয়, সাহেব সই করেন নি। বুকের মধ্যে চড়াৎ করে শব্দ হয়। কাজটা হলে একটু পাওনা হ'ত।

কোর্ট শেষ হলে উকিল লোনের এফিডেবিটটা দিয়ে বলেন, আর ওটা কিন্তু হ'ল না।

মমতা নিশিকান্ত দু-জনে দাঁড়িয়ে। মমতা বললো, কেন বাবু?

—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বিশ্বাস করতে পারছেন না।

—তাহলে লোনের ব্যাপারে মমতা যে ওই লোক ওখানে বসবাস করে সেটা বিশ্বাস করলো কি করে?

উকিল কড়া চোখে তাকায় নিশিকান্তর মুখের দিকে। একটু মুখ বাঁকিয়ে রীতেনকে বলে যায়, আমার ফিটা দিয়ে যাও তাড়াতাড়ি। একপা ফেলে গজগজ করতে করতে এগোয়, কে কাকে রাখনি রাখবে সেটাও যেন করিয়ে দিতে হবে।

নিশির বু'কে কথাটা কেমন খচ্ খচ্ বাধে।

মমতা থমকে দেখে সকলকে। চুপ চাপ ভাবে, বিশ্বাস টিশ্বাস বুকের ভেতরের জিনিস। সেটা দিয়ে কাগজ কলমে হাজার বার লিখলেও কি চিরস্থায়ী হয়! শুধু একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে সাহেব কাকে বিশ্বাস করলো নি? আমাকে, না নিশিকে?

ঈশ্বরের খোঁজে

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

যাদু পাটিকারের বহুদিনের ইচ্ছে, ঈশ্বরের পট আঁকবে। কিন্তু ঈশ্বরকে সে কোনদিন দেখেনি, তাই জানে না, কেমন তার আকার অবয়ব, কেমনই বা তার গড়ন। অজানা অদেখা বস্তুর পট ও আঁকবে কেমন করে?

তাই হাটে-বাটে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে ঘুরে মানুষের মুখে ঈশ্বরের আদল খোঁজে।

যাদু পাটিকারের পায়ের তলায় সর্ষে। মাথায় চরকি। ঘুরছে, শুধু ঘুরছে, পাগলা ঘোড়ার মত একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। রেলে, বাসে, নৌকোয়, পায়ে হেঁটে। ঘরে বাস নেই তেরাত্তির। কঁহা কঁহা মুল্লুকে চলে যায়। সারা বাঁকড়ো জেলাটা ওর নখদর্পণে। তাছাড়া ঘোরাটা ওর পেশা। ঘোরার নামই তো জীবন। অনড় হয়ে থাকা মানেই তো ঘরে থাকা।

আসলে পটকার বা পটুয়া গাঁওয়ালি ভাষায় বলে পাইটকার। পাটিকার শব্দটাই তো যথেষ্ট অর্থবহ, তাহলে যাদু কথাটা চাপল কেন মাথার ওপর? আছে হে আছে, তারও পিছনে কারণ আছে। কারণের পেছনে কার্য ঘোরে, কার্যের পিছনে কারণ। যেমন দিনের পিছু রাত ঘোরে রাতের পিছু দিন।

তাই যাদু কথাটাও ওদের নামের গোড়ায় এমনি অবিচ্ছেদ্য ভাবে জুড়ে গেছে। পট দেখায়, তাই পাটিকার, সেই সঙ্গে কিছু ভেল্কিও।

ওরা মৃত মানুষদের দূতিয়ালি করে। পরলোকবাসীদের বকলমা। জীবিত আত্মীয়া পরিজনদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ করিয়ে দেয়। প্রয়াতদের বার্তাবহের কাজ করে। তাদের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার কথা জানায়।

এসব কি সত্যি? প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু পাটিকার বলে, বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ। ঈশ্বর, পাপ, পুণ্য এইসব বায়বীয় বস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ক প্রতীতিগুলি মানুষের মনের অন্তস্থলে গোপন ইচ্ছার রূপ নিয়ে লালিত হয়, নাহলে এই যে মানুষ রাশি রাশি অর্ঘ্য দেয় দেবতার পায়ে তাকি দেবতার কাছেই পৌঁছায়? অতএব তর্ক নিষ্প্রয়োজন। এটাই যাদু পাটিকারের জীবনযাপন ও জীবিকার স্বপক্ষে সহজ এবং নিরাপদ যুক্তি।

পৃথিবীতে অনেকেই তো ঈশ্বরের নাম ভাঁড়িয়ে খায়। ও না হয় ভূতের নাম ভাঁড়িয়ে খাচ্ছে। তাছাড়া, ভূত এবং ঈশ্বর তো প্রায় একই। দুই-ই দাপটের সঙ্গে এই পৃথিবীতে অশরীরে বিরাজমান।

বলতে গেলে পাটিকারের নিজস্ব কোন সাকিন নেই। আদি নিবাস শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলঘেঁষা ভরতপুর গ্রাম ছেড়ে ওর পূর্বপুরুষদের কেউ এদিকে ছিটকে পড়েছিল। এখন তো অনেকেই জাতবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে। কথা বেচে আর পেট ভরে না। তাছাড়া মানুষের মন বড় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে।

শিলাই নদীর কূলে, যমনা গাঁয়ের সীমানায় একটা কুঁড়ে বানিয়ে পরিবার নিয়ে বাস করে। একপাশে শিয়াল বন। নদীর ওপারে পীরের দরগা। সেখানে সাঁই দরবেশের নিত্য আনাগোনা।

মাসের মধ্যে মাত্র দুএকবার পরিবারের সঙ্গে থাকতে পায় পাটিকার। তখন সাঁঝরাতে ডাহুকরা ঘরে ফেরে। চাঁদের আলোয় উঠোনটা ভরে যায়। ভেতর থেকে গরম ভাতের গন্ধ ভেসে আসে। পারিজাতের সুবাসও হার মানে তার কাছে। ওর ছেলেটা পিদিমের আলোয় শতকিয়া মুখস্থ করে। আর গরম ভাতের গন্ধে বুঁদ হয়ে পাটিকার তখন নতুন পট আঁকার আয়োজন করে। পুরোন কাপড়ের ওপর গোবর আর কালো মাটির কাই দিয়ে প্রলেপ দেয়। তার ওপর এক পোঁচ গালার আস্তরণ দিয়ে পরিপাটি করে পট বানায়। দুদিন ঘরে থেকে তারপর আবার উধাও।

হাটে বাটে, মেলায় গঞ্জে মুরুব্বি মাতব্বরদের সঙ্গে দেখা হয়। সেখানেই দিনখন ঠিক হয়। তারপর নির্দিষ্ট দিনে পৌঁছে যায় সেই গাঁয়ে।

কিন্তু এখন যেন সব কিছুই বদলে যাচ্ছে। ওদের আমন্ত্রণের মধ্যে

আন্তরিকতার সুর খুঁজে পাওয়া যায় না আর। একটা ঘুণপোকা যেন বাসা বেঁধেছে মানুষের মনের মধ্যে।

বিশ্বাস ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

মটগোদার শনিমেলার এককোণে দাঁড়িয়েছিল সাজমাতুর সাঁওতাল গাঁওবুড়ো হাড়মা টুডু ওর বছর দশেকের নাতিটাকে সঙ্গে নিয়ে। বোধহয় মোরগ লড়াইএর আখড়া থেকে ফিরেছে। নাতিটার দুবগলে দুটো মোরগ। একটা পাঁইসা আর একটা ঝিঁঝরে। পাঁইসাটা বেজয়া। উদ্ধত ভঙ্গীতে ঘাড় ঘুরিয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছিল। ঝিঁঝরেটা হাকুয়া। ওটার সর্বাঙ্গে রক্ত ঝরছিল। ধুঁকছিল।

একগাল হেসে এগিয়ে গিয়ে কুশল সমাচার জিগ্যেস করল পাটিকার।

—'জোহার মাঝি, জোহার' (নমস্কার, গাঁওবুড়ো) অপরিচিতের মত নিরুত্তাপ কণ্ঠে মাঝি বলল, 'জোহার'।

তারপর নীরব, বিষণ্ণ গাঁওবুড়ো দূরের পানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পাটিকার অস্বস্তি বোধ করে, তাহলে কি ভুল লোককে ও সার্জমাতুর গাঁওবুড়ো ঠাউরেছে? অথবা হয়ত পাটিকারকে ভুলেই গেছে।

—'আমি হে, ময়না গাঁয়ের সুজন পাইটকার। চিনতে নারছ? কতবার গেছি তুমাদের গাঁয়ে।'

আচ্ছন্নের মত গাঁওবুড়ো বলল 'ও পাইটকার। হুস্, পাইকার।'

—'সিদিন যে বাইপুরের হাটে দেখা হল্য হে?'

—'হবেক বা। আইজকাল দিশার ঠিক নাই।'

এক চটকে মনে পড়ল পাটিকারের। এই তো গতবছর 'বীর-সেক্রা'র (অরণ্য শিকার) সময় একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে ওর সংসারে। সেই থেকে পাথর হয়ে গেছে লোকটা।

ওর নাতিটা ঘরে ফেরার জন্য ছটফট করছিল, সেটা লক্ষ্য করে পাটিকার বলল, 'ঘরে ফির্যা যাও মাঝি। তুমার নাতিটা আকুলি-বিকুলি করছেক।

গাঁওবুড়ো বলল 'যাই। এস্য একদিন আমাদের গাঁয়ে।' মনে হল নিমন্ত্রণটা নেহাতই সৌজন্যমূলক। কারণ তল্লাট জুড়ে যাদু পাটিকারের আনাগোনা। মাঝি, পারগানা, দেশ মাঝিদের (সাঁওতাল সামাজিক প্রশাসনে বিভিন্ন স্তরের কর্তা) সঙ্গে ওর ওঠাবসা। সমাজে বদনাম হতে পারে, তাই।

ওর আন্তরিকতাটা পরখ করবার জন্য পাটিকার বলল 'তাহল্যে কালই?'

গাঁওবুড়ো বলল 'বেশ।'

নাতিটার হাত ধরে ক্লান্ত পায়ে চলে গেল হাড়মা। এই তো গতবছরও ঝলমলে রোদ্দুরের মত তরতাজা ছিল, অথচ আজ—। পাটিকারের বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মানুষের দশ দশা—।

অন্যান্য মেলার মত মটগোদার মেলাও দিনের বেলা সবাইকার, রাতের বেলা সাঁওতালদের। রাত ভর নাচ গান চলে। পাতা নাচ। বুয়াং নাচ। দং সেরেঞ্! লাগড়ে সেরেঞ্।

রাতটুকু হাটচালায় কাটিয়ে পরদিন কাকভোরে পাটিকার রওনা হল সার্জমাতুর পানে।

দুই

রাইপুর পর্যন্ত বাসে, তারপর বেশ কিছুটা পথ পায়ে হেঁটে পাটিকার যখন সার্জমাতুতে পৌঁছাল, সূর্য তখন মাথার ওপর। সকালী রোদের রেশমি পরশটা ফুরিয়ে এসেছে।

গাঁয়ে পা দিয়েই অবাক হল পাটিকার। কেমন যেন শুনশান, ছমছমে ভাব, পরিত্যক্ত, বেছপ্পরবন্দী গ্রামের মত। বেওয়ারিশ কুকুরগুলো পর্যন্ত উধাও, যারা গাঁয়ে কোন নতুন আগন্তুক দেখলে তারস্বরে চীৎকার করে। তাছাড়া নেই কোন দামাল শিশুর দল, কোমরে বাঁধা কড়ি ঘুনসি আর দস্তার নিমফল, যারা ওকে দূর থেকে দেখেই উল্লাসে সমস্বরে চীৎকার করে উঠত 'পাইটকার এসিছে হে, পাইটকার এসিছে হে' তারাও বিস্ময়কর ভাবে অনুপস্থিত। সারা গাঁ জুড়ে বিষণ্ণতা। সাঁওতাল গাঁয়ের স্নিগ্ধতাটাই হারিয়ে গেছে। ঝকমকে উঠোন, তকতকে দেয়াল, তার ওপর নানাবিধ অলঙ্করণ, লতাপাতা, ফুলপাখি মায় রেলগাড়ি উড়োজাহাজ পর্যন্ত। রঙ ঝরে গেছে। দেয়াল ফেটে ফেটে গেছে। এবার বোধ হয় বাঁধনা পরবের সময়ও ঘরের কলি ফেরানো হয়নি। গ্রামটার এমন জীর্ণদশা দেখে দুঃখ হল পাটিকারের। হেন সময়ে পথের মাঝে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল হাড়মার সঙ্গেই। ওকে দেখে হকচকিয়ে গেল গাঁওবুড়ো হাড়মা। ও আশা করেনি সত্যি সত্যিই আজই এসে পড়বে পাটিকার।

পাটিকার বলল 'জোহার মাঝি'।

হাড়মা বলল 'জোহার, পেড়া হড়' (নমস্কার, কুটুম) তুমি জাহের থানে (জাহের দেবীর বেদি) বস্য। আমি আসছি।'

গোড়েত আর জগ মাঝি (গাঁওবুড়োর সহকারী) জাহের থানে পাটি বিছিয়ে দিল। সবার মুখেই একটা বিষণ্ণতার ছায়া দেখে পাটিকারের সন্দেহ হল সুখ কি তাহলে গতবছর শিকার পরবের পর থেকেই এ গাঁ ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গেছে?

ইতিমধ্যে জাহের থানে লোকজন জড় হয়েছিল। সহসা পিয়াল গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বিষাদ প্রতিমার মত একটি রমণীর দিকে নজর পড়ল। স্মৃতির তারগুলো একসঙ্গে ঝনাত করে বেজে উঠল। কোথায় যেন দেখা হয়েছিল, হাটে, মেলায়, না ফেরী ঘাটে—

কিছু মনের তল পর্যন্ত খুঁজে দেখার অবসর পেল না পাটিকার। তার আগেই অধৈর্য শ্রোতাদের তাগিদে গল্পের ঝাঁপি খুলতে হল।

—'আমি পাইটকার। আমার পায়ের তলায় শর্ষে, মাথায় ঘুরনচাকি।' তাই আমি ঘুরি, যেমন পিরথিমি ঘোরে সুয্যির চারপাশে। ঘোরার নাম জীবন। পিরথিমি ঘুরছে। মানুষ ঘুরছে। ঘুরছে যে যার ধান্দায়। ঘুরতে ঘুরতে কেউ বা টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ঘোরার বিরাম নেই।'

'ঠিক, ঠিক।'

—'কুথাও আমার সাকিন নাই হে। আইজ ভৈরববাঁকির চরে তো কাল দ্বারকেশ্বর পেরিয়ে এক্তেশ্বরের মেলায়, তো পরশু বিষ্টুপুরের ক্ষীরকুলতলার পরবে। সব ঠেঁয়ে আমি থাকি। উদিকে কাসাঁই পেরিয়ে খাতড়া ইন্দপুর, রানীবাঁধ, উদিকে মটুকরনী ছাড়িয়ে শালতোড়া, ওন্দা, পাত্রসায়ের—'

সবাই হাঁ করে পাটিকারের মুখে ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত শোনে। ইতিমধ্যে কাজ সেরে গাঁওবুড়ো হাড়মা টুডু ফিরে আসে।

—'কি বলছিলে হে পাইটকার?'

—'বলছিলম, ঘোরার নামই ত জীবন'

—'ঠিক। কিন্তু আমরা সাঁওতালরা ঐ জাত ভবঘুর্যা হে। কতবার ঘর বেঁধেছি ঘর ভেঙ্গেছি তার কি ঠিক ঠিকানা আছে। জোতদার মহাজনদের উৎপাতে কতবার জমি-জিরোত ছেড়ে দেশান্তরী হয়েছি তার কি হিসাব আছে। তবুও দেখ পরনের 'ভোগা' টোর (কৌপীন) বহর সেই আড়াই হাত। এক আঙ্গুলও বাড়ে নাই আর।'

—'আহা হা, ঘরছাড়া হওয়ার থিকে আর বড় দুঃখু কি আছে হে।'

হাড়মার মন সুদূরে চলে যায়। সিধু-কানহু একবার রুখে দাড়িয়েছিল

এইসব অত্যাচার আর অনাচারে বিরুদ্ধে। গোটা সাঁওতাল জাতটাই সাথ দিয়েছিল। রক্তে রাঙা হয়ে গিয়েছিল ভাগনাদিহির মাঠ। ইংরেজ সরকারের ভিত আলগা হয়ে গিয়েছিল। ফিরতি বছর রুখে দাঁড়াল সেপাইরা। তারপর স্বদেশী বাবুরা। ইংরেজরা শেষ পর্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু মহাজন আর জোতদারের যুগ শেষ হল না আজও। আজও বংশ পরম্পরায় ব্যাগার দিতে হয়। একছুনি দাদনের দুছুনি সুদ দিতে হয়। বাকি খাজনার দায়ে বাপ পিতামোর জমি নীলাম হয়ে যায়।

এসব কথা আগে ভাবত না হাঁড়মা। এই ভাবনাগুলো মনে এলেই যখন ভেতরে ভেতরে রক্তাক্ত হত। তখন দুবোতল হাঁড়িয়া খেয়ে মনের জ্বালাটা শান্ত করত।

শহরের কটা বাবু এসেই সব ওলট পালট করে দিল। সোনার চাঁদ ছেলেরা কোন মায়ের কোল খালি করে এসেছিল কে জানে। ওরা নয়া দুনিয়ার স্বপ্ন দেখত। নতুন ধরতি। সেখানে কোন ভেদাভেদ থাকবে না। বৈষম্য থাকবে না।

এসব কথা মনে পড়লে মনটা বড় দুর্বল হয়ে যায় হাড়মার।

এ বছর সারাটা বছর এ গাঁয়ে কোন পাল-পার্বণ হয়নি। বাহা, মা-মড়ে, শোহরাই, কোনটাই না। সারাটা গাঁ শোকে স্তব্ধ হয়ে আছে।

হাড়মা অনুভব করছিল ওর বুকের পুরোন ক্ষত থেকে রক্ত নিঃসরণ সুরু হয়েছে আবার। বুকটা জ্বলছে। হাড়মা অস্থির বোধ করছিল। জ্বলুনীটা কমাবার উদ্দেশ্যে পাটিকারকে বলল 'সাদাপানি' (হাঁড়িয়া) খাবে পাইটকার।'

পাটিকার নিজেও তৃষ্ণার্ত বোধ করছিল। বলল, 'তা, হলে মন্দ হয় না।'

হাড়মা ইশারা করতেই হাঁড়িয়া এল এক কলসি। সঙ্গে শালপাতার দোনা। লঙ্কা আর কাঁচা পেঁয়াজ। অচিরেই নেশা জমে উঠল।

সেই সময় আবার পিয়াল গাছের ছায়ায় সেই বিষাদ প্রতিমাটির দিকে নজর পড়ল পাটিকারের, আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, এই মেয়েটিকেই তো বছর দুয়েক আগে টগোদার কানি মেলায় ও সুখের নিদান দিয়েছিল।

তখন ঈশ্বরের ওপর ভারী রাগ হল পাটিকারের। তুমি নিদয় হে বিধেতা পুরুষ। বছর না ফিরতেই সোনার পিতিমেকে পাথর পিতিমে করে দাও। মদের আসরে ঈশ্বর প্রসঙ্গ জমে ভালো, তাছাড়া নেশা যখন তুঙ্গে।

পাটিকার বলল 'ভাই হাড়মা, ঈশ্বর কেমন? হাড়মার বুকটা তখন খানিকটা হাল্কা হয়েছে। ও শুধোল কে ঈশ্বর? মাঝি, মাতব্বর না পারগানা?

কুন গাঁয়ের? 'পারিস' (গোত্র) কি? হাঁসদা? হেম্ব্রম? মুর্মু? বেসরা? না টুডু?'

—নাহে, ঈশ্বর মানে ভগমান।

—'আমি দেখি নাই।'

—'আমিও না। ঈশ্বরের পট আঁকব ভাবছি, কিন্তু চেহারাটো কেমন আন্দাজ করতে নারছি।'

—কেউ দেখে নাই। চাঁদপানা বাবুগুলো বলত 'ঈশ্বর গরীবদের কাছে হাঁড়িয়ার চেয়েও ডাগর লেশা, কিন্তু বড়লোকদের ঘরে মাইন্দারী করে।

—'তবে যে শাস্তরে বলেছে পিরথিমি যখন পাপে ভার-ভারন্ত হয়্যা যায় তখন ভগবান অবতার হয়্যা জনম লেয়, যেমন, মৎস্য, কূর্ম, বরাহ'—

এভাবে দশাবতারের রূপ ব্যাখান করে পাটিকার। হাড়মা অবাক বিস্ময়ে কপালে চোখ তুলে বলল 'দিকুদের (অনাদিবাসী) শাস্তরেও এই কথা বলেছে? আমাদের সাঁওতাল পুরাণেও তো একই কথা বলেছে হে। পিরথিমি প্রথমে জলের তলায় ছিল। তখন সিখেনে শুধু জলের জীবরা বাস করত। কাছিম, কাঁকড়া, কেঁচো, শোল, রাঘব বোয়াল।

ছেলেবেলায় গড়মবাবার (ঠাকুর্দা) মুখে শোনা গল্পটা আওড়ায় হাড়মা

—'তারপর একদিন ঠাকুরের খেয়াল হল মানুষ গড়বার। ঠাকুর বললেক, ইবারে কি বেনাব হে? ইবারে মানুষ বেনাব। নিজের 'কড়াম জাং' (পাঁজরের হাড়) দিয়ে বেনালেক একজোড়া হাঁসা—হাঁসিল (হংস-হংসী)। হাঁসা-হাঁসিল বড় হল। উড়ে বেড়াতে লাগলেক, কিন্তু কুথাও এতটুকু জিরাবার থল নাই হে। ঠাকুরকে বলতেই ঠাকুর জলের জীব দিগে ডাকলেক। তুমরা কেউ ধরতি বেনাতে পারবে হে? কেউ পারলেক নাই। তখন কেঁচো বললেক, আমি পারব হে, যদি কাছিম আমাকে আশ্চয় দেয়। তারপর কেঁচো কাছিমের পিঠের ওপর দাঁড়াই মাটি উগরে উগরে ধরতি বেনালেক। সেই ধরতির উপর হাঁসা-হাঁসিল দুটো মানুষ ছানার জনম দিলেক। পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ি। উয়ারা আট বেটা আর আট বিটির জনম দিলেক। তাদের 'বাপলা' (বিয়ে) হল। পিলচু হাড়াম আর পিলচু বুড়ি উয়াদের আলাদা আলাদা 'পারিস' (গোত্র) বেঁধে দিলেক। তাদেরই নাম হল 'খেড়ওয়ার' (সাঁওতাল)।

পাটিকারের চোখে ঘোর লেগেছিল। ও তখন ভাবছিল, সবারই জন্ম বৃত্তান্ত মোটামুটি একই প্রকার।

পাটিকার খোলাটে চোখে তাকিয়ে বলল 'সবার শেষে জনম লিবেক কল্কী অবতার। পিরথিমি যখন পাপে ভারাভার হবেক, তখন মহাপ্রলয় হবেক। অগ্নিবৃষ্টি। তখন পিরথিমিকে পাপমুক্ত করবেক কল্কী অবতার।'

'ধ্যুত। পেন্দা (মিছে) কথা' হাডমা ঝাঁঝিয়ে উঠল 'পিরথিমি কি এখনও পাপে ভারভারন্ত হয় নাই? আমাদের শাস্তরে বলেছে, সাঁওতালরা যখন 'হিহিডি-পিপিডি থিকে 'খোজ-কামান' তখন একবার পিরথিমি পাপে ভারভারন্ত হয়েছিল। তখন 'সেঙ্গেল দাঃ' (আগুন বৃষ্টি) হয়েছিল।'

হাডমার মনে পড়ল, গল্পটা শুনে শহরের সেই চাঁদপানা বাবুরা বলেছিল, শাস্তরে ঠিক কথাই বলেছে। তবে ঈশ্বর অগ্নিবৃষ্টি করেন না। ঈশ্বর তোমার হাতে আগুন তুলে দিয়েছে। সেই আগুন তোমাকেই জ্বালতে হবে। পাপীরা ধ্বংস হবে সেই আগুনে।'

তখন পিয়ালতলায় দাঁড়িয়ে থাকা সেই মেয়েটি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল। ওর সঙ্গিনীরা ওকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। পাটিকারের মনে পড়ে গেল, ও হাডমার বিধবা পুত্রবধূ, নাম গুরুবারি।

পাটিকারকে দেখে গুরুবারির আবেগ উথলে উঠছিল। সোমবার সঙ্গে পরিচয়ের দিন থেকে ওর মৃত্যু পর্যন্ত আনুপূর্বিক ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছিল। মটগোদার শনিমেলায় যাওয়ার পথে পরিচয়। ওদের গাঁয়ের নাম এদেল বাহা। ফুলের নামে নাম। এদেলবাহা মানে শিমুল ফুল। মাঝখানে নদী ওপারে সার্জমাতু। এদেলবাহা থেকে মেয়েদের দল যাচ্ছিল, সার্জমাতু থেকে ছেলেদের।

পথের মাঝেই গানের ওতোর চাপান। মেয়েরা সার্জমাতুর সেরেঞ্জিক (গায়ক ও গীতিকার) সোমরা টুডুর নাম শুনেছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না। সোমরাও নিজের পরিচয় গোপন রেখে অন্যের বাঁধা গান গাইছিল মেয়েদের উত্যক্ত করবার জন্য। সোমরা গেয়েছিল

মেন না, মেন না, কুডিকো
দাড জংপে
কোডাকো পটস পটস সীদুঁর
নাকো ঠোসা বাডাযেত
(ওগো তরুণীরা শোন
ত্রস্তে পালাও এখান হইতে

যুবকেরা সবে আসিছে ত্বরিতে
সিঁথীতে সিঁদুর ঘসিতে চকিতে
বাধা মানিবে না কোন।)

গুরু বারিদের দল গাইল পাল্টা

চরণ,

মেন না, মেন না কোডাকো
দাড জংপে
কুডিকে চুলহা কুডায দাড়ুযাকো
পাঞ্চা বাডায়েত।
(ওগো তরুনেরা শোন
এখান হইতে পালাও এখনি
ছুটিযা আসিছে যতেক রমণী
উদ্যত হাতে লইয়া অশনি
শঙ্কা না জানে কোন।)

মেলাতে আবার দেখা হযেছিল। এক ফাঁকে ওরা গিয়েছিল পাটিকারের ডেবায। পাটিকার খডি পেতে বলেছিল ওদের ভবিষ্যত জীবন সুখের হবে। তারপর নিভৃতে আরও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। অন্তরঙ্গতা নিবিড হযেছিল। কিন্তু গুরুবারির বাপ লক্ষণ সরেনের মত ছিল না এ বিয়েতে। ও চেযেছিল, ওর জামাই হবে বীর। 'সেরেঞ্জিক' নয়। তল্লাটের সেরা শিকারীর সঙ্গে মেযের বিযে দিতে চেযেছিল লক্ষণ। শেষ পর্য্যন্ত 'ঞির বোলোক্' (কন্যাহরণ) বিযে করতে হয়েছিল সোমরাকে। সার্জমাতুর যুবকরা গিয়ে গুরুবারিকে তুলে এনেছিল। তারপর নদীর চরে একটা ছোটখাটো লড়াই হয়েছিল। শেষে উভয পক্ষের মাঝি ও পারগানার মধ্যস্থতায় যথাবিহিত 'গোনং' (কন্যাপণ) দিযে আনুষ্ঠানিক বিযে হয়েছিল ওদের।

তারপর কিছুদিন ছিল বড সুখের কাল। পাল-পার্বণে নাচ গান। নতুন নতুন 'সেরেঞ' বাঁধত সোমরা। সেই সঙ্গে মন মাতানো 'কেঁদরী'র (কাছিমের খোল দিযে তৈরী বেহালার মত বাদ্যযন্ত্র) সুর। গুরুবারি আর ওর সঙ্গিনীরা নাচত। একসঙ্গে ধান বোযা, ফসল কাটার কাজ করত ওরা। জীবনযাত্রা ছিল বন্ধুর, কিন্তু জীবন যাপন সহজ ছিল। কিন্তু কিছু দিন পরই এল সেই বিপর্য্যয়ের কাল।

শহরের চাঁদ পানা বাবুদের সঙ্গে ওদের পরিচয হল। ওদের সঙ্গে এদের

স্বপ্ন মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। এদের ছিল বঞ্চনার বেদনা। জমির ক্ষুধা। ওদের ছিল হৃতসম্পত্তি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি। নয়া দুনিয়া গড়বার স্বপ্ন। সেই স্বপ্নের আবেশে বুঁদ হয়ে গিয়েছিল এ তল্লাটের সাঁওতাল, মহালী, কামার, কৈবর্ত্তরা। ওরা কত সহজে এদের সুখ দুঃখকে ভাগ করে নিয়েছিল। মুরুব্বি-মাতব্বরদের সঙ্গে গল্প করত। ওদের সঙ্গে 'দাঃমাণ্ডি' (জল ভাত) ভাগ করে খেত।

ওরা সোমরাকে বলেছিল সবাইকে বীর যোদ্ধা হতে হবে এমন কোন কথা নেই। তুমি সেরেঞ্জিক। তুমি গান বাঁধবে। জাগরনের গান। প্রতিবাদের গান। প্রতিরোধের গান। গানই তোমার অস্ত্র। তুমি গানে সুরেই আগুন ঝরাও।'

উৎসাহের আতিশয্যে সেই রাত্রেই একটা নতুন সেরেঞ্জ বেঁধেছিল সোমরা,

কিসান,
আপেয়াঃক্ হাতিয়ার সরেপে
আঃশার তিয়ার দহয়পে
নয়া দিব হিজুঃক্ কানা
নয়া ধরতিবন জরুর বেনাওয়া।
(কিসান,
তোমার হাতিয়ারে দাও শান
তৈরী রাখো তোমার ধনুর্বান
দিন বদলের দিন আসছে
নতুন দুনিয়া আমরা গড়বই)

'কেঁদরী তে সুর তুলহ সোমরা।' কেঁদরী টাই ছিল ওর মরন বাঁচন। সেই লোকটা আঃ শার হাতে নিয়ে 'সেক্রায় (শিকারে) গেল। আর ফিরল না।

(৩)

সূর্য্য ক্রমশঃ পশ্চিমে ঢলছিল। হাড়মা হাঁড়িয়ার নেশায় চুর। পাটিকারেও ঝিমুনি এসেছিল।

জগমাঝি বলল ইবারে তুমার 'দরোশন' (পট) টো বাইর কর হে পাইটকার।'

পাটিকারের সম্বিত ফিরল এতক্ষণে। আসল কাজটাই বাকি। বাঁশের

কঞ্চির সঙ্গে গুটোনো চিত্রপটটি খুলে প্রাসাঙ্গিক উপাখ্যানগুলি বিবৃত করতে লাগল। বাবু বিবির খিস্যা, যমরাজের বিচার, পাপের শাস্তি, পুণ্যের ফল ইত্যাদি। সেই সঙ্গে সুর করে গাইতে লাগল,

হেরো দেখ দরোশন করহ বিচার
একদিন এই দশা হইবে তোমার
যমরাজা পায়ে ধরি মারিতে পাছড়ি
শাঁখা বাজ্জ পাঁইজর যাবে গড়াগড়ি।

তারপর নখদর্পণ। নখে ভুষোর কালি আর তেল মাখিয়ে হৃতবস্তুর হদিশ দেয়। আখণু মোড়লের গরু হারিয়েছে।

—'কি গো মুরুব্বি কিছু দেখতে পায়' ছানিপড়া চোখে এক চিলতে কালি ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না আখণু।

—'ভাল কর্যা দেখ, একজন লোক এক পাল গরু তাড়ায়ে লিয়ে যেছে?

ঠিক ঠিক।

—'উত্তর দিশায় গেছে। বাইপুরের হাটে খবর লাও।'

পাটিকার জানে এই পথ দিয়েই বলদেব পাইকেররা বাইপুরের গোহাটায় গেছে।

এবার পরলোক সংবাদ। মংলু হাঁসদার বাবা মারা গেছে গত ফাগুনে।

'শীতে বড় কষ্ট পেছে হে মুরুব্বি।'

তাহলে কি চাই?

'কেটের চাদরটা জাড়িয়ে আরামে থাকবে বুড়ো মানুষটা।'

পাটিকারের দাবি সামান্যই। এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর দানে পাটিকারের ঝুলি পূর্ণ হয়ে ওঠে। তেল পড়া, খড়ি পাতা পট দেখানো শেষ হওয়ার পর যাওয়ার উদ্যোগ করে পাটিকার। দু পা বাড়িয়ে নিভৃতে গুরুবারির সঙ্গে দেখা হয়।

কুণ্ঠার সঙ্গে গুরুবারি সুধোয়, 'মানুষটোর সঙ্গে তুমার দেখা হয় পাইটকার?'

পাটিকার অস্বস্তী বোধ করে। এই সরল মেয়েটিকে ঠকাতে ওর মন চায় না।

পাটিকার বলল 'না মাঈ। উতো সগ্‌গে বাস করে। সেক্রায় যারা মারা যায় তাদের সগ্‌গ বাস হয়। সগ্‌গের সঙ্গে আমার কোন যোগাযোগ নাই।

একটা অব্যক্ত যন্ত্রনায় গুমরে উঠল গুরুবারি। যে জগদ্দল পাথরটা ওর

বুকে চাপানো আছে, সেটাও নামাবে কি করে? কি করে বলবে সে সেক্রায় মৃত্যু হয়নি সোমরার।

ভৈরবরাঁকির চরে সোমরার লাশটাকে দেখে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলে গুরুবারি। ওর ভাই অর্জুন বলেছিল, 'বুকে পাথর চেপে রাখ বুইন। বাপ বলেছিল বীরের সঙ্গে তোর বিয়া দিবেক। ইয়ার চেয়ে ডাগর বীর আর কে আছে?

উদ্গত অশ্রু রোধ করতে পারেনি গুরুবারি। অর্জুন আরও বলেছিল, 'সবাইকে বলবি, সোমরা সেক্রায় মারা পড়েছে, নাহলে পুলিশ হয়রানি করবেক।' আঁচল থেকে কেঁদরীটা বার করে গুরুবারি বলল 'উয়ার সঙ্গে লিচ্চয় তুমার দেখা হবেক পাইটকার। উয়ার আইজ্ঝা এখনও মেটে নাই। দেখা হলে এই কেঁদরীটো উয়াকে দিয়ে দিও। ইটোর বিহনে নাজানি সেরেঞ বাঁধতে পারছে নাই মানুষটো।'

তারপর মুখে আঁচল দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল গুরুবারি হায়রে বিশ্বাস। পাটিকারের চোখ দুটো জলে ভরে এল।

সন্ধ্যে উতরে যাওয়ার পর বিষন্ন মনে ঘরে ফিরল পাটিকার। ওর ছেলেটা ধুমজ্বরে বেহুঁস। ওর বউ কপালে জলপটি দিচ্ছিল। শিলাইএর ওপারে পীর সায়েবের দরগায় উরস উৎসব। সন্ধ্যে থেকেই ফকীর দরবেশদের আনাগোনা। তখন দুরের অশ্বত্থগাছের শাখায় শাখায় জোনাক জ্বলছিল। হঠাৎ একজন দরবেশ মনভুলে ওর ঘরে ঢুকল। পরনে আলখাল্লা। যোনী বাতাসার মত গায়ের রং। রুগ্ন ছেলেটার মাথায় হাত বুলিয়ে তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ছেলেটার জ্বর কমল। জ্ঞান ফিরে এল।

তখন ওর বউ ভাত রাঁধতে বসল। গরম ভাতের গন্ধে বিভোর হয়ে রঙ, সরা আর তুলি নিয়ে ঈশ্বরের পট আঁকতে বসল পাটিকার।

অকস্মাৎ ঝড় উঠল। দমকা হাওয়ায় রঙের সরা গুলো উল্টে পড়ল পটের ওপর আর, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল, পাটিকার যে, সব রঙ মিশে গিয়ে একটা নিরাবয়ব রূপ ফুটে উঠেছে, যার মধ্যে মিশে আছে গুরুবারির সারল্য, সোমরার স্বপ্ন, চাঁদপানা বাবুদের নয়া ধরতি গড়বার প্রত্যয় এবং ফেনী বাতাসার মত গায়ের রঙ, সেই বৃদ্ধ দরবেশের স্নেহের পরশ।

তখন একটি পরম সত্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল পাটিকারের কাছে। ঈশ্বর একটি বিশ্বাসের নাম। যে বিশ্বাস নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে, অথবা মরে যায়। অস্তিত্বহীন নিরাবয়ব একটি সত্তা সব দায়-দায়িত্ব নিয়ে শুধু মানুষের মনের মধ্যে বেঁচে থাকে। নানাবর্ণে উজ্জ্বল এই কাগজের টুকরোটিকে ও ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি হিসেবে পটের মধ্যে সেঁটে রাখবে। কেউ জিগ্যেস করলে বলবে, 'ঈশ্বর বহুকাল আগে ফেরারী হয়ে গেইছে হে, শুধু তার ছায়াটুকু রেখে গেইছে।'

রুশ দেশের লোককথা প্রসঙ্গ

সুধীর কুমার করণ

ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে শ্লাবিক-ভাষী বিভিন্ন জাতির বসবাস। রুশীলোককথার আলোচনা প্রসঙ্গে বিশাল শ্লাভ্-পরিমণ্ডলের ফোকলোর বা লোকযান নিশ্চিতভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোকবিশ্বাস, লোকাচার, লোকসঙ্গীত, লোককথা প্রভৃতির প্রাচীন লালন-ভূমি রূপে এখনও ঐ পরিমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। তার কারণ,—অধিকাংশ শ্লাবিক-ভাষী দেশে কৃষি-নির্ভর গ্রামীন জীবনযাত্রার স্রোত প্রবাহিত ছিল দীর্ঘদিন। তার সঙ্গে সমানভাবে ছিল নিরক্ষরতা। এই পরিবেশের মধ্যে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল লোকযানের বিভিন্ন ধারা। এই ধারা কোন কোন ক্ষেত্রে সংলগ্ন দেশগুলিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিন্ জাতির রূপকথায় প্রভাব পড়েছিল রুশ-রূপকথার পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, জার্মানিক-ভাষী অঞ্চলেও শ্লাবিক লোকবিশ্বাস ও গীতিকার প্রভাব আবিষ্কার করা যেতে পারে। আলবানীয় পুরাণের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সার্বজাতির পুরাকাহিনী।

শ্লাবিক লোকসাহিত্যের মধ্যে কয়েকটি বিশিষ্ট 'টাইপ' লক্ষ্য করা যায়। যেমন, লোকনাট্যের উপযোগী সংগীত-সংলাপ কিংবা এককভাবে গেয় নাট্যগীতিকা, লোককথা, ধাঁধা, প্রবাদ, পুরাকাহিনী, মন্ত্রগান, বিলাপ-গীতি ব্যালাড বা গীতিকা এবং আনুষ্ঠানিক প্রেমের গান প্রভৃতি। বিশেষ করে, শীতকালীন উৎসবে লোকনাট্য অপরিহার্য,—যার মধ্যে প্রাচীন ধারার মুখোশ—

নাচ ও বর্তমান। মুখ্যতঃ হাস্যরসাত্মক সংলাপ ও সঙ্গীত, পুতুল-নাচ এবং মূকাভিনয় এই সব লোকনাট্যের অঙ্গ।

শ্লাবিক ভাষী বিভিন্ন জাতির মধ্যে পুরাকাহিনীর ধারা প্রাচীনকাল থেকেই মৌখিক ধারায় প্রবাহিত ছিল। বল্‌কান অঞ্চলের কোন কোন কৃষকের মুখে এখনও সেই প্রাচীনধারা বর্তমান। ইউক্রেন এবং বলকানের পশ্চিম-অঞ্চলের কোন কোন কৃষকের মুখে এখনও তারযন্ত্র সহযোগে পুরাকাহিনী গান করা হয়। খৃষ্টধর্মের প্রভাবে, খৃষ্ট সম্পর্কিত অনেক কিংবদন্তীও তীর্থযাত্রীদের মুখে মুখে গীত হ'তে শোনা যায়। গ্রীক অর্থোডক্‌স্ চার্চের অনুগামীরা শবযাত্রায় বিলাপ-গান গেয়ে থাকেন। মোরাভিয়া, শ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড এবং ইউক্রেনে, ব্যালাড-এর প্রচলন খুবই বেশী।

লোকসাহিত্যের বিভিন্ন ধারার মধ্যে শ্লাবিক লোককথা প্রকৃতপক্ষে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। বিশেষ করে রুশদেশের লোককথা একটি নিজস্ব ধারায় প্রবাহিত। কাহিনীর প্রারম্ভে একদিকে যেমন ব্যবহৃত হয় প্রোলোগ বা সূচনাত্মক কথামুখ, তেমনি ব্যবহৃত হয় কাহিনীর শেষে সমাপ্তি-বাচন বা এপিলোগ।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাঙলা লোককথায় সাধারণতঃ একটি এপিলোগ, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়। যেমন :

'আমার কথা ফুরুলো
নটেগাছটি মুড়ুলো।—ইত্যাদি

রুশ-লোককথার পরিসমাপ্তিতে এপিলোগের প্রয়োগ একটি বিশিষ্ট প্রয়াস। গল্প শেষ করে, গল্পকথক প্রায়ই একই এপিলোগ ব্যবহার করে থাকেন, তবে তারতম্যও পরিলক্ষিত হয়। একটি আজারবাইজানী কাহিনীতে জার্নিয়ার নামে এক চালাক গৃহবধূর চতুরতার কথা বলা হয়, যে – তার স্বামীকে বিপদের হাত থেকে মুক্ত করেছিল। এই কাহিনী শেষ হলেও সমাপ্তি-বাচন অনিবার্য, যার সঙ্গে কাহিনীর কোন সম্পর্ক নেই।

কথক বলেন,—

—আপেল পড়লো আকাশ থেকে,—
একটা আপেল কার?
—না—আমার।
আরেক আপেল নিলো সে
—এ কাহিনী বললো যে।

আর একটা পেলো কে ?
—এ কাহিনী শুনলো যে। [মণির পাহাড়]

এই রকমের আরো আছে। যেমন—

—আপেল পড়লো আকাশ থেকে,—
একটা আপেল কার ?
—যে শুনলো, তার।
—আর একটা কার ?
যে বললো, তার।
—শেষ আপেলটা কাদের ?
বাদবাকী লোক,—তাদের।

আলেকজাণ্ডার আফানাসিয়েভের সংগৃহীত রুশলোককথায় যে সব এপিলোগ ব্যবহৃত হয়েছে,—তাতে মনে হয়, গল্পকথক নিজেই যেন ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। বস্তুতঃ শ্রোতাদের কাছে এপিলোগ গুলি খুবই হৃদয় গ্রাহী হয়ে ওঠে। 'গর্তের মধ্যে পশুরা' নামক একটি কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে এক ধূর্ত শেয়ালের মৃত্যুতে। কুকুররা ওকে ছিঁড়ে ফেলেছিল। এপিলোগ' শুরু হলো এই ভাবে—

"—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও ছিলুম সেথা। খেলুম কসে মধুর
কিছু মদ্য। ঠোঁট ভিজলো। ভিজলো নাকো জিভ। ওরা আমায়
পরতে দিল দারুণ একটা কোট। কাকেরা সব উঠলো
ডেকে—'কোট খানা তো দারুণ !' আমি শুনলুম, বলছে ওরা
'দাও ফেলে দাও কোট।' দিলুম ফেলে কোট। ওরা তখন
আমায় দিল—লাল রঙের টুপি। কাকেরা সব উঠলো
ডেকে—'লালরঙের টুপি, লাল রঙের টুপি।' আমি
শুনলুম বলছে ওরা—'দাও ছুঁড়ে দাও টুপি।' খুলে
ফেললুম টুপি। তার পরে আর রইলো নাকো কিছু।

আর একটি এপিলোগ খুবই সংক্ষেপিত। যেমন—

ভোজ সভাতে আমি ছিলুম নিজে
পান করেছি মধু এবং মদ।
কিন্তু আহা! সেই মধু ও মদ
দাড়ি বেয়ে গড়িয়ে গেল পড়ে।

বস্তুতঃ কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য গল্পকথকের সমাপ্তিবাচক

কৌতুকরসের সৃষ্টি করে এবং শ্রোতাদের মনে গভীর আনন্দের সঞ্চার করে। গল্পকথক যেন সশরীরে ঘটনা স্থলে উপস্থিত ছিলেন, তাঁকেও যেন ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। যেন বলা হয়েছিল,—

এসো হে! এসো—।
মধু আর মদ খেয়ে যাও,—এসো।
আমি কিন্তু যাই নি।
ওরা বলে তেতো মধু, মদটা কেমন ঘোলা।
তা' হলে—বল—
কি মানে হয় তার।

এক বোকার গল্প শেষ করে গল্পকথক একটা ছড়া ব'লে কাহিনীতে দাঁড়ি টেনেছেন,—তেমন নিদর্শনও পাওয়া যায়। যেমন

বোকার একটি কূপ ছিল,
কূপের মধ্যে তিমি মাছ,—
আমার কথা শেষ হলো।

এই এপিলোগটি বাঙলা রূপকথার সেই সমাপ্তিবাচনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়—'এক যে ছিল শেয়াল / তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল / তার বাপের নাম রতা / ফুরুলো আমার কথা।

বলাবাহুল্য, এ বিষয়ে দক্ষিণী এবং পশ্চিমী শ্লাভদের চেয়ে পূর্বাঞ্চলীয় শ্লাভদের কৃতিত্ব বেশী। লক্ষ্য করা যায়, লোককথাগুলি মুখ্যতঃ গদ্যভাষায় কথিত হলেও তার মধ্যে পদ্য থেকে যায়। এমন কি কোন কোন লোককথা পরিপূর্ণ ভাবে বর্ণনাত্মক পদ্যের মাধ্যমেও প্রকাশিত। বিশেষ করে ধর্মীয় এবং সামাজিক কিংবদন্তী মূলক লোককথা,—শ্লাভ-লোককথার একটি উল্লেখযোগ্য দিক। এই প্রসঙ্গে, এ কথাও স্মরণ যোগ্য যে শ্লাভদের সঙ্গে ইরানীয়দের সম্পর্ক একদা খুবই ঘনিষ্ট ছিল। ইন্দো-ইরানীয় ভাষার সঙ্গেও শ্লাবিক ভাষার সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। লোককথার ক্ষেত্রেও এই প্রাচীন সম্পর্ক আবিষ্কার করা যায়।

মধ্যযুগে রুশসম্রাট আলেকসিস মিখাইলোভিচ লোককথার উপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করেছিলেন। কারণ, চার্চ-ও ঘোষণা করেছিল যে ধর্মীয় কাহিনী ছাড়া মানুষের রচিত অন্যকোন কাহিনী বলা বা শোনা চলবে না। ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে চার্চের নির্দেশে এই ফর্মান জারী করা হয়েছিল যে "অনেকেই স্বপ্নদর্শনকে বিশ্বাসযোগ্য মনে করে, অনেকেই পাখির ডাকের মধ্যে ভূত-

ভবিষ্যৎ শুনতে পায়; অনেকেই ভুত-প্রেত এবং অশুভ শক্তিকে বিশ্বাস করে, শুধু তাই নয়, উদ্ভট অবাস্তব কাহিনীকেও বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে। এই ভাবে তারা নিজেদের আত্মাকে কলুষিত করে এবং চটুল আমোদপ্রমোদকে জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক বলে বিবেচনা করে। অতঃপর এই ধরনের বিশ্বাস এবং উদ্ভট কাহিনী শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।"

বলাবাহুল্য জার এবং চার্চের সম্মিলিত প্রয়াস, লোককথাকে উচ্ছেদ করতে পারেনি। তার গতি অব্যাহত থেকে যায়। প্রাচীন শ্লাভ লোককথা কেবলমাত্র শ্লাবিক-গণ্ডীর মধ্যেই উদ্ভুত হয়েছিল, তা' নয়। স্বাভাবিক ভাবেই চলমান ভিন্‌দেশী লোককথাও এই লোককথার ধারাকে পরিপুষ্ট করেছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এবং প্রাচ্যদেশ থেকেও লোককথার অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে, কখনও লিখিত গ্রন্থ থেকে, কখনও মৌখিক সূত্রে। এইভাবে, এরুশলাশ লাজারেভিচের কাহিনী গৃহীত হয়েছিল শাহনামার 'রুস্তম ও মোহ্‌রাব' কাহিনী থেকে। মধ্যযুগীয় ইতালী দেশের কাহিনী রুশ দেশে রাজকুমার বোভার কাহিনী হয়ে দেখা দেয়। প্রাচ্যদেশ থেকেও অনেক কাহিনী চলে আসে। বস্তুতঃ এই সব কাহিনীর রুশীকরণ ঘটে যায়।

মধ্যযুগীয় জার আলেক্‌সিস্ মিখাইলোভিচের রাজত্বকালে কলিন্‌স্ নামে এক ইংরাজ পরিব্রাজক, রুশদেশ ভ্রমণ করতে এসে আইভান দি টেরিব্‌ল্ বা বিপজ্জনক আইভান সম্পর্কিত দশটি লোককথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। প্রকৃতপক্ষে আইভান বা ইভান-কাহিনীর প্রচলন ছিল রুশদেশের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। গ্রামীণ কৃষকদের মধ্যে প্রচলিত রূপকথা-উপকথা, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় ছিল না বলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে গ্রামীণ জনপ্রিয় রূপকথা সংগৃহীত হয় নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে গল্পকথকদের প্রভাব ছড়িয়ে পড়লেও, গল্পকথকরা মুখ্যতঃ রোম্যান্টিক এবং অ্যাড্‌ভেঞ্চার-এর কাহিনী শোনাতেন বেশী করে। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লোককথা সংগ্রহের দিকে দৃষ্টি পড়ে। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে রোগ্‌দান ব্রোনিৎসিন-এর রুশ লোককথা প্রকাশিত হওয়ার পর অনেকেই লোককথার সন্ধানকার্যে ব্রতী হন। বিংশশতাব্দীতে সোভিয়েৎ-দেশে প্রচুর পরিমাণে লোককথা সংগৃহীত হয় এবং লোকযানচর্চার প্রসার ঘটে।

রুশপণ্ডিত পি, ডি ভ্লাডিমিরভ, রুশ লোককথাকে তিনটি মুখ্যভাগে ভাগ করেছেন, যথা—প্রাচীন বা পুরাকাহিনী, পশুকাহিনী এবং প্রাত্যহিক

জীবনের গল্প। এর মধ্যে একচল্লিশটি টাইপ বা ধারার কথা-ও উল্লিখিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, আর্নে-ও লোককথার তিনটি ভাগের কথা বলেছেন, যথা—অ্যানিমেল টেল বা পশুকথা (আদি-উপকথা), যথার্থ লোককথা বা প্রপাবলি সো-কল্‌ড্‌ টেল এবং অ্যানেকডোট অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকার পারিবারিক কাহিনী। যথার্থ লোককথা' বলতে আর্নে বুঝিয়েছেন, —যাদুগল্প, কিংবদন্তী, রোমান্টিক গল্প এবং মূর্খ শয়তানের কাহিনী। যাদু গল্পের মধ্যে পড়ে, অত্যাশ্চর্য ঘটনা, অলৌকিক ক্ষমতা, অলৌকিক সহায়ক, অলৌকিক বিপদ এবং অলৌকিক বস্তু'প্রভৃতির কাহিনী।

যাদুবিষয়ক কাহিনী শুধু রাশিয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়,—তা' পুরোপুরি আন্তর্জাতিক। রুশলোককথায় ড্র্যাগনজয়ী বীর, বন্য পশুর দুধ, এবং অনুরূপ সংখ্যাহীন কাহিনী প্রভৃতি যাদু গল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এইসব কাহিনীর নায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইভান। লক্ষ্য করা যায় ইভান কখনও জারের পুত্র, কখনও কৃষকপুত্র, কখনও সওদাগরপুত্র। আবার কখন সে মূর্খ। বেলো-রুশী লোককথার ভাসিল, মলদাভীয় লোককথায় বাসিলিক, আর্মেনীয় লোককথার ভাচাগান,—রুশদেশের ইভানেরই প্রতিরূপ। রূপকথার বীরাঙ্গনা নায়িকাদের নাম হেলেন, মার্থাআন্না, ভ্যাসিলিনা, নাতাশিয়া, মারিয়া মোরেভ্‌না প্রভৃতি। বীর নায়কদের অত্যাশ্চর্য সহায়ক ওপিভালো, ওবিযে-দালো, গোরিনিয়া প্রমুখ রুশ লোককথায় বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী।

যাদু গল্পের মধ্যে, ডাকিনী বাবা-ইয়াগার কাহিনী বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। বাবা-ইয়াগা, প্রকৃতপক্ষে সাধারণ ডাইনী নয়, বলা চলে রাক্ষসী। তার লম্বা লম্বা পা, সে একটা উদুখলের উপরে চড়ে ঘুরে বেড়ায়; সে ঝাঁটা হাতে মানুষকে তাড়া করে, ঘরের মধ্যে এক পা এক কোণে আর এক পা অন্য কোণে ছড়িয়ে বসে থাকে। এ ছাড়াও আছে ভয়ংকর ড্র্যাগনের কাহিনী, যার মাথার সংখ্যা কখনও তিন, কখনও ছয়, কখনও নয় কিংবা বারো। উড়ন্ত ড্র্যাগনের নরমাংস ভক্ষণের কাহিনীও বহু প্রচলিত।

অত্যাশ্চর্য বস্তুর মধ্যে আছে, টেবিলের ঢাকনা,—যা নিজে নিজেই বিস্তৃত হতে পারে। আর আছে, ছোট টেবিল, যে নায়কের আদেশ পালন করে। আছে, শিঙ্‌ বা শিঙা, যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাজিক কার্পেট এবং নানা রকমের পানীয়। আছে,—আশ্চর্য-বাক্স, অবাক-ডিম, অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট টুপি, আংটি, চিরুণী, চুলের কাঁটা প্রভৃতি।

বস্তুতঃ রুশলোককথায় ম্যাজিক বা যাদুশক্তির অলৌকিক কাহিনী

প্রাচ্যদেশীয়—বিশেষ করে ভারতীয় লোককথার সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রুশলোককথায় রাক্ষস নেই, ড্র্যাগনই রাক্ষসের প্রতিরূপ। ড্র্যাগন, জলতলের কামরূপী জীব, কিন্তু—তার ক্রিয়া-কলাপ ভারতীয় রাক্ষসের মতোই। গভীর হ্রদের মধ্যে, স্তম্ভের মধ্যে কিংবা তালগাছের উপরে কৌটোর মধ্যে রাখা ভোমরার মধ্যে রাক্ষসরাক্ষসীদের 'প্রাণ' সংরক্ষিত থাকার যে কাহিনী ভারতীয় লোককথায় বর্তমান, রুশ লোককথাতেও তেমন ইংগিত মেলে। একটি রুশলোককথায় লক্ষ্য করা যায় অমর কাশ্চেইর 'প্রাণের' সন্ধান দিতে গিয়ে ডাইনী বাবা-ইয়াগা, ইভানকে বলেছিল—" কাশ্চেই-র প্রাণ আছে এক ছুঁচের ডগায়, ছুঁচ আছে এক ডিমের ভিতর, ডিম আছে এক হাঁসের পেটে, হাঁস আছে এক খরগোশের পেটে, খরগোশ আছে এক পাথরের সিন্দুকে, সিন্দুক আছে এক ওকগাছের মাথায় আর ঐ গাছটা অমর কাশ্চেইর চোখের মণি, কড়া পাহারা সেখানে।'

সাধারণতঃ, ভারতীয় রূপকথায় বীরনায়ক রাজপুত্রের কোন নাম থাকে না। লালকমল নীলকমল প্রভৃতি নামও সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু রুশ-লোককথায় ইভান নামটি প্রায়শঃই বীরত্বের প্রতীক। সম্ভবতঃ ইতিহাসস্পৃষ্ট কোন কিংবদন্তীর নায়করূপে ইভানের প্রতিষ্ঠা ঘটে গিয়েছিল এবং ইভানের নাম জড়িয়ে অসংখ্য রূপকথার উদ্ভব ঘটেছিল। ভারতীয় জাতকের বোধিসত্ত্ব এইভাবেই অসংখ্য উপাখ্যানের নায়ক। রাজপুত্র ইভান ড্র্যাগন বধ করে রাজকন্যা মার্থাকে বিবাহ করেছিল, বিবাহ করেছিল রাজকন্যা এলেনাকে। ইভান, অমর কাশ্চেইকে নিহত করে মোরেভ্‌নাকে পত্নীরূপে লাভ করেছিল। সওদাগরপুত্র ইভান বীরত্ব দেখিয়ে রাজার সেনাপতি হয়েছিল। কৃষকপুত্র ইভান এবং মূর্খ ইভানও বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। রুশ লোককথার বৃহদংশ জুড়েই ইভানের প্রতিষ্ঠা।

ইভানের সহকারী বীর নায়কদের মধ্যে পকাতি গরোশেক্ এবং ভাসিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরাও ড্র্যাগনের হত্যাকারী। মলদাভীয় লোককথার নায়ক ফ্রমোস, সূর্যের বোন ক্যাসিনজ্যানাকে বিয়ে করেছিল। আর্মেনীয় লোককথার ভাচাগান এবং আলতাই লোককথার আরেলদেই-মর্গেন ও তার বীরপুত্র একই সম্মানের অধিকারী।

পশুপাখি সংক্রান্ত আদি উপকথা, রুশ লোককথাকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে যদিও অন্যবিধ লোককথার চেয়ে পশুকথার সংখ্যা অনেক কম। ইউরোপীয়

লোককথার বেশ কিছু অ্যানিমেল টেল, রুশ লোককথায় স্থান লাভ করেছে। তবু,—অনেক পশুকথাতেই রুশীয় মৌলিকত্ব বর্তমান। উদাহরণ স্বরূপ নেকৃডের গান, মাছিদের প্রাসাদ, বিড়াল-মোরগ-শেয়াল, ধাইমা, শেয়াল প্রভৃতি লোককথার উল্লেখ করা যেতে পারে। এও লক্ষ্য করা যায় যে পশ্চিম ইউরোপের কাক ও শেয়াল, বন্যপ্রাণী ও গ্রাম্যপ্রাণীদের যুদ্ধ, কাক এবং ব্যাঙ্, গাড়ীর উপর ভালুক প্রভৃতি পশুকথা রুশদেশে পৌঁছোয় নি।

রুশদেশের লোককথায় শেয়ালের ভূমিকাই মুখ্য। নেকৃডে মূর্খ, ভালুকের বুদ্ধি মোটা এবং খরগোশ কাপুরুষতার প্রতীক। বিড়ালকে অনেক সময় গল্প কথকের ভূমিকায় দেখা যায়। অন্যান্য পশুপক্ষীদের মধ্যে আছে ব্যাঙ্, কাক, কুকুর, ঈগল, হাঁস, ভেড়া, নেউল এবং সিংহ।

পশুপাখি সম্পর্কিত অতিপ্রাচীন জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজতে গিয়ে যে সব মিথ্-এর উদ্ভব ঘটেছিল, পৃথিবীর সর্বত্র তার নিদর্শন মেলে। রুশ লোককথার মধ্যেও তেমন কাহিনী আছে। যেমন: শেয়াল ও নেউল গর্তে থাকে কেন, কুকুর কেমন করে মালিক পেলো, সারস পাখি ব্যাঙ্ খায় কেন, নেকড়ে কেন শিকার করে ভেড়া, হাঁস কেন জলে নেমে স্নান করে, মোরগছানা কেন ধুলো মাখে—এরং এই ধরণের নানা কাহিনী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে, ইউরোপ ভূখণ্ডে কেবলমাত্র রুমানিয়াতে এই ধরণের 'অ্যানিমেল-মিথ' অনেক। তুলনামূলকভাবে রুশদেশে তা অল্পই।

ঈশপের নীতিগল্প থেকেও কিছু কিছু গল্প রুশদেশে গৃহীত হয়েছিল। যেমন,—শেয়াল ও সারসের গল্প। তবে,—শেয়ালের পরিবর্তে নেকৃডে-কেও পাওয়া যায়। সিংহ, শেয়াল ও গাধার শিকার ভালুকের শিক্ষাদান প্রভৃতি ঈশপ থেকে গৃহীত। এ ছাড়াও আছে সিংহ এবং মশা, ভালুক এবং মৌমাছি—পায়রা এবং মৌমাছি প্রভৃতি নীতিগল্পের প্রভাব।

এও লক্ষ্য করা যায় যে ভারতীয় পঞ্চতন্ত্রের কয়েকটি কাহিনীও রুশদেশে পরিগৃহীত হয়েছে। শশকের বুদ্ধিতে সিংহের মরণ, কাক ও সাপের গল্প প্রভৃতি পঞ্চতন্ত্রের মৌলিক কাহিনী।

এছাড়াও প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংখ্যাহীন লোককথা রুশ-লোককথার পরিমণ্ডলকে বিশেষ ভাবেই প্রসারিত করেছে। এইসব কাহিনীকে কয়েকটি 'টাইপে' ভাগ করা যায়। যেমন—

এক: নায়কের বা বীরের বিবাহ সংক্রান্ত গল্প,

দুই : অলস পত্নীকে যোগ্য করে তোলার গল্প,

তিন : চালাক যুবক ও চতুর যুবতীর গল্প,

চার : বুদ্ধিমতী কনিষ্ঠা কন্যার গল্প,

পাঁচ : চালাক চোরের গল্প,

ছয় : বোকা-হাঁদার গল্প,

সাত : হাস্যরসাত্মক গল্প,

আট : ধনী-দরিদ্রের গল্প, প্রভৃতি।

রুশ লোককথায় কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর প্রচলনও অত্যধিক। এই সব কাহিনীতে লোকবিশ্বাসের আদিম রূপও বর্তমান। বনদেবতা, দৈত্য-দানব, ভূতপ্রেত প্রভৃতি এইসব কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। এছাড়া খৃষ্টানধর্মের সঙ্গে যুক্ত ধর্মীয় পুরাণের অনেক কাহিনী কিংবদন্তীর আকারে পাওয়া যায়। যে সব কিংবদন্তীর সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ, সে-ক্ষেত্রে পিটার দি ফার্স্ট-এর নাম অবশ্যই উল্লেখযোগ্য।

এও লক্ষ্য করা যায় যে অনেক দীর্ঘায়ত রুশ লোককথা ইরান থেকে, বিশেষ করে শাহনামা থেকে গৃহীত হয়েছিল। দেবের গল্প, এজভানের ফুল, ইব্রাহিমের কাহিনী, বৈদ্য লোকমানের কাহিনী, আমিরণের গল্প, সওদাগরকন্যা ও সাতভাই-এর গল্প প্রভৃতি, ইরাণ দেশ থেকেই রুশ দেশে অনুপ্রবিষ্ট হয়। মুখ্যতঃ এইসব কাহিনী অন্তরঙ্গভাবেই গৃহীত হয়েছে, জর্জীয়, আজারবাইজানী এবং আর্মেনীয় লোককথায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইরানীয় দেব বা দএব, ভারতীয় দেব-এর বিপরীত শব্দ, – সাধারণভাবে যেমন ভারতীয় অসুর ইরানীয় অসুরের বিপরীতধর্মী শব্দ। আমিরণ-কাহিনীতে দেখা যায় যে 'দেব গভেলেসাপি' সূর্যকে গ্রাস করেছিল। এ কাহিনীর সঙ্গে দানব রাহুর সূর্যগ্রাস সম্পর্কিত ভারতীয় কাহিনীর সম্পর্ক থাকাই সম্ভব।

বহুজাতিক বিশাল রুশদেশের মধ্যে বিভিন্ন জাতি তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক বৈশিষ্ট বজায় রেখে সংখ্যাহীন লোককথার উদ্ভব ঘটিয়েছে। এখনও তার প্রবহমান ধারা অব্যাহত। ককেশীয় লোককথা সম্পর্কে অধ্যাপক 'ই পোমেরান্ত-সেবা'-র উক্তি সমগ্র রুশদেশের লোককথা সম্পর্কেও প্রযুক্ত হতে পারে। তিনি বলেছেন,—You will enter a peculiar world, beautiful and mysterious, the world of fairytale and legend. Fabulous heroes, often endowed with supernatural powers, struggle and, after trial and suffering evercome Invariably it is the

powers of light, goodness and truth which triumph over the powers of darkness, evil and false-hood" অর্থাৎ—এ এক রহস্যময়, অদ্ভুত সৌন্দর্যলোক। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী বীরদের শক্তিমত্তা, সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী সংরক্ষিত আছে এই সব রূপকথা আর কিংবদন্তী-অবদানের মধ্যে। এই সব কাহিনীতে অন্ধকারের পরাজয় ঘটে আলোর হাতে। অশুভশক্তি এবং মিথ্যা হার মানে শুভশক্তি ও সত্যের কাছে।

বলাবাহুল্য এই বক্তব্য পৃথিবীর সমস্ত রূপকথার উপরই প্রযোজ্য। বস্তুতঃ এই সব লোককথার সঙ্গে বক্তা কিংবা শ্রোতার কোন ব্যক্তিগত সম্পর্ক নেই কিন্তু বহু প্রাচীন প্রবহমান লোকবিশ্বাস ফল্গুধারার মতো যেমন লোকমানসে প্রবাহিত হয়ে চলে, তেমনি—লোককথার মধ্যেও তার অস্তিত্ব থেকে যায় বলে, —লোককথার সঙ্গে শ্রোতাদের এক হৃদ্য সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

রুশবিপ্লবের পরবর্তীকালেও এই সব লোককথার ধারা অব্যাহত। সব সময় তা' যে অপরিবর্তিত থাকে, তা' অবশ্যই নয়, কারণ সামাজিক পরিবর্তনের সূত্রে অনেক প্রাচীন লোককথাই তার স্বরূপ হারিয়ে ফেলতে পারে। এও লক্ষ্য করা যায়, সোভিয়েৎ সমাজে লোককথার 'মোটিফ'-গুলিকে যথাযথ রেখে নতুন লোককথার উদ্ভবও ঘটে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য—কোন তাৎক্ষণিক রচনাকে লোকসাহিত্য নামে অভিহিত করা চলে না, যদি না দীর্ঘদিন ধরে তা' গতিশীল এবং প্রবহমান থাকে।

মোটের উপর রুশ লোককথা সামাজিক পরিবর্তনের মুখে পড়েও হারিয়ে যায় নি। তার প্রভাব এবং প্রসার এখনও অব্যাহত।

মাড়াইকল

সৈকত রক্ষিত

চেপুলাল বেশবাব শরীবে মাংস আর নেই বললেই চলে। শরীবটা তার একটা সুষম ছন্দ ও বীতিতে গাঁথা, যেন, হাডের মালা। অঙ্গের সঙ্গে অঙ্গের ঠোকাঠুকি লাগলে ছন্দেব কোনো কোমলতা সে টেব পায না। পায এক ধাতব অনুরণন। দৃশ্যত, তাব শবীবে, বাডতি হাড যেমন কিছু আছে, তেমনি আছে বাডতি কিছু উপাদানও। তাব লোমশ ভুরুর পাকা ও মোটা লোমের রাশি, তাব বেডে ওঠা নখ—যা অপবিচ্ছন্নতার দরুন নীল থেকে কালো হয়ে উঠেছে আর সারা গাযে-পিঠে ময়লা, যা আলাদা করে ময়লা বলে আর বোঝা যায না। মযলাব রঙ হয়ে উঠেছে তার গায়ের রঙ। আর এমন মেটে মেটে গাযেব সঙ্গে অদ্ভুত এক প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য নিযেই পাঁশুটে চুল দখল কবে আছে তার গর্দানের ওপর ভারি মুণ্ডুটি। চোখেব কোলে পিচুটি জমে। এবং জমলে, পাতা সহজে খুলতে পারে না চেপুলাল। হয়ত তার কষ্টই হয়। কিন্তু সব কষ্ট-ক্লেশই চেপুলাল গোপন বাখতে পারে। তার মুখের অকপট হাসি, রক্তহীন বিবর্ণ মাডিতে ভুট্টাব দানার মতো দাঁতের চেয়ে থাকা—এসবের মধ্যে বয়ে গেছে তাব নির্বিকাবচিত্ততা। তাব উদাসীন মনের অভিব্যক্তি। এই মন নিয়ে, গাডোযান চেপুলাল, কথা বলে তার রুগ্নপ্রায় গরু দুটির সঙ্গে। তাদের কাঁধে কাঁধে টেনে নিয়ে যাওযা নডবডে গাড়িটির সঙ্গেও। কখনো-বা, ধুলো ওডানো মেটো পথের দুপাশে বিস্তব জঙ্গলঝাডি

আর মাথার ওপরে নীল চাঁদোয়ার মতো ঝুলে পড়া আকাশ দেখে সে আচমকা গাড়ি থামিয়ে দেয়।

ছইবিহীন গাড়িতে, দুলতে দুলতে, ঘুম এসে যায় কুঞ্জ মোদকের। অকস্মাৎ গাড়ি থেমে গেলে, দুলুনিও থামে। তখন ছন্দপতনের বিরক্তি নিয়ে চেপুলালের দিকে সে চায়। থুতনি কাঁপিয়ে ধমক দিয়ে বলে ওঠে, 'হেই শ্লা চ্যাপা! গাড়ি রুকে দিলি য্যা? রাস্তয়ে বাগ আছে ন ভালুক আছে?'

অযোধ্যা পাহাড় থেকে নেমে আসার পথে, ঝোপঝাড় আর গাছপালার আড়ালে বাঘ না থাকলেও ভালুক কিংবা বনবরা তো থাকেই। পথ আটকে থাকে বুনো হাতিও। হাতি স্থানীয় গ্রামবাসীদের কাছে কেবল হাতি নয়, ঠাকুর। চেপুলাল কি কাছে দূরে কোথাও সেই ঠাকুরের উপস্থিতি আঁচ করেছে? পাতপালা মাড়িয়ে, দুমড়ে মুচড়ে, ঝোপের মধ্যে কোথাও নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ঠাকুর?

কুঞ্জ দেখে চেপুলালের পিছন। তার পাঁজরার দুটো পাশ যেন কেউ একেকবার ফুলিয়ে ফের চুপসে দিচ্ছে। হয়ত পাহাড় থেকে সমতলে গাড়ি চালানোর ক্লান্তিতে সে হাঁপিয়ে চলেছে। এভাবে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে একটু জিরিয়ে নিতে চায় সে। নাকি সত্যিই কোনো জন্তু-জানোয়ার দেখে সে কাতর, সন্ত্রস্তও?

চেপুলাল, হাতের ছড়িটা নিয়ে, ধীরে ধীরে পাছা ঘষটে কুঞ্জর দিকে মুখ ফেরায়। পিচুটি বসা চোখদুটো, এখন, যেন হাড়িয়া খাওয়ার ফলেই রক্তিম। যেন এই জঙ্গলেরই ক্ষয়িষ্ণু এবং শেষতম অসভ্য প্রজাতি সে। একমুখ ভয়ঙ্কর ক্রূর হাসি নিয়ে, সে, কুঞ্জকে দেখে। আর বলে, 'হামি আর কৎদিন বাঁচব, হ্যাঁ কুঞ্জখুড়া? বাঁচব হামি?'

কুঞ্জ নিশ্চিন্ত হয়। হাতি নয়, বরা নয়, ভালুক নয়—কোনো জংলী জানোয়ার তার পথ আটকে দাঁড়ায় নি। দাঁড়ালে জানোয়ারের হিংস্রতা এবং গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেপুলাল কি পারে তার কেঠো গাড়িখানা লদপদ গতিতে ছুটিয়ে দিতে? হয়ত সে পারে। হয়ত গরুর ল্যাজ মুচড়ে দিয়ে, সে বলে উঠত তার গরুকে, 'চল্, হাইক্ যা! হাইক্ যা! টাক-টাক-টাক-টাআআআক্!' চেহারায় তার গাড়োয়ানিসুলভ ক্ষিপ্রতার কোনো আভাস না থাকলেও, কুঞ্জ জানে, শ্লা চ্যাপার ভয়-ডর নাই।

ভয়-ডর যত কুঞ্জর। নিজেকে নিয়ে, নিজের জীবনকে নিয়ে। অথচ

যেখানে, পাহাড়-জঙ্গলের পাদদেশে, সে গড়ে তুলেছে তার বসতভূমি, যেখানে তার আখচাষের জীবিকাও নির্দিষ্ট হয়ে গেছে বংশ পরম্পরায়, সেখানে থেকে ভয়-ডর পেলে চলে কি করে? জঙ্গলে থাকলে মানুষকেও জংলী হতে হয়। যার অনেকটাই হতে পেরেছে চেপুলাল। হতে পারে নি কুঞ্জ।

কুঞ্জ হতেও চায় নি। প্রকৃত আখচাষীর মতোই, সে, বছর বছর চাষের সফলতাটুকু নেবে, ভয়টুকুও সে নেবে। নিজের মতো করে, বুকের তলে তলে, গোপনে। আর চেপুলাল? কুঞ্জর সে ভয়েরই যেন প্রহরা। সে যেন তার আখের ক্ষেতে, জঙ্গলে, শালঘরে বিকট অগ্নিকুণ্ডের কাছেও এক অনিবার্য বর্ম। অথবা সে স্বয়ং ঢালও। যা দিয়ে সে প্রতিপক্ষ ঠেকাবে। তাই গাড়ির সম্মুখভাগে চেপুলাল। সে গাড়োয়ান। গাড়ির পশ্চাতে কুঞ্জ। সে তার যাত্রী।

মুহূর্তের উদ্বেগ মুহূর্তেই কেটে যায় কুঞ্জর। কপালের চামড়া তার ততখানি কুঁচকে ওঠার অবকাশ পায় না। এই বয়সে তার কাঁচা-পাকা লোমে ঢাকা বুকের ভেতরেও, ভেড়ার শুকনো অণ্ডকোষের মতো হুড়হুড় করে না হৃৎপিণ্ডটি। আর তাতেই তার ফাঁড়া কাটার আনন্দ, যা সে কৃপণের মতো চেপে রাখে। এবং চেপুলালের দিকে তাকায়।

চেপুলাল ঘাড় ঘুরিয়ে থেকে স্বস্তিতে বসতে পারে না। সে লুঙ্গি জড়ানো কোমরটা আরো একটু নড়াচড়া করে বলে, 'কই বৈল্লে খুড়া? বাঁচব? হামি আর কৎদিন বাঁচব বৈলে দাও ক্যান্নে?' ঢুকঢুক করে সে হাসতে থাকে।

আপাত অপ্রকৃতিস্থ চেপুলাল, এমন একটি চূড়ান্ত প্রশ্ন করে বসলেও, তার উত্তরদাতা কি কুঞ্জ? প্রশ্নের নেপথ্যে সে যেন দাবি করে বসে তার বেঁচে থাকার মোট দিনগুলি জেনে নিতে। সে ভেবে নেয় তার বাঁচা এবং মরে যাওয়াও পুরোটাই নির্ভর করছে কুঞ্জর ওপর। কুঞ্জরই ওপর।

কুঞ্জর চোখে আবার স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার মুহুর্মুহু কেঁপে ওঠা পাঁজরাগুলো। জ্যোতিষির মতো নিরাসক্ত তার দৃষ্টি। সে যেন সত্যিই তার শরীরের আড়ে-খাড়ে গেঁথে থাকা হাড়কটা গুনে, যোগফল কষে, একটা কিছু বলে দিলেও দিতে পারে। কিন্তু কুঞ্জ তা দেয় না। তার বহুশ্রুত এই প্রশ্নে সে তাকে উল্টে দাঁত কিচিয়ে দেয়। বলে, 'চুপ যা! চুপ, হারামী!'

চেপুলাল তখনো হাসে। বলে, 'হঁ, হামি চুপেই যাছি। লাও ক্যান্নে—' গরুর পিঠে সে তবলার মতো বাজিয়ে দেয়। গাড়ি ফের চলতে শুরু।

একটু বিরতি নিয়ে কুঞ্জ আবার নতুন করে বলে, 'তোর মরণ আছে, আঁই? শ্লা, ই-দুনিয়ার সবকাই মরে ফুঁরায় যাবেক, তবোও—' বাক্য সে সম্পূর্ণ করে

না। এদিক ওদিক, ধূসর গাছপালায় চোখ বুলিয়ে, সে তৎপর হয়ে বলে 'লে চাঁড়ে, গাড়িটা চলা। বেলা কৎটা হঁয়েছে ভাল ন উপ্‌রে।'

কুঞ্জর কথায় চেপুলালের সূর্যের দিকে তাকিয়ে বেলা আন্দাজ করার দরকার হয় না। তখনো তার সম্পর্কে কুঞ্জর শেষ মন্তব্যটি তাকে আচ্ছন্ন করেই রাখে।

আসলে, বাঁচা মরার প্রশ্নটি তার নিজের হাড়সর্বস্ব শরীরটার ভরে দাঁড়িয়ে থাকলেও, কখনো সে নিজের কাছেই নিজে ধন্ধে পড়ে যায়। হয়ত সত্যি-সত্যিই তার মরণ নেই। তা থাকলে পরে, বউব্যাটা নিয়ে এতগুলো বছর সে টিকে আছে এবং টিকে যাচ্ছেও কোন দৈব মহিমায়? সে তো কেবল কুঞ্জর গাড়োয়ান না? সে তার পারিবারিক চাকর—মুনিষ-হাল চালৈয়া—শাল রাখাদার কী নয় সে? ক্ষেতে-মাঠে-ঘাটে-ঝুড়ে জঙ্গলে সর্বত্র সে নিজেকে মজুত রেখেছে কুঞ্জর প্রয়োজনে। অযোধ্যা পাহাড়ের পাদদেশে বিশবিটাঁড়ে তার ঘর। ভোর ভোর সে বউ ভাবনি আর বছর এগার বয়সের ছেলে হীরালাল বেশরাকে ছেড়ে নদী পেরিয়ে ভুলভুলিতে এসে পড়ে। কুঞ্জর গ্রামে। আর আশ্চর্য! পথ হাঁটার ক্লান্তিও তার নেই। এই অমিত প্রাণপ্রাচুর্য কি তবে তার চিরকালীন বাঁচার তাগিদেই? আর মৃত্যুও যদি হয়, তাহলেও, সে চায় দায়মুক্ত মৃত্যু। হঠাৎ করে মরে গেলে, কে দেখবে কুঞ্জর আখের চাষ? শালের আগুনের সামনে ঠায় বসে থেকে, প্রহরের পর প্রহর ফুটন্ত রসের কড়াইয়ের গাদ কেটে কেটে, টিন টিন আখের রসকে কে রূপান্তরিত করবে ঝোলা গুড়ে, বজ গুড়ে, বালি গুড়ে?

চেপুলাল এবার সত্যিসত্যি সূর্যের দিকে তাকায়। তারপর হাতের বুয়ান ডালটা দিয়ে নিজের পিঠে সপাসপ কয়েকটা আলতো ঘা মেরে, সে, নিজের মতো করে গরুর পিঠেও ঘা লাগায়।

গরু দুটোও, চেপুর দেখাদেখি আলস্য নিয়ে, নড়ে ওঠে। গাড়ির চাকার শব্দে স্পষ্ট হয় সে আলস্য। 'চ্যাঁ-য়্যাঁ-বট্-বটাৎ-চ্যাঁ' শব্দ করতে করতে সেটা আবার চলে।

আবার ঢুল আসে কুঞ্জর।

'হাইক, হাইক। টাক-টাক-টাক—' গাড়ির গতি বাড়াতে, চেপুলাল, কখনো ল্যাজ মুচড়ে দেয়, কখনো চাবুক মারে। গাছে গাছে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে তার প্রতিধ্বনি। হাইক! হাইক। নিজের ঝুলন্ত পা দুখানিতে সে নিজেই ঠোকা ঠুকি খায়। আর একেকবার বলে ওঠে, 'হেই কুঞ্জখুড়া!

এখনো ঘুমাছই? উঠবে নাই? পাছে বিটিঘরে বিহাই তুমাকে গুঁন্দলু ঘাঁটার সঙে ভাঙ খাওয়াল?'

'হেই শ্লা, ভাঙ খাওয়াবেক ক্যানে?'

'না, বলি এত য্যা ঘুমাছ?'

'কুথায় ঘুমায়? আচকায়?'

'এই য্যা দশ ডাকে তুমার রা পাছি নাই। অমন তলমুখ করে যদি থাকবে ন, ত কৎক্ষণেই ভালুকে তুমার মুডটা ছিঁডে লিয়ে যাবেক। আর তুমি জানতেই পারবে নাই।'

এমন ধারার রসিকতায় কুঞ্জ জ্বলে ওঠে। পাল্টা সে বলে, 'আমাকে ভালুকে খাবেক? তকে খাক। শ্লা, গরক চণ্ডাল!'

'হঁ, একদিনকে তাও খোবোর পাবে—' চেপুলাল হাসতে থাকে। বলে, 'শুনবে লদীর ধারে মৈবে পডে আছি!'

কল্পনার চোখে সে নিজেই নিজের মৃতদেহ দেখতে পায়। বিশরিটাঁড থেকে ভোববেলা নেমে আসার সময় জংলী হাতি, নদীতে জল খেতে এসে তাকে তাডা করছে। তাবপর শুঁডে আছডে—!

'কিন্তুক হামকে ভালুকে খাইলে তুমার দশা কি হবেক? কে তুমাকে এমন করে গাডি চাপায় বিহাই ঘরকে নিযে যাবেক?'

কুঞ্জর চোখের মণিতে, চেপুলালের এই জিজ্ঞাসাটি কেউ যেন ঝুলিয়ে দেয়। এবং সেটা ঝুলতেই থাকে। যেভাবে গরুর গলকম্বলের তলায় টুং-টাং শব্দ তুলে ঝুলতে থাকে পলাশ কাঠের ঘণ্টাটি।

আব দাঁত কিচিয়ে ওঠে না কুঞ্জ। ধুতির নিচে, তলপেটে গুঁজে রাখা কাপডের থলিটা থেকে সে বের করে মেয়ের দেওযা গুডপিঠেগুলি। তার কযেকটা চেপুব দিকে বাডিযে দিযে বলে, 'হাই লে, মববি ত খাঁইযেই মর।'

চেপু এক হাতে করে পিঠে খেতে থাকে। মুখে গুঁজে গুঁজে। আরেক হাতে সে গরুর পিঠে মারে চাবুক। তারপর এক সময়, দুডদাড গতিতে গাডি ছুটিয়ে, কুঞ্জকে ঠেসিয়ে দেয় তার আখেব ক্ষেতের আল বরাবর।

শীতের শুরু।

সারারাত্তির বাতাস থাকে ভারি। মিহি ধুলোব মতো শিশির পরতে পরতে জমতে থাকে আখেব ক্ষেতগুলিতে। সেই শিশিরে ক্ষেতের মাটি

ভেজার আগে ভিজে যায় গাছগুলি। পাতাগুলি। রোদ যখন ফিনকি দিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন চকচক করে প্রতিটি সজীব পাতা। বাতাসে দোল খায়। আর রাতভর জমে থাকা শিশির, বৃষ্টির ফোঁটার মতো, অশ্রু-বিন্দুর মতো আরো দ্রুতি নিয়ে গলে গলে পড়ে। এ যেন প্রকৃতির আরেক রূপভাষ!

গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে ধুতির কাছাটা আটকে যায় কুঞ্জর। সে তৎক্ষণাৎ একপ্রস্থ গালাগাল করে নেয় চেপুলালকে। বলে, 'কৎবার তকে বলেছি—এই খঁচগুলায় কাপড় ছিঁড়ছে। পিটে দিতে তোর কিস্যার বাজছে?'

চেপু ডুব দেওয়ার মতো করে, গাড়োয়ানের জায়গা থেকে তলিয়ে যায়। তারপর দুটো হাত, দুটো হাঁটু, গর্দানের ওপর তার টলমল করা ভারি মাথাটি দুমড়ে মুচড়ে, গোটা শরীরটা নুইয়ে সে গরু দুটোর মধ্যিখানে হামাগুড়ি দিয়ে কুঞ্জর পাশটিতে দাঁড়িয়ে যায়। একবুক বাতাস, মুখের বাসি ও পচা দুর্গন্ধসহ ছাড়ে। এই প্রথম সে বুকের ভেতরে সারারাত আটকে রাখা বাতাস খালাস করে। আর বলে, 'পিটে দিব? ত পিটেই দিছি—' বলে, সে, ক্ষেতের বাইরে রাস্তার ধারে যেখানে বুয়ান গাছের ঝোপ, তার ভেতর থেকে একটা ভারি পাথরখণ্ড এমন ভঙ্গিতে নিয়ে আসে, যেন আর একটি কথা বললেই কুঞ্জকে সে সটান আঘাত করে বসবে। অতঃপর জড়ের প্রতি এক যুক্তিহীন আক্রোশ নিয়েই সে কাঠের পাটার গায়ে বেরিয়ে থাকা গজালটির মাথায় ঘা মারতে থাকে। ঠাণ্ডার দরুন, যে জড়তা ছিল তার হাতের রুগ্ন পাঞ্জায়, আঙুলে, তা ধীরে ধীরে কেটেও যায়। তারপর পাথর ফেলে দিয়ে, হাতের ধুলো না ঝেড়ে যখন সে ক্ষেতের দিকে চায়, তখন ক্ষেতের লাগোয়া পাহাড়ের পুরো পশ্চিম পাদদেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে প্রত্যুষ! পেকে ওঠা ইক্ষুদণ্ডের মতো, যা, ঈষৎ লাল ও হলুদে মেশামেশি।

ভাবলে কেবল বিস্ময় জাগে, এই ক্ষেতগুলোই কি ধূ ধূ করে রোদের তাপে? লাঙল ঘুরলে ফলার মাটি রুক্ষতা নিয়ে বাতাসের টানে ওড়ে? অথচ এখন? ক্ষেতের পাশে ক্ষেত। যতদূর চোখ যায়। হলদে হয়ে এসেছে প্রতিটি গাছ। পেকে খসে পড়ছে পাতাগুলি। এই পাকা ফসলের ক্ষেতটির দিকে তাকালে চোখ বড় শান্ত, শীতল হয়ে পড়ে। পাহাড়ের শীর্ষ জুড়ে সন্নিবদ্ধ জঙ্গল, যা পুরোপুরি সবুজ, আর তার ঢালে ঢালে, মালভূমি জুড়েও আবাদের প্রগলভতা—অদ্ভুদ বৈচিত্র্য নিয়ে উজ্জ্বল! এখন, রুক্ষতার কোনো স্থান নেই এখানে।

যত রুক্ষতা রয়ে গেছে চেপুলালকে ঘিরে। শীত যদিও ততোটা প্রকট হয় নি, তবু, ইতিমধ্যে খড়ি কাটতে শুরু করেছে তার গোটা গায়ে। এমন কি, যে-করার সে নিজের থাবার পাঁচ-পাঁচটা আঙুল দিয়ে আঁচড় কেটেছে পিঠে, ঘাড়ে, ঘাড়ের পিছন থেকে মেরুদণ্ড বরাবর, যে-করার সে হাতের ছড়ি দিয়ে চুলকেছে পিঠ—সমস্ত রেখাচিত্রগুলি এখন জীবন্ত হয়েই ভয়ঙ্কর করেছে রুক্ষতা। তার নগ্নতাও।

চেপুলাল জাড়ে কাঁপতে থাকলে, নিজের শরীরটাকে সে নিজেই রোদের দিকে সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে, আখের ক্ষেতের উজ্জ্বল রোদে চোখ তার ঠিকরে গেলে, সে যেন ঘাড়ে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে নেয় তার মাথাটি। এবং সেই একই জায়গায় এক শরীর নগ্নতা নিয়ে সে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবলেশহীন। স্থবির।

প্রকৃতি ইতিমধ্যে পাল্টে গেছে। অথচ চেপুলাল? তার স্থিতিজাড্য নিয়ে সে অনড়। তার নগ্ন বুকের উপরি-ভূমিকে কত ঋতুই না ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে যায়। গ্রীষ্মেও সে থেকেছে নগ্ন, এই শীতেও সে প্রায় নগ্ন। চেপুলাল দাঁড়িয়ে থাকে যেখানের সেখানেই।

ক্ষেতভর্তি পাকা আখ দেখে, কুঞ্জ যেন আলের মাটিতেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে! বাস্তবিক, সে খায়ও। আর সে-সময় নিতান্ত অসতর্কতা সত্ত্বেও তার নজরে পড়ে যায় পায়ে পায়ে স্পৃষ্ট ভূমিটুকু। সেখানে কয়েকটা ভুরভুরে ফুটো দেখে, সে বলে, 'হ্যাঁ চ্যাপা, রাতে পাছে ক্ষেতকে শিয়াল আসছে?'

'শিয়াল?'

'হঁ রে শালা।' কুঞ্জ খেপে ওঠে। পাহাড়ের শেয়াল তার ক্ষেতে ঢুকে পড়ার পিছনে হয়ত চেপুলালেরই আস্কারা রয়েছে।

চেপুলালও সেই মাটি দেখে। যেন সে দেখে কুঞ্জর দুটি পা। আর বলে, 'হঁ, এই ত। ঠিকেই ধরেছ। ই-গুলা শিয়াল-পাদাই বটে।'

'তাইলে?'

'তাইলে আর কি। আখ পাকলে শিয়াল ত আসবেকই। শিয়াল আসবেক, ঠাকুর আসবেক, পকা লাগবেক।' চেপুলাল হাসতে হাসতে বলে যায়, 'মাটি হছে রসমতা। তার ফল তুমি একাই খাবে? সবকাই খাবেক নাই?'

কুঞ্জ রাগতে গিয়েও রাগে না। হাতির প্রতি অসন্তোষ নিয়ে, সে,

চেপুকে কুকথা বললে না জানি তার পরিণাম কি হবে। প্রসঙ্গ পাল্টে সে ক্ষেতের ভেতর ঢুকে পড়ে। দুহাত দিয়ে, আখের খাড়া হয়ে থাকা গাছ-গুলিকে সে দুপাশে টালতে টালতে এগোয়। আর এদিক ওদিক লক্ষ করে বলে, 'ইবার তাইলে ঝুড়াঝুড়ি করলেই হৈল। লয়?'

'হঁ। পাইকে যখন গেছে, তখন যত চাঁড়ে চাঁড়ে গাছ ঝুড়ে নামাবে, তত চাঁড়ে চাঁড়ে তুমিও শালঘর ইস্টার্ট করতে পারবে। বঠে কি নাই?'

'বঠে।' কুঞ্জ এক মুহূর্ত থামে। আবার বলে, 'চাঁড়ে আর কুথায় হৈল? আশপাশের ক্ষেতগুলান নাই দেখতে পাছিস?'

'হঁ। সবকাই ঝুড়াঝুড়ি শুরু করে দিয়েছে বা। সহদেও দত্ত, রাধু, গোবিন্দ মাহাত—' চেপু পরপর কতগুলো নাম আউড়ে যায়, যারা প্রত্যেকেই স্থানীয় চাষী। তারা ইতিমধ্যে ক্ষেত কাটা আরম্ভ করেছে। অথচ কুঞ্জ? ক্ষেত কেটে আখের বোঝা নিয়ে সে করবেই-বা কি? এখনো শালঘরের চালটাই সে ছাইতে পারে নি। শালঘর হলে, তার মেঝেতে হবে বিশাল উনুন, উঠোনের একদিকে আখ কেটে এনে এনে পাহাড় করা হবে। আর উঠোনের মাঝে বসবে মাদলা—মাড়াই কল। এই সবকটা কাজ বাকি। অথচ সবকটা কাজই টুকুস টুকুস করে হলেও করে যেতে হবে চেপুলালকে। দিনভর খাটতে সে যখন আছেই, যখন সে খোরাকি পাবে, বাড়তি হিশেবে পাবে ঘরের এঁটো মাড়জল, জামবাটিতে বাসিপচা ভাত, ছেলে-বউয়ের খাওয়ার জন্য দুটো-একটা কাউ আখডাঁড়ি, তখন আলাদা মুনিষ লাগিয়ে, কুঞ্জ, কড়চের পয়সা খসাবে কেন?

'কই শুনলি। চ্যাপা—' কুঞ্জ পিছনে ঘাড় ঘোরালে, মুহূর্তের জন্য, চেপুলাল তার চোখের আড়াল হয়ে যায়। আখের গাছে গাছে, ঝাড়ে-ঝুড়ে ঢাকা পড়ে যায় তার শরীর। কুঞ্জর ডাকে, সে, শেয়ালের মতো গুড়খে গুড়খে আসে।

ক্ষেত থেকে বেরিয়ে, কুঞ্জ আবার গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ায়। আগের বাক্যটি সম্পূর্ণ করতে সে বলে, 'তোর বউকে খোরোর দে তবে। কাল-পরশু ল্যা ঝুড়তে হবেক।'

'ধরে লাও ক্যানে, খোরোর একরকম দিয়াই আছে। বস্‌সব-বস্‌সর তুমার যে কাম করছে তাকে লতুন করে তুমি কি খোরোর দিবে?' চেপুলাল ফক করে হাসলে, তার হলদেটে দাঁতে পেদো পোকা উড়ে বসে। সাথে-সাথ দাঁতে পালিশ মেরে দেয় সে।

চেপুর এমন জবাবে কুঞ্জ খুশিই হয়। সে বলেছেও ঠিক। প্রতি বছরই

এমনি সময়ে ভাবনি আর হীরালাল আসে তার কাজ করতে। তাও কি হালে হালে আসছে? সেই যখন হীরালাল ছিল ভাবনির কোলে, যখন ভাবনির স্তনের গঠন ছিল ডাঁটালো এবং কুঞ্জর সামনেই সে আদুড় গায়ে তাকে স্তন দিত। চেয়ে চেয়ে আড়চোখে দেখত কুঞ্জ। এখন সেই হীরালাল, নাবালক হলেও বাপের দেখাদেখিতে মাদলা ঘোরাতে শিখেছে। আর ভাবনি শুধু কাটাই করে। ক্ষেত থেকে সেই কাটাই করা আখের বোঝা গাড়িতে লাদিয়ে হারামী চেপুলাল, শালা চেপুলাল, গরক চণ্ডাল চেপুলাল 'টাইক্-টাইক্-টাইক্' করে গরু তাড়িয়ে শালঘরে ডাঁই করতে থাকে। ক্ষেতের কিছুটা অংশ সাফ হয়ে গেলে শালঘরে সে আগুন দেয়। মাটিকে গড় করে সেই অগ্নিকুণ্ডে লোহার জগদ্দল কড়াই বসায়। এবং পুরোহিতের মতো সেও আগুনের পাশে বসে। ঝাঁঝরা হাতে। সেই ছড়ানো কড়াইটি আখের রসে টই-টই করলে, চেপুলাল তাতে নিজেরই প্রতিকৃতি দেখতে পায়। তারপর জ্বাল খেয়ে, জ্বাল খেয়ে সেই প্রতিকৃতিই টলটল করতে করতে একসময় ভেঙে টুকরো টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এভাবে ছত্রখান হয়ে গেলে পর, রসও আর রস থাকে না। তা গুড়ের চেহারা পায়। যেন আগুনের তাপে, জ্বালায়, ঘামে আর শ্রমে নিজেকে নির্মূল অথবা একাকার করে চেপুলালই চেপুলাল থেকে পাল্টে যায় গুড়ে।

ওই পোড়া পোড়া গুড়ের গন্ধের জন্য সালভর অপেক্ষায় থাকে কুঞ্জ। ওই গন্ধ মানেই তার সূত্র ধরে মাছির মতো উড়ে আসে যত পাইকার। যত গুড়ের ব্যাপার। গুড়ের যোগান। গুড়ের টাকা। গুড় গুড়।

অভ্যেসবসত, কুঞ্জ, নিজের ঠোঁটদুটো চেটে নেয়। বলে, 'চালটা কৎটা বাকি আছে, ছাইতে?'

'নাই বেশি। কিন্তুক ফের শ-ট্যাক পুয়াল লাগবেক য্যা?'

'ক্যানে, পুয়াল ত আমার ঘরেই আছে? ভাঙা ঘরটায়?'

'স্যা ত আছে। কাল লিতে ঢুকলি ত খুড়ি বলল দিব নাই। বলল, শালঘরে পুয়াল দিলে গাইটাই কি খাবেক?'

'গাইটা? ধ্যেৎ বুড়বক।' কুঞ্জ বউয়ের প্রতি রাগটা সরাসরি চেপুর ওপর দিয়ে চালিয়ে দেয়। বলে, 'গাইটা আগে ন আমার শালঘরটা আগে? কই, ই-বিত্তান্ত কাল আমাকে তুঁই কই বলিস?'

'বলা মানে—শুধু পুয়াল ক্যানে—ঝাঁটিও ত লাগবেক?'

'ঝাঁটি লাগবেক? ত চল দেখি নদীর এপারটায় টুকু ডাঁড়াব। আজ সেনারনার হাট বঠে ন?'

'বঠে।'

পাহাড় থেকে সাঁওতাল মেয়েরা মাথায় মাথায় ঝাঁটির বোঝা নিয়ে নামবে। সেনারনার হাটে সে-ঝাঁটি বিক্রি করতে যাবে তারা এপথ দিয়েই। কুঞ্জ এখন সেই মুখে দাঁড়িয়ে, তাদের থেকে কয়েক বোঝা ঝাঁটি কিনে নেবে। চালে বসানোর জন্য। প্রচুর দামাদামি করে কিনে, সে, এই গাড়ি করেই আবার নিয়ে আসবে শালঘরে। তারপর সেখানেও সে দাঁড়িয়ে থেকে, চেপুলালকে চালের মাথায় ওঠাবে। মাঝে মাঝে বিড়িতে টান দিয়ে, চেপুকে গালাগাল আর নির্দেশ দিয়ে যাবে। চেপু একসময় ছেয়ে ফেলা চালের মাথা থেকেই দেখতে পাবে—তার চোখের মতো রক্তবর্ণ হয়ে উঠছে গোধূলির সূর্য! আর চালের নিচে ঠাণ্ডা হচ্ছে তার জামবাটি ভর্তি মাড়ভাত, শাক রাঁধা। পলাশ পাতে নুন।

গাড়িতে উঠে, চেপুলাল, নিজের পিঠে চাবুক মেরে গাড়ি ছেড়ে দেয়। তারপর সে গান ধরে—এপাশ-ওপাশ ঘাড় নাড়তে নাড়তে :

বাঁশপাতাটি সরু সরু
বেলপাতাটি কল্পতরু
শাগের পাতা কলমি লতা
অগাধ জলেও ডুবল না
দিলদরিয়ার মাঝে
ডুবে দেখরে অজব্ কারখানা

ঠাণ্ডা পড়ছে কুলু কুলু। তার ওপর কুয়াশা।

কোত্থেকে একটা কাঁথা ছেঁড়া জোগাড় করেছে চেপুলাল। সেটা পিঠে ফেলে, গায়ের ঠাণ্ডা বাঁচাতে টানাটানি করলে শরীরের বেশিটাই আঢাকা থেকে যায়। কোমর থেকে নাভির ওপর, এমন কি বগলের নিচের পাঁজরাগুলোও সে ঢাকতে পারে না। ভুরভুর করে বাতাস ঢোকে তল্লা দিয়ে। তার গোটা গা কাঁপে। কাঁটা দেয়। এমন ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতেই সে নদী পেরিয়ে এসেছে। এমন ঠাণ্ডায়, উপরন্তু, পরিমণ্ডল কুয়াশায় আচ্ছন্ন বলে কিছুই তার গোচরে পড়ে নি। গাছপালা আর ক্ষেতের আলে নাদ ফেলতে ফেলতে মাঠে যাওয়া কাড়া-গরু—এসবই এড়িয়ে গেছে তার দৃষ্টি। অথচ কি আশ্চর্য, কোনো দৃষ্টিসূত্র ছাড়াই চেপুলাল এসে পড়েছে কুঞ্জর ঘরের

দুয়ারে। অনেকটা কুকুরের মতো, স্বাভাবিক অথচ তীব্র ঘ্রাণশক্তি নিয়ে। সে, জাড়ে কাঁপতে কাঁপতে শিকল ঠুকতে থাকে। বলে, 'কুঞ্জখুড়া, কই উঠলে? কপাটটা টুকু খুলতে বল ন। এগো লতিকার মা—'

কুঞ্জর বউ, যে লতিকার মা-ও, কপাট খুলে দেয় তাকে। ভিতর ঘর থেকে কুঞ্জ প্রায়দিন একবুক কাশি নিয়েই ওঠে। কাশতে কাশতে, আব্দার করে বলে, 'আইসেছে শ্লা গরক চণ্ডালটা। ইযার মু দেখে আমাকে উঠতে হছে। আজ দিনটা কেমন য্যা যাবেক।'

উঠোনে এখনো ভোরের আবছা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চেপুলাল, যেন প্রকাশ্যে আত্মগোপন করে দু হাঁটু ওপরে রেখে জড়োসড়ো হয়ে বসে। আর কুঞ্জর এমন সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্বোধনে সে চোখ কচলাতে কচলাতে হাসে। সে জানে, গালমন্দই তার মনিবের কথোপকথনের ধরতাই। সে খুশি হয়। ঠাট্টা করে বলে, 'টুকু গঙ্গাজল ছেঁড়াবে নকি খুড়া?'

'গঙ্গাজল?'

'এই চণ্ডাল তুমার ঘরকে আইসেছে, তার হতেই।' চেপুলাল বসে বসে কয়েক পা হাঁটে। কড়চ থেকে শালপাতার চুটি বের করে লতিকার মাকে বলে, 'টুকু আগুনটা দাও ন আমাকে।'

'এখন চুলহাই ধরাই নাই!'

'ধরাও চুলহাটা। আর যদি কাঠ-মোটের জগাড় নাই 'ত বল ক্যান্নে হামি চ্যালা করে দিছি।'

লতিকার মা তার পায়ের কাছে কুড়ুলটা ফেলে দিয়ে যায়।

কুড়ুলের প্রতিটি কোপের শব্দে সরে সরে যায় ভোরের অন্ধকার। এভাবে কোপের পর কোপে, পলাশ কাঠের ফালিগুলো যখন ঢিবি হয়ে ওঠে, যখন তার গায়ে তৈলাক্ত ঘাম আর কোটরে ডুমো ডুমো চোখ চকচক করতে থাকে, তখন, সে-রকমই রাগ নিয়ে ওঠে দিনের প্রথম সূর্য। কুঞ্জর ঘরের সীমানার ভাঙা পাঁচিলের তলা থেকে, সূর্য যেন চেপুলালকে উত্তক্ত করে, দফে দফে তরতর করে উঠতে থাকে।

চেপুলাল, তাকে লক্ষ করেই হাতের কুড়ুলটা মাথার ওপরে উঁচিয়ে রাখে।

সেই কাঠ দিয়ে উনুন ধরানো হয়। গোয়ালঘরে বসে, চেপুলাল, ফুঁ দিয়ে দিয়ে লম্বা চুমুকে চা খেয়ে যায়। তারপর, চুটির ধোঁয়ায় সে অস্পষ্ট করে দেয় নিজের মুখ।

কুঞ্জ বলে, 'শ্লা, চুটি খাঁইযে খাঁইযে আঙরা হঁযে যাবেক তোর ফোপশটা। চল্ ইবার।'

'আর আঙরা হলেই মরণ? যমের রেজেস্টেরি খাতায় হামার সোব চুটির হিশাব আছে। একটি একটি। আজ তক্ক হামি কৎগুলা চুটি খাঁইয়েছি জান কুঞ্জখুড়া? এই ধরে লাও ক্যান্নে—' চেপু আঙুলের গাঁট গুনে হিশেব করে। বলে, 'এই শ-দুশ হাজার কাহন হবেক। ইযার ক-ন হিশাবেই নাই। ক-ন হিশাব নাই।' বলে সে চুটির শেষাংশ দাঁতে ধরে, গোয়াল থেকে গরুগুলো খুলে দেয। তাদের পাছায গুঁতো মেরে মেরে চৌকাঠের বাইরে বের করতে গেলে, গুঁতোর প্রতিঘাতে সে নিজেই কদম-দুকদম পিছিযে আসে। তারপর, একসময়, সে নিজেও গরুর মতোই খুরে চৌকাঠ মাড়িয়ে বেরিযে যায়। কুঞ্জর দুযারে পড়ে থাকা গাড়ির কাঠামোটাতে সে গরু দুটো দুপাশে জোতে। এবং কুঞ্জর সঙ্গে ধরাধরি করে শালঘরের জিনিশপত্রগুলো সে লাদিযে নেয় তার গাড়িতে। পালা ফোটানো বড় বড় কড়াই, খালি টিন, ঝাঁঝরা, গুড়ের ঢাকা এবং কুঞ্জকেও। তারপর? টাইক্ টাইক্।

'তোর বউ এৎক্ষণে আইসে গেছে? ন পাছে আজও ডেরি করছে? সকাল সকাল কাজে ঠেসলে তবে ন বেলাকে কাজটা জানাবেক। জাড়ের বেলা দেখতে দেখতেই ফুরায়।'

কুঞ্জ বলেছে ঠিক। শীতকালে রোদ উঠতে উঠতে আবার কখন যে রোদ মিলিযে যায় বোঝা যায় না। ছোট দিনের বেলা। সন্ধে হলো মানেই কাজও খতম। তখন না ক্ষেতে গিয়ে আখ কাটা সম্ভব, না শালঘরে মাদলা ঘোরানো সম্ভব। তখন সাত তাড়াতাড়ি কুঞ্জও যে ঘরে ফিরে যেতে চায়। খেযে-দেয়ে, কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিযে সে ছেলে-মেযে-বউ আর নাতিপুতিদের নিযে মাঝ উঠোনে আগুন জ্বালাবে। হাত পা সেঁকবে। রাতকহানী বলবে।

তেমন কোনো পারিবারিক জীবন চেপুলালের নেই। যদিও তার পরিবার আছে। এবং সে পরিবারের সঙ্গে তার মিলন ঘটে কেবল দড়ির খাটেই। তারপরও, পুরা দিনের ভেতরে, বউয়ের সঙ্গে, ছেলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ যে ঘটে না তা নয়। কিন্তু সাক্ষাতের প্রতিটি মুহূর্ত তৈরি হয কুঞ্জর উপস্থিতিতে। কুঞ্জর কারণেও। সেখানে কোনো ভাব বিনিময নেই, ব্যক্তিগত কথোপকথনের ফুরসত নেই। ফুরসত পেলেও, তাদের অলক্ষ্যেও কুঞ্জ যেন মূর্তিমান হয়েই থাকে।

চেপু মাঝে মাঝে একগুঁয়ে হয়ে যায়। মাঝে মাঝে কুঞ্জর কোনো কথারই জবাব সে দেয় না। কেবল গরু দুটোকে 'হাইট, হাইট। হিঁঈঈঈব্যা! লেঠেও লেঠেও! এমনি সব যিস-তিস অর্থহীন শব্দে চালনা করতে করতে সে আত্মস্থ থেকে যায়। তারপর কুঞ্জ যখন আরো চেঁচিয়ে ওঠে, যখন সে রাগে, নিজেরই ঘোৎনা দিয়ে ঝাপটা মেরে বাতাস কাটে, তখন চেপুলাল তার ট্যাসট্যাসে দাঁতগুলো দেখিয়ে শুধু হাসতেই থাকে।

এখনো, চেপু তেমনি হেসে উঠলে, কুঞ্জ বলে, 'মডার পারা হাসছেই, হাগছেই। পাছে তোর বউ আজ ব্যাটো ধেনাবেক।'

না, আর কোনো সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা ভাবনির নেই। এটা অবশ্য চেপুর অনুমান। তার একমাত্র ব্যাটা হীরালাল, এখন দশ বছরের। হীরালালের জন্মের পর দশ দশটা বছর সে ভাবনির সঙ্গে প্রায় নিয়মিত কাম-শ্রম দিয়েও, বিনিময়ে সে তার গর্ভে অঙ্কুরোদ্গম ঘটাতে পারে নি। যদিও সে কর্মসাধনে তার কোনো আকাঙ্ক্ষা বা অভিপ্রায়ও ছিল না। তবু, অপ্রত্যাশিত হলেও, সন্তানপ্রাপ্তির বার্তা তার মতো হাভাতে মানুষের কাছেও তো সুখের? বউয়ের প্রতি অংশত নিরাসক্ত মনোভাব নিয়ে সে চুর-চুর হেসে গলা ভিজিয়ে নেয়। বলে, 'হামার বউ ফের ধ্যানাবেক? ধ্যানাক ক্যান্নে, ধ্যানাক॥'

কুঞ্জর শরীর জুড়ে, চকিতে একটা আলোড়ন খেলে যায়। সেই আলোড়নকে সে নিজের মধ্যে খানিকক্ষণ মনে রাখতেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার কল্পনায় ভাস্বর হয়ে ওঠে ভাবনির সেই শরীর, যখন সবেমাত্র তার কোলে এসেছে হীরালাল। যখন সে নিপুণ মায়ের মতো যখন তখন ছেলেকে গুছিয়ে মাই খাওয়াতে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে নি। যখন শরীরে তার স্বাস্থ্য ছিল। যখন তার বুক—পাছা ও দাবনা একই ছন্দে মাংসের ভারে টলমল করতো—সেই বিরাট কড়াইয়ে সদ্য ঢালা পানার মতো।

'আর ইটা বুঝে লিয়ে খুড়া—' গরুকে খেদিয়ে, চেপুলাল, কুঞ্জকে ডাকে।

'কি বটে?'

'বলছি য্যা—' গায়ের কাঁথাটা টানাটানি করে সে বলে, 'ব্যাটা হোক আর বিটি হোক, হামার বউ যদি আখিরে ঠ্যাগায়, ত স্যাটা তুমারেই লাভ।'

'আমার লাভ? তোর বউ ধ্যানালে?'

'বঠে নাই?'

কুঞ্জ এখনো বুঝে উঠতে পারে না। চেপু তার বক্তব্য সরল করে বলে, 'হামার পারা উ-ও তুমার শালে কাম করবেক। এক চ্যালা যাবেক, ফের এক চ্যালা আসবেক। বঠে ন?'

বাস্তবিক, এমন এক অকাট্য কড়ার করেছে সে চেপুকে দিয়ে, যার এখনো পর্যন্ত অন্যথা হয় নি। এখনো পর্যন্ত কেবল চেপু না, ভাবনি না, কিশোর হীরালালও তার আশৈশব খাটোয়া তার মুনিষ। এরপরও যদি ভূমিষ্ঠ হয় তার নতুন প্রজন্ম, তাহলে সে-ও জন্মলগ্ন থেকে পাবে বসে টুবটুব করা আখঝাড়ের গন্ধ, শালে জ্বাল দেওয়া পানার গন্ধ, টিনে টিনে বিশুদ্ধ গুড়ের গন্ধ—যার একক মালিকানা কেবল কুঞ্জ মোদকের।

শালের কাছে গাড়ি ঠেসতেই কুঞ্জ দূর থেকেই দেখতে পায় ভাবনি কাজে লেগেছে। দাউলি নিয়ে ডাই করা আখের দণ্ডগুলো সে একেক কোপ মেরে আগা এবং গোড়া কেটে রাখছে। আগাগুলো রাখছে অন্যত্র, গাদা করে। এগুলো সে পরে গোবর জল মাখিয়ে ভিজে পাঁকে ফেলে রাখবে। তবেই সেগুলো সজীব থাকবে। এবং এই সজীব আগাগুলোই আবার পোঁতা হবে ক্ষেতে। চৈত্র-বৈশাখ নাগাদ।

হীরালাল এতক্ষণ চুষে চুষে খাচ্ছিল চাষের নতুন ওঠা আখ। কিন্তু চেপুলালের গাড়িতে কুঞ্জকে আসতে দেখে, সে তা ছুঁড়ে ফেলে দেয় গাদার মধ্যে। এখন সে হাতে মুখ মুছে সেই মুখ আবার গামছা দিয়েও ঘষে নেয়। তারপরও থেকে গেছে ঠোঁটের জোড়ে আখ চিবানোর টাটকা দাগ। আর এখন সে, ঘুরে ঘুরে, শালঘরের চালার সামনে বসানো মাড়াই কলটা আনাড়ির মতো দেখতে থাকে। কল এখনো ঘোরে নি। আজ থেকে তা ঘুরবে। আজ থেকে শুরু করে, যতদিন ক্ষেতের আখ থাকবে ততদিন ঘুরে যাবে মাদলা।

'মাদলা' হলো পিনিয়ন। প্রত্যেক মাড়াইকলে তিনটি করে পিনিয়ন যান্ত্রিক কৌশলে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ঢালাই লোহার এই বিশাল বিশাল মাদলাগুলোর প্রত্যেকটির ওজন একমণেরও বেশি। তাদের গায়ে সরু সরু খাঁজ কাটা। মাটির সঙ্গে সমান্তরাল একটি কাঠের খোঁটা দিয়ে মাদলাকে ঘোরানো হয়। সেই ঘূর্ণায়মান মাদলার ফাঁকে, একেবারে আখের খণ্ডগুলো ঢুকিয়ে দিলে তা পিষিয়ে যেতে থাকে এবং নিচে পেতে রাখা টিনের মধ্যে জমতে থাকে তার রস। এই রসই হলো পানা।

কুঞ্জ ডেকে নেয় হীরালালকে। ডাকে সে ভাবনিকেও। তারা সকলে

ধবাধবি করে গাড়ি থেকে টিন, কড়াই ইত্যাদি মালপত্র নামিয়ে রাখে শাল ঘরে। শালঘরে জল তো আছেই। মাটির বড় হাঁড়াতে। খাওয়ার জন্য, গুড়ের টিন আর হাত মুখ ধোয়ার জন্য, ভাবনিই এনেছে সে জল। প্রয়োজনে সে আবার আনবে।

গাড়ি থেকে মাল খালাস হলে, চেপুলাল গরু দুটোও খুলে নেয়। খুলে সে তাদের পিঠে চাপড় মারতে মারতে মাডাইকলের পাশে নিয়ে আসে। লম্বা খোঁটার দু'প্রান্তে বেঁধে দেয় এবং সে তাদের ল্যাজ মুচড়ে চালু করে দিলে, তারা বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে থাকে। ঘোরে মাদলাও। অথচ পানা পড়ে না। শালঘরে এমন নিষ্ফল মুহূর্ত তৈরি হয় না বললেই চলে। কুঞ্জ তাকে আর দীর্ঘায়িত করতে নারাজ। হীরালালকে তাই সে তাগিদ দিয়ে বলে, 'যা মুহা, মুহা সোব জিনিসগুলা।'

হীরালাল ফুর্তি নিয়ে ছোটাছুটি করে। সে খণ্ড করা আখের বোঝা দু' হাতে নিয়ে পেটে চেপে এগিয়ে আসে মাডাইকলের কাছে। চেপু টিন পেতে দেয়।

শালঘর এবং তার আঙিনার চারপাশটি পর্যবেক্ষকের মতো দেখতে থাকে কুঞ্জ। নতুন চালের ওপর ঠিকরে পড়ছে পুবের কাঁচা রোদ। নতুন বাতা, নতুন খড়, ঝাড়া উঠোন। চতুর্দিকে একটা কেমন পরিচ্ছন্নতা। অথচ এই পরিচ্ছন্নতা আর ক-দিনেই কেটে যাবে। যখন এমনি সকাল থেকে বেলা ডুবু পর্যন্ত মাদলা ঘুরবে, তার পাশাপাশি চালাঘরের মেঝেতে বড়মুখের উনুনে ফুটতে থাকবে গুড়—হাওয়ার দমকে দমকে ছাই উড়বে, গুড় পুড়বে—ডাবুতে ডাবুতে কড়াইয়ের গুড় টিনে আর টিনের পানা কড়াইয়ে ঢালতে গিয়ে চার-পাশটা কেমন চিটচিটে হয়ে পড়বে। আর তখন জমে উঠবে কুঞ্জর এই শাল ঘর। তখনই সে চট পাতবে তার কেঠো তক্তপোষে। লোকজন এসে বসবে। গুড়ের নমুনা চাইলে, বা না চাইলেও, সে পলাশ ডাল গুড়ের টিনে ডুবিয়ে খদ্দেরের চোখের সামনে লম্বা করে তুলবে। ভাবতে ভাবতে কুঞ্জ কি টের পায় তার ল্যাটপ্যাটে হাতে নোটের গোছা?

সেই ভেজা ভেজা তৃপ্তিপূর্ণ আমেজে কুঞ্জ গলা বাড়িয়ে দূরবর্তী শালঘর-গুলোর দিকে একনজর তাকাতে চেষ্টা করে। নগেন কুণ্ডু, বিরাম মাঝি, ছুটু দত্ত—সবার শালেই চাঁই পঁক করে ঘুরে যাচ্ছে মাদলার খোঁটা। জোড়া গরু। শালে শালে গুড়ও ফুটছে। বাতাস যেন অল্প অল্প করে ভারি হতে শুরু করেছে পানার কাঁচা গন্ধ আর গুড়ের গন্ধে। সেই গন্ধ আরো একটু পেতে,

কুঞ্জ তার লক্ষের ফুটোগুলো শূন্যে ভাসিয়ে রাখে। আর পায়চারি করতে করতে, মাঝে মাঝেই সে এসে দাঁড়ায় ভাবনির পিছনে।

মাদলা ঘোরাতে ঘোরাতে গান ধরেছে চেপুলাল। খোঁটার দুপ্রান্তে বাঁধা গরু দুটোর, কখনো সে মোলায়েম পিঠে হাত বোলায়, কখনো বা মুচড়ে দেয় ল্যাজ। আর তাদের অক্ষরেখা ধরে সেও ঘুরতে থাকে তাদের পিছু পিছু। ঘুরতে থাকে।

অবিরাম ঘুরতে থাকার ফলে, তাদের ঘুরে ঘুরে যে বৃত্ত রচিত হয়েছে, সে বৃত্তের পরিধি বরাবর পা ফেলে ফেলে ঘুরে গেছে চেপুলালও। এখন সেই বৃত্তই সে যেন উত্তরাধিকার সূত্রে চিনিয়ে দেয় হীরালালকে। এখন হীরালাল গরু ঘোরায়—আর ভাবনি, মাদলায় গুঁজে দেয় আখ। পানা পড়ে।

চেপুলাল, তার আখের ছিবড়ের মতো নির্ভার শরীরটা দিয়ে আগলে রাখতে চায় পানায় টইটম্বুর কড়াইটি। সে রাখেও তা। মাদলার পাশে জমে থাকা আখের ছিবড়ে, যা আবার আলাদা করে শুকনো হয়েছে, তা-ই সে উনুনে ঠেলে দেয় জ্বালানি হিসেবে। সেই জ্বালানির লেলিহান আগুন, চেপুলালের বুকের পাকা পাকা লোমগুলো অব্দি ধুঁড়সে দিতে চায়। তার বুকের লোমগুলো, বগলের গোড়ায় ময়লা জমা পুরু লোমগুলো তার শরীরের ঘাম আর বোঁটকা গন্ধ নিয়ে তেমনি থেকে গেলেও, কনুইয়ের ওপর থেকে হাতের এমনকি পায়ের কিছু কিছু লোমও ঝলসে গেছে আঁচে।

চেপুর কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। গায়ের লোম, মাথার চুল, আঙুলের নখরাজি - এসবই বুঝি তার শরীরের পটভূমিতে নিতান্তই প্রাচুর্য। এমন-কি, অন্তত এই মুহূর্তে, দুটো হাত এবং বুকের পাঁজরা বা গর্দানটুকুই যথেষ্ট। একহাত দিয়ে সে জ্বালানি ঠেলে দেয়, আরেক হাতে ঝাঁঝরা ধরে কড়াইয়ের পানা উথালিপাথালি করে। গাদ ফেলে। আর ঝাঁপ খাওয়ায়। আর পাঁজরায় সে শুষে নেয় যত উত্তাপ। কোনো একদিন তার এই উত্তপ্ত পাঁজরাগুলিই কি বজ্র হয়ে ফেটে পড়বে? এমন কথা চেপুলাল ভাবতে পারে না। তাই সব উত্তাপকে প্রশমিত করে, তার ম্যাডম্যাডে দাঁতগুলি হাসি আর উচ্ছ্বাসের ভাষা হয়ে ওঠে। হাতের ওই লম্বাটে ঝাঁঝরাটি নিয়ে, নিজের সঙ্গে নিজেই অনর্গল কথা বলে চলে। কড়াইয়ের তলদেশ থেকে, ঝাঁঝরাটিকে সে একবার চক্কর খাইয়ে লম্বভাবে আসমানে তোলে। তারপর

সেই ক্ষিপ্রতা নিয়ে, ফুটন্ত রসে ক্রমাগত চাপড় মারতে মারতে সে বলে, 'ঝাঁপ, ঝাঁপ দে! ঝাঁপ।'

তক্তপোষে বসে বসে বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে যায় কুঞ্জ। সে কেবল সৃষ্টিশীল রঙ দেখে চেপুলালের। শকুনির দৃষ্টিতে যখন সে দেখে মাড়ের মতো শাদা রঙ কেটে গিয়ে পানা ক্রমশ লালচে হয়ে উঠছে এবং তখনো ঝাঁপ খাইয়ে যাচ্ছে চেপুলাল, তখন সে তার হাঁটুর ভেতর হাঁটু ডুবিয়ে আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারে না। বসার মুদ্রা পাল্টে, সাময়িক অস্থিরতা নিয়ে, সে এক লোমশ দাবনার ওপরে আরেক পা, অথবা পায়ের ওপরে দাবনা রেখে উশখুশ করে। আর শরীরটা সামনে ঝুঁকিয়ে, বুড়ো কুকলাসের মতো সে ডাকে, 'হেই চ্যাপা! ভালবি ন—'

ঝাঁপের শব্দে কুঞ্জর ডাক সে শুনতে পায় নাকি?

'হেই শ্লা চ্যাপা—'

চেপুলাল তার আঁচে আর ঘামে চকচকে মুখ নিয়ে তাকায় কুঞ্জর দিকে। তখনো হাসে। আর শূন্যে তোলা ডান হাতের ঝাঁঝরার প্রতিটি ফুটো থেকে চুঁই চুঁই শব্দে পড়তে থাকে রঙদার পানা।

'আর কৎক্ষণ ফুটাবি?'

'রঙটা আসতে হবেক ন? এখুনি যদি ইয়ার জ্বাল বন্ধ করে দিই, ত মাল ঢের শাদা দেখাবেক। কাঁচা থাইকে যাবেক। আর কাঁচা মাল—'

'চুপ দে!' কুঞ্জ কাঁচা মাল সম্পর্কে তার মুখে কিছু শুনতে চায় না। সে কি জানে না, গুড় ঠিক ঠিক রঙ পাওয়ার আগেই তাকে নামিয়ে দিলে, সে-মাল যখন টিনে টিনে প্যাকিং হয়ে যাবে, তখন বর্ষায় তা গেঁজে উঠবে। অবশ্য তেমন মাল খদ্দের কিনবেই বা কেন? তারা যে কুঞ্জর থেকে চতুর। তারা যেমন কাঁচা মাল কেনে না, তেমনি মাল বেশি পাক খেয়ে খেয়ে কালচে হয়ে উঠলেও তা কিনতে চায় না। কালচে মালের দামও কমে যায়।

'গুড়ের রঙ হবেক কেমনটি?' জ্বাল খাওয়াতে খাওয়াতে, চেপুলাল, এক সময় চাটু উঁচিয়ে দেখায়, 'এমনটি। এমন সৈল্লা গাছের লাঠার পারা।'

হ্যাঁ, গুড়ের এই রঙ দেখে কুঞ্জ খুশি না হয়ে পারে না। এবং এই রঙের সঙ্গে, চেপুর উপযুক্ত উপমার প্রয়োগেও। সত্যিই গুড় চরকানো যে ডাবুটা সে ধরে থাকে, ওই কুকলাসটির তিরতির করা চোখের দিকে, তার রঙ প্রকৃতই সজনে গাছের গায়ে জমে ওঠা আঠার মতো স্বচ্ছ ও তকতকে।

কুঞ্জ জিভ চাটে, খুশিতে। সেই খুশির প্রকাশ ঘটে চেপুলালকে ধমকে

ওঠার মাধ্যমে। বলে, 'উটা আমাকে কি দেখাছিস, হ্যাঁহ্? ফের জ্বাল খাওয়াছিস ক্যানে?'

শেষ ছিবড়েগুলো জ্বলে নিঃশেষ হওয়ার মুহূর্তেও চেপুলাল, অবিকল তেমনি ভঙ্গিতেই তাকিয়ে থাকে কুঞ্জর দিকে। তেমনি হাতে তার গুড়ে লটপটানো ডাবু, ডাবু থেকে পতনশীল গুড়ের ধারা আর তির্যক দৃষ্টি নিয়ে আগুনের আঁচে তার চকচক করা মুখমণ্ডল।

গুড়ের গরম গরম সুমিষ্ট গন্ধ একবুক টেনে নিতে, কুঞ্জ, তার নাকের পিণ্ডটা আরো একটু সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

শালঘরের মাথা থেকে উঠোনেও, একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছে শীতের রোদ। আখের গাদায়। মাদলার খোঁটায়।

কুঞ্জ এখনো শালে আসে নি দেখে, যতটা পারে গুড় খেয়ে নিচ্ছে হীরালাল। ভাবনিও। পলাশ পাতায় অনেকটা করে ঘন গুড় এখন তাদের প্রাতরাশ। তারা শালঘরের চালার পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে থাকে। এই খেয়ে কাজ করতে করতে দুপুরে ফের বাসি ভাত, শাগ বাঁধা, যা জামবাটিতে কাপড় জড়িয়ে শালঘরে এনে রেখেছে ভাবনি। তারা গুড় চাটে আর একেকবার উঁকি মেরে কুঞ্জর আসার পথটি লক্ষ করে।

কুঞ্জর উপস্থিতিতে আখ ভেঙে খাওয়ারও বড় একটা অবকাশ থাকে না। গুড় খেলে তো সে কাঁই কাঁই করবেই। তবে খাবার জন্য সে তাদের মজুরি বাদেও দেয় প্রতিদিন দুটো মাঝারি সাইজের আখ। সব শালেই এই প্রথা।

ভাবনি সেই আখগুলোই জমা করে করে একদিন বোঝা বেঁধে বেচে দেয়। আর যে গুড়টুকু সে চেয়ে কিংবা তলপেটে লুকিয়ে নিয়ে যেতে পারে, সেটা সে ঘরেই রাখে। আগামী দিনগুলোতে একটু একটু করে খাওয়ার জন্য।

শালে গুড় নিয়ে কাজ করতে করতে চেপুর যে কি হয়েছে। সে না আখ খায়, না গুড়। যদিও সারা শরীরটাই তাঁর চিটচিটে হয়ে থাকে। গুড়ের ভাপ আর ছাইয়ে। মাথার চুলে জট পড়ে পড়ে মাথার ওপরে বিঁড়া হয়ে বসেছে। স্নান করার ফুরসৎটুকুও সে পায় না। পেলে হয়ত কাছের কোনো ঘাট থেকে যে দ্রুতগতিতে সে একটা ডুব দিয়ে আসে, তাতে গায়ে মাথায় লেগে থাকা গুড়টুকু শুধু গলে। ধুয়ে যায় না।

চেপুলাল এখন শালঘরে ঘুমোয়। টিনে টিনে ভর্তি গুড় সে পাহারা দেয়।

সকালে কুঞ্জ শালে এসে পড়ার ঢের আগেই সে ঘুম থেকে উঠে পড়ে। ভাবনি আর হীরালাল তখনো পর্যন্ত না এলেও, সে নিজেই একা একা কাজ শুরু করে দেয়। সারারাত শালঘরের ঠাণ্ডায় ঘুমিয়ে থেকে, অথবা ঘুমতে না পারলেও, নিজের সঙ্গে নিজের মোকাবিলার দরুন কোনো দুর্বলতার ছাপ সে তার সকালের কাম-কাজে রাখে না। যদিও, চোখের কোলে জমে পিচুটির দলা। থেকে থেকে সে কাশে। কাশির দমকে যেন মূল ধরে নাড়া খেতে থাকে তার বুকের হাড়গোড়গুলো।

ইদানিং একটু নিস্তেজ হয়ে পড়েছে সে। ঘুমও পায়। উনুনের পাশে বসে থেকে, ঝাঁপ খাওয়াতে খাওয়াতে, কখন যে চোখের পাতা দুটি নেমে আসে সে নিজেও টের পায় না। বগবগ করে ফুটে ওঠা গুড়ের শব্দেই তার তন্দ্রা কেটে যায়। অথবা, কুঞ্জই তাকে চেঁচিয়ে ডেকে দেয়। বলে, 'য়েই শ্লা চণ্ডাল! মু জুব্‌ডি খাঁইয়ে পড়বি য্যা কড়াইটার ভিৎরে।'

ঝাঁঝরা হাতে নিয়েই সে চনমন করে ওঠে। ম্লান হাসিতে মৃত্যুর আশঙ্কাকে অগ্রাহ্য করে যায়। ফের ধুঁকতে ধুঁকতে সেই একই রকমভাবে পানায় জাল খাওয়াতে থাকে।

গুড়ের পাইকারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসে কুঞ্জ। তাকে শালঘরে ঢোকার আগে, পলাশ গাছগুলোর পাশ দিয়ে আসতে দেখেই ওরা গুড়ের এঁটো পাত ফেলে মুখ মুছে নেয়। ভাবনি হাতে নেয় কোমরে গোঁজা দাউলি। আর হীরালাল 'হাইট্ হাইট্' করে গরুদুটোকে মাদলার খোঁটায় বাঁধার জন্য নিয়ে যায়।

কড়াইয়ের গুড় টিনে টিনে ভরে চেপুলাল, এখন ফের কড়াই বসিয়েছে জ্বালে। পানাভর্তি কড়াই এখনো ফোটে নি, এখনো তেমন জোরদার তেজে জ্বলে ওঠে নি মোটা মোটা পলাশের গুড়িগুলো।

'তরা এখনো কাজটা ইস্‌টার্ট করতেই পারিস নাই?' কুঞ্জ হীরালালকে বলে, 'কিস্যার লাইগে এত বেলায় শালে ঢুকেছিস, হ্যাঁহ?'

ওরা কিছুই বলে না। কাশির শব্দ তোলে চেপু। আর উনুনশালে বসে থেকেই সে যেন বুক উজাড় করে কাশতে থাকে। কাশে আর মুখভর্তি ভারি কফ তুলে সে জ্বালানির জন্য জমিয়ে রাখা আখের ছিবড়েগুলোর ওপর ফেলে।

গা ঘিন ঘিন করে কুঞ্জর। বলে, 'আচ্ছা অঘোরী ত। উঠে টুকু উ-পাশটায় যা ক্যানে।'

কতবার সে উঠে উঠে কফ ফেলবে? বুকের ভেতরে কদিন থেকে তার

এমন ঠাণ্ডা জমেছে যে কফ ফেলেও সে কূল পায় না। ওইটুকু খাঁচায় এত কফ আসেই বা কোথা থেকে! চেপুলাল ভেবে পায় না।

'রাতের বেলি বড় জাড় লাইগেছে। তার হতেই এমন কাশি।' বলতে বলতে চেপুলাল একটু থামে। ফের বলে, 'একটা কম্বল-তম্বল যদি থাকে ত দাও ন খুড়া। আর নাই যদি কম্বল, ত আ-র গটাকতক চট ছিঁড়াই আইনে দাও। রাতের জাড়টায় বোড়ো কাঁপায়।'

তার কোনো বক্তব্য কানে নেয় না কুঞ্জ। যে চটের বিছানাটা সে করে দিয়েছে, চেপুর জন্য, সেটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট। শীতকালে ঠাণ্ডায় কাতর হলে চলে? তাছাড়া অল্পস্বল্প ঠাণ্ডা-গরম বৃষ্টিবাদলা সহ্য করার সহজাত ক্ষমতা তো তারা জন্ম থেকেই পেয়ে যায়। তারা সাঁওতাল যে। জন্ম থেকে ঝুড়ে-জঙ্গলে মাঠে-ঘাটে ঘোরে, রাত কাটায়। রাতে কুঞ্জর শাল রাখা করে বলেই কি শালে বাড়তি জাড় এসে ঢোকে?

এতকথা না বলে, স্রেফ মুখ ঝামটা দেয় কুঞ্জ। আর পাইকারকে সে দড়ির খাটে বসিয়ে নিজে বসে তক্তপোষের ওপরে। তার টুকরো কাগজের গোছা, মুদ্রাশূন্য কাঠের ক্যাশবাক্স ইত্যাদি আগলে নিয়ে ধুতিতে লুকোনো বিড়ি এগিয়ে দেয় পাইকারের দিকে। বলে, 'মাল আপনি যখন খুজবেন আমার ঠিনে মজুত পাবেন। চায় দশ টিন লেন, চায় বিশ টিন লেন। তবে দরে আমি এক পসাও কমাতে লারব। ক্যানে ন, মাল আমার একনম্বর আছে। নিমুনা দেখে লেন ক্যান্নে—' সে বলামাত্র শরীর ঝুঁকিয়ে একটা টিনে সটান ঢুকিয়ে দেয় নিজের আঙুল। তর্জনিতে যে গুড় সে লটপটিয়ে তোলে, সেটা জোর করেই পাইকারের চেটোতে মাখিয়ে দেয়। বলে, 'খান। খাঁইয়ে দেখুন। এই মাল আপনি ছুটু দত্ত কি নগেন—কারো ঠিনেই পাবেন নাই। গুড়ের বতরটাই হচ্ছে ম্যান। আমাদের ওই চেপুলাল যা বতর বুঝে, অমন আর কে বুঝতে পারে?'

পাইকার চেপুলালকে দেখে। তাদের দেখাদেখি সেও তার কানে গুঁজে রাখা পোড়া বিড়িটা ধরিয়েছে। দাঁতে চিবিয়ে রাখলেও, অন্তত এই মুহূর্তে তাকে আগের মতো চনমনে ফুর্তিবাজ দেখায় না। অন্য সময় হলে সে কুঞ্জখুড়ার এককথার বদলে দশ কথা বলে ফেলত। কিন্তু এখন কথা বলার কোনো স্পৃহাই তার নেই। পারলে আগের কথাগুলোই সে প্রত্যাহার করে নিতে চায়। এখন চেপুলাল তার হাতের ভারি ঝাঁঝরাটার টানেই ঝুঁকে পড়ছে উনুনের দিকে। কাশছেও।

'ত ঠিক আছে, আশির দরেই পাকা। আমার পাঁচটিন মাল বারটার 'জয় শম্ভু'যে উঠায় দেন। পাক্কা ?'

'পাক্কা।'

ব্যস্ত পাইকার সটাসট নোট গুনে ফেলে দেয় কুঞ্জর কাঠের বাক্সর ওপর। কুঞ্জ সেগুলোই আবার থুতু দিয়ে গোনে। আবার গোনে। এবং পাইকার উঠতে চাইলেও, সে তাকে জোর করে বসায়। তাকে আবো একটা বিড়ি দিযে সে শুনিযে যায গুডের হালফিল বাজাবেব কথা। যদিও তার কোনো কথাই অজানা নয পাইকারের। সে তো আজকের পাইকাব নয। আজ প্রায আট দশ বছব ধবে এখান থেকে গুড সে পুরুলিয়ার বাজাবে নিয়ে যাচ্ছে। শুধু এখানে, এই তুলতুলি গ্রামেই না, তুলতুলির লাগোযা গ্রামের পর গ্রামে কেবল আখেবই চাষ হয়, গুড হয। এই গুড পুরুলিয়া ছাডাও বাঁকুডা-মেদিনীপুব-টাটা-চাণ্ডিল চলে যায়।

কুঞ্জ বলে 'গুডের ত এই সিজিন। এখন আমদানি আছে, যদি পঞ্চাশ-একশ টিন মাল আপনি ইস্টক করতে পাবেন, ত বর্ষাটার পবে পবেই দ্বিগুণ পোফিট পাবেন। বর্ষায় গুড কে খায় ?'

পাইকার হাঁ-না কিছুই বলে না। বিডিব শেষ টান দিযে সে উঠে পডে। যাবাব সময় আবার বলে যায, 'তাইলে বারটার জয শম্ভু ?'

'বারটাব জয শম্ভু।'

নির্ধাবিত সমযে জয শম্ভু বাস এসে দাঁডালে, কুঞ্জ খালাসি দিযে বাসের মাথায মাল লাদিযে দেয়। তারপর কডচের বিডি হাতডাতে হাতডাতে সে এসে ঢোকে শালঘবে।

শালঘবে যেন মাটি নেই। মাটির ওপরে গুড আর আখের ছিবডের একটা পুরু আস্তরণ। তার ওপব দিযে হাঁটা-চলা করতে কবতে তল পাযেও গুডের চাকডা লেগে থাকে কুঞ্জব। সেই পা নিযে তক্তপোষে উঠে পডে সে। আর আগেব মতোই শরীর ঝুঁকিয়ে চেপুলালকে ডগমগ হযে বলে, 'দিনকে দিন চিনির বাজাবে আগুন লাগছে। এখন গুডেই পসা। গুড ভিন্ন মানুইষের কাজ হবেক ক্যানে ? হবেক ?'

চেপুলাল কফ ফেলে। কাশিব শব্দে কুঞ্জর উচ্ছাস তার কানে যায না।

মাঝবাত্তিরে জঙ্গলের হাতি নেমেছিল আখক্ষেতে। যদিও ক্ষেতে এখন

আর তেমন আখ নেই। কিছু কিছু করে প্রত্যেকেই কেটে ফেলেছে। তাহলেও যা আছে, তাকে হাতির গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য প্রত্যেক শালঘর থেকে লোকজন ছুটে গেছে। মশাল হাতে নিয়ে, ক্যানেস্তারা বাজাতে বাজাতে। যেতে পারে নি কেবল চেপুলাল।

হাতি নামার খবর পেয়ে, কুঞ্জ আজ ভোরভোরেই শালে এসে হাজির। পলাশ গাছের সারির পাশ দিয়ে আসতে আসতে সে দেখে—চালের মাথা থেকে ঝুলন্ত চটের আড়াল তখনো তোলে নি চেপু। তখনো সে বুঝি ঘুমিয়েই আছে।

কুঞ্জ চেঁচাতে চেঁচাতেই আসে। যখন সে মাদলার কাছে এসে দাঁড়ায়, দেখে, তক্তপোষ থেকে বিছানার কুন্তলী নিয়ে মাটিতে পড়ে আছে চেপুলাল। আলুথালু হয়েছে তার ছেঁড়া লুঙ্গি। একটা কুকুর চেটে চলেছে তার তল পা দুটো। তার পিঠ, তার ঘাড়।

কুকুর দেখে সামনে আর এগিয়ে আসতে পারে না কুঞ্জ। দূর থেকে সে তাকে হাতে ঝাপ্টা দিয়ে তাড়াতে চেষ্টা করে। বলে, 'হাড়িক, হাড়িক!' বলতে বলতে সে, ভয় এবং সন্দেহ নিয়েই চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই শ্লা চণ্ডাল! আজ উঠবি ন নাই রে?'

কোনো প্রত্যুত্তর আসে না তার। কুকুরটি তখনো গা চাটতে থাকে চেপুলালের। আর পায়ে পায়ে আঁচড় কেটে সে উড়িয়ে দেয় উনুনের বাসি ছাই।

বাদশা ও মধুমতী

অমর মিত্র

ধ-বনি অপেরা যাচ্ছে মৌচুরিয়া। নদীর কূল ঘেষে দশমাইল হাঁটা পথ, তারপর জালবিলি মৌজার কাছে নদী পার হয়ে মৌচুরিয়া। পালা আরম্ভ রাত্রি নয় ঘটিকায়, পৌঁছে দুপুরবেলা পেট পুরে খেয়ে ঘুম। সন্ধে থেকে সাজন গোজন।

নদীর নাম সুবর্ণরেখা। এই পৌষের সকালে তা বালিভাসা। নদী খুব পুরোন, তা-এর কূল দেখলেই ধরা যায়। ধ-বনি অপেরার বয়স ও কম হলো না। অধিকারী নরোত্তম দাসের নিজের পার্টি, অর্ধেক শেয়ার তার, বাকি অর্ধেক ধ-বনি প্রাইমারি স্কুলের হেডমাস্টার মোহন মাইতির। অর্ধেক শেয়ার হোল্ডার হওয়ার কারণে সব পালার মুখ্য চরিত্রের অভিনেতাও এই মোহনকুমার।

আগে চলেছে ড্রেসার মেকাপ ম্যান ড্রেসবাক্স সমেত নরোত্তম দাস আর অন্য অ্যাক্টররা। অনেকটা দূরে দূরে তাকে অনুসরণ করছে সেন্ট ভুর ভুর টেরিকটনের চোস্ত পায়জামা পাঞ্জাবি আর নিউকাট পরা মোহনকুমার। কাঁধে পড়ে রয়েছে চওড়া পাড়ের কাশ্মিরী শাল, হাতে কমদামী সিগারেটের প্যাকেট। পাশে পাশে এবারের পালার মূল আকর্ষণ অভিনেত্রী মন্দাকিনী।

মন্দাকিনীর আসল নামটি জবা। মোহন মাইতির বুদ্ধিতেই লিফলেটে এই নামটি ছাপানো হয়েছে, লোকে নেবে ভাল, জবা মাজি কোন নাম হলো নাকি! ওই নামে লোকে ভীড় করবে!

এবার ধান হয়েছে ভাল। বানে যায় নি, শুখায় যায় নি, আশ্বিন কার্তিকের ঝড়েও যায় নি। তাই যাত্রা পার্টির বায়না খুব। হাইওয়ের ধারে, মফস্বলী গঞ্জে আসছে কলকাতার সুবিখ্যাত অপেরা, আর মৌচুরিয়া আটাঙ্গী অমর্দা, সাতমা জালবিঠিতে যাচ্ছে ধ-বনি অপেরা, দলং অপেরা, ঝাড়গ্রাম অপেরা, সাঁওতাল গ্রাম পায়রাচালিতে সাঁওতালি পালা আসছে পর্যন্ত সিংভূম-চাকুলিয়া থেকে কেননা ওইসব গাঁয়ে বাস ঢোকবার পথ নেই, গো গাড়ি এক নাগাড়ে চলার পথও নেই। ঝোরা ঝর্ণা, ধানক্ষেত নদী, সব পার হয়ে তবে ঢোকা যায়। আর দশ হাজারি বিশ হাজারি কলকাতার অপেরা আনার ক্ষমতাও ওদের নেই, সুতরাং বছর বছর যেমন যায় ধ-বনি অপেরা, এবারও যাচ্ছে তেমন। যাচ্ছে বটে, কিন্তু এবারের যাওয়ার একটু আলাদা মাত্রা আছে, নায়িকার ভূমিকায়, হাস্যময়ী লাস্যময়ী যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো রূপসী মন্দাকিনী। মোহন মাইতির দেওয়া এই বিশেষণ লিফলেটে ভুল বানানে ছেপে বেরোনর পর যেন সাড়া পড়ে গেছে। ধ-বনি অপেরায় 'ফিমেল' একবার মাত্র এসেছিল, সেই বছর পাঁচেক আগে, কিন্তু প্রথম রাত্তিরের পর তাকে দূর ক'রে দেয় অধিকারী, পালার নির্দেশক নরোত্তম দাস, না পারে গান গাইতে না পারে কোমর দোলাতে, জড়োসড়ো, মুখস্থ ডায়ালগ-ই ঠিক ঠিক বলতে পারে না। এর চেয়ে শ্যামল দণ্ডপাটই ভাল। অপেরার জন্ম থেকে ফিমেল সে নিজে, কণ্ঠস্বরটি বাদ দিলে কে বলবে না সে ফিমেল, বুকে দুই নারকেল মালা চোখে কাজল ঠোঁটে রঙ মাখিয়ে সে যেন ফিমেলের উপর, রঙ ঢঙ কী! কিন্তু এবারে আর তা চলল না। মৌচুরিয়া থেকে সতীশ বেরা এসেছিল অম্রাণের মাঝামাঝি কনট্রাক্ট করতে। ব'লে গেছে ধান মার খেলনি, ইবারে টাকা বরং বাড়ায়ে দিবো, কিন্তু ফিমেল চাই, দাড়ি গোঁপ কামানো দঁড়পাটের নাথ নাথ বুলে চিৎকার লকে শুনবেনি দাস মশায়। গাঁয়ে ভি ডি ও ঢুকতো আরম্ভ করিছে, ডায়নামো দিয়া ভি ডি ও দিখানো হলো অমর্দায়, পাঁচ কানিয়াতে হয়ে গেল গিরাউণ্ড সিনিমা, দু দিনা চারটা উত্তম সুচিত্রার বই। সত্যিকারের ফিমেল আনুন, আমরা পালায় ডায়নামো লিয়ে আসব।

অম্রাণের সেই সময়ে নদীর তীর জুড়ে গ্রাম গ্রামান্তরের মাঠ সোনা হলুদ, ধান পেকে টসটসে ভারটি শুকিয়ে যাওয়ার মুখে। সেই ধান কাটা প্রায় শেষ, কোথাও এখনো কাটা চলছে। নামাল খাটতে যাওয়া পরিবার হাত গরম ক'রে ফিরছে ঘরে, ধ-বনি অপেরা যাচ্ছে মৌচুরিয়া। অপেরা পৌঁছলেই এত ফসলের গরম একটু ঠাণ্ডা হয় বটে।

॥ '২ ॥

ফিমেল চাই। এ দাবী নরোত্তম বলেছিল তার অপেরার লোকদের।

অপেরার সকলে চাষীবাসী মানুষ। আশ্বিনের মাঝামাঝি থেকে যখন মাঠ নিয়ে নিশ্চিন্ত, নিষ্কর্ম, রিহার্সাল আরম্ভ করে। কার্তিকের শেষ পর্যন্ত বা দরকারে অঘ্রাণেও গড়িয়ে যায় রিহার্সাল। তারপর তো ধান কাটা শুরু। কেউ নিজে নেমে পড়ে কাস্তে হাতে মজুর কামিনের সঙ্গে। কেউ বা মাঠের ধারে ব'সে তদারকি করে, ঠাট্টা ইয়ার্কি চলে কামিন মজুরের সঙ্গে। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বিড়ি ধরায়, ডায়ালগ আওড়ায়, 'শুনো শুনো কনিয়া, আমু দিল্লির বাদশা, অসমুদ্দরো হিমেচল আমোর বুকির ভিতরে, তাই লিয়ে আমু তুমার পনয় পাখী, তিষণা মিটাবেনি?'

ডায়লগের ছিরিতে হাসতে হাসতে ধানে গড়িয়ে পড়ে যুবতী কামিন, মজুর ঠায় দাঁড়িয়ে বলে' 'উরম ভাষা বললে হবে নি মাইতি বাবু, বাদশার মত বলো।'

হা হা করে হাসে প্রাইমারি মাস্টার মোহন মাইতি, 'লগড করছিলাম'।

মজুর নবীন সিং এর বউ কুসমি ধানের গোছা বাঁধতে বাঁধতে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায়, কালো টসটসে মুখ এই শীত সকালে ঘামে একাকার, যেন বিন্দু বিন্দু শিশির ধ'রে আছে নাকের পাটায়, চওড়া কপালে, গলার কাছে বুকের খাঁজে, হেসে জিজ্ঞেস করল, 'কি পালা হইছে ইবার মাস্ট'র বাবু, কি পালার ডায়লক দিচ্ছ?'

মোহন মাইতি তার দিকে তাকিয়ে আবার ডায়ালগ আওড়ায়, 'আমু তুমার পনয় পাখী, তিষণা মিটাবেনি পালার নাম দিল্লির বাদশা।'

টলটলে শিশির বিন্দু যেন হাওয়ায় ধানের ডগা থেকে চলকে মাটিতে পড়ে, হাসি চাপতে চাপতে কুসমি বলে, 'দিল্লির বাদশা ইখন নাই, উর অবস্থা খারাপ, ইখানের বাদশার কথা বুলো।'

মোহন মাইতি গম্ভীর হয়, ইখানের বাদশা তো লালপাট্টি।

—উয়াদের ডায়লক বুলো। নবীন সিং ও বউ এর সঙ্গে মসকরায় যোগ দেয় ধানের গোড়ায় কাস্তে চালাতে চালাতে, 'মিটিন হলো শুনোনি, দিল্লির বাদশা যায় যায়।'

মোহন মাইতি উঠে দাঁড়ায়, রসের কথা রাজনীতিতে গিয়ে মিশছে, সে আল বেয়ে হাঁটতে থাকে, বলে, 'উয়াদের ডায়লকে পনয় ভালবাসা নাই, রস-

নাই, শুধু লডাই আব লডাই, শুন ইবার ফিমেল আসছে, লডাই উযাব সঙ্গে হব্যা।'

ফিমেল! দাঁডিযে পডেছে আব সব মজুব কামিনও। মোহনের এখানে এক লপ্তে ছ'বিঘা জমি। জমি তাব সর্বমোট তিবিশ বিঘা, তা বাদে পুকুর ভিটেবাস্তু পতিত মাটি তো আছেই। বর্গা হযেছে মাত্র পাঁচ বিঘায়। নিজে দাঁডিযে থেকে বাকি পঁচিশ বিঘার বর্গাদার উচ্ছেদ করেছে অনেক কায়দায। সে এখন আল ঘুবে ঘুবে সব জমিতেই যাবে। ফাঁকি মাবছে কিনা মজুব কামিনে তা দেখ ভাল কববে। আব হ্যাঁ, খবর দেবে ধ-বনি অপেরায় এবাব নাবী চবিত্রে ফিমেল, ফিমেল বোলে ফিমেল। নবোত্তম দাস গেছে বালিচক, কনট্রাক্ট ক বে ফিবল ব'লে, 'লে লে সাফ ক'র্যে ফেল, ফিমেল এস্যা গেলে মোব আর টাযেম হবেনি ধানেব হিসাব নিযার, পালা ইবাব সুপার হিট।'

অবাক খবব! মোহন মাইতিব কথায সব মজুব কামিনের হাত থেমে গেছে। আঁচলে গলা মুছতে মুছতে উঠে দাঁডিযেছে কামিনেব দল নানান জমিতে। তাদের গাযে খড শিশিব মাটি একসঙ্গে ঘামে জডিযে গেছে। ঘাম টসটসে ধান গন্ধ নিযে পর পব সব যেন উঠে দাঁডাতে থাকে, 'উ মাস্ট'র বাবু, সাচ বুলছো?'

॥ ৩ ॥

'—হাঁ হাঁ সাচ বলছি, জবামাজি সুন্দরী, গাযেব রঙ ধলা, কলাপাকার মত, চব্বিশা অঘ্রাণ আসব্যা। বিহাস্যালে।' বলল, 'নরোত্তম দাস, বালিচক কনট্রাষ্ট করে সে ফিরল এই শেষ বাসে।

—'তুমি চিনতা আগে।' জিজ্ঞেস কবল চাযে চুমুক দিতে দিতে মোহন মাইতি।

—'যখন খড্গপুবেব শিল্পীচক্রে ছিলাম, তখন উযাবা দুই বুন এস্যাছিল আকটিং কবত্যা, সে ধরে। দশ বছব আগে, জবা চামেলি দুই বুন, ষোল সতেরো বযস ছিল, দিখেছিলাম সেই বড বন্যার পবের বছব।'

—'তাহলে তো ইখন বযস অন্যাক! চলব্যা?' সন্দেহ প্রকাশ করেছে মোহন।

—'খুব চলব্যা, উ বয়সেব মেয্যা ইখন পাব কুথায, বিহাস্যালে আসুক দিখবে তখন, বুঝতেই পাববেনি চাষা ঘরেব মেয়্যা।'

নবোত্তম দাস তাব পুরোন ডাযেবি ঘেঁটে নাম ঠিকানা বের ক'বে চ'লে

গিয়েছিল বালিচক। চাষা ঘরের মেয়ে বাপ বিছানায় শুয়ে, তাই দুই বোনকে তখনই যাত্রাপার্টি ধরতে হয়েছিল। অনেকবছর কেটে গেছে। এখন দু'জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। চামেলির অনেক দূরে, নাড়াজল এ। জবার ওই বালিচকেই।

—'বিয়া হয়ে গিইছে। ক্র কোঁচকান মোহন মাইতি।'

—'তা তুমরা পাঁচ হাজার দশ হাজার দিতে পারবেনি, ইদিকে চাও টাটকা ফিমেল, তা তো হাওয়ার লয়।'

অন্ধকারে তাকাল নরোত্তম। জবা মাজিকে চলবে, ভালই চলবে। তার সেই বিছানায় শোয়া বাপ এখন বেঁচে নেই। দুটি ছোট ভাই বড় হয়েছে, তারা ক্ষেত মজুরি করে। জবাচামেলির বিয়ে না হলেও ধান কেটে ধান কষে পেট চালাতে হতো। কিন্তু বিয়ের পর জবারই বা দিন যাচ্ছে কিভাবে। স্বামী ময়দাকলে কাজ করে, তা এখন বন্ধ। নরোত্তমকে দেখে ঠিক চিনতে পেরেছে, বলল, 'কাকাবাবু পারব খুব, করছি তো ডেবরার এক পার্টিতে তবে উদের বায়নাকম, নোতন দলতো, ধ-বনি অপেরার তো নাম আছে, কি ব'ম বায়না ইবার?'

—'বিয়া অলা ফিমেল, দাস ই ঠিক হলোনা, নাচতে পারব্যা? গান করত্যা পারে। রোমান্টিক সীনে জড়ো মতো হয়ে থাকবেনি তো!' মোহন খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে।

—'সব বুলে এসেছি, কী করত্যা হব্যা।'

—'লাগবে কত?' জিজ্ঞেস করল মোহন মাইতি।

—রিহার্স্যালের দিন তিরিশ ইবাদে টিফিন আর দুফরের মিল, দুপিঠের বাস ট্রেন ভাড়া, আর পালার জন্য পঞ্চাশ, টিফিন মিল আর বাসট্রেন ভাড়া তো দিতে হব্যা, সব মিলে শ'ট্যাকার উপরে যাবে।

তাহোক, এখন জবা মাজিকে চোখে দেখার দরকার। মোহনমাইতি চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ফিগার কিমন, গায়ে মাংস আছে তো?'

—শ ট্যাকায় যা পাওয়া যায় তার চেয়্যা খারাপ লয়, বরং ভালই। নরোত্তম দাস অন্ধকারে পা বাড়ায়। তার চিন্তা আসবেতো, টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে দশ, না এলে ওটা লস, এছাড়া তার আজ বালিচক যেতে আসতে খরচ কম হয়নি। একশো টাকা একটু বেশিই খরচ হচ্ছে। আরো কমদামী ফিমেল খোঁজ করলে পাওয়া যেত হয়ত। কিন্তু এখন আর সময় নেই।

॥ ৪ ॥

মোহন মাইতি কেন নবোত্তম দাস পর্যন্ত অবাক বাস থেকে জবা মাজি আর তার স্বামী ননীগোপাল নামতে। জবা যদি হয় চাঁদ, ননীগোপাল তার কলঙ্ক। একদমই মানায়না। আর নরোত্তম যেদিন কনট্রাক্ট করতে গিয়েছিল সেদিন এই চাঁদের চোদ্দ কলা পূর্ণ হয়নি যেন আজ একেবারে পূর্ণিমা লেগেছে জবা-মাজির চাঁদ অঙ্গে।

শুধু মোহন মাইতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেল করল, 'উটিকে, সঙ্গে ?'

নবোত্তমের কাছে জবাব পেয়ে মোহন বিড়বিড় করল, 'গার্ড লিয়ে এস্যাছে, উ স্বামীর সামনে দিল্লিশ্বরের গলা বেড দিতে পারব্যা ?'

নবোত্তম কথা ঘুরোয় 'কিন্তু ফিমেল কিমন, পছন্দ হইছে ?'

—'তা হইছে তবে উ মর্কট সঙ্গে এল কেনে ? মোহন কথা বলতে বলতে জবা মাজির এক এক অঙ্গের সুষমায় এক একবার মুগ্ধ হয়।'

কুঠিঘাট সুবর্ণরেখার সেতুর উপরে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে স্বামী স্ত্রী। স্বামী দেখছে নদীর বালির ঢেউ, স্ত্রী দেখছে দূর পশ্চিমে জেগে থাকা সিংভূমের পাহাড়ের নীল। জবাকে লাগছে ঠিক বড় ঘরের মেয়ের মত। এস ডি ও সাহেব একবার তার শালি নিয়ে এসেছিল এই নদী দেখাতে। সেই রূপসীর ছিরি ছাঁদ যেন একেবারে জবার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে পিছন থেকে। দ বলেছিল নবোত্তম, কলাপাকার মত রঙই বটে, তাতে হলুদ ফিনফিনে ব্লাউজ মানিয়েছে বেশ, ভিতরের কালো অন্তর্বাস ফুটে বেরোচ্ছে। দলামলা পাট সিল্কের হলুদ শাড়ি, কমদামী কিন্তু জবামাজির গায়ে উঠে যেন তার দাম বেড়ে গেছে। ধ-বনি অপেরার দামও এবার বাড়বে। বাড়বে তো বটেই, যেমন আশঙ্কা করেছিল মোহন মাইতি তা নয়, গায়ে মাংস আছে ঢের, তাকালে চোখ যেন কাঁঠালের আঠায় আটকে যায়। মোহনের সন্দেহ ছিল, সেই বছর পাঁচ আগে পরীহাটি থেকে যে ফিমেল এনেছিল নবোত্তম, তার মত হবে হয়ত। সে মেয়ের না ছিল রূপ, নাছিল অ্যাকটিং-এর ক্ষমতা। তবু তাকে ঘষে মেজে তৈরি করছিল নবোত্তম, রিহার্সালে যতবার বলো আসবে, শুধু বাস ভাড়া খাওয়া আর পাঁচটাকা দিলেই হবে। কিন্তু ফার্স্ট নাইটের পর তাকে দূর করে দিয়েছিল নবোত্তম, কেননা সে নাকি কেঁদে পড়েছিল তার কাছে, মাইতি বাবু পালার পর জঙ্গলে ডেকেছিল তাকে। ডেকেছিল মোহন, তবে সকলের সামনে তো নয়।

নরোত্তম মোহন মাইতির কাঁধে হাত দিল। 'ইবার তুমি কিন্তু অ্যাকটিং ছাড়া অন্য কথা বলবেনি, অপেবার বদনাম হঁই যাব্যা!'

মোহন নিঃশব্দে হেসে অন্যদিকে ঘুবে তাকায। নরোত্তম এই ভয়ে ফিমেল আনা বন্ধ কবেছিল। অভিনয যে একটা আর্ট তা মোহন মাইতির বুঝবাব সময নেই। সে টাকা ঢালে অপেবার পিছনে, তাব নিজস্ব মতামত অন্যের দ্বাবা প্রভাবিত হতে যাবে কেন? যতই বলুকনা নরোত্তম শিল্পীচক্রের ডিবেক্টব নির্মল পাল কী বলেছিল, নট্টকোম্পানির মাখন নট্টই বা একবাব কী উপদেশ দিযে ছিল তাকে।

নবোত্তম ডাকল হেঁকে, 'এস হে, টিফিন কর্যা পাচ মিনিট রেস্ট লিযে লাও, নদী দিখলে তো চলবেনি, তুমাব অ্যাকটিং চলবে কিনা আগে তা দিখাব দবকাব, আমি অ্যাকটিং চাই।'

নরোত্তমেব কণ্ঠস্বব একটু ভাবীই। একদম ঢিলে দেওয়া চলবে না। টাকা উশুল কবে নিতে হবে খাটিযে। ফিমেল আর্টিস্ট একটু ফাঁক পেলেই সুযোগ নেবে। তা যেন না নিতে পাবে।

নবোত্তম আবাব কণ্ঠস্বব ভাবী কবে, 'আসাব কথা একজনের, এল দু'জনা, দুটা মিল টিফিন তো লাগবেই, দাম কাটাব কথা, তবে কাটবোনি, বদলে রিহার্স্যালটা বেশি সময ধর্যা হোক, তিনটাব জাযগায় পাঁচটা পর্যন্ত, শেষ বাস খড়্গপুর যায় পাঁচটা পনেরোয়, উতে গেলেও লাস্ট ট্রেন পাব্যা।'

শেষ কথাটায ভীতমুখে আগে ঘুবে দাঁড়ায ননীগোপাল, পরে তার বউ। বউ এগিযে এল, ননীগোপাল ভীত ধীরপায়ে বেশ তফাতে।

- 'কথাটা কানে যাচ্ছে, টাযেম নষ্ট কবছ।' নবোত্তম আবাব দাবড়ে দিল।

জবা বলল, 'ইদিকটা চিনা নাই তো, একা আসত্যা দিতে উর ভয কবছিল, পাঁচটা পর্যন্তই রিহার্স্যাল দিবো দাস মশায. তবে যদি পাবেন দুপিঠেব না হলেও উর এক পিঠের ভাড়াটা যদি দেন, একা মেযেমানুষ, প্রথম দিন আসতে দেয কি কবে ইটা ভাববেন তো!'

নবোত্তম ফিবল মোহন মাইতির দিকে, 'দিখলে, ফিমেল মানেই টাকা আদায, কনটাক্ট হলো একজনের ভাড়া দিবো, ইখন বলছে উযার সোয়ামীবও লাগব্যা, চলো চলো আগে পার্ট বলো দেখি।'

নরোত্তম জোব পাযে হাঁটে প্রাইমাবি স্কুলেব দিকে। জবা মুখ কালো করে একবাব পিছনে ফিবে তাব স্বামীকে দেখল, তাবপব হাঁটতে লাগল

নরোত্তমের পিছনে। তার পাশে হাঁটতে আরম্ভ করেছে মোহন মাইতি, প্রথমেই বিনা ভূমিকায় বলল, 'ভাড়া দিয়া যাব্যা, তবে ল্যাংবোট লিয়ে আসা তুমার ঠিক হয় নাই, দরকারে আমি গিয়ে লিয়ে আসতাম।'

জবা ভীরু চোখে মোহনের দিকে তাকায়, চোখের দৃষ্টিটা একটু ধারালো এই মানুষটার তবে তার উপর সহানুভূতিশীল, তাই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি পালায় আছেন?'

—'হঁ্যা, হীরো, মোহন মাইতি আমার নাম, পালায় দিল্লিশ্বর, তা তুমার মুখখানি কিন্তু মন্দাকিনীর মত, উ নামেই লিফলেট ছাপব, জবা নামে চলবেনি।'

জবা চট করে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল ননীগোপাল কত দূরে। সে মোহন মাইতির কথার জবাব না দিয়ে মুখ নিচু করে হাঁটছে।

॥ ৫ ॥

মোহন মাইতি কমদামী ফিল্টার সিগারেট বাড়িয়ে ধরল নরোত্তমের দিকে, বলল, 'লিফলেটে মন্দাকিনী নাম ছাপা হব্যা, নামেই আসর ফাটব্যা।'

মাথা নাড়ল নরোত্তম, 'উহুঁ, মুখখানি ঠিক বৈজয়ন্তী মালার মত, নাম দাও বৈজয়ন্তী, কুমারী বৈজয়ন্তী।'

সজোরে মাথা ঝাঁকায় মোহন, 'তুমি মন্দাকিনীর বই ছাখোনি, তাই বৈজয়ন্তীমালার কথা বুলছ, রাম তেরি ।'

পাশের ঘরে তালপাতার চাটাই এ তখন মুড়ি চপ পিঁয়াজ আর আখের গুড় নিয়ে বসেছে জবা ননীগোপাল। ননীগোপাল খুব ভয় পেয়ে গেছে। নরোত্তমের কথায় গুটিয়ে গেছে কেন্নোর মত, বউকে বলছে। 'তাড়াতাড়ি খেয়ে কাজে বসো দেখি, বাবুরা এমনি এমনি ট্যাকা দিবেনি।'

সে কথা নরোত্তম শুনেছে। যেন নরোত্তম কে শোনানোর জন্যই গলাটা একটু জোর করেছিল ননীগোপাল, 'তুমি কাজ ঠিকমত করলেই তো দু পাঁচটাকা বেশি চেয়ে লিবে।'

কতটা বোকা ভাবা হয়েছে ননীগোপালকে ততটা যেন সে নয়। তবে বুদ্ধি জাহির করতে ও ভয় পাচ্ছে রীতিমত। মুড়ি পিঁয়াজ চপ দু থালা এলে সে প্রথমে বলেছিল খাবেনা, তার খিদে নেই, শেষে বউ জোর করতে আর মোহন মাইতি বলতে তবে না নিল। এখন খাচ্ছে গো-গ্রাসে। সকাল থেকে কারোর পেটে কিছু পড়েনি তা বোঝা যাচ্ছে।

নবোত্তম বলল, 'গঙ্গা যমুনা দিখেছো তবে বুঝতে বৈজয়ন্তীমালা কেমন ছিল। কেমন অ্যাকটিং, দিখেছো রাজকাপুরের সঙ্গম, সাঁতার পোষাক পরা বৈজয়ন্তীমালা!'

—'উসব বিটিশ আমলের বই, সে আমলে তুমার বৈজয়ন্তী সাযবাবানু, আর ই আমলে হলো , ইখন আর অ্যাকটিং ছ্যাখেনি লকে, ছ্যাখে ফিগার। রঙঢঙ যাকে বুলে গ্ল্যামার, আর । খুব চাপাগলায় বলল মোহন মাইতি, 'সেক্স, ইখন উটাই চলছ্যা, তুমার আনা ফিমেলের কিন্তু তা আছে।'

কথা হচ্ছিল চাটাই এ বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে, তখনই কথার মধ্যে বেরিয়ে এসেছে জবা, বলল মাইতিকে, 'বিড়ি হব্যা?'

চমকে উঠেছে একসঙ্গে দুজনেই। তাদের শেষ কথাটি কানে গেছে কিনা কে জানে! মোহন ভাবল, যাক না কানে, যা সত্যি তাই বলেছে, বরং এতে খুশিই হবে জবারাণী। কিন্তু বিড়ি চায় কেন। বসে যে ছাই পড়ে যাবে বিড়ি ধরালে।

—'বিড়ি কেনে?' মোহন মাইতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। এত সুন্দর চুল, এত সুন্দর মুখ, কোমর, লেবু কোষার মত ঠোঁট, বিড়ি খাওয়ার অভ্যেস আছে নাকি জবা রানীর। হলুদ পাটসিল্কের শাড়ি ছেড়ে ইতিমধ্যেই পরে নিয়েছে আধ ময়লা ছাপা শাড়ি, চুলের খোপা ভেঙে দিয়েছে, তা নেমেছে কোমর অবধি, বুকের ব্লাউজটি আগের মতই আছে। মোহন মাইতির চোখ শেষ পর্যন্ত বুকের কাছে গিয়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল।

জবা আঁচল টেনে বলল, 'আমার হাজরাণ্ড খাবে, খুব নেশা, যদি এক বাণ্ডিল বিড়ি আর ম্যাচ এনে দেন ।'

নবোত্তম কী বলতে গেলে মোহন তাকে থামায়, সে নিজে পকেট থেকে টাকা বের ক'রে একটা ছেলেকে পাঠালো দোকানে।

নবোত্তম কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারল না, বলল, 'আর কি চাই, একা আসতে পারনা, পিকনিক করত্যা এসেছো নাকি, লাও আরম্ভ করো, একদম ফাঁকি চলবেনি।'

জবা মাথা নামায়, 'ধরে নিন অতিথ এসেছে আপনার গাঁয়ে, আমি অ্যাকটিং এ পুষিয়ে দেবো দাস মশায়।'

নবোত্তমের হঠাৎ খেয়াল হলো সকাল থেকে তাকে দাস মশায় দাস মশায় করছে ননীগোপালের বউ জবারানী। কনট্রাক্ট করতে গেলে কিন্তু কাকাবাবু কাকাবাবু ব'লে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে।

রিহার্সাল আরম্ভ হচ্ছে। বিড়ি আর দেশলাই স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে জবা বলল, 'তুমি বরং একটু ঘুরে এস, খাওয়ার এখনো অন্যাক দেরি।'

ননীগোপাল ঘাড় কাত করে বেরিয়ে যেতেই মোহন মাইতি যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মনে হচ্ছিল লোকটা যেন তার বউকে পাহারা দেওয়ার জন্যই সঙ্গে এসেছে। তাতে রসের গুড়ে বালি। সে একেবারে জবার মুখোমুখি বসল, চোখে চোখ লাগছে অবিরত, নরোত্তম বোঝাচ্ছে কোন সীনের মাহাত্ম্য কি রকম!

জবা বলল, বইতো আপনি দিয়ে এসছিলেন দাসমশায়, আমি পার্ট মুখস্থ করেছি, ইখন রিহাস্যাল আরম্ভ করেন, ভুল হলে বুঝায়ে দিবেন, উনিতো দিল্লীর বাদশা, আমি চাষীর মেয়ে মধুমতী, দেখা হলো দুজনায়, বলি , উঠে দাঁড়ান আপনি মাইতিবাবু।'

জবা নিজে দাঁড়িয়ে মোহন মাইতিকে দাঁড় করালো, তারপর আবেগ মথিত গলায় ডায়ালগ বলতে আরম্ভ করল, 'তুমি তো দিল্লীশ্বর, সব মানুষের ঈশ্বর, যদি যাঞ্চা করো, কতশত রূপসা সুন্দরী তোমার তৃষ্ণা দূর করবে হে প্রিয়, আমি অবলা চাষীকন্যা, ঘরে অন্ন নাই, কুটীরে ছায়া নাই, তুমি কেন দুয়ারে দাঁড়ালে?'

মোহন মাইতি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে জবারানীর দিকে। সত্যিই যেন সে অবলা চাষীকন্যা আর তার সামনে প্রণয় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছে দিল্লির বাদশা। গলা খাঁকারি দিয়ে মোহন কোন রকমে বলল, 'মধুমতী তোমার রূপই অন্ন, তোমার রূপই ছায়া, রূপে মোর তৃষ্ণা মিটাও ।'

জোর রিহার্সাল চলতে লাগল। প্রাইমারি স্কুলের দরজা জানালা মানুষের মুখে অন্ধকার। গোটা ধ-বনিই যেন ভীড় করেছে ফিমেল দেখতে। দিল্লিশ্বর মোহন মাইতির বারবার ভুল হতে লাগল, ভুল হবেনা কেন, জবারানী যেন অবলা চাষীকন্যা মধুমতী হয়ে মজিয়ে দিয়েছে তাকে। নাচের মহড়াও হয়ে গেল। নরোত্তমের নির্দেশে হাঁটুর অর্ধেক উন্মুক্ত ক'রে কোমরে শাড়ি গুঁজে জবারানী কোমর দোলাতে লাগল। 'বাহ্, বাহ্! ইমন স্মার্ট ফিমেল আর কুনো অপেরাই নাই।' চাপা গলায় নরোত্তমের কানে কথাগুলো বলল মোহন মাইতি।

দুপুরে কুমড়োর ঘ্যাঁট, বিউলির ডাল আর পোস্ত বাটা দিয়ে ননীগোপাল আর তার বউ ভাত খেল পেটপুরে। তারপর ননীগোপাল পাশের ঘরে চাটাই এর উপর লম্বা হলো, নাক ডাকতে আরম্ভ করল ওর।

আবাব রিহার্সাল। পাঁচ মিনিটও বিশ্রাম পেল না জবারানী। তাকে টেনে তুলল নরোত্তম ভারী গলায় হেঁকে হেঁকে, এস হে, শীতকালে ঘুমানো ভাল নয়, ইখনো অনেকগুলান সীন আছে, নাইট হন্ট তো করবেনি।

জবা বলল, 'বসে বসে বলি, খাওয়াটা বেশি হযে গেছে।'

—বেশি খেলে কেনে, ফিমেলদের বেশি খেতে নাই তাতে ফিগারও যায় আলিস্তিও আসে, নাও দাঁড়াও, আব একবাব গানটা ধবো, না, না গান লয়, উটা ঘবে অভ্যেস কবো, নাচটা আর একবার হোক, ততক্ষণ মোহন মাইতি একটু বেস্ট লিযে লিক।

ভবা পেটে কোমর দোলাতে লাগল জবারানী, নরোত্তম সিগাবেট ধরিযে তাকিযায হেলান দিয়ে নির্দেশ দিতে লাগল, আহা ঘুরে ঘুরে কবো, শুধু সামনে হলে তো হবে না, পিছনটাও দিখবে লকে, অপেরায় ফিমেল দিখতেই না ভীড করবে লকে, তা ফিমেল যদি লজ্জাবতী হয়—

জবাব মুখে ভয এল। সে হাঁপাতে লাগল নাচতে নাচতে। তখন মোহন মাইতিই রক্ষা কবল তাকে, থাক, বাড়িতে অভ্যেস করো ইটাও, খাওযার পর ইসব হয না দাস।

—তবে বাসে উঠাব আগেই ভাত খেলে পাবত। বলল নবোত্তম, 'বিহাস্যাল তো ফোকটে দিয়া হচ্ছেনি, তবিশ টাকা, তাবপবে ·।

রিহার্সাল চলতে লাগল। মোহন মাইতি উঠে দাঁড়াল আবার। সে এতক্ষণে অনেক স্বাভাবিক, জবাও তার কাছে যেন নির্ভর কবছে একটু, তাতে চাষীকন্যা মধুমতীর প্রণয সম্ভাষণ আরো গাঢ হচ্ছে যেন। মোহন মাইতি, দিল্লির বাদশা, গলা বেড দিযে টেনে এনেছে চাষীব মেয়েকে বুকের উপব, বলছে. 'দিল্লির বাদশা আমি সব ছেড়ে দিবো।'

—এ তুমার মোহমাযা বাদশা।

মোহন মাইতির চাপে যেন দম বন্ধ হযে আসে জবাব। বুকে পিষে ফেলছে তাব হাসফেসে শরীবটাকে। হিন্দি সিনেমার অনুকরণে-এ পালাতে কোন বাখঢাক নেই। সে কোনরকমে দিল্লির বাদশাব বাহু বন্ধনমুক্ত হযে জোর নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে বুকেব দলামলা আঁচল ঠিক করতে লাগল, হালুকচালুক তাকাতে লাগল একবাব পাশের ঘবের দিকে, আর একবাব প্রাইমারির বারান্দায জমা দর্শকদেব দিকে। কোন কথা বলল না। এত লোকেব মাঝখানে তাকে যে প্রায এলোমেলো কবে দিল বাদশা তাতে মাথা কাটা যাচ্ছে লজ্জায়, তবে হ্যাঁ, লোক ছিল বলেই না বাদশা তাডাতাডি ছাডল।

॥ ৬ ॥

বিকেল পাঁচটায় নদী অন্ধকার। বাস এল ওপার গোপীবল্লভপুর থেকে, নদীর উপর সিধুকানু সেতু পেরিয়ে।

বাসে ওঠার সময় মোহন বলল, আর গার্ড আনার দরকার নেই, চিনে গেলে তো, পালার দিন ফার্স্ট বাসে আসব্যা, ফার্স্ট ট্রেন পেলেই ফার্স্ট বাস পাব্যা।

ঘাড় কাত করল জবারানী।

নরোত্তম বলল, বিহাস্যালটা মনোমত হলোনি, শেষ দিশ্যটা আরো ভাল করে করত্যা পারতে, না করলে স্টেজে মাত করব্যা কি কর্যা।

—তা তো বটে। সমর্থন করল ননীগোপাল।

নরোত্তম বলল, বউকে একা পাঠিয়ো, ভয় নাই, কত ফিমেল একা অ্যাকটিং কর্যা যায়, তবে না উ বুঝত্যা পারবে সব, চালাক হব্যা, আরো তো বায়না আছে।

ননীগোপাল ঘাড় কাত করল।

—হাঁ জবা, ভাল করে অভ্যেস করো ঘরে, সব সময় মনে করব্যা তুমি ননীগোপালের বউ লও, অবলা চাষী কন্যা, বাপ গরীব পেটে ভাত নাই, কিন্তু রূপে তুমি গাঁ আলো করো। নরোত্তম উপদেশ দিল।

—উতো তাই বটে দাসবাবু, নাহলে এ্যাদ্দূর আসবে কেনে আপনাদের নিকট, শিখায়ে পড়ায়ে নিবেন। ননীগোপাল বিড়বিড়িয়ে বলল।

দাস হতভম্ব। মোহন মাইতি নির্বাক। ননীগোপাল বউ এর আগে আগে বাসে উঠে গেছে। কথাটা ও ভেবে বলল, না এমনি বলল!

॥ ৭ ॥

ধ বনি অপেরা চলেছে মৌচুরিয়ায় আসর করতে, নদীর পাড় ঘেষে ঘেষে পশ্চিমে, সিংভূমের পাহাড় শ্রেণীর মুখোমুখি। যাচ্ছে ফিমেল জবারানী, লিফলেটে কুমারী মন্দাকিনী, কুমারী না হ'লে রস গাঢ় হয় না। কোলে তার দেড় বছরের ছেলে, কখনো ঘুমিয়ে কখনো জেগে মায়ের কোলে চেপে সে ও চলেছে মৌচুরিয়া।

বাস থেকে বাচ্চা কোলে জবা নামতেই মাইতি ক্ষুব্ধ, 'আবার পাহারা নিয়ে এলে, তুমি কুমারী মন্দাকিনী, বাচ্চা নিয়ে মৌচুর্যা যাব্যা?'

নরোত্তম আরো কঠিন, 'এই জন্যই ম্যারেড ফিমেল আনতে নাই,

ল্যাংবোট থাকব্যাই, অ্যাকটিং কিমন হব্যা সে চিন্তা করব্যা কখুন ল্যাংবোট লিয়ে।'

জবার মুখ অন্ধকার। এই ধরণের প্রতিক্রিয়া যে হতে পারে তা সে আন্দাজ করেছিল, তবে এতটা নয়। ননীগোপাল এলে আসরে কোমর দোলানো, দিল্লীর বাদশার সঙ্গে ঘনিষ্ট আলাপে তার বাধো বাধো ঠেকত ঠিক, বাচ্চা নিয়ে তো সে অসুবিধে হবেনা। আসরে আজ সবার মন জয় করে নেবে এই ভেবে ভেবে এসেছে, তাতে আরো ডাক পাবে অন্য সব অপেরা থেকে, কিন্তু দাসমশায় আর মাইতি বাবুর মুখ দেখে সে অসহায় বোধ করল, কোনরকমে বলল, ছেল্যাটা সন্ধে থেকে ঘুমায়, কুনো অসুবিধে হবেনি দাস মশায়, আপনি দিখবেন অপেরার নাম আমি রাখব, আগের বার মার কাছে রেখে এসেছিলাম, মার হইছে ইবার জ্বর, ভাই দুটা ধান কাটত্যা গিইছে হুগলী, রাখি কার কাছে, উপায় হলে রেখেই আসতাম।

—কেনে ননীগোপাল, উ মদ্দাটা কি করছে, বউ এর আয় খ্যাবা আর ছেল্যা রাখতে পারবেনি? নরোত্তমের গলায় ঝাঁজ ফোটে।

—তাইতো ঠিক ছিল, কিন্তু উর ময়দাকলের মালিক নাকি মিসিন তুলে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করছে, সব লেবারে পাহারা দিতে লেগেছে কল, ঘরে থাকার উপায় নাই, ঘর তালা দিয়া মেয়্যাটাকে রেখে এলাম মার কাছে, উটার বয়স ছয়, দেখে এলাম গা ঘুষঘুষ করছে।

কথা বলতে বলতে জবা মুখ নামিয়েছে। শেষ কথাগুলি খুব আস্তে বলল যাতে বলাও হয় এবং দাসমশায় না শুনতেও পায়।

নরোত্তম এতে গলেনা, ইসব কথা বহু শুন্যাছি, সব এককথাই বলে, কুনো ফিমেল আলাদা লয়, হাঁ কনটাক্টর বাইরে কিছু দিতে পারবোনি, নাও রেডি হও, হাঁটত্যা হবে।

মোহন মাইতি ভাবছিল নরোত্তম ঠিক ই বলছে। ম্যারেড মেয়েছেলে নিয়ে ঝামেলা বিস্তর। তাছাড়া কুমারী মন্দাকিনী, বাচ্চা নিয়ে গাঁয়ে ঢুকলে লোকে ঠিক জেনে যাবে এ হলো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফিমেল। তাতে গ্ল্যামার তো যাবে। সমস্যা আরো। পার্টি রওনা হবে এই সময়েই জেগে উঠল জবারানীর ছেলে। একেবারে ননীগোপালের মুখ বসানো, ময়লা রঙ, মাথায় কোঁকড়া চুল, খুব রোগা। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। জবা এতে খুব বিব্রত, শেষে না পেরে মাইতিকেই আশ্রয় করল, দাদা শুনবেন।

রাগী নরোত্তম বিড়ি টানছে ফস ফস করে। মোহন এগিয়ে আসতেই জবা

ইঙ্গিতে ছেলের গা দেখালো, আসতে ঠাণ্ডা লাগল কিনা, জ্বর এলো কিনা। তাকে আশ্বস্ত করল মোহন মাইতি, না, ও কুছু লয়, চাদরে ঢাকা ছিল কিনা, তাই একটু গরম গরম লাগছ্যা গাটা।'

মোহন মাইতির সহানুভূতি পেয়ে জবা চাপা গলায় বলল, 'একটু দুধ হতো তো খাউয়ে নিতাম, পথ তো কম নয়।'

কথাটা নরোত্তম প্রথমে শুনতে পায়নি। মোহন মাইতির মাথায় চকিতে বুদ্ধি খেলে গেল, ঘুরে বলল, 'দাসমশায় রওনা হও, ই বাচ্চাটাকে একটু দুধ খাউয়ে লিই, এতটা পথ যাবে তো, শিশু বলে কথা, পিছে পিছেই যাচ্ছি।'

তাই হলো। নরোত্তম আপত্তি করলনা। তার দরকার অ্যাকটিং। তার জন্য মোহন আর মন্দাকিনীর পরস্পরের কাছে ফ্রী হওয়াও দরকার। আসছে তো পিছনে।

চা-দোকানে জবার ছেলে দুধ খেল এক বাটি। তাতেই ঠাণ্ডা। জবাকেও চপ মুড়ি আর দুটো রসের মিষ্টি খাইয়ে নিল মোহন মাইতি। পালার দিন টিফিনের ব্যাপার রাখেনি দাস মশায়। খাওয়ার পর চা খেতে হলো জবাকে মাইতি বাবুর সঙ্গে। তাতেও সময় গেল। অপেরাপার্টি এগিয়ে গেছে অনেকটা। প্রায় আধ ঘণ্টা বাদে উঠল মোহন মাইতি। জবা কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বলল, 'চলেন দাদা, ইকে লিয়ে আর চিন্তা নাই, শুধু ঘুমায়, শরীরে বল কম।'

মোহন বলল, 'আবার দিয়া যাব্যা, মৌচুর্যা পৌছে এক সের দুধের অর্ডার দিবো, তুমার বাচ্চা খাবে আর ঘুমাবে।' হাহা করে হাসল কথা শেষ করে মোহন।

জবা তার গায়ের খদ্দরের চাদরটি খুলে ছেঁড়া ফোমের কাঁধ ব্যাগে ঠেসে দিল। ওই চাদরেই জড়িয়ে এনেছে ছেলেটাকে। রোদ ইতি মধ্যে, গাঢ়, নদীর ধারে হাওয়াও তেমন নেই, পৌষ মাসে যেন ফাল্গুনের আনচান করা ভাব। বাচ্চার মাথা থেকে ফ্ল্যানেলের ময়লা টুপি আগেই খুলে নিয়েছিল জবা, ফ্ল্যানেলের জামাটির বোতাম খুলে দিল, তার নিচে ছেঁড়া সোয়েটার তো রয়েছেই। কালো কালো পাদুটি বেশ সরু, নেতিয়ে পড়েছে একেবারে মায়ের বুকে। অপেরাপার্টি অনেক দূরে, এখান থেকে মেঘ ডাকলেও বোধ হয় সাড়া পাবেনা।

—দাদা আপনি খুব করলেন। জবা আবার কৃতজ্ঞ হয়।

না, না এ আর কী, তা তুমারে দিখলে কিন্তু বুঝা যায় না দুই ছেল্যা

মেয়্যাব মা বডিটা রেখিছো চমৎকার, কে বলব্যা তুমি কুমারী না, লিফলেট দিখেছো ?

জবা এই ধরণের প্রশংসায় আনত, কোন বকমে বলল, কে লিখল উসব কথা ?

—আমি, ভাল হয় নাই ? মোহন আগ্রহ ভবে জিজ্ঞেস কবে।

জবা মুখ তুলতে গিয়েও পারেনা, বাচ্চাব গাল হাত বোলায় অন্যমনস্কের মত।

মোহন মাইতি হঠাৎ সাহসী হয়, শুনো, যৌবন জোযাবে ঢলো ঢলো

জবার মুখ লাল, সে বাচ্চা আঁকডে কোন রকমে হাঁটে। পৌষমাসের রোদ্দুব মোলাযেম। এখনো হাঁটা হয়নি বেশি পথ, তবু জবা মাজি ঘেমে একাকাব।

—তুমি খুব চালাক, ননীগোপালকে আসতে বাবণ কব্যাছি তো ইকে লিযে এলে গার্ড কব্যা, কী ঠিক বলিনি !

হয়ত কথাটা ঠিক। জবা নিজেই তো আগবাডিযে ছেলেটাকে নিযে এল। ছেলে থাকলে যেন অনেক দিক দিযে নিশ্চিন্ত, কিন্তু সেকথা বলবে কি ক রে, বলল, 'গার্ড তো আব আসবে থাকবেনি, আমি দাসমশায়ের দিযা টাকা উশুল করে দিবো, সে চিন্তা নাই।'

মোহন মাইতি শুনল ওর গলায় ঈষৎ ঝাঁজ, তা হোক, মেযে মানুষ নেতিযে থাকলেই বা ভাল লাগে কাব, সে উপদেশ দিল, 'হাঁ সিটা মনে রেখো, না হলে দাসমশায আর ডাকবেনি, পরীহাটির বিমলা এসেছিল বছর পাঁচ আগে, এক বাত্তিরের পর ই তাকে দূব করে দিল, মোব নামে নালিশ করত্যা গিইছিল দাসেব নিকট, দাস অ্যাকটিং ছাডা আর কিছু বুঝেনি, তার পাওনা উটা, পেলেই হলো।'

জবা চট কবে মুখ তুলল, নালিশ কেনে ?

—কেনে আবাব, উসব যাক, হাঁটো দেখি।

জবা মাজি চিন্তিত হলো যেন। কোল বদল কবল বাচ্চাটা, কাঁধ বদলও হলো। তাবপব হঠাৎ অন্যমনস্কেব মত বলল পাহাড অবধি যেতে হবে ?

হাসল মোহন মাইতি, উহুঁ, পাহাড অন্যাক অন্যাক দূব।

জবা ঘাড উঁচু কবল সিংভূমেব পাহাডেব দিকে তাকিয়ে, ফিসফিস করে বলল, আমি এর আগে কখুনো পাহাড দেখিনি।

—তাই ! অবাক হলো সেণ্ট ভুবভুবে মোহন মাইতি।

—হাঁ, বিহাস্তালের দিন পথম দেখলাম।

—বুঝা যায় নি তো তা। মোহন সরে এল জবার পাশে।

জবা এবার হাসল মাইতির দিকে আড চোখে তাকিয়ে। 'বলার উপায় ছিল! ভরাপেটে পর্যন্ত নাচতে হলো, দাস মশায় খুব কঠিন মানুষ।'

—আর আমি। মোহনমাইতি এবার কাঁধ ছুঁয়ে ফেলল জবার নিজের কাঁধ দিয়ে।

অন্যমনস্কের মত জবা নদী দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি না বললে আমি বেহাই পেতাম। আজ যেমন!' কথা শেষ করতে পারলনা জবারানী, মোহনের দেহের ধার তার দেহে ছুঁয়ে যাচ্ছে বারবার।

মোহন বলল, আজ কিন্তু ঢেলে অ্যাকটিং করব্যা!

জবা একটু সরে গিয়ে বলল, না করলে দাস মশায় টাকা দিবেন?

—তা যখন বুঝেছো তুমার দ্বারা হব্যা, আজ দুজনায় আসর মাত!

মাথা তুলল না জবা, হঠাৎ চাপা গলায় বলল, 'শেষ সীনটায় অতটা না করলে হতনা মাইতিদা, গাঁ ঘরের লোক দেখবে।'

হা হা ক'রে হাসল মোহনমাইতি, কালো ছেলের গাল টিপে দিল আলতো করে, 'লকে তো উ সীনের জন্যই টাকা দিবে, অ্যাকটিং করতে অতো রাখঢাক করলে চলে, যা বুলেছো বুলেছো দাসকে বলোনি কিন্তু।'

—না, না, তা কেন, আপনাকেই বলছি। জবা একটু সরে গেল।

—ইতে তো লজ্জার নাই, তুমি চাষীর মেয়্যা মধুমতী, আমি দিল্লির বাদশা, অ্যাকটিং করতে গেলে স্ত্রী হত্যা হব্যা। মাইতি আবার সরে এল জবার দিকে।

জবা যেন শুনতে পেলনা কথাগুলো, বাচ্চাকে আবার কোল বদল করতে করতে বলল, 'দাদা পঁচিশটা টাকা বেশি দিবার ব্যবস্থা করবেন দাস মশায়কে বলে, পরের বার না হয় কেটে নিবেন।'

নরোত্তম দাস বলেছিল, এইসব ফিমেলের টাকার খাঁই খুব যেদিক থেকে পারে চুষে নেবে অপেরাকে। নরোত্তমের কথাগুলো সত্যি মনে হচ্ছে এখন। মোহনমাইতি প্রকাশ করলনা তার মনের ভাব। শুধু আরো সরে এসে জবারাণীর ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল। বাচ্চাটা একহাতে খামচে ধরেছে মায়ের অনাবৃত কাঁধ, সে বাচ্চার হাতের পাশে আচমকা নিজের হাত রাখল, বলল, আমিই দেব, দাস মশায়কে আজ বুলতে হবেনি।

জবা যেন কুঁকড়ে যায়। কলের পুতুলের মত দম নিয়ে সে হাঁটছে একটি

কচি হাত আর একটি শক্ত থাবা কাঁধে নিয়ে। বাঁদিকে মাইলের উপর চওড়া-বালি ভাসা নদী। ডাইনে ধানক্ষেত। কোনক্ষেতের ধানকাটা শেষ, কাটাধান উঠছে গো গাড়িতে, কোন ক্ষেতের ধানে এখনো কাস্তে পড়েনি। নুয়ে আছে এই জবাবাণীর মত। আকাশটা হাল্কানীল, তা সাঁতরে পাখির ঝাঁক নামছে ক্ষেতের উপর। মাঠের মানুষ হাঁ করে দেখছে দুজনকে, অপেরায় তাহলে সত্যি ফিমেল এল।

মোহনমাইতি হঠাৎ যেমন হাত রেখেছিল ঘাড়ে, তেমনি নামিয়েও নিল হঠাৎ, তাতে জবা যেন স্থির হয়ে শ্বাস নিল, একটু হেঁটে জিজ্ঞেস করল, ই নদীতে বান হয়?

—হয়, খুব বান, এক্কেবে যৌবন জোয়ারে ঢলো ঢলো।

জবার মুখ লাল হয়েছে আবার, তা দেখতে পেল মোহন। আরো দেখল ছেলেটা জেগে উঠেছে হঠাৎ, নড়ছে ক্রমাগত, পিটপিট করে তাকাচ্ছে অচেনা পৃথিবীর দিকে। জবা থাবা দিল, ঘুমো বাপ ঘুমো না ঘুমুলে তোর শরীর খারাপ হবে।'

নদীর ধারে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হাঁটছে ধ-বনি অপেরার ফিমেল। বাচ্চাকে জাগতে দেখে মোহন একটু তফাতে। তফাতে বলেই জবা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমন্ত বাচ্চার দিকে তাকাতে তাকাতে জিজ্ঞেস করে, 'দাদা আপনার ক'বিঘা জমিন?'

—তিরিশ বিঘা, পুকুর বাস্তু বাদে অবশ্য। মোহন ভারীগলায় জবাব দেয়।

জবা অবাক চোখে তাকায় মোহনমাইতির দিকে! মোহনমাইতি তার সম্পত্তির হিসেব দিতে পেরে খুবই খুশি, উল্টে জিজ্ঞেস করে, ননীগোপালের নাই?'

জবা উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করে সব জমি বর্গায়?

—পাঁচবিঘা ছাড়া রিকর্ড হয় নাই।

জবা আরো অবাক, জিজ্ঞেস করল, 'আপনার তাহলে চিন্তানাই, আচ্ছা দাদা, বর্গা কাটানো যায়নি?'

মাথাদোলায় মোহন, 'উঁহু, উ হলো কলঙ্কের মত, মেয়্যামানুষের গায়ে যা লাগলে আর উঠেনি।'

—মোদের দুই বিঘার সবটায় বর্গা লিখা হয়ে গেছে, ধান দেয় না। বিষণ্ণ গলায় জবা বিড়বিড় করতে করতে হাঁটে, 'আপনি পার পেয়ে গেলেন, অথচ মোদের দুবিঘা চলে গেল, একটা ধানও দেয় না।'

মোহন মাইতি এবার সরে এল জবার খুব কাছে, হাত রাখল তার ব্লাউজ আর শাড়ির বাঁধনের মধ্যবর্তী অনাবৃত পিঠে, 'ঠিক কর‍্যা অ্যাকটিং যদি করত্যা পার, কত জমিন হব্যা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল মেয়ে, পেটেই জুটেনি, জমিন হবে কি করে।

—না না হব্যা। মোহন মাইতি হাত সরিয়ে এনে কোমরের ধারে রাখল, আঙুল সামনে বাড়ালেই পেট, একটু তুললে বুক।

এতক্ষণে যেন জবার খেয়াল হলো তা, সে চট করে সরে গিয়ে চাপা গলায় যেন ধমক দিল মাইতিকে, আপনি বড় গা ঘেষা মানুষ, ছেল্যোটা জেগে যাবে, নিন দেখি. আমি একটু সামলে নিই।

মোহন মাইতিকে এভাবে নিরস্ত করছে জবারানী তা সে বুঝেও বাচ্চাটাকে দু হাতে ধরল। জবা তার হাতে বাচ্চা দিতে দিতে অস্ফুট গলায় বলল, 'কী গন্ধ আপনার গায়ে, গন্ধে না জেগে ওঠে।'

—চাল্লি সেন্ট, গায় দিবে? মোহন এক হাতে বাচ্চা সামলে অন্য হাত পকেটে ভরল, নাও না, বেলাউজে দাও ভাল লাগব্যা।

—না, হাসল জবা। দাঁড়িয়ে কাপড়ের ভাঁজ ঠিক করল। ব্লাউজের কাঁধ থেকে বেরিয়ে আসা ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপ ঢুকিয়ে দিল ভিতরে, নদীর দিকে ফিরে। পিছন থেকে হাঁ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে ধ-বনি প্রাইমারির হেডমাস্টার, তিরিশ বিঘা জমির মালিক মোহন মাইতি।

আঁচল টেনে জবা ঘুরে দাঁড়াতেই মোহন বলল, নাওনা সেন্ট।

—না, আমি চাষীর মেয়ে মধুমতী। জবা এড়াতে চাইল।

—তো কি হলো, আমি দিল্লির বাদশা দিচ্ছি, আচ্ছা আমি না হয় স্প্রে কর‍্যা দিই মধুমতী, বুকে লাগালে সর্বক্ষণ গন্ধ পাব্যা।

—না, না। জবা ভীত হয়ে ওঠে, ছেল্যাটাকে দিন, আপনি যা করছেন উ পড়ে যাবে।

মোহন মাইতির নিঃশ্বাস গরম। চোখ যেন ক্রমশ ঘূর্ণায়মান। সে দেখছিল বালিচকের ননীগোপালের বউ এর সব অঙ্গই প্রখর, নেশা-য় যেন টানছে তাকে। আঁচলের আড়ালে ভারী দুটি বুক ভয়ে কাঁপছে, গাল দুটি রোদে পুড়ে অথবা মোহনের কথায় যেন রক্তাভ। বেলা অনেক। সূর্য মাথায়। ডানদিকের কোন ক্ষেতে আর মানুষ নেই, শুধু পাখির ঝাঁক। সে এগিয়ে দু হাতে বাচ্চাটাকে তার মায়ের কোলে তুলে দিতে দিতে আবার সুযোগ নিল, ছুঁয়ে ফেলল জবার বুক, কোমর। জবা শুধু তাকাল একবার।

তারপর সামনের দিকে উধাও করল দৃষ্টি। অপেরার মূল পার্টিকে আর দেখা যাচ্ছে না, নদীর বাঁকে মিলিয়ে গেছে। কেউ কোথাও নেই। অগণন প্রকৃতি, কিন্তু মানুষ মাত্র দুটি। মোহন মাইতি আস্তে আস্তে জবার কাঁধে হাত রাখল, বসবে ইখানে মধুমতী।

জবা কেঁপে ওঠে, বলল, দেরি হয়ে যাবে।

—যাক! হাঁটা যয়েছে অনেকটা, তুমি আবার ছেল্যা কোলে নিয়ে, ছেল্যাটাকে শুইয়ে দাও মাটিতে, ঘাসের উপর ঘুমাক।

—আর কতদূর? জবা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করে।

—মাইল তিন, নদী পার হত্যা হবা উদিকটায়। মোহন তর্জনী তুলে দেখায়।

জবা বলল, না চলেন, দাস মশায় কি বলবে!

—তুমি কিছু না বলল্যাই হলো, বিমলা মানে পরীহাটির সেই ফিমেল নালিশ করত্যা গিয়েছিল, উকে দূর কর্যা দিল নরোত্তম দাস, অ্যাকটিং ছাড়া উ কিছু বুঝেনি।

মোহন মাইতির ভারী বসন্ত কণ্ঠস্বরে জবার গা যেন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগল। দাঁড়াতে তার ভয় করল। বসতে আরো ভয়, অথচ বসার কথা বলায় সে যেন খুশিই হয়েছিল মোহন মাইতির উপর। কোমর টনটন করছে। ছেলে কোলে ক'রে এত হাঁটার অভ্যেস তো নেই। সে ঘুরে তাকায় ফসলের ক্ষেতের দিকে। শুধু ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি, টিয়া শালিক-দুপুরটা ঘন হয়ে উথলে পড়ছে যেন দুধের মত।

মোহন মাইতি আবার বলল, বসো, আমি বসছি, তুমি তো একা যেত্যা পারবেনি!

মোহনের ঠোঁটে চাপা হাসি। সে জমির আলে ব'সে সিগারেট ধরায়। জবা একটু ওধারে কোমর নামিয়ে দিল আলের উপর। আহ্ কী আরাম! বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরল বুকের উপর। তখন দেখল মোহন উঠে আসছে, তার মুখোমুখি উবু হয়ে ব'সে ধোঁয়া ছেড়ে দিল একগাল, তামাকগন্ধী। সিগারেটটা হঠাৎ ছুঁড়ে দিয়ে মোহন যেন শকুনের লাফে এগিয়ে এল উবু হয়েই, দুটো হাত বাড়িয়ে জবার আনত মুখ তুলে ধরে, মধুমতী, আমি দিল্লির বাদশা।

জবা ঢলে যায় পিছনে, মুখ ছাড়িয়ে নেয় মোহনের দুই হাত থেকে, 'আপনি স'রে বসেন দাদা, আমি গরীব চাষার মেয়ে, গরীব চাষা, লেবারের বউ, মরদা কল ইখন বন্ধ।'

মোহন মাইতি নিঃশব্দে হাসে, চাপা গলায় বলল, ডায়লক ভুল হলো একটু, তবে চলব্যা, ই ব'মেই চলব্যা, শুধু বলোনি গরীবের বউ, তুমি কুমারী মধুমতী।

জবা আবার পিছনে ঢলে, 'আপনি সত্যিই বাদশা, তিরিশ বিঘা জমিন, মাত্তর পাঁচ বিঘায় বর্গা, মোদের জমিনের সব বর্গা, ধান পাইনা, সবে বসেন দাদা।'

বারবার জবার পিছনে ঢলে যাওয়া ভাল লাগেনা মোহনের, সে বলে, 'ইতেই তুমি ইমন করছ জবারানী, কথা আছে শেষ দিশ্যে চুমু দিবার, তুমাকে জানান বারণ ছিল, চুমু দিলেই হই হই পড্যা যাবে, বায়না হব্যা একশোটা।'

জবা থর থর করে কাঁপে, বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে খুব জোরে। মোহনের আঙ্গুল চেপে বসছে তার রোদ পোড়া ত্বকে, জবার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল প্রায়। তাকে এক হাতে বেড দিয়ে ব্লাউজের বোতাম অন্যহাতে খুলতে যায় বাদশা মোহন মাইতি, তাতে জবা ছটফটিয়ে উঠতেই বাচ্চাটা তীব্র আর্তনাদে নদীর তীর ভাসিয়ে দিল প্রায়। এতে যেন সম্বিত ফেরে জবা মাজির, সে তীব্র চোখে মোহনকে ভর্ৎসনা করে, একি করছেন!

মোহন মাইতি হেসে বলল, কানছে কেনে?

জবা এবার বিব্রত ছেলের দিকে তাকায়, এ কান্না তার খুব চেনা, সে হঠাৎ কাতর চোখে মোহনের দিকে তাকায়, আপনি একটু সরেন দাদা।

—কেনে, আমি কি বাঘ, আসবে তুমার গায় হাত পড়বেনি?

—না, না তা নয়, একটু সরেন। প্রায় কেঁদে উঠেছে যেন জবারানী, 'ইকে ঘুম পাড়াই'।

কী মনে করে মোহন মাইতি সরে গেল। গিয়ে বসল বুনো কুলঝোপের ওধারে। ছেলেটা সত্যিই পাহারা দিচ্ছে ওর মাকে। জবা মাঝির বুদ্ধি কম নয়। হিসেব কষে এসেছে। কিন্তু তার দেহ এখনো উদোম হাওয়ায় আনচান। ঝিমঝিম করছে সর্বাঙ্গ। জবারানীর সর্ব অঙ্গ যে তাকে টানছে ক্রমাগত। বাচ্চা ঘুমোক। রাতটা তো পড়ে আছে। বাচ্চা ঘুমোক। নদীর ধার আর জনহীন দুপুরটা শেষ হতে তো এখনো অনেক দেরি। ঘুমোক। বাচ্চা ঘুমোক। থাবা দিয়ে ঘুম পাড়াচ্ছে বোধহয় জবা। মোহন ঝোপের আড়ালে ঘুরে বসল। সোজা ভরভরন্ত পাকাধানের মাঠ। ধান কাটা শেষ। এখন গাড়ি এসে নিয়ে গেলেই হলো। এর ফাঁকে শালিক টিয়া-ছুটছে উড়ছে। এর মাঝে! মোহন মাইতি দেখল জবা তার বুকের

আঁচল ফেলেছে, ব্লাউজের কটা বোতাম খুলে ব্রেসিয়ার তুলে, পা মেলিয়ে বসে ঘন রৌদ্রে যেন মেলে ধরেছে কচি তালের মত মসৃণ বসন্ত বুক। বাচ্চার মুখে তা ঠেসে ধরেছে জবারানী। কোলের ছেলে দুধ টেনে টেনে হাঁপাচ্ছে। সামনে দুই টিয়া অবাক স্থির চোখে দেখছে জবারানীকে।

মোহন মাইতি কাঁপতে লাগল। এ দৃশ্যের প্রথমটায় যেমন দৃষ্টি জুড়িয়ে এসেছিল, তা যেন এখন শত চক্ষু হয়ে খুলে যেতে চাইছে। ধান গন্ধী, দুগ্ধ গন্ধী পৃথিবীর অঢেল দুপুর ক্রমশ ঘন হচ্ছে। মোহন মাইতি আবার উঠল, ডাকল কুলঝোপের আড়াল থেকে, 'মধুমতী। বড় তিষণা আমার গো।'

—দাদা আমি গরীব চাষার মেয়ে, গরীব ঘরের বউ, ঘরে ভাত নাই, অন্ন নাই

জড়িয়ে যেতে লাগল জবারানীর কথা, আপনি বড় মানুষ, বাদশা মানুষ, কত জমিন, কত মেয়ে আপনার। ভুল হয়ে যেতে লাগল কথাগুলি। চাপা কান্না হাওয়ায় লাট খেতে লাগল।

॥ ৮ ॥

ধ-বনি অপেরার পুরো পার্টি এতক্ষণে পৌঁছল। ওইতো ফিমেল আর হীরো। ফিমেলের চুলে ধুলো বালি, পিঠে ধান খড় মাটি, শাড়িতে পাছার কাছটায় মাঠের ঘাস খড় মাটি ঘষে লেপটে গেছে। মাথা নামিয়ে হাঁটছে। মুখ তোল, না হলে গাঁয়ের লোক তোমার দেখবে কী। কাঁধে তার ছেঁড়া ফোমের ব্যাগ দোল খাচ্ছে। ও মা, বাচ্চা বয়েছে যে। কাঁখে বাচ্চা। বাচ্চাটা কাঁদছে, তীব্র রাগে হাত পা ছুড়ছে একনাগাড়ে। গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক দাঁড়িয়েছে পথের দুপাশে। তাদের গায়েও ধান খড় মাটি, পাখির পালক। ফিমেলের গায়েও তাই। শীতের হাওয়া হঠাৎ আবার বল পেয়েছে যেন, মাঠের খড় উড়োচ্ছে, ধুলো সাঁই সাঁই পাক খাচ্ছে।

নরোত্তম চিৎকার করল, দেরি হলো কেনে?

বাদশা মোহন মাইতি চাপা হাসিতে মুখ ভরিয়ে জবাব দিল একটু জোরে, 'ল্যাংবোট লিয়ে এস্যাছে যে।

কাঁখের বাচ্চা সামলায় জবারানী, তার মুখে হাত চাপা দেয়, চুপ কর বাপ চুপ কর, বাবুরা বকব্যা, মারব্যা।'

বাচ্চা কোলে জবারানী বসল বটতলায়। নরোত্তম দাস তার দিকে এগিয়ে এল, নরোত্তমকে দেখে জবারানী তাড়াতাড়ি বলে, কুনো চিন্তা নাই দাসবাবু, এমনি খুব ঠাণ্ডা, কেনে যে ইমন করছে!

জবারানীর কণ্ঠস্বর ক্রমশ স্তিমিত হয়। মৌচুরিয়ার লোক ভীড় করছে তার চারদিকে।

ফ্ল্যাগ স্টেশন

রাম বসু

[নির্জন স্টেশনের বসবার জন্য কাঠের বেঞ্চ। বসে আছে আলোক অনিমা। স্বামী স্ত্রী। বয়সের খুব তফাৎ নেই। যুবক যুবতী। ধাতব স্তব্ধতা। কোথাও মানুষের স্বর নেই। ওরা বসে আছে। রাত্রি হয়েছে। পাহাড়ী পরিবেশ।]

অনিমা : কতক্ষণ বসে আছি। মনে হয়
অনন্ত, অনন্ত কাল বসে আছি
ঠিক এক ভাবে, ঠায় চেয়ে আছি
সামনের দিকে। সামনে অনন্ত শূন্য।

আলোক : হুঁ

অনিমা : প্রতীক্ষার শেষ নেই

আলোক : প্রতীক্ষার যদি শেষ থাকে
তবে সে আর প্রতীক্ষা থাকে না

অনিমা : তা-ও ঠিক। প্রতীক্ষার মানে
অন্তহীন চেয়ে থাকা—
[বিরতি। হঠাৎ জোর দিয়ে]
কিন্তু প্রতীক্ষার উদ্দেশ্য থাকে
প্রতীক্ষার মানে, কোন কিছুর জন্যেই প্রতীক্ষা

আশা থাকে, আশা, যে জন্যে প্রতীক্ষা
তার অবসান হবে একদিন

আলোক : হুঁ

অনিমা : আমাদের আশা ?

আলোক : ধন্য আশা কুহকিনি তোমার মায়ায়
আশাহীন আশা থাকে
জয়হীন জয়

অনিমা : অসহায় বাধ্যবাধকতার মতো

আলোক : উই আর কনডেমণ্ড টু হোপ

অনিমা : উই আর কনডেমণ্ড টু হোপ

[বিরতি। ঝিঁ ঝিঁ ডাক। পাতার শব্দ।]

অনিমা : ছাখো, ছাখো ডালপালা উথলে উঠছে
বুকচাপা দীর্ঘশ্বাসে ফুলে ফুলে

আলোক : ফুলে ফুলে ফুল হয়ে যাবে
ফুল হবে যদি অগ্নিপরীক্ষায় অ-হত অম্লান থাকে

অনিমা : অগ্নি পরীক্ষায় ?

আলোক : দহনের

অনিমা : কেন এ দহন ?

আলোক : দহনের নামই জীবন

অনিমা : তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর

[আলোক নিরুত্তর]

তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর
বাতাসের ব্যথিত আঙুল আমার চিবুকে গালে
বেদনার্ত মমতার অন্য স্বাদ আছে

ওভাবে তাকিয়ে থেকো না আলোক
ভয় লাগে, আমাদের ভালবাসা
উচ্চারিত হতো যদি—

আলোক : অনিমা

অনিমা : কি ?

আলোক : না, ও কিছু না

অনিমা : চমকালে কেন ?
আলোক : কই, না তো
অনিমা : কখন যে ট্রেন আসবে।
এ এক ভূতের রাজ্য, আজব স্টেশন
রেল আছে, গাড়ি নেই
স্টেশন রয়েছে, স্টেশনমাস্টার নেই
এ এক ভূতের রাজ্য
আলোক : ছাখো, ওই গাছের পিছন থেকে
আমাদের ফলো করছে কেউ—
অনিমা : আমাদের ফলো করছে কেউ ?
মানে ? কি বকছো যা তা ?
কে ফলো করতে যাবে ? কেন ?
আমরা কি ফেরারী আসামী, খুনী ?
এ কথা কি করে মাথায় এল ?
আশ্চর্য, আলোক, তাকাও আমার দিকে
তাকাও, অদ্ভুত !
আলোক : দুটো গাছের ফোকোরে, ছাখো, ভাল করে ছাখো
এক জোড়া চোখ, আমাদের দিকে, তীক্ষ্ণ, তীব্র
অনিমা : কই ? ওই গাছের ফোকরে ?
[অনিমা এগিয়ে গিয়ে টর্চ জ্বালালো]
ছাখো, কিছু না, গিরগিটি
আদপে লোকটা গাছের ফোকোরে নয়
তোমার মনের ভিতরে, তোমার মনের ভিতরে
[বিরতি]
আলোক : আমার মনের ভিতরে
আমার মনের ভিতর ?
কিছু নেই তোমার, তোমার মনের গভীরে ?
অনিমা : না, কি থাকতে পারে ? কেন থাকবে ?
আলোক : টর্চের আলোয় তাকে দেখতেও পাবে না
অন্তর্মুখী নির্জনতায়—
[বিরতি]

অনিমা : কেন এই অবসেশান এল ?

আলোক : সেই নিষ্ঠুর রাতের পর্ব

অনিমা : কোন নিষ্ঠুর রাতের পর ?

আলোক : লোকটা বললো : আমাকে বাঁচাও
বাঁচাও আমাকে

অনিমা : তা নাও বলতে পারে
আদিবাসীদের ভাষা তুমি তো বোঝ না

আলোক : আর্তনাদের ভাষা সর্বত্রই এক
এক ও আদিম, অপরিবর্তনীয় ধ্রুব
জীবনের জন্যে তার অসহায় আকুলতা চিরকাল এক, এক

অনিমা : আমি তা বলছি না

আলোক : তবে কি বলছো ?

অনিমা : মানে কত কিছু থাকতে পারে, মানে ইয়ে

আলোক : আর্তনাদ চিরকাল এক স্বরে কথা বলে অনু
তার আবেদন আমাদের বুদ্ধির বিবরে নয়
রক্তের ভিতরে। কানে গেলে গায়ে কাঁটা দেয়
সে চিৎকার করে বললে : আমাকে বাঁচাও
আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ
তার আর্তনাদ শুনে আমরা পালিয়ে এলাম

জানো অনু, তারপর থেকে মনে হচ্ছে
গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের ফলো করছে—

অনিমা : গোয়েন্দা পুলিশ ?

আলোক : হ্যা, মনে হচ্ছে ওদের চোখেই
আমরা সন্দেহভাজন

অনিমা : ভারতের গোয়েন্দা পুলিশ
এক আদিবাসী খুন হল
পরদেশী, আমাদের ফলো করতে যাবে গোয়েন্দা পুলিশ
থামো, নাটক করো না
যে দেশে প্রতি পলকে খুন হচ্ছে

পরিকল্পিত ভাবে খুন করছে
রাষ্ট্র দল ব্যক্তি সংগঠন—খুন করে দিব্যি আছে
থামো নাটক করো না

আলোক : বুদ্ধি হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু
যুক্তির নিপুন জালে অতিবড় অপরাধ
রাতারাতি শূন্য হয়ে যায়
আদালতে আকচার হচ্ছে
কিন্তু চৈতন্যকে ঘুম পাড়াবে কি করে
অবশ্য যদি সে চৈতন্য থাকে
জীবিত হলেই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে চৈতন্য থাকবে
এ কথা নিতান্ত মিথ্যা—

[বিরতি]

অনিমা : ট্রেন কি আসবে না
এ এক ভৌতিক স্টেশন
রেল আছে, গাড়ি নেই
স্টেশন রয়েছে, স্টেশনমাস্টার নেই
তাই আরো অসহ্য লাগছে
সব যেন স্থানু
অথর্ব সময়

আলোক : অথচ সময় নষ্ট দেহ রাত্রির শরীরে
আঁচড় কাটছে। অথচ সময়
সময় ধোপার মত আমাদের আছড়ে কাচছে
কিন্তু পরিচ্ছন্ন হবো কোন দিন
কোন দিন হবো না কি সময়ের পবিত্র স্তবক ?

অনিমা : এই হাড় হাভাতে ফ্ল্যাগ স্টেশনে আমরা
আমরা খাঁচায় বন্দী পশুর মতন

আলোক : আমরা যে খাঁচায় বন্দী পশুর মতন
এই বোধ, মানে, অভিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা
যা নাকি বাঁচার ধাঁচটা পালটায়
এই অভিজ্ঞতা যদি সত্যি অভিজ্ঞতা হতো
তা হলে হয় তো আমরা এমন হতাম না

অনিমা : আলোক, ছাখো ভাল করে ছাখো
মনে হল কারো শ্বাস যেন আমার ঘাড়ের ওপর
মনে হল আমাদের পিছনে কেউ
[আলোক টর্চ জ্বলে ওদিক সেদিক ছাখে।]

আলোক : না, কেউ না, মনে হয় মতিভ্রম
তোমার আমার, ভয়ার্ত কল্পনা
কিন্তু কেন ভয় ?

অনিমা : স্টেশনমাস্টার নেই, কোন কুলি পোর্টার—কেউ না ?

আলোক : এতো ফ্ল্যাগ স্টেশন, অন্তরীন
তুমি আমি অন্তরীন আমাদের স্বতন্ত্র সত্তায়
আমরা সাঁকো গড়তে চাইছি
ভেঙে যাচ্ছে, বারবার ভেঙে যাচ্ছে
সমস্ত অস্তিত্ব বিশ্ব নিসর্গ আকাশ মিলে মিশে সমুদ্র হচ্ছে না
[বিরতি]

আলোক : মানুষের মরণের ভাষা
কী ভীষণ অন্তর্ভেদী
পাহাড়ের নির্জনের ধারে এসে বুঝেছি এবার
হয়তো মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে
খুঁজে পায় আহত মানুষ
জীবনের প্রতি তার অন্ধ ভালবাসা

অনিমা : পাহাড় পৌরুষ আর এই মাটি নিষ্করুণ বলে
এখানে ধ্বনির ধাক্কা চেতনাকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে

আলোক : অথচ কলকাতা আমাদের চালাক কলকাতা

অনিমা : ধ্বনি নেই প্রতিধ্বনি নেই শুধু অন্ধ উত্তেজনা
প্রবঞ্চনা অনেক সহজ। কারণ সেখানে নেই
অন্তর্মুখী নির্জনতা

আলোক : অন্তর্মুখী নির্জনতা
তখনই সত্তার পাতাল দেখা যায়
দেখা যায় বুকের গভীরে ফুটন্ত ধাতুর লাভা

অনিমা : আমারও মনে হচ্ছে
ওমন ভাবে পালিয়ে না থেকে
মৃত্যুলগ্ন আদিবাসীকে জল দিয়ে

আলোক : জল দিয়ে শুশ্রূষু হাতের স্পর্শে

অনিমা : হয়তো মৃত্যুর আগে ও বুঝতো
জীবন তো আততায়ী নয়
নির্বোধ প্রেমিকও

আলোক : আর এই ফ্ল্যাগ স্টেশনে
গাড়ি এসে থামতো হঠাৎ
গন্তব্য পেতাম

অনিমা : এবং লক্ষ্য অর্থ ও তাৎপর্য

আলোক : জীবনের মরণের

অনিমা : অর্থ ও তাৎপর্য

আলোক : সময় সহিস হতো

অনিমা : আমরা সোয়ার

আলোক : ক্ষয়হীন বর্ষের ঢালুতে ফলভারে অবনত গাছ

অনিমা : করতলে সমুদ্র উপল

আলোক : হাতের এ রেখাগুলো নয়
নদী হয়ে যেত

আলোক : [চিৎকার করে]
নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বুকের ভিতর
বিশ্ব হাতে পারি না কখনো

অনিমা : নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে বুকের ভিতর
বিশ্ব হতে পারি না কখনো

আলোক : আর আমি বিশ্ব না হতে পারলে
বিশ্ব অর্থহীন, বস্তুপুঞ্জ, গরলের ফেনা

অনিমা : অসহ্য, অসহ্য সব
ভেঙে ফেলো
গুঁড়ো করে দাও

আলোক : সে ক্ষমতাও নেই

অনিমা : তবে ?
[নিরুত্তর স্তব্ধতা]

অনিমা : [হঠাৎ]
মনিয়া ডুকরে উঠলো

শুনতে পেলে ?
মনিয়া ডুকরে উঠলো
সারাগায়ে কেরাসিন ঢেলে
দাউ দাউ জ্বলতে জ্বলতে
মনিয়া ডুকরে উঠলো : বাঁচাও বাঁচাও
শুনতে পেলে ?

আলোক : না তো, ও তো রাতের পাখির ডাক

অনিমা : রাতের পাখির ডাক ?
মনে হল, আমি ঠিক শুনতে পেলাম
চটকলের মজুর মনিয়া
এক বছর লক-আউট
চিমনির মুখে বাবুই-এর বাসা
মনিয়া ভিক্ষে করে বাঁচতে গিয়েও
বাঁচতে পারে নি। মনিয়া নিজের হাতে
মেয়েটাকে গলাটিপে মেরে, নিজে
সারাগায়ে কেরাসিন ঢেলে
জ্বলতে জ্বলতে চিৎকার করলো :
আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও
হয়তো মরার আগে
খুঁজে পায় আহত মানুষ
জীবনের প্রতি তার অন্ধ ভালবাসা

আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও
আমরা কেউ বাঁচাতে যাইনি
যে যার নিজস্ব বৃত্তে দিব্যি সুখে আছি

আলোক : কেন ? শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত ঘরে
ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেছি
এ বলেছে—ওই শালা দোষী
ও বলেছে—এই শালা দোষী
এর ফাঁকে গদী পোক্ত করি
কটিন মাফিক হরতালও ডাকি

আবার মালিক বলে, আধুনিকীকরণ
তার রীতি হল এই, নরহত্যা
বিলেতের শিল্প-বিপ্লবের যুগে
তিনটে প্রজন্ম কি খতম হয় নি ?

যুক্তির মরফিয়া দিয়ে চৈতন্যকে অসাড় করেছি

অনিমা : অমন চিৎকার আমি জীবনে শুনি নি
বল্লমের মতো এসে হৃদ্‌পিণ্ড বিদ্ধ করে দিল

আলোক : লোকটা কি আদিবাসী ছিল ? ভুলে গেছি
মনে আছে পূর্ণিমার পাহাড়ের গায়ে
সে ছিল সজীব গাছ, উদ্ধত, স্বাধীন, নক্ষত্র-পিপাসী

জীবিত হলেই চৈতন্য থাকে না
সে-ই চৈতন্য যা জীবনকে তছনছ করে

অনিমা : চোখ খুলে, চেতনাকে প্রসারিত পরিচ্ছন্ন করে
বাঁচতে পারি না। চারপাশে এত খুন এত রক্ত
উলঙ্গ অন্যায়, লোভ, কখনো প্রচ্ছন্ন
কখনো বা ঘোষিত গর্বের সঙ্গে
প্রতিপদে পরাজিত মানবতা, আত্মসমর্পণ
চোখ খুলে থাকি যদি আত্মঘাতী হবো মনিষার মতো
হে ঈশ্বর আমাদের যন্ত্র করে দাও,
কর শুদ্ধ করি বা পিশাচ
না হয় আমলা বা মন্ত্রী কিম্বা শিল্পপতি
হে ঈশ্বর আমাদের পশু করে দাও

আলোক : ফিরবার পথ নেই আর
পশু হতে পারবো না কখনো
আবার মানুষ ?
তাও নয়—। না মানুষ না পশু
এই গোধূলি সীমান্তে উজ্জীবনের আশা নিয়ে ফাঁসির কয়েদি

অনিমা : তবে এই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আমরা
অস্তিত্বের খাঁচায় বন্দী
দিনরাত দগ্ধ হবো শুধু ?

আলোক : উজ্জীবনের আশা নিয়ে ফাঁসির কয়েদি
উই আর কনডেমড টু হোপ

অনিমা : নিরাশায় বলিদত্ত আশা

[বিরতি। স্তব্ধতা। হঠাৎ কর্কশ সঙ্গীত। সব যেন খান খান হচ্ছে। অনিমা ও আলোক প্রায় দৌড়ে মঞ্চ মুখে গিয়ে চিৎকার করছে]

অনিমা আলোক : স্টেশনমাস্টার, স্টেশনমাস্টার
আমাদের ট্রেন কি আসবে!
কখন আসবে?
স্টেশনমাস্টার, স্টেশনমাস্টার
কখনো আসবে কি আমাদের ট্রেন

[প্রতিধ্বনি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। অনিমা ও আলোক হাত ধরাধরি করে সামনের দিকে তাকিয়ে। সঙ্গীত। পর্দা।]

ভালো আছো ?

পূর্ণেন্দু পত্রী

ব্যাধ।

তত আধুনিক নয়,
তাই নির্বাসন।

আর কারো মুখস্থ মন্ত্রের
পুনরুচ্চারণ নই, তাই কাঁটাতারে
চিহ্নিত করেছ সীমারেখা।

এত দূরে, তবু শোনা যায়
হাসির হুল্লোড়, তৃপ্ত গান।
বাঘ-ছালে শুয়ে গড়াগড়ি
মজলিসি কথার মধ্যে বাষ্পে-টানা ইঞ্জিনের
ধোঁয়ার পাহাড়।
অক্ষরে পরাগ ছিল
সে অক্ষর দামামা হয়েছে।

নির্বাসনে কী সুন্দর শুয়ে আছি ঘাসে
একা একা।
শুয়ে আছি রাজছত্র মাথার উপরে
সমগ্র আকাশপট
ভারতবর্ষের।
এই কচি ঘাসগুলি নিজেদের কোমল আঙুলে
ঘোড়ার খুরের ছাপ,
আক্রমণকারীদের ভাঙা মুকুটের ছিন্ন কণা
ইস্পাত ফলক, লৌহ বেড়ি
সব কিছু লুকিয়ে ফেলেছে
শিকড়ের মাটির গভীরে।

নিজেদেব ঘাম দিযে মুছিয়ে দিযেছে
বক্তদাগ।
সভ্যতা সবুজ দেখতে
এই ঘাসগুলি ভালোবাসে।
ছেড়ে আসা,
সম্মোহন তবু রয়ে যায়।
হাতে ক্ষতচিহ্ন দেখে
স্মৃতি চমকে ওঠে,
নির্মাণেব দিনগুলি মনে পড়ে, ঝাপটা হাওয়া,
ছাতা নেই, তুখোড বর্ষণ।
পাথুবে শহর খুঁটি পুঁততে দেবে না
আবো একটা তাঁবু হোক সার্কাসের গড়ন না মেনে,
ক্ষীপ্ত ক্ষোভ।
কেনাবেচা যে বকম, সে রকমই সৃজনশীলতা,
এই জাল ছিঁড়ে যাবে কেন?

পেবেকে ভূমিষ্ঠ তুই,
কানে এলে শোক নিভে যায।
পেরেকেবই মত ছিলি গোটা ছেলেবেলা,
নিজেব নির্মাণ চোখে ভাসে।
পেবেকে থাকবি না আব?
ঘুম ছিঁড়ে সোজা হয়ে বসি।

পেবেক-ফলার মত ঘাসগুলি
বিছানা এখন।
কোথাও জননী নেই, তবু যেন ঠোঁটেব কাছেই
মাতৃস্তন।
ইউবিদিকে চতুর্দিকে
অর্ফিযুস নামে কাকে ডাকে।
ব্যাধ? না আমাকে?

ব্যাধ? ভালো আছো?
তোমার শিং ও দাঁত সব ভালো আছে?
জবায়ের ছুরিখানি? এবং মুখোশ?
ভালো আছে?

পাহাড়ের নীল ছায়া লম্বা নেমে গেছে জনপদে।
এখন শতধাদীর্ণ, আগে ছিল
আগ্নেয় পুরুষ।
আমাদের দীক্ষাগুরু,
দ্বন্দ্বের ছন্দের মাত্রা তাল, দর্পণে কোথায়
কীভাবে তাকাতে হবে, নিঃস্বের বিশ্বের
প্রতিনিধি হতে গেলে গায়ত্রীর কোন্ মন্ত্র,
সবই এই আগ্নেয় পাহাড়ে এসে শেখা।
আজ তার অস্থিসার, পাঁশুটে রঙের অবয়বে
বহুবর্ণ ঘুন।

ব্যাধ! আমি ভালো আছি
ঘাসে।
অতীব আদিম এরা। ইতিহাস জানে। ইতিহাসে
কী ক্ষতির কেমন মলম।

তোমার দরজা এত ছোট কেন,
সুড়ঙ্গেও এত সুখ পাও?
বাতাসের বাইরে থেকে মুখস্থ বুলির তোতাপাখি।
বলতো যখন সূর্য বলি
ঠিক কাকে ডাকি?

তুমি চেয়েছিলে বলে
ছেড়ে দিয়ে এসেছি চেয়ার।
ভাগ্যিস ছেড়েছি।
সব নদীনালা নৌকো এখন আমার।

যেখানে যা ইন্দ্রপ্রস্থ তার সব গম্বুজ খিলান
ছিন্নপক্ষ গরুড়ের সমস্ত পালক
প্রাচীন বটের পাতা, শত ঝুড়ি, সহস্র শিকড়
আকাশের চলচ্চিত্রে প্রতিক্ষণে এপিকের প্রতীকের নবরূপায়ন;
এই সব নিয়ে
কী বিরাট স্বেচ্ছানির্বাসন।

ভারতউৎসব

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

প্রথম প্রস্তাব :

ভারতীয় সংস্কৃতি এখন খুব সেয়ানা হয়েছে।
হৈ হৈ শিল্প হচ্ছে, নাচ, বাজনা, গান হচ্ছে, কিছু গ্রন্থশিল্পী
এই একবার যাচ্ছে রাশিয়া, অন্যবার আমেরিকায়
তার ফরাসীও সদ্য শেষ হলো, আগামী নব্বুই সালে
ভারত বেড়াতে যাবে পশ্চিম জার্মানী
ধন্য ধন্য রব ওঠে গোল পৃথিবীতে।

আমরা যারা স্বয়ম্ভু স্বদেশী! দেখি রামায়ণ কি করুণ,
মহাভারতের ভার নিয়ে অদূরদর্শিতা ধার্মিক টি ভি-র!
ভারতকে খুঁজতে খুঁজতে হন্যে হয়ে গেলেন শ্যাম বেনেগাল!
আমাদের সংস্কৃতিতে যে এত তুলো ছিল
আগে কে জানতো? ধুনে ধুনে শেষ করাই যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব :

ফ্রাঙ্কফুর্ট এয়ারপোর্টটা আমার খুব ভাল লেগে গেল
প্লেন থেকে নেমেই জার্মান বীয়ারের ঐতিহ্য সংস্কৃতি চেখে দেখি
স্বাদ সেই একরকমই বিখ্যাত কোমল!
আমেরিকায় যে কটি লেখাপড়ার যায়গায় আমি

ওদের অতিথি হয়ে ঘুরেছিলাম, কি অবাক দেখলাম
ঐসব ধার্য অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ পড়েননি তেমন।
আমি বিষাদপাথর হয়ে গেছি।
তবে হ্যাঁ, এটেনবরোর কল্যাণে এখন গান্ধীজীকে
আমেরিকানরা বেশ ভাল চিনেছেন।
হায়! জ্ঞানপ্রদর্শনীর যত সভা সম্মেলনে
নিমন্ত্রিত হয়ে যেতাম, আমাকে
পরিচয় করিয়ে দেওয়া হতো এইভাবে
"হিয়ার ইজ এ পোয়েট ফ্রম গ্যান্‌ডীজ ল্যাণ্ড"
শুধু ইণ্ডিয়ান বললে এখনো নাকি
অনেকেই রেডইণ্ডিয়ান বোঝে, তাই

তৃতীয় প্রস্তাব :

তবে প্যারিস লেগেছে ভাল, মোটামুটি কলকাতারই মতন রাস্তায়
টুকরো কাগজ, ছেঁড়া ন্যাকড়া আর বীয়ার কার্টুনের
লীন মেলামেশি দেখে শহরে ঢুকেই খুব মন ভাল হয়ে গেল।
মূল অসুবিধে হলো তাদের ভাষায় কথা না বললে
ইংরেজী বুঝলেও ফরাসীরা কোনো প্রশ্নের উত্তরই দেয় না।
যদিও আমার সঙ্গে বান্ধবী দোভাষী ছিল
কিন্তু সেরকম মতামত বিনিময় সম্ভব হয়নি।
বরং মূকাভিনয়েই ল্যুভর হ্য গল সেণ্টার,
এফেল টাওয়ার আর সা-জাঁ-লিজে ঘুরে বেড়াতে
সুবিধে হয়েছে। রাস্তায় বিপ্লবস্মারক খিলান দেখে
তাকে ছুঁয়ে ছবি তুলে ক্যাপশান দিলাম
"আমিও ফরাসী বিপ্লব"
ঠিক এইখানেই লেখা থাক আমার ভ্রমণ ছিল
ভারতীয় সংস্কৃতির গোত্রনাশ-তামাসার বেশ কিছু আগে।
রাজনীতি যখন কিছুতেই আর মাননীয় হয়ে উঠলো না
তখন ভারত থেকে কিছু কিছু শিল্পকর্মী বাইরে পাঠানো হলো!
শুনলাম একমাত্র সাহিত্য সঙ্গীত ছাড়া ভাস্কর্য ছবিতে

আমরা নাকি অনেক পেছনে। তবু বারবার দেশে দেশে গিয়ে
করজোড় প্রার্থনা জানানো হলে—মহাশয়গণ
এরপর আপনারাও ভারতে চলুন
আপনারা না এলে আমাদের ডলার, ডয়েশ মার্ক, ফ্রাঁ যে বাড়বে না।
হট হট করেও যখন গরিবীকে হটানো গেল না
তখন এসব আর্ত উৎসবকে তো বাইরে পাঠাতেই হবে
না হলে খুবই ক্ষতি হয়ে যাবে কারো কারো কীর্ণ কারেন্সীতে!
কামান বারুদ নিয়ে, তহবিল তছরূপ নিয়ে আলোচনা চলছে চলুক
শুধু শিল্পের মস্করা নিয়ে ক্ষয়-ক্ষতিগুলি
ঘুণপোকা হয়ে যে ক্রমশই নষ্ট করে দিচ্ছে
আমাদের বেদ-অহংকার, সূর্যমন্দিরে ভগ্নাংশ পাথর
অর্কপ্রভ হয়ে উঠে আর সমুদ্রকে কাছে ডাকছে না—এ সবল সত্য
কে বোঝাবে?

তবু সংস্কৃতি বেড়াতে যাবে, মিন্ট থেকে
সদ্যছাপা হতভম্ব কারেন্সীনোট তাকে
শীততাপনিয়ন্ত্রিত সঙ্গ দেবে
ভারতের ট্যুরিষ্ট তামাসা-শিল্প পৃথিবীবিখ্যাত হয়ে যাবে

তুমি কি এখনো বলবে আমি নিতান্তই এক নিন্দুক কলমবাজ
যে মন্দ ছাড়া কোনো ছন্দ লেখেনি কখনো!
আমাকে কে তোয়াক্কা করছে এই সংসদীয় দেশে!

মামা-ভাগ্নের গপ্‌পো

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

'ও ভাগ্‌না, ভাগনা আছো নাকি ?' হর দোর-গোড়ায় হাঁক পাড়ে।

ভাগ্‌না অর্থাৎ মেঘা ঘরে শুয়ে বলে, 'শালা', বাপের শালা হ'তে যার সাধ, তাকে নিজের শালায় পরিণত করেও পূরো আশ মেটে না মেঘার।

'ভাগ্‌না—' দরজা ধরে ঠেলছে হর।

মেঘা তাও সাড়া দেয় না। মেঘার বৌ কাতু উঠে দরজা খুলে দিয়ে ভেতরে চলে যায়। হর ঘরে ঢোকে : 'আওয়াজ দিস্ নি কেন ? ঘরেই তো রইচিস্।'

মেঘা খেঁকিয়ে ওঠে : 'না ঘরে নেই। ডাকাতি করতে বেরোইছি।'

'সেই দেখতেই তো আসি।'

'তা দেখলে-টা কী ?.

'তুই বোষ্টম হয়ে গেলি রে ভাগ্‌না। সত্যি তাজ্জব'।

'তাই তোমার বড় কষ্ট, তাই না মামা ?'

'দুর। আমার কষ্ট হতে যাবে কেন ?'

'অন্যের ভাল হলে তোমার কষ্ট হয়। হয় না ? বল মামা। তাছাড়া তোমার ভাগ।'

'ভাগ! বড়বাবু-ছোটবাবু খায়। আর এখন আমি তো রিটায়ার দিইচি।'

এটা মেঘা আগেই শুনেছে। রিটায়ারের আগে ডিউটি থাকে, মামারও ছিল। চৌকিদার বা দফাদার এই রকম একটা কিছু হবে। কিন্তু তার আসল কাজ ছিল খবর জোগাড় করা। তখন থেকেই এ বাড়ীতে মাঝরাতে তার আনাগোনা। খবর নিত, মেঘা রাতে বাড়ীতে আছে কি না, না কি ডাকাতি-বাহাজানি করতে গেছে। তার তখন তবু একটা মানে ছিল। তখনও হর ওরফে মামা ওরফে টিকটিকি একটা পদস্থ সরকারী কর্মচারী। সরকারেরও শক্ত শাখা পুলিশের লোক। দরজা তার জন্যে খুলতেই হবে। যত রাতই হোক। বৌর পাশ থেকে টেনে তুলে আনবার, ঘুম থেকে জাগাবার হক আছে ওদের। কিন্তু এখন হর রিটায়ার দিয়েছে। তাও রাত-বিরেতে হানা দেয় কেন? তবে পুলিশী কেতায় কত কীই আছে। প্রশ্নটা তাও করে ফেলে: 'হ্যাঁ গো, মামা, পুলিশ তো ছাড়ে না আমাদের মতো চোর-ডাকাতকে। তোমায় ছাড়ছে না কেন? তুমিও কি মোদের দলে নাম লেখালে নাকি? রিটায়ার দিলে, তাও—'

'দূর। আমি কি তোর কাছে কোন কাজে আসি নাকি? তুই একটা পুরনো লোক তোকে দেখতে আসি।'

'মাইরি! তোমার বড় পীরিত আমার ওপর। আর পীরিতের দেখা তো রেতের অন্ধকারেই হয়। মাঝ রেতে। তা কেমন দেখলে?'

'দেখলুম তো। কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ রে, তুই কাজ-কারবার একেবারেই ছেড়ে দিলি? এই জোয়ান বয়সে?'

'জোয়ান আর নেই গো! হাড়ে ঘুন ধরেছে।'

'ও ঘুনের হাড়েও ভেল্‌কি আছে রে তোর। একা দশটা লোকের মহড়া নিতে পারিস।'

'তা পারি গো মামা তোমাদের পাঁচ জনের আশীর্ব্বাদে। কিন্তু না, আমি আর ও পাপের কাজ করব না।'

'তুই তো এমন পুণ্যির লোক ছিলি না রে। তুই কি সন্নিসি হবি নাকি রে! ভয় পেয়েছিস? আমরা থাকতে ভয় কী রে। এমন একটা রমরমা কারবার তোর! খাবি কি? এত ভয় তোর? পাপের ভয়? নরকের ভয়? ভগবানের ভয়?'

'না, না, ও সব বাজে জিনিসের ভয় নেই আমার। ভয় মারে। মামা, মার খেয়েছ কোনো দিন?'

'তা আর খাই নি? পুলিশের টিকটিকি, মার খাব না? একবার জুতো

মেরেছিল। একবার কান মুলতে লাগলো। বলে কি, কানদুটো কেটে নেবে। আবদার ভাব শালাদেব। বাপ-মাযেব দেওয়া কান, শালারা কেটে নেবে। অনেক কষ্টে সেবার কানদুটো রক্ষে পেযেছে। আব একবার আমার কাপড খুলে নিয়ে—'

'ওগুলো মার নয় মামা। ওগুলো তোমায ইজ্জত মেরেছে। আমি বলছি, মাব। খাঁটি মার। দুশো-চাবশো মানুষ মাবতে লাগলো তোমায়। যে যা দিয়ে পারছে পেটাচ্ছে। একটু বাদেই তুমি বুঝলে। এবা নিছক পেটাতে আসে নি। খুন করতে নেমেছে। তোমার গতরে কাপড কি কান আছে কি নেই, সে-সব তোমার মনেও পডবে না। শুধু মরণ। পাঁচশো যমদূত তোমার চামডা মাংস রক্ত দিযে একটা খণ্ড বানাচ্ছে। সেই ইঁদুর-মারা বলে না, ঐ জাতের ব্যাপার, কিন্তু আবো আক্রোশ।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখেছি বই কি। জগা ডাকাত যখন ধরা পডল, লোকে ঠিক এই করেছিল। কান তো দূর অস্তক, হাত পা খুলি খাঁচা কিছুই খুঁজে পাওযা দায়।'

'আমিও দেখেছি। জগাকে দেখেছি। আরো দেখেছি। আগে লোকে ডাকাত-চোর ধবলে পুলিশে দিত। এখন লোকে পুলিশের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না। পুলিশ তো এই তোমার মতো সব। তাই লোকোরাই চোর-ডাকাতকে রক্তমাংসের ডেলা পাকিয়ে দেয।'

'এ ভয তো বরাবরই ছিল ভাগ্না। তা বলে কি জাত-ব্যবসা ছাডে?'

'টিকটিকিরা ছাডে না। রিটায়ার দেওযাব পরেও টিকটিকির ভূত হয়ে চলে।'

বাইরেব আকাশ ফর্সা হতে সুরু করেছে। ঘবেও তার আভা। ধীরে বলে মেঘা, 'আব এট্টা কথাও আছে। ছেলে ডাঙব হযিছে না? ওব ছামুতে এক ঘা জুতোও পবাণে বড বাজবে। তাছাডা বযসও তো কম হোলো না। আমাবও তো রিটাযার চাই, না কি?'

'কিন্তু তোর ভাল লাগবে এই নিরিমিষ্যি চলন? কী রে কথা বলছিস না যে।'

কী বলবে মেঘা! তার নখ দাঁত খুলে বাখতে না রাখতেই রিকশাওয়ালা অবলীলায় গায়ের ওপর দিযে বিকশা চালায, মাছওযালা দামী মাছ দেখাতেই চায না। বাস্ওযালা গাডী থামায় না।

'খাবি কী? আর কোন কাজকম্মো জানিস্? চাকরিই বা তোকে দেবে

কেন? পুলিশের খাতায় তোর নামে কী সব লেখা আছে—তার পরেও তোকে চাকরি দেবে কে? তোর সাকরেদ যারা ছিল, তারাও তো বসে পড়েছে। তারা কিছু দিতে পারবে না। তাদেরই খাবার জুটছে না।

এ সব কথা জানে মেঘা। তবু হর-র মুখে শুনে বুকে একটা জ্বলুনি বোধ করে। একটু থমকে থেকে বলে, 'একটা কাজ দাও না। কি, চুম্ মেরে গেলে যে।'

'চুম্ মারবার কিছু নেই। হিজলগাঁর হালদার বাড়ী। সব ঠিক করে দেবে ওদের বাড়ীর কাজের লোক। কথাবার্তা হয়ে আছে। তুই গেলেই—

'ডাকাতি?'

'তুই তো আর ডাকাতি করবি না। তাহলে চুরি।'

'না, মামা। তুমি আমায় অন্য কাজ দাও।'

'তুই কী কাজ করবি? জজ-মেজিষ্টার হবি?'

'তুমি কি এই কাজের কথা বলতেই আজ এয়েছ?'

'হ্যাঁ। কার কাছ থেকে জানিস?'

'বড়বাবু।'

'হ্যাঁ।'

'এত তাড়াতাড়ি বড়বাবুর হাত খালি হয়ে গেল?'

'তোরা যদি না দিস তবে বড়বাবুর হাত তো খালি হবেই।'

'বড়বাবু কি আর একা আমার হাতে ভাত খায়।,

'বড়বাবু কিন্তু সত্যি-মিথ্যে পাঁচটা মামলায় ঝুলিয়ে দিতে পারে তোকে। থানায় আটকে গো-বেড়ন দিতে পারে।'

'সে তো জানিই। আমার ডাঙায় বাঘ, জলে কুমীর।'

'বড়বাবু বলেছে, যুধিষ্ঠিরের বাচ্ছাকে বলে দিস, যুধিষ্ঠিরও পাপ করেছিল। সেইজন্যে সগ্‌গে যেতে হোঁচট খেয়েছিল।'

'আরে বাবা, যুধিষ্ঠির-ফুদিষ্ঠির নয়। ভয়, স্রেফ ভয়। ভয় জানে না বড়বাবু? নকশাল আমলে চাকরি করে নি?'

'বড়বাবুকে তুষ্টু করে চলাই ভাল, বুঝলি। তেনার ইচ্ছে মেনে চললে ভালো থাকবি। নইলে—'

'মামা, তুমি কি আমায় ভয় দেখাচ্ছ? তোমার বড় বাপকে গিয়ে বলে দিয়ো, এই ম্যাঘা মণ্ডল কারুর বড় বাপকে পরোয়া করে না।'

'তুই মিছে রাগ করছিস। বড়বাবু কি নিজের জন্যে করে নাকি?'

'না। মরা বাপের ছেরাদ্দের জন্যে করে।'

'জ্যান্ত বাপের জন্যে করে। বড়বাবুরও বড়বাবু আছে। তারও বড়বাবু আছে। তারও—। শেষ চূড়ো-টা কোন্ আকাশে ছুঁয়েছে কেউ জানে না। এই টাকার জোগান তো বড়বাবুকেই দিতে হয়।

'বড়বাবুকে নয়। তোমার ভাগ্নেকে দিতে হয়।'

'একই কথা।'

'একজন পেটায়। আর একজন পিটুনি খায়। একই কথা হল?'

'মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ কর। ছেলেকে তৈরী কর। তাপর বিটায়ার দে।'

'না ছেলেকে আমি এ লাইনে দোব নি।'

এমন সময় একটি ল্যাংটা শিশু টলমল করতে করতে ঘরে ঢোকে। তার পেছনে 'খোকা ও খোকা' বলতে বলতে ঢোকে ন্যাংটো একটি নবীন যুবক। ন্যাংটো খোকা এর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে মেঘার কোলে। বোঝা গেল, খোকা তার মা-র কাছ থেকে পালাবার জন্যেই এখানে ঢুকেছে। হর-র চোখ ন্যাংটো খোকার দিকে পড়ে না, পড়ে নবীন যুবকের দিকে। 'বাদ্‌লা না? আয় রোস। এ কী, তোর এ দশা করলে কে? মুখে-চোখে কিসের দাগ রে নাতি?'

'তোমরা কথা বল।' বলে মেঘা নাতিকে নিয়ে ভেতরে যায়।

বাদ্‌লার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সাদা ব্যাণ্ডেজ ফুটে বেরিয়েছে রক্ত—এখন শুকিয়ে কালো, ঠোঁট ফেটে ফুলে রয়েছে। হাতে পিঠে বুকে জালশিরের দাগ। প্রথমে বাদ্‌লা বলতে চায় না। কিন্তু হর জেরায় জেরায় বার করে সব কথা।

শঙ্কু মাছের আড়তদার। সেখানে কাজ করে বাদ্‌লা। ভোর রাতে যেতে হয়। দুপুর হতে না হতেই কাজ শেষ। রোজ দশ টাকা। দেরী হলে জলখাবার দু টাকা। দুপুরে এ চাকরির ছুটি। দুনম্বর চাকরি সুরু। এর জন্যেও আলাদা পয়সা পায় বাদ্‌লা। খুব বিশ্বস্ত লোক ছাড়া এ কাজে শঙ্কু কাউকে করে না। শঙ্কুর পাড়াতে থাকে তুলসী। তার কারবার কলকাতায়। সুতরাং সে সারা দিন বাড়ীতে থাকে না। তুলসীর বৌর সঙ্গে ভাবসাব আছে, শঙ্কু দুপুরের শেষটুকু এখানেই কাটায়। কিন্তু সতর্ক শঙ্কু একটি পাহারা রাখে। অদূরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে লুকিয়ে বসে থাকে বাদ্‌লা। চোখ খোলা রেখে বসে থাকাই তার ডিউটি। 'সন্দেহজনক' কেউ এলেই দৌড়ে শঙ্কুকে

খবর দিয়ে আসতে হবে। সে-রকম খুবই কম ঘটেছে। ঝোপের মধ্যে ভোরে-ওঠা বাদ্‌লা ঘুমিয়ে পড়বারই কথা। কিন্তু তাকে জেগে থাকতে প্রচণ্ড সাহায্য করতো মশা, কখনো বা দু-একটি জোঁক।

একনম্বর চাকরি-টা অত্যন্ত তুচ্ছ মনে হোতো মেঘার, দ্বিতীয় চাকরিটা মনে হোতো ঘৃণ্য। আর দুটো চাকরির একসঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। একটা ছাড়লে দুটোই ছাড়তে হয়। পরের বৌর সঙ্গে পীরিত পাহারা দেওয়ার নাম চাকরি। ওর থেকে চুরি-ডাকাতিও অনেক ভাল। কিন্তু না, মেঘা নিজে ওসব ছাড়ছে, ছেলেকে ও কাজে আনবে কী করে? সুতরাং পীরিতের পাহারার পার্টটাইম চাকরি চলছিল। ভালই চলছিল। শঙ্কু বিশেষ প্রসন্ন বাদলার কাজে। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো। বজ্রের মতোই মুষ্টি ও যষ্টির আঘাত বৃষ্টির মতো অঝোরে ঝরতে লাগলো ঝোপে-বসে-থাকা বাদলার ওপরে। ফোলা ফাটা রক্তচিহ্ন নিয়ে ছুটে আত্মরক্ষা করলো। কিন্তু আত্মরক্ষার তাগিদে প্রভুকে রক্ষার কথা তার মনে আসেনি। কোন খবর দেয় নি, দেওয়া সম্ভবও ছিল না। শঙ্কু প্রায় হাতেনাতে ধরা পড়ে, কাঁছা-কোঁচা মুঠোয় চেপে মুষলধারার মধ্য দিয়ে কোনক্রমে প্রাণে বাঁচে। বেঁচেই তার রোষ পড়ে প্রহরী বাদলার ওপরে। সুতরাং প্রহরী বাদলা দ্বিতীয় দফায় বেদম মার খায় তার মনিব শঙ্কুর লোকেদের কাছে। দুটো চাকরি খুইয়ে বাদলা এখন স্বশরীরে সেবা করছে।

ছেলের রক্ত দেখে মেঘার ডাকাতিয়া রক্ত ঝাঁকি মেরে উঠেছিল। কিন্তু সে তো এখন আর ডাকাত নয়। সে তো এখন ভালো হয়ে গেছে। যেদিন ছেলে ঐ চাকরি নিয়েছে, সেই দিন সবাই আরো জেনে গেছে যে মেঘা এখন কত ভাল কত নিরীহ হয়েছে। সুতরাং আজ নিজের হাত নিজের কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। শেষ পর্যন্ত সে ছেলেকে বললো, 'যা পুলিশে যা।' পুলিশ তার ডায়রি নেয় নি। এদিকে শঙ্কু শাসিয়ে গেছে যে তার বাড়ি থেকে বাসন-কোসন চুরি হয়েছে, এবং এগুলি যে বাদলা নিয়েছে তাতে তার বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই। সে যে কোন মুহূর্তে পুলিশে যাবে।

ঘরে ঢোকে মেঘা। হর বাদলাকে বলে, 'পরে আমার সঙ্গে দেখা কোরো।'

মেঘা বলে, 'নাও গো মামা, এটুটু চা খাও। দুলু, বাদলার বৌ করে দিলে। যা রে বাদ্‌লা, চা খেয়ে নে।' বাদ্‌লা ভেতরে চলে যায়।

হর বলে, 'ভাগনা, সত্যি তুমি সন্ন্যিসি হয়ে গেছ।'

মেঘা বলে, 'ক রাত তো ঘুমোই না। চোখ বুঁজলেই ছাল-ছাড়ানো বাদ্‌লার চেহারাটা ভেসে ওঠে। কিন্তু আমি কী করব মামা। আমি যে ভালো হয়ে গেছি।'

'ভালো না ভীতুর ডিম।'

'ঐ একই হোলো মামা।'

'চল ওঠ।'

'কোথায়।'

'একবার বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবি।'

'থানায়?'

'হুঁ। বড়বাবুই বলে দিয়েছে।' হর-র গলার স্বরে বোঝা যায় যে ও বড়বাবুর হুকুম নিয়ে এসেছে। না গিয়ে উপায় নেই। শেষে লোকের চোখের সামনে পিছমোড়া করে বেঁধে নেবে। সুতরাং—যেতে হয়। বাদ্‌লার বিকৃত চেহারা, তার পেছনে খোকা-কোলে দুলু, তারও পেছনে বৌ, কাতু। কাতুকে বুড়ি-বুড়ি দেখাচ্ছে।

থানায় বড়বাবু ভীষণ ব্যস্ত। দক্ষিণের এই জলজঙ্গলের এলাকার মানুষের দারিদ্র্য বেশি। শান্তি-শৃঙ্খলার জিম্মাদার বড়বাবুর সময় তাই কম। 'আজ রাতটা থেকে যা। কাল কথা হবে।' যেন কোন অতিথিকে বলছেন। কিন্তু এ অতিথিকে থাকতে হয় হাজতে। হর সান্ত্বনা দেয়: 'কাল সকালে ছাড়া পেয়ে যাবি। রাজী হয়ে যা।'

অন্ধকার হাজতবাসে মেঘার বুকে একটা জ্বলুনি শুরু হয়। বিনা কারণে, অথবা বড়বাবুর টাকার কারণে, তাকে আটকে রাখা হচ্ছে।

সকালে তিনটি ডাকাতির মামলায় জড়ানো হয় মেঘাকে। পুরনো কেচ্ছা, সে-সবের টাকা মেঘা ও বড়বাবু দুজনেরই হজম হয়ে গেছে। বড়বাবুর আচরণ খুবই সরকারী। ডাকাতির মামলার বাইরে কোন কথাই নেই। যেন চেনেনই না। বেসরকারী কথা অবিশ্যি সর্বদাই বলে যাচ্ছে হর। বড়বাবু খুব চিন্তিত মুখে বলেন, 'কী করা যায় বল্ তো।'

'চালান দিয়ে দ্যান। আট-দশ বছর ঘানি টেনে আসি।'

'খুব ঘানি টানার সখ হয়েছে দেখছি।'

'সখ নয় বড়বাবু। এ সবই আমার পাওনা ছিল। আমাদের কথাবার্তা হয়েছিল, লেনদেন হয়েছিল। ঘানি এড়িয়ে গিয়েছিনু। এখন আপনার ধম্ম যদি বলে, ঘানি চাপিয়ে দিন, তবে টাকাটাও ফেরত দিয়ে দেবেন।'

কথা শেষ হওয়ার আগেই কলের প্রচণ্ড বাড়ি পড়লো মাথায়। 'শালা।'

রক্তটা মুছে মেঘা বলে, 'এটাও আমার পাওনা ছিল।'

'শালা যুধিষ্ঠির।'

'আমি ও সব কিছু নই, বড়বাবু। আপনি মিছে আমায় দুষছেন।'

হরও বোঝাতে চেষ্টা করে। মেঘাকে বলে, 'ভাগ্‌না, কেন খুঁচিয়ে ঝগড়া করছিস্‌।'

'আমি আমার ঘরে না খেয়ে পড়েছিনু। খোঁচানু আমি? তবে ও তুমি বুঝবে না মামা। তুমি হলে গে' দালাল। আর আমি শালা একটা ডাকাত।'

বাদ্‌লা দেখা করতে আসে। রক্ত-চিহ্ন দেখে চমকে ওঠে। বলে, 'বাপো, ওরা কি তোরে মেরেছে?'

'ও কিছু না রে বাপ, ইজ্জৎ কিনতে ওটুকু লাগে।'

বাদ্‌লা হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে: 'আমি যে কী করি।'

হঠাৎ-অস্থিরতায় ধাক্কা লাগে মেঘার বুকে। সত্যি তো, শুধু সে একা তো নয়। ছেলেটার কী হবে? বলে, 'বাপো, তা লে কি বাজী হয়ে যাব?'

'না, না, সে-কথা কই নি। কী করি সেটা ভেবে ভেবে তল পাই নি।'

'আমিও সব কথা ভাবার ফুরসৎ পাই নি। ভেবেছিনু বড়বাবুর সঙ্গে খেলাটা শেষ অবধি খেলব। কিন্তু তা হয় না। ব্যাটার কথা ভাবতে হয়। আমার নাতি—'

'এ সব কী ভাবছ তুমি। তুমি যেমন আছো তেমনি থাকো। তোমার চোষালে চোখের কোলে রক্তের দাগ দেখে ভেব্‌লে গিয়ে ও কথা বলিছি। আমার কথা তোমায় ভাবতে হবে না, তুমি তোমার রাস্তায় চল।'

'আমার রাস্তা! সে কি আর তোকে, খোকাকে বাদ দিয়ে রে!'

'আমি চলি।' চলে যায় বাদ্‌লা।

পর দিন যেন ভোজবাজির খেলা শুরু হয়। মেঘাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বলতে গেলে খাতির-যত্ন করেই সবাই বিদায় দেয়। মেঘা ভ্যাবাচ্যাকা খায়: 'কী হোলো।'

হর বলে, 'কি আবার। এট্‌টা ভাল লোককে তো আর সত্যি জেল দেওয়া যায় না। আর তুই তো এখন পূজো-পেন্নাম পাবি।'

'কেন? কেন?'

'শুধু ভালোর কদর নেই। ডাকাত থেকে কি কালোবাজারী থেকে ভালো হলে তবে নাম।'

বড়বাবুও হাসিমুখে বিদায় দেন। বলেন, 'মেঘা তুই যেন চিরকাল ভালই থাকতে পারিস।'

তার ভাল থাকবার জন্যে বড়বাবুর এত মাথাব্যথা কেন? তবু সেলাম করে বড়বাবুকে: 'বেয়াদপি সব মাফ করে দেবেন, বড়বাবু।'

বাদ্‌লাও খুশী। কিন্তু চোখের কোলে কী একটা আবছা অন্ধকার যেন! তাহলে মেঘা ছাড়া পাচ্ছে বলে কি খুশী হয়নি ছেলেটা! না, না এসব কী ভাবছে মেঘা। 'চল্, চল্. বাড়ি যাই।'

'তুমি এগোও, আমি আসছি।'

হর মেঘার সঙ্গ নেয়। মেঘা বলে: 'মামা, কী হোলো? বড়বাবু ছাড়লো কেন?'

'বিনাদোষে আর কদিন আটকে রাখা যায় একটা লোককে। দেশে আইন আছে না!'

বাড়ি। আঃ। বড় খুশী লাগলো, ভেতরে ভেতরে এত ভালবাসে সে এই ভাঙা বিধ্বস্ত বাড়িটাকে?

হর বলে, 'যাই ভাগনা। ঘরের লোক তোমায় দেখতে চায়।'

'মামা, কথাটা বলে যাও।'

'কোন কথা নেই।'

মেঘা এইবার হর-র কলার চেপে ধরে: 'শালা, তোকে খুন করব।'

'বলছি, বলছি। বাদ্‌লা তোর কাজ করবে। ঐ হালদার বাড়ি। তোর তো সত্যি বয়স হয়েছে। বাদ্‌লা জোয়ান।'

'পাঁচশো লোক মারলে জোয়ান করবে কী?' যেন কেঁদে ওঠে মেঘা। তার চোখের সামনে খোকা। বাদ্‌লার পরে কি খোকাও যাবে ঐ পথে? দুলুর চোখ দুটো টস্‌টস্ করছে। কাঁদিস না রে দুলু? ঐ দেখ কাতুকে। বুড়ী ও চিরকাল ছিল না।

'যাই।' হর যায়। ওর রাত-বিরেতে এ বাড়িতে হানা দেওয়া অব্যাহত রইল। যখন-তখন এসে হাঁক দেবে: 'কই হে ভাগনা, আছো নাকি!' না, ভাগনা বলবে না। বলবে, নাকি। না, না, ভাগনাই বলবে। এ যে জন্মজন্মান্তরের সম্পর্ক, মামা-ভাগ্নের সম্পর্ক। অবিচ্ছেদ্য।

চুহার ৪০ দৌড়

জ্যোৎস্নাময় ঘোষ

আরে এ চুহা -

চুহা—আ—আ—

দু-রকমের দুটি কণ্ঠ উচ্চ গ্রামে হেঁকে বেড়ায়। একটি কণ্ঠ তীক্ষ্ণ সুরেলা কিন্তু খরখরে। মনে হয়, গলার ভেতর শিরীষ কাগজের মাজাঘষা চলছে। অন্যটি গীর্জার ঘণ্টার মত গম্ভীর ধাতব ধ্বনি ছড়ায়, গমগম করে বাজে।

হাঁক দুটি সহসা মরে যায় না, শূন্য প্রান্তরে ঘুরে বেড়ায়। সেদিকে কান পেতে রেখে খরখরে বলে, শালা সট্‌কেচে।

ঘণ্টা মাথা ঝাঁকায়।

তার দিকে কুটিল চোখে তাকিয়ে খরখরে। মনে হয়, পিছলে পিছলে যাচ্ছে তার চোখ। ঘণ্টার পেছল মুখ সে খুঁজে পায় এক সময়, বলে, মিত্তির, শালা সট্‌কেচে।

মিত্তির আবার মাথা ঝাঁকায়।

আমি জানতুম। এ-ও জানতুম, আমার বউ মাগীটা পাইলে যাবে। জানতুম। মিত্তির জানতুম, বুঝেচিস?

ব্বা, না জানলে সোয়ামি কিসের—

তবে! তুই শালী যদি চলিস ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। 'পাতায় পাতায় ঝরে নিশির শিশির।' এমনি পড়েচিলুম? তা ভাগ্‌লি

ভাগ্‌লি ট্রাক ডাইভারের সঙ্গে ভাগ্‌লি! দেশ-গাঁয়ে ইজ্জতের হাওয়া খুলে দিয়ে গেলি আমার, অ্যাঁ! মিত্তির—

ছ্যাঃ।

এই পেট্রোল পাম্পে যত বীরত্ব তোর। বললুম যে, একদিন গিয়ে থুতু ছিট্টে দে আয়। গেলি?

যাই নি। তা, না থাকলে কী করব? শিশিরের বউটা কিন্তু বেশ সোন্দর। মনটাও দরাজ। চা খাওয়ালে, খাস্তা

কার বউ?

প্রশ্নটা শুনেই ঝিম মেরে গেল মিত্তির।

'শিশিরের বউ'। বেটা কায়েতের বুদ্ধি রোজ। আরে, মরা ইস্তক ও-শালী এই শর্মার বউ হয়ে থাকবে। শিশির, শালা ছোটলোক না হলে বুজত, জন্মভর একটা দু নম্বরি মাল বয়ে বেড়াতে হবে। ছেলেটাকে বেজায় ঠক্‌কেচে, বুয়েচিস? আরে এ চুহা—

চুহা—আ—আ—

হাঁটতে হাঁটতে থমকে পড়ে চুহা। মনে মনেই বলে, মরুক চেঁচিয়ে হাড়গিলে বিট্‌লেরা। রাত কাঁটায় কাঁটায় দশটায় পাম্পের মালিক মেজো মজুমদার চলে যেতেই বোতল খুলে বসে পড়ে ক্যাশবাবু আর নাইট গার্ড ফিঙে মিত্তির। তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় হুকুম—ছোলা নিয়ে আয়। রাত যত বাড়ে ছোলা ততই চানা হতে থাকে। তখন, চানা লে আও।

একখানা মেটাডোর ভ্যান তার পাশ ঘেঁষে বে-রে করে চলে যেতেই, নয়ানজুলির ওপর লাফিয়ে পড়ে চুহা। এই জাতীয় মহাসড়কে উন্মত্তের মত ছুটে চলে সবাই। ফুল পাঞ্জাবের মত হেভি গাড়িও পাল্লা দেয় রাজদূত জিপ মারুতির সঙ্গে এই মহাসড়কে। অ্যাকসিডেন্ট এখানে নৈমিত্তিক ঘটনা এ-পথের পরতে পরতে জমে আছে মানুষের রক্ত। গতির কাছে নিত্যদিন এখানে পরাভব মানুষের।

বাঁ হাত আর হাঁটুতে ভর দিয়ে উঠে বসতেই ডান হাতে ধরা শালপাতার ঠোঙা থেকে ভিজে ছোলার গন্ধ পায় চুহা। ঝটিতি চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে এক মুঠো ছোলা মুখের ভেতর পুরে দিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকে।

আরে এ চুহা—নিজেকেই নিজে ডাকে, মনে মনে।—চুহা—আ—আ তার বাপের গলায় অবশ্য এ-রকম কোন সুর খেলে না। কেমন যেন ধমকে ওঠে, চু-হা। রুক্ষ চেহারার মতই গলাখানাও রুক্ষ তার। খোঁচা খোঁচ

দাড়ি। একমাথা চুল—কোথাও বা জট, কোথাও বা ফিকে হলুদের ছোপ। ডান হাতে স্টিলের বালা। চোখ লাল। সব সময় কী যেন জ্বলে তার ভেতর। তার উত্তাপে সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিতে চায় অধর, চুহার বাপ। ওয়েল্ডার হিশাবে নামডাক রয়েছে। তবু, চুহা তার এই তের বছর বয়সে কত কারখানায়ই না কাজ করতে দেখল বাপকে—

বাতাস কাঁপিয়ে ডাকটা শোনা যায় আবার। চুহা বোঝে, এবার খেপে উঠবে তারা। আর দেরি নয়। তা হলেই চড়চাপড় খিস্তি—মনে হতেই বড় বড় পা ফেলে সামনে এগোয়। পাম্পে ঢোকার মুখেই কাচঘরের ভেতর ফিঙে মিত্তিরকে হেসে কুটোপাটি হতে দেখল। খানিকটা এগোতেই শিরীষমাজা গলা থেকে বগ্‌বগ্‌ করে উঠে আসা কিছু কথা কানে যেতেই থমকে পড়ে চুহা।

হাসচিস, অ্যাঁই! বাউনের প্রেস্টিজ পাংচার করে দিল শালী, আর তুই—

কামড়ে দিল, এ্যা—

একেবারে কুত্তার মতন—খপ। বিবেচনা দেখ। তুই শালী, কুড়মুড় করে দু-খানা চপ সাঁটলি, গপাগোপ রসগোল্লা খেলি গণ্ডাখানেক, আর হাতখানা ধত্তে না ধত্তে দাঁত বসিয়ে দিলি।

তোমাকে তো বলেচি চক্কোত্তিদা, যে আমি না থাকলে ও-সব কত্তে যেত না। যেই দুদিন ছুটি নিয়েচি

আরে, এ মেয়েছেলে সামলানো তোর কম্ম নয়

কী যে বল না। আমি হচ্চি গে নাইট গার্ড। কত রকম প্যাঁচ জান্তে হয় আমাকে। এট্টা পনের-ষোল বছরের আবাত্তি ছুঁড়ি

বহু রাত্তি বুড়ি মরে এরম দু-একখান ছুঁড়ি জন্মায়। খোঁজ নে দেখ, এর মদ্দে শালীর দাড়ি-গোঁপ যদি না উট্‌টে থাকে তো কী বলচি।

ধুস। কী যে সব বল।

অ্যাঁই! জেনে রাখ, কোন কোন মেয়েছেলের দাড়িগোঁপ থাকে। কারো কারো হয়ত চাপা থাকে, আমার বউ-এর যেমন। এরা হচ্চে গে ভয়ঙ্কর।

মেয়েছেলের গোঁপ-দাড়ি। দেকিনি তো। উঁহু।

আরে, অদ্দকাংশের চাপা থাকে। আমি জানব না, অ্যাঁ? তোর শালা বউ মরেচে সেই কবে। দাড়ি-গোঁপ ওটার ফুরসৎ পেল যে

তা মন্দ বল নি। কেমন ফাটা কপাল আমাদের দেক। আমারটা মরেচে, তোমারটা ভেগেচে। হি হি হি

চুহা—

চু—হা—আ—

চুহা আসে, নিঃশব্দে। ঠোঙাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রেখে পকেটে হাত ঢোকায়।

এ্যাত্‌খন কার গৈলে ধোঁয়া দিচ্চিলে, 'মদনামার'?

টেবিলে কিছু ধাতব শব্দ বাজে।

শেকলের কদ্দুর?—বলে, মিত্তির দ্বিতীয় থাবা বসানার আগে ঠোঙাখানা কব্‌জা করে নেয় চক্কোত্তি।

হচ্চে।

বেশ মন দে কর। কাগজ কাট, আর পোঁদে পোঁদে সেঁটে যাও। কাট, আর, সাঁট। লাগলে কাগজ আরও কিনে দেব। কিন্তু গোটা পাম্প শেকলে শেকলে শেকলে

চুহা বেরিয়ে যায়।

শালার দেমাক দেখলি, মিট্‌টির?

হুঁ।

ঠিকাচে। ঠিক আচে।

চুহা দরজার ফ্রেমে এসে দাঁড়ায়।

কী, গাড়ি?—চক্কোত্তির ঘোলাটে চোখ চুহাকে খুঁজে বেড়ায়।

চুহা মাথা নাড়ে।

আসচে, হ্যাঁ?

হ্যাঁ।

আরে, এগুলো সরা। মিত্তির, জলদি, জলদি। ঠোঙাটা ধর। ডট পেন্সিলখানা কোথায় রাখলুম দেখদিনি—

চুহা বাইরে আসতেই প্রিমিয়ার পদ্মিনীর আলোয় ঝলসে যায়। চোখ বুজেই ছুটে যায় তবু গাড়ি লক্ষ্য করে।

ড্রাইভার নেমে আসে। দুহাত ছড়িয়ে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙে। তার দিকে না তাকিয়েই বলে, পাঁচ। তারপর জমাট অন্ধকারের দিকে হেঁটে যায়।

পেট্রল ট্যাংকে নজেলের ঠোঁট ঢুকিয়ে দিতে গিয়ে পেছনের সীটে চোখ

আটকে যায় চুহার। ভেতরটা অন্ধকার। ড্যাস বোর্ডের আলো নেভানো। অন্ধকারে জড়াজড়ি করে পড়ে আছে দুটি শরীর। আর—

চোখ ফিরিয়ে আনে চুহা। নজেলের সুইচ টিপে দেয়। তেল পড়ার শব্দ শোনে। মিটারের দিকে তাকিয়ে থাকে। সুইচ থেকে আঙুল সরে যায়। চোখ ফিরে যায় মহার্ঘ অন্ধকারে।

বাইরের অন্ধকার পরিমাপ করে চুহা। ড্রাইভার লোকটিকে কোথাও দেখতে পায় না। বাঁ দিকে শরীরটা ঘুরিয়ে নেয়। নিচু হতেই বুকের ভেতর দামামা বেজে ওঠে। ডান হাতে ধরা নজেল কেঁপে ওঠে। বাঁ হাত ভেতরে ঢুকিয়ে দিতেই পার্সের ওপর গিয়ে পড়ে। খস্‌খস্‌ শব্দ হয়। ভেতরকার দামামা আর বাইরের খস্‌খসের অসহ চাপে চুহার মনে হয় যে-কোনো মুহূর্তে এক বিস্ফোরণ ঘটে যেতে পারে। বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে সে কিংবা তার হৃৎপিণ্ড। হয়তো অজ্ঞানই হয়ে যেত। কিন্তু তার অন্তর্গত জগতের গলিঘুঞ্জিতে বাতি উঁচিয়ে রইল আদিম এক প্রেরণা।

একসময় যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। বড় শান্ত, বড় নিরুদ্‌বিগ্ন দেখাল তাকে। এই সময়ই নজরে পড়ে, অন্ধকারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে দুটি মূর্তি। একজন খুবই চেনা মনে হয়—বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে তার স্কার্ট। কয়েক পা এগিয়ে আসতেই আর কোন সন্দেহ থাকে না—ময়না, তার দিদিই। সঙ্গের লোকটি সেই ড্রাইভার।

ওদিকে কোথায় গিয়েছিল দিদি? পিতম সিংয়ের ধাবায়? এত রাতে, একা একা? নাকি, মাঠে গিয়েছিল? কিন্তু, ডাকবে না তাকে? এ-রকম তো হবার কথা

যেন প্রশ্নগুলো থেঁতলে মাড়িয়ে ময়না সামনে এসে দাঁড়াল। দাঁড়াল অনেকখানি জায়গা ছেড়ে রেখে। হাসল বোধহয়, অনুচ্চ কণ্ঠে বলল, একটু নজর রাখিস। তারপর ড্রাইভারের হাত ধরে বাসের দিকে এগিয়ে গেল।

যেতে যেতে থমকে পড়ল ড্রাইভার। প্রায় ছুটেই এল গাড়ির কাছে। হাত বাড়িয়ে খপ করে তুলে নিল সেই পার্স। সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরটা থরথর করে কেঁপে ওঠে চুহার।

ব্যাগ খুলে একখানা নোট তার দিকে এগিয়ে ধরে, তেলের দামটা দিয়ে দিও ভাই। তারপর মুচকি হেসে নোটখানা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে চলে যায়।

তখনই হাঁকটা বাজে, চু-হা

চু-হা-আ

দুটি কণ্ঠই অসহিষ্ণু।

পায়ে পায়ে অফিসঘরে যায় চুহা। ক্যাশবাবুর সামনে নোটখানা মেলে ধরে।

ড্রয়ারের গর্ভে নোটটি ছুঁড়ে দিয়ে রাগে গরগর করতে থাকে চক্কোত্তি, এটা কী রেণ্ডিবাড়ি, বানচত। ও-সব বোন-বোনাই বিজনেস করার জন্য বহুঘর ভাড়া পাওয়া যায়। যাও, সে-সব জায়গায় যাও। ঐখানে ইসব

আর, ইদিকে হাত কামড়ে দে সতীপনা দেকাস। চক্কোত্তির হাতটা যে কামড়ে দিলি, সে যদি একন পুলিশ ডেকে ধইরে দেয়, ভাল হবে? বুঝিয়ে বলবি, বুয়েচিস, যে চক্কোত্তিরে, কী, আমারে চটিয়ে থুলে আখেরে লুস্‌কান তারই। এ সোজা কতাটা বুইতে না পারলে ব্যাবসা চলবে—

খারাপ লাগে, খুব খারাপ লাগে। অন্য লোকের বাপেরা কাজ করে, কাছেভিতের মিনিমাঙ্‌নার স্কুলে দু-এক ক্লাস পড়ে তাদের ছেলে-পিলেরা। আর তার বাপের কারখানা শুধু বন্ধ হয়ে যায়। টানা পাঁচ বছর বসে। মা বলত, খুব খারাপ সময় এখন। হাড়মাস চিবিয়ে যাবে। তার কথাটাই ফলেছে যেন। শুধু কাঠামোটাই যা রয়ে গেছে, বাদবাকী তার সব কিছুই চিবিয়ে খেয়েছে এই সময়। বাপ হয়, যেন জ্যান্ত কোন মানুষ নয়, বিরাট একখানা কংকাল দাঁত কিড়মিড় করছে সর্বক্ষণ।

বস্তির প্রাইমারি স্কুলে পড়ত তখন। পড়াশোনা কী হতো, বুঝতে পারে নি। তবে, একে শূন্য দশ পর্যন্ত গড়গড় করে পড়তে পারত। মুখস্থ বলতে পারত অ আ, ক খ। লিখতেও পারত। তখন। এখন পারে কিনা, কে জানে।

বাপ একদিন চিলের মত ছোঁ মেরে ক্লাস থেকে তুলে নিয়ে গেল, লাগিয়ে দিল সিন্ধু সাহুর চায়ের দোকানে। সারা পথ গর্জন করতে করতে এসেছে, কোথায় দুটো পয়সা রোজগারের ধান্দা করবে, তা না, ইস্কুলে আড্ডা জমাচ্ছেন উনি। অন্যদের দেখেও তো শেখা যায়। তোর বয়েসি কোন্ ছেলে বসে বসে বাপের অন্ন ধ্বংসাচ্ছে?—যাবার সময় ডেঁটে গিয়েছিল, কোন উল্টোসিদে কিছু যদি করেছ, চাম খুলে নেব। মনে রেখ।

কাজে লেগে গেল সেদিন থেকেই। গ্লাশ ধোয়ার কাজ। জলখাবার ও সপ্তাহে নগদ দশ টাকা। সে আজ বছর চারেকের কথা। এর ভেতর মা মারা গেল।

আমতলা বস্তির পেছনটা হলো স্থানীয় কলকারখানার ছাই ফেলার জায়গা।

নিত্যদিন লরি লরি ছাই পড়ে এখানে। সেই ব্রিটিশ আমল থেকেই পড়ে আসছে। ছাই জমে জমে পাহাড়ের আকার নিয়েছে জায়গাটা। আমতলা এবং আশপাশের বস্তির তো বটেই, এমন কি, দূর দূর বস্তির মেয়েরাও কয়লা কুড়তে আসে এখানে। ভোর না হতেই দেখা যায় ছোটবড় ঝুড়ি নিয়ে পিলপিল করে মেয়েরা ছুটছে সেদিকে। সবাই চায় নতুন ছাইয়ের গাদার অধিকার। কয়লার পরিমাণ সেখানেই বেশি।

চুহার মাও ভোর রাতে উঠে ছাইগাদায় ছুটত। ঘুমঘুম চোখে সে-ও ছুটত তার পেছন পেছন। সেদিন রাতে তার জ্বর এসেছিল। মা বলত, তাত ওঠা। পরদিন সকালে মা একলাই গেল ছাইগাদায়। মঘনাকে রেখে গেল তার পাহারায়।

জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্নের মত পড়ে ছিল সে। একসময় মনে হলো, তার চারপাশ দিয়ে যেন ছুটে যাচ্ছে অসংখ্য পা। চীৎকার করে কী সব যেন বলতে বলতে যাচ্ছে তারা। উঠে পড়েছিল। কিন্তু বেরতে পারে নি। বাইরে থেকে শেকল তোলা ছিল। কাজটি যে দিদির, বুঝতে পেরেছিল।

ফিরেই যাচ্ছিল বিছানায়। এমন সময় কে যেন কাকে ডেকে বলল, ছাইগাদায় মানুষ ডুবে যাচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে হে। চলে চল, চলে চল—

মার কথা মনে পড়ে গিয়েছিল চুহার। চীৎকার করে উঠেছিল, শেকল খুলে দাও, মা মরে যাচ্ছে আমার মা—খুলে দাও—

কেউ খুলে দিয়েছিল। পলকে ছাইগাদায়। সেখানে তখন গিস্‌গিস্ মানুষ। ভয়ংকর এক অস্থিরতায় সেই চাপ চাপ মানুষের দেয়াল ভেঙে ভেঙে সামনে এসে দাঁড়াতেই শক্ত থাবায় তাকে আটকে দিয়েছিল কেউ। ধমকে উঠেছিল, রুক যা—

কিছু দূরে দেখা যাচ্ছিল পুলিশের এক বেষ্টনী। অনেকটা জায়গা ঘিরে ছিল তারা। ভেতরকার কিছুই নজরে আসছিল না তার। একটা খাকি রং আড়াল করে রইল তাকে।

ঠিক তখনই অনেকটা দূর থেকে প্রবল এক হুঙ্কার ভেসে এল, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে বলছি। ছোড় দো, ছোড় দো। তুকরো জান লে লেঙ্গে শালেলোগ, ইয়াদ রাখ—

বাপের গলা কানে যেতেই অস্থির হয়ে উঠে চুহা। কিন্তু ডানায় তখন সাঁড়াশির চাপ। দু-পাটি দাঁতের ওপর তার জিভ ঘুরে বেড়ায়। মোটা বোমশ আঙুলের ওপর ঘুরে বেড়ায় তার চোখ। হাতখানা লক্ষ্য করে যেই

মুখ ঘুরিয়েছে, অমনি সামনে থেকে সরে যায় খাকি রং। তার দৃষ্টি এখন অবাবিত। ভেতরে তাকাতেই—

সব অস্থিরতা মরে যায়। মাথার ভেতর ঝিম্‌ঝিম্ করে কী যেন ঘুরে বেড়াতে থাকে। চোখ ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিল সে। পারে নি। পালিয়ে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু পা যেন শিকড়।

আট বছরের এই শিশুটির সামনে সব কিছু অবলুপ্ত হয়ে গেল। শুধু ভেসে রইল একখানা হাত—ছাইয়ের পাহাড়ের ভেতর একটু একটু করে তলিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হয়েছিল, ছাই নয়, যেন তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ করেই তলিয়ে যাচ্ছে একখানা শরীর—হয়তো তার মার, হয়তো—

হঠাৎ তার চোখ দুহাতে চেপে ধরেছিল কেউ। তার ছলছল কণ্ঠ কানে যেতেই বুঝেছিল, দিদি। কণ্ঠ বুজে বুজে আসছিল যন্ত্রণায়, থরথর করে তা কাঁপছিল। ভাইয়ের মুখ বুকের ওপর চেপে ধরে ফিশ্‌ফিশ করে উঠেছিল, তাকাসনি ওদিকে তাকাতে নেই—

কথাটি শুনেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল চুহা।

চারপাশে ছড়ানো রঙিন কাগজের লম্বা লম্বা ফালির ভেতর বসে শেকল বানাচ্ছিল চুহা। রঙিন কাগজ জুড়তে বসলেই হন্তাদার কথা মনে পড়ে। তাদের বস্তির প্রাইমারি ইস্কুলটি তার হাতেই তৈরি। হন্তাদার বাপ সতীশ-জেঠা নাকি এককালে ডাকাতি করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কালী ভক্ত হয়ে পড়ে এবং তাদের বস্তির সামনে কালী মন্দির বানিয়ে শেষ জীবনটা ওখানেই কাটিয়ে দেয়। সতীশ জেঠাকে যমের মত ভয় করত হন্তাদা। সে যে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষা পর্যন্ত পাশ করে এল, তার পেছনে ছিল এই ভয়। শেষ পরীক্ষার প্রথম দিন জেঠাকে প্রণাম করতেই, সে তাকে মন্দিরের ভেতর নিয়ে গিয়েছিল। এক খাবলা তেল-সিঁদুর কপালে লেপে দিয়ে প্রতিমার দিকে চেয়ে বলেছিল, মারে, ছাওয়াল পরীক্ষা দিতে যায়। মুখ রাখিস। যাও।—শুন। ফেল করলে, এই কাপিতে ফ্যালাইয়া বলি দিমু। কথাখান মনে রাইখ। হেইলে পাশ করতে পারবা।

জেঠার কথাতেই ইস্কুল খুলেছিল হন্তাদা। মন্দিরের পাশে একখানা চালা তুলে দিয়েছিল জেঠাই চেয়েচিন্তে। ইস্কুল হওয়ার মুখেই জেঠা মারা গেল হঠাৎ সন্ন্যাস রোগে। ইস্কুল হয়। দু-এক করে ছাত্রছাত্রী বাড়ে। বছর ঘুরতেই তিনজন বন্ধুকে নিয়ে এল হন্তাদা। তারাও পড়াবে। সবাই তার

ইস্কুলের বন্ধু ছিল, একসঙ্গেই পাশ করেছে। এর মাস কয়েক বাদে ইস্কুলটি সরকারি ইস্কুল হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল, মাস্টারদের লিস্টে হন্তাদার নাম নেই। কাজ হয়েছে তার তিন বন্ধুর। এ-নিয়ে বস্তিতে খুব তোলপাড় হলো কদিন। ইস্কুল বন্ধ রইল। তখন শহরের নেতারা এল, কারখানার নেতারা এল। যারা গরম হয়ে ছিল, তাদের শীতল করে গেল। হন্তাদার পিঠ চাপড়ে বলে গেল, ইস্কুল তো তোমারই রইল, ভাই। সন্ধে বেলায় কী কর? আমাদের অফিসে এস না। কথা হবে।

হন্তাদা যায় নি। কথাও হয় নি। এরপর থেকেই একটা কথা কানে কানে ছড়াল; ডাকাতের ছেলের কাছে ছেলেমেয়ে পড়ালে তারা কী জিনিশ তৈরি হবে, বোঝ!

হন্তাদা পাগল হয়ে গেল। তাদের বারোয়ারি কলতলায় সারাদিন বকবক করে, ভদ্রলোকের ছেলেদের সঙ্গে কখনও ছেলেকে মিশতে দেবে না। খবরদার। সর্বনাশ করে ছাড়বে। আম খেয়ে আঁটিখানা হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলবে, আম তো তোমারই রইল, ভাই। কোভি এ মত্ ভুল্না কী হম হ্যাঁয় বস্তিবালে, অর ও শালেলোগ হ্যাঁয় নওটংকি। বলে আর থুতু ছেটায়।

একদিন পনেরই আগস্টের আগে শিকল বানাচ্ছিল তারা। প্রতিবারই বানায়। ক্লাব থেকেই কাগজ কিনে দেয়। ক্লাবঘর সাজানো হয়। পতাকা ওঠে। মাঝ রাত পর্যন্ত মাইকে গান বাজে। এক বছর বিনে পয়সায় ভি-ডি-ও দেখানো হয়েছিল। অমিতাভ্ আর মিঠুনের ছবি। স্বাধীনতা খুব জমেছিল সেবার।

তো সেবার শেকল বানাচ্ছিল তারা। হঠাৎ হন্তাদা এল কোত্থেকে যেন। শেকলের দিকে চেয়ে খুব একচোট হাসল। তারপর বলল, স্বাধীনতার পায়ে শেকল পরাচ্ছ। তোমরাও। কার কাজ, কে করে। অবোধ, অবোধ—

চুহার কাছে স্বাধীনতা মানে, একখানা লবেঞ্চুস খান দুয়েক জিলাপি, বড় জোর, বিনি পয়সায় সিনেমা। আর রাতভর জেগে শিকল বানানো। হন্তাদার কথাগুলো সে বুঝতে পারে নি। তবু শিকল বানাতে গেলেই কথাগুলো মনে পড়ে।

কিন্তু শিকল না বানিয়েও উপায় নেই। বড় মজুমদার, পাম্পের মালিক, নিজে ডেকে বাবা-বাছা করে বলেছে, এবার বেশ ধুমধাম করে স্বাধীনতার দিনটি পালন করতে হবে। চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে এবার। এ তো যে-সে কথা নয়। শেকল বানাও দেখি—বেশ বড় করে। লালের ভাগটা একটু

বেশি করে দিও। টুনি লাইটের মালা আর জেনারেটারের কথা বলে দিয়েছি। আর মিষ্টির প্যাকেটও—

তার কথাটা ফেলা যায় না। তার জন্যই মাথা গোঁজার এই ঠাঁইটুকু আজ তাদের ভাঙাচোরা বাস হলেও আশ্রয় তো। বাসখানা পামপে পড়েছিল অনেক দিন থেকেই। তাদের বস্তির পদ্মপিসি বড় মজুমদারের বাড়ি রান্নার কাজ করে। বছর পাঁচেক টানা বাড়ি ভাড়া বাকি পড়েছিল তাদের। ঘর না ছাড়লে আর চলছিল না। অষ্টপ্রহর বাড়িওলা আর তার লোকজনের খিস্তি খেউড় শুনতে শুনতে বাড়ি ফেরা প্রায় ছেড়েই দিল তার বাপ। এদিকে মা মারা যাওয়াতে সংসারের আয় কমে গিয়েছিল। কয়লা বেচে কিছু চাল সে আনত রোজই। আয় বলতে তখন তার সপ্তাহে পনের টাকা আর দিদির তিরিশ টাকা। দিদির টাকাটা পাওয়া যেত আবার মাস কাবারে। দিদি তখন কাজ করত আচার্যিবাড়ি। জলখাবার দুপুরের খাবার পেত। আর পেত পুজোয় শীতে দুপ্রস্থ জামাকাপড়। কিন্তু একবেলা হলেও খাবারের এ-রকম কোন বাঁধা ব্যবস্থা ছিল না তার বাপের। না খেতে পেয়ে পেয়ে দিনকে দিন হিংস্র হয়ে পড়েছিল সে। হয়ে উঠেছিল হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

এক রাতে বিছানা থেকে ঘুমন্ত দিদিকে টেনে হিঁচড়ে তুলে ফেলল তার বাপ। গর্জে উঠল, তোর মত ধুম্‌সো মাগী ঘরে থাকতে আমি না খেয়ে মরব। সবাই চালাকি পেয়েছ। তারপর টানতে টানতে দিদিকে নিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল।

অনেক রাতে ফিরে এসেছিল দিদি। এসেই শুয়ে পড়েছিল। তার অনেক পরে এসেছিল তার বাপ। ঘরের বাতাস মদের কটু গন্ধে ভারি হয়ে উঠেছিল। জীবনে সেই প্রথম মদ গিলেছিল মানুষটা।

পরদিন সকালে কাজে বেরবার মুখে দিদি তাকে একটা টাকা দিয়েছিল। অবাক গলায় সে জিগ্‌গেস করেছিল, টাকা কোথায় পেলিরে দিদি? শুনেই দুচোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে বেরল তার। খপ করে তার চুল মুঠোয় চেপে ধরে তাকে মারতে মারতে প্রায় আধ-মরা করে ফেলে তার পাশে বসে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল একসময়।

সেদিন থেকেই আচার্যিবাড়ির কাজ ছেড়ে দিয়েছিল দিদি। দিনভর আয়েশ করত, সিনেমা দেখত, রাতে বেরিয়ে যেত। খুব খারাপ লাগত তার। অন্য সবার দিদিরা কত ভাল। আর তার দিদি—এক এক দিন ভাবত, আর

একটু বয়েস হলে, আর একটু শক্তি হলে বাপ আর দিদি দুজনকেই খুন করে ফেলবে সে।

তবু দিদিকে নিয়েই উঠতে হলো এই ভাঙাচোরা বাসে। পদ্মপিসির মাথায়ই বাসের কথাটা এসেছিল। সে-ই নিয়ে গিয়েছিল তাকে বড় মজুমদারের কাছে। তা সে রাজি হয়েছিল। বলেছিল, থাকতে পারলে থাকবে। আমার আর আপত্তি কি? তা থাকবে যখন, দরকার হলে, রাতের বেলা পাম্পের কাজকর্ম একটু করেকম্মে দিও। এ-জন্যে কিন্তু কোন পয়সাপাতি দিতে পারব না—

এখানে উঠেছে প্রায় মাস পাঁচেক হলো। সে এখন এক মুদিখানায় কাজ করে। জলখাবার, দুপুরের খাবার ছাড়া সপ্তাহে পনের টাকা। টিফিনের জন্য পঞ্চাশ পয়সা নগদ। দুপুরে দুঘণ্টা ছুটি। মোট চারজন কর্মচারী তারা। আয়ের আরো কিছু পথ মিলেজুলে বের করে নিয়েছে তারা। এখন তাদের এই ভাইবোনের সংসারে চাল ডাল তেল নুনের সেই নিত্য হাহাকারটা আর নেই।

তবু বাপের ওপরই বেশি টান দিদির এখনও। সে থাকে স্টেশনে, শেডের তলায়। মাঝে মাঝেই দিদি চলে যায় সেখানে। রাতও কাটায় কোন কোন দিন। দিদি এখন কাঁদে। সে দেখেছে। দিদি ভাল হচ্ছে। ভাল মানুষেরা কাঁদে। চুহা জানে।

তবু মাঝে মাঝে কী যেন হয় দিদির। খুব অস্থির, খুব অন্যমনস্ক হয়ে যায়। চুহা বুঝতে পারে, পুরনো সেই পাপ তখন হাতছানি দেয় তাকে? নিজেকে প্রাণপণে সামলাতে চায় সে। কখনও পারে। কখনও বা অস্থির পায়ে বেরিয়ে যায়। চুহার কান্না পায় তখন।

ওই শুয়ে রয়েছে দিদি। মুখটা কেমন দুঃখি দুঃখি। বয়েসের তুলনায় অনেকটা বড় দেখায়। কেমন যেন ভাঙাচোরা। সেদিকে চেয়ে বুকখানা গভীর মমতায় ভরে ওঠে।

পরদিন দোকানে পা দিতেই মণ্টে জিগ্‌গেশ করল, তোর বয়েস কত রে?

আমার বয়েস জেনে তোর কী হবে!

বিয়ের সম্বন্ধ করব। বল না। তাড়াতাড়ি। সতুবাবু দেখছে।

শুনেছি তো, তের।

তোর হবে।

কী ?

পরে বলব—

তখনই সতুবাবুর নাকি গলা ভেসে এল, লবঙ্গ দশ গ্রাম। মুগ ডাল

এক ঘেয়ে এই আনুনাসিক কণ্ঠ সেই দুটো পর্যন্ত ক্লান্তিহীনভাবে একই পর্দায় বেজে যাবে। হাতঘড়ি নয়, দেয়ালঘড়িতে দুটো না বাজা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকবে টঙে। সে-পর্যন্ত আটখানা হাত প্রায় একই লয়ে অভ্যস্ত মুদ্রায় কাজ করে যাবে।

সতুবাবু চলে যেতেই সামনের ঝাঁপ পড়ে। মধু আর উদ্ধব খেতে চলে যায়।

ওরা ফিরে এলে যায় মণ্টে আর চুহা।

ঝাঁপ পড়তেই পকেট থেকে ছাপানো একখানা কাগজ বের করে মণ্টে। বলে, শোন, কী লিখেছে : স্বাধীনতার চল্লিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে কিশোর-কিশোরীদের দৌড় প্রতিযোগিতা।—প্রাইজ আছে। ফার্স্ট হলে নগদ আড়াইশ টাকা, একখানা মেডেল

পরের কথাগুলো আর কানে যায়নি চুহার। একটা দৌড় জিততে পারলেই সাড়ে তিন মাসের বেতনের টাকা পকেটে। সে কখনও স্বপ্ন দেখেনি। চুহারা স্বপ্ন দেখে না। কৈশোর বিস্তারের কাল। চুহাদের কোন বিস্তার নেই। এই প্রথম এই কিশোর ভাবতে শিখল, শুধু হাত নয়, পা-ও উপার্জনক্ষম হতে পারে। একটা সংখ্যা তাকে স্বপ্ন দেখাতে শেখাল—বিস্তারের স্বপ্ন। ভেতরে ভেতরে মনোরম এক শিহরণ তাকে উতলা করে দেয়। খুব ভাল লাগে। খুব সুন্দর মনে হয় চারপাশ। শুধু লবেঞ্চুস আর জিলিপি নয়, স্বাধীনতা ভিন্ন একটা দ্যোতনা বয়ে আনে তার কাছে। একটা উদ্‌ভাস।

পরবর্তী কটা দিন একটা ঘোরের মধ্যে রইল চুহা। চেনাপরিচিতরা জেনে গেল চল্লিশ দৌড়ে ছুটছে সে। রাত গভীর হলে দেখা যেত মহাসড়কের ধার ঘেঁষে ছুটছে শীর্ণ দুটি পা। বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছে তার। হয়তো বাতাসের অভাবে। হয়তো বা এক কাল্পনিক গর্বে।

দৌড়ের দিন খুব সকাল সকাল মাঠে পৌঁছে গেল চুহা। মণ্টে এসেছে তারও আগে। হাত ধরে সে-ই তাকে ভেতরে নিয়ে যায়। মাঠ তখন বর্ণময়, উজ্জ্বল। অসংখ্য পায়ের ঘোরাফেরা সেখানে।

মণ্টে তাকে একটা শামিয়ানার তলায় নিয়ে গেল। সেখানে নাম লেখাতে হবে। পরপর কটা টেবিলে নাম নেওয়া হচ্ছে। চুহা লাইনে দাঁড়াল। মণ্টে রইল তার পাশ ঘেঁষে।

নাম বলতেই টেবিলের ছেলেমেয়েরা কলকল করে হেসে উঠল।

চুহা? চুহা আবার কারো নাম হয় না কি!

হয়, হয়। জানতি পার না। বর্গীয় জ নয়, জেড।

সবাই জানে। তোকে আর বিদ্যে ফলাতে হবে না।

কিরে, চুহাই লিখব তো?

বোঝ! নাম হলো চুহা, তা তুই কি সমুদ্রগুপ্ত লিখবি না কি।

বাবার নাম?

....

কী করেন?—কিছু করেন না মানে!—কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে? ঠিক আছে, ঠিক আছে। আজকের দিনে অশুভ কথা বলতে নেই, ভাই। কী লিখব রে?

লেখ না, সার্ভিস।

রামানন্দ সাগর ইজ গ্রেট—

রিয়েলি—

রামায়ণ সাগর বল—

তোমার তো খালি ছিরিদেবী আর মিঠুন থাকলেই হলো। আর্ট ফিল্মের কী বুঝবি তুই—

রামায়ণ আর্ট ফিল্ম নাকি। অত বাড়াস নি। পাঁচ-ছয়ে থাক—

ঠিকানা?

ঠিকানা শুনে সবার লকজ হবার উপক্রম।

বাস মানে?

মডার্ন বেদুইন। ক্যারাভ্যান টু বাস—

ক্যাবাবাস বল—

ইয়ার্কি রাখ তো। শোন ভাই, তোমাকে আর দু-একটা কথা জিগ্‌গেস করি। বয়েস কত?—প্রমাণপত্র এনেছ?—স্কুলের সার্টিফিকেট—অ।—বার্থ সার্টিফিকেট—বুঝলে না—তুমি জন্মেছ তো ভাই কোন একদিন—

এই, অতিদাকে ডাক তো। তুমি এখানটায় দাঁড়াও ভাই। অন্য নামগুলো আমরা লিখে ফেলি ততক্ষণ।

অতিদা সব বৃত্তান্ত শুনে উল্লাসে ফেটে পড়ল, ওয়েলকাম, মাই ফ্রেণ্ড। চারদিকে যা দেখছ, সব তোমাদের জন্য করা হয়েছে। স্বাধীনতা কেমন তলা অব্দি পৌঁছে গেছে। তত্ত্বকথা নয়, তাকিয়ে দেখ, গাধারা। তোদের দিয়ে শুধু দেয়াল মোছা আর পোস্টার সাঁটাই হবে। তুমি আমার সঙ্গে এস, ভাই—

অতিদা তাকে নিয়ে নানা জটলায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। চীৎকার করে বলতে লাগল, ডাইরেক্ট ফ্রম ক্লাস। এ কম্‌পিটিটার অব ফ্রীডম রান। ফ্রীডম পারকোটেলস। জ্যাস্ট সী, সী—চোখ থাকলে দেখ। বফর্সের চাইতেও জোরাল কামান এনেছি একখানা। দেখ—

অচিরাৎ এক দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল চুহা। নানা হাতে আদর খেতে হলো তাকে। মহিলারা তার গাল টিপে দিলেন। একজন আঁচল দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছিয়ে দিয়ে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, পরে কথা বলব। রায় বাবুদের দোকান তো?

তাই দেখে নাক সেঁটকাল একজন। দক্ষিণ ভারতের পেছল শাড়ির আঁচল হাতে জড়ান ছিল তার। এখন মনে হলো, তাঁত পরে আসাই উচিত ছিল।

অতিদার হাঁকডাকে জন কয়েক ফটোগ্রাফার ছুটে এল। চুহাকে দেখিয়ে বলল, সাবজেক্ট এখানে, সার। মিসেস ব্যানার্জি, আর একবার ঘাম মোছান, প্লীজ। নিন, সার—

দক্ষিণী শাড়ির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। মনে হলো, বুঝি কেঁদেই ফেলবেন।

অতিদা এবার তাকে কোলে তুলে নিল। ফ্ল্যাশ জ্বলে উঠল। এরপর সে একটা হামি খেল তাকে। খেল মানে, খাওয়ার পোজ দিল আর কি। এমন সময় খবর এল, কেন্দ্র এবং রাজ্যের মন্ত্রীরা এসে পড়লেন বলে। তাকে মিসেস ব্যানার্জির কাছে গচ্ছিত করে দিয়ে পড়িমরি ছুটল সে।

তিনি কোলের কাছে টেনে নিলেন তাকে। তার সর্বাঙ্গ বেয়ে মাতৃস্নেহ ঝরে পড়তে লাগল। তিনি ফিশ্‌ফিশ্‌ করে বললেন, দোকানে কত পাও?—সে কী, এটা কী একটা কাজ হলো। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। আমার বাড়ি থাকবে তুমি। খাওয়া-পরার দায়িত্ব আমার। একশ টাকা হাত খরচা। টি-ভি আছে, রঙিন। কোন অসুবিধে হবে না। কবে আসবে বল?

দক্ষিণী তার পার্শ্ববর্তিনীকে বললেন, কত ঢংই না জানে মুকুজ্জে গিন্নি।

পার্শ্ববর্তিনী মুচকি হাসলেন, ঢং নয়। ওর কাজের লোক চলে গেছে।

ট্র্যাকে দাঁড়িয়ে নিজেকে বড় অসহায় মনে হয় চুহার, বড় নিঃসঙ্গ। চারপাশে পরিচিত কোন মুখ খুঁজে পায় না। মণ্টে কখন যেন সরে পড়েছে। দিদির আসার কথা।

কিন্তু কোথায় তারা? আরো যাদের আসার কথা ছিল, তারাই বা কই? মনটা খারাপ হয়ে যায়।

স্টার্ট নিতে ভুল হলো দু-দুবার। শুধু চুহার নয়, অনেকেরই। তিন বারের বার গুলির আওয়াজ পেতেই বেদম ছুট। প্রথম পাক শেষ করার মুখেই বুকের ভেতরটা কেমন যেন খালি খালি মনে হলো চুহার। বুঝতে পারে পিছিয়ে পড়ছে সে। তখনই চারপাশ থেকে ভেসে আসে একটা ডাক—চুহা—চুহা—চুহা—

দেখতে পায়, ট্র্যাকের বাহিরে দিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে আরও অনেকে। ওই তো দিদি—তপনদা—মণ্টে—ওই তো মধুদা—হারু—ওকে, রুক্মিণী—

চোখের ওপর অন্ধকার ঝামটে যায়। বুকের ভেতর থেকে সাঁই-সাঁই শব্দ ওঠে। পা অবশ হয়ে আসে। অনেক দূর থেকে কারা যেন ক্রমাগত হেঁকে যায়

চুহা—

চুহা—

লী—অ, লী—অ, লী—অ—

কালো পর্দাটা দুলতে থাকে।

চুহাকে ফেলে রেখে স্বাধীনতা ছুটে যায়।

ন্যাংটো

সুধাংশু ঘোষ

ব্যাপারখানা এইরকম। একটা ছোট উঠোন ঘিরে চারখানা শনের ঘর। উঠোনে লোক জমেছে। গ্রামের নানা বয়েসের মানুষ। চার-পাঁচ বছর থেকে পঁচাত্তর-আশি বছরের। জমায়েতের কারণ একটা লোক মরে যাচ্ছে, এই মরবে-মরবে করছে আর কি। আর দু-পাঁচ মিনিটের মামলা। এমনিতে অবশ্য এখনো যে বেঁচে আছে তার লক্ষণ তেমন দেখা যাচ্ছে না। বুকের ওঠানামা চোখেই পড়ে না প্রায়। সারা জীবন মৃত্যু দেখে যারা হাত পাকিয়েছে, একমাত্র সেই বিশেষজ্ঞরা বুঝতে পারছে, লোকটা এখনো বেঁচে আছে। যারা অনভিজ্ঞ তাদের কারো কারো সন্দেহ হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগে—হতে পারে আধ ঘণ্টা, হতে পারে দশ মিনিট—লোকটার হাত বা পায়ের আঙুল সামান্য নড়েছিল এবং সেটা ছিল বেঁচে থাকার স্পষ্ট প্রমাণ।

মানুষ মরছে আকছার। তা এই লোকটা মরছে বলে এত লোক জমেছে কেন? বারবার লোকটা-লোকটা বললে অচেনা-অচেনা লাগে। ওর তো একটা নাম আছে। ওর নাম তারিণী, তারিণী মণ্ডল। লোক জমে যাওয়ার সব থেকে বড় কারণ, তারিণীর বয়েস একশো বছর। এনিয়ে তর্ক নেই এমন নয়। খানিক আগে উঠোনের সদ্য গোঁফ-গজানো এক ছোকরা মন্তব্য করেছিল, ওর সেঞ্চুরি হল না। আমি যতটা জানি, ও আটানব্বইতে আউট হয়ে যাচ্ছে। ছোকরাটি কোথা থেকে এটা জেনেছে তা বলতে পারল না।

একটু বেশি বয়েসের অন্য একজন পণ্ডিতি ফলিয়ে বলেছিল, তারিণীর বয়েস একশো ছাড়িয়ে গেছে। ওর বয়েস একশো দু' বছর। এটা উনিশশো উননব্বই সাল। তার মানে এই নয় যে যীশুর বয়েস এখন দাঁড়ায় এক হাজার নয়শো উননব্বই বছর। ওখানে চার বছরের একটা ব্যাপার আছে। তারিণীরও সেইরকম। ওর বয়েস আটানব্বই থেকে চার বছর বেশি।

একখানা শনের ঘরের মাটির খোলা বারান্দায় পড়ে আছে তারিণী। পিঠের তলায় মাদুর বা চাটাই বা কাঁথা বা চাদর কিছু নেই। স্রেফ মাটি। গীতায় জীর্ণ বসন খারিজ করে নতুন বসন পরার কথা আছে। তারিণীর অঙ্গে বসনের বালাই নেই। কুঁচকিতে একফালি ন্যাকড়া জড়ানো। তাতেই লজ্জা নিবারণ। লজ্জা মানে যারা মৃত্যু দেখতে এসেছে তাদের। তারিণীর লজ্জার প্রশ্ন নেই। হুঁশ নেই তারিণীর। গায়ের চামড়া ফেটেছে, ঝুলে পড়েনি কোথাও। সেই চামড়ার রঙ, মোটেই অতিরঞ্জন না করে বলা যায়, মর্চে পড়া লোহার মতন। অল্পস্বল্প অতিরঞ্জন করে বলা যায়, তারিণীর দেহখানি একটা মাঝারি তালগাছের মতন। একটা ন্যাড়া তালগাছ যেন মাটির দাওয়ায় শুইয়ে রাখা হয়েছে।

আরো অনেক লোক তারিণীর মৃত্যু দেখতে আসত, যদি মাঠ ভেঙে বা গ্রামের পথ দিয়ে হেঁটে আসা যেত। তা তো সম্ভব নয়। মেঠো পথ, ধান-ক্ষেতের মধ্যিখানের আলপথ দু'মানুষ জলের তলায়। বর্ষাকাল যে। ভাদ্র মাস। যারা এসেছে তারা নৌকোয় এসেছে। যারা ইচ্ছে থাকলেও আসতে পারে নি তাদের নিজেদের নৌকো নেই অথবা তারা অন্যের নৌকোয় জায়গা পায় নি। এটা নিচু জলা গ্রাম, উঁচু শুকনো মাটির গ্রাম নয়। জলা গ্রাম বছরে পাঁচ মাস ডুবে থাকে জলের তলায়। ঘরদুয়োর ডুবে যায় না, কারণ প্রত্যেকটা বাড়ি এক-একটা টিলার ওপর, মাটির টিলা। তাই প্রত্যেকটি বাড়ির পাশে একটা করে গভীর গড়, যেখান থেকে মাটি তুলে টিলা বানানো হয়েছিল, যার ওপর ঘরদুয়োর।

আষাঢ় শ্রাবনে ঢল নামে। নদী, খাল-বিলের পাড় ভেসে যায়। মাঠে, ধানখেতে জল আসে। হু হু করে জল বাড়তে থাকে। মজা হল, ধানখেতে যত জল বাড়ে ধানগাছ ততটাই বেড়ে যায়। ধানখেতে দেড়-দু-মানুষ জল হলে ধানগাছ তারও ওপরে উঠে যায় অন্তত এক ফুট, আর উঠে গিয়ে দোল খায় বাদলা বাতাসে। খেলার মাঠ, গরু-ঘোড়ার ঘাস খাওয়ার পড়ে জমি বর্ষা ঋতুর জলের তলায়। মাঠে, ধানখেতে, টিলার পাশের গভীর গড় বা খাতে অজস্র ছোটবড় মাছ আসে নদী, খাল-বিল থেকে। ভাদ্রমাসের বাতাসে সব

সময় আঁষটে গন্ধ। তার সঙ্গে পচা হিজলফুলের গন্ধ মিশে যায়। মাঠের সাপ টিলাগুলোয় উঠে আসে। শনের বা টিনের ঘরের মাটির ভিতে, সংলগ্ন ছোট বাগানে গর্ত খুঁড়ে ঢুকে যায়। সাপ, পোকামাকড়ের সব থেকে সুখের ঘর ছাড়াভিটেয়। ছাড়াভিটে হল সেই টিলা যার ওপর একদা কারো বাস্তু-ভিটে ছিল, ঘরদুয়োর ছিল। সেই ঘরদুয়োরের মানুষজন মরে-ছেড়ে গেছে। এই গ্রামে ছাড়াভিটের সংখ্যা অন্তত দশ।

আশ্বিন-কার্তিকে জল শুকোয়। মাঠে, ধানখেতে আবার মানুষের পা। বর্ষার সময় যে অজস্র ছোটবড় মাছ এসেছিল। তাদের বেশির ভাগ থেকে যায় টিলার পাশের খাতে।

এখন যেহেতু ভাদ্র মাস, চারদিকে থইথই জল, ইচ্ছে থাকলেও খুব বেশি মানুষ আসতে পারে নি তারিণীর মৃত্যু দেখতে।

মনে হয়েছিল, আর মোটে দু'-পাঁচ মিনিটের মামলা। ভুল মনে হয়েছিল। এখন বিশেষজ্ঞদের সন্দেহ হচ্ছে, তারিণী আরো খানিকটা সময় নেবে।

রোদ্দুর যতক্ষণ ঝকঝকে ছিল, সাদা মেঘের ছায়া পড়েছিল ঘোলা জলের সমুদ্রের ওপর। পড়ন্ত বেলায় সেই ছায়া যখন মিলিয়ে যাচ্ছে, নজরেই আসছে না প্রায়, তখন যে-দাওয়ায় শুয়ে তারিণী মরবে-মরবে করেও পুরোপুরি মরছে না তার উলটো দিকের শনেয় ঘরের মাটির দাওয়ায় চন্দ্রকান্ত এসে জমিয়ে বসল। লোকটা আসতে উঠোনে যাদের ভিড় তারা পায়ে পায়ে সরে গেল তার দিকে। ঘিরে ধরল চন্দ্রকান্তকে, তবে থেকে থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছিল, তারিণী একটুও নড়েচড়ে কিনা। বিশাল বুকের ভেতর থেকে একটা মৃদু ঘড়ঘড়ানি সম্ভবত উঠে আসছে। ঠিকঠাক শুনতে হলে একেবারে বুকের পাশে গিয়ে কান পাততে হয়। অত কাছে কে যায়!

চন্দ্রকান্তকে ঘিরে ধরার কারণ আছে। চন্দ্রকান্ত দাসের বয়েস আশি বছর। শুটকো চেহারা, এখনও ফটাফট হেঁটে যায় অনেক দূর, যাকে ইহলোক বলে সে-জায়গাটা ছেড়ে যাবার লক্ষণ নেই। গ্রামের ইসকুলে চল্লিশ বছর মাস্টারি করেছে চন্দ্রকান্ত। ইসকুলের ছেলেমেয়েদের সামনে বকবকানি চালিয়েছে চল্লিশ বছর। পঁয়ষট্টিতে অবসর নেবার পর ইসকুলের ছেলেমেয়েদের আর পায় না। ইদানীং পঞ্চায়েতের ব্যাপারে চুপসে-যাওয়া গাল যতটা সম্ভব ফুলিয়ে বক্তিমে ঝাড়ে। ভাষণ দেওয়া নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। বড় তৃপ্তি পায় ভাষণ দিয়ে। দাঁত আছে, জিভ-ঠোঁট নড়ে মোটামুটি। কথা বোঝা যায়।

ফলে শ্রোতা ধরে রাখতে পারে। পঞ্চায়েতের নির্বাচনে ওর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় না কেউ। চন্দ্রকান্ত দাস বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।

কেউ মরে গেলে, সে যখন বেঁচেবর্তে ছিল তার সেই সময়কার মহান কীর্তিগুলো জানতে সবার আগ্রহ। তারিণী তখনো মরেনি, মরছে। দাওয়ায় যা দৃশ্যমান তা অবশ্য বাইরে থেকে তারিণীর লাশ ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। সে যখন তেজী ঘোড়ার মতন জ্যান্ত ছিল, তার সেই সময়কার কীর্তিগুলো জানতে সবার আগ্রহ। যারা তার মৃত্যু দেখতে এসেছে তাদের মধ্যে অনেকেই তার বিষয়ে কানাঘুষোয় কিছু কিছু শুনেছে। কেউ কেউ তেমন কোনো খবর রাখে না তার সম্বন্ধে। তারা আজ শুনতে চায়। বলবে কে? চন্দ্রকান্ত। তার থেকে আর কে বেশি জানে?

শোনা গেছে, এক সময়ে তারিণী ঘোড়ার পিঠে বসে কালবৈশাখীর আগে উড়ে যেত। এরকম কথা শুনলে ভারি ইয়ে হয়। কিন্তু ঘোড়া পেল কোথায়? এই তো ছোট উঠোন ঘিরে চারখানা শনের ঘর, ঘোড়া পেল কোথায় তারিণী? ইসকুলে যারা লেখাপড়া করেছে তাদের এক বিখ্যাত লেখকের একটা বিখ্যাত গল্প মনে পড়ে যায়। মেলায় একটা তাঁবু থেকে বাঘের ডাক আসছে। একটি করে পয়সা দিয়ে তাঁবুতে ঢুকলে বাঘ দেখা যাবে। যারা ঢুকছে তারা দেখছে একটা খালি-গা হাড় জিরজিরে লোক হাঁড়ির মধ্যে পাতলা বেত আঙুল দিয়ে জোরে চেপে ধরে টান মেরে বাঘের ডাক তুলছে। দর্শকরা তাঁবু থেকে বেরিয়ে যাবার সময় লোকটা হাত জোড় করে বলছে, বাইরে গিয়ে কাউকে বলবেন না যে এখানে বাঘ নেই। পেটে ভাত জোটে না, বাঘ কোথায় পাব। তা সেইরকম, তারিণী ঘোড়া পেল কোথায় যে ঝড়ের আগে উড়বে?

এজাতের প্রশ্নের উত্তর সবার থেকে ভাল জানা আছে একজনের, চন্দ্রকান্ত দাসের। ঝট করে বলে দেবে, ঘোড়াটা অবশ্যই সামন্তবাড়ির ছোটকত্তা শিবশঙ্করের।

বেঁচে থাকতে ভিক্ষে পায় না, মরে গেলে মূর্তি গড়ে মালা পরানো হয়— এমন তো কতই দেখা গেছে। তারিণী এখনো মরেনি, কিন্তু মরছে তো ঠিকই। দশ মিনিট আগে আর পরে। সুতরাং কথা বলার যার নেশা সেই চন্দ্রকান্তর মুখে শুনলে দোষ কী তারিণীর জীবন বৃত্তান্ত?

চন্দ্রকান্ত বলছিল, আমার যখন কুড়ি বছর, সামন্তবাড়ির ছোটকত্তা শিবশঙ্করেরও তখন কুড়ি বছর, তখন তারিণীখুড়োর ছেলে মুকুন্দরও কুড়ি বছর

বয়েস। এখন অবস্থা পড়ে গেলেও ওই সময়ে জোতদার সামন্তদের খুব রমরমা ছিল। মুকুন্দ কাজ করত সামন্তবাড়ি। তার বাপ তখনো এই গ্রামে আসে নি আষাঢ় মাসে মুকুন্দ গিয়েছিল আদিত্যদের ছাড়া ভিটেয়। সেখানে তখন কেবল মাটির ঢিবি আর ঝোপঝাড়। বর্ষায় গরু-ঘোড়াকে শুধু বিচিলি খাইয়ে রাখতে মন সায় দেয় না। সামন্তদের তখন ডজনখানিক দুধেল গাই আর একটা তেজী ঘোড়া। ছাড়াভিটেয় একটা ডিঙিনৌকো নিয়ে ঘাস কাটতে গিয়েছিল মুকুন্দ, গরু-ঘোড়াকে খাওয়াবে বলে। লকলকিয়ে ওঠা ঘাস—রবীন্দ্রনাথের গানের কথায় নবতৃণদল—কেটে আঁটি বেঁধে আনবে বলে গিয়েছিল আদিত্যদের ছাড়াভিটেয়। কাছেই তিনি ছিলেন, একটি গোখরো। ঘাস কাটার ধারালো অস্ত্রখানির পোঁচ তাঁর গায়ে লেগে গিয়েছিল কিনা কে জানে তিনি মোক্ষম ছোবল মারেন মুকুন্দর হাঁটুর ওপরে। এই ঘটনা সকাল বেলার।

ঠা ঠা দুপুর অব্দি মুকুন্দ ওখানেই পড়ে থাকে। তারপর তার লাশ আবিষ্কৃত হয়। ছাড়াভিটেয় ওই তিনচার ঘণ্টা নরম মাটিতে ঘাসের মধ্যে চিতিয়ে পড়ে-থাকা মুকুন্দর ওপর একবার রোদ্দুর, একবার বৃষ্টি। পোকামাকড়, ছিনে জোঁক ওঠে তার গায়।

খবর যায় তার বাপের কাছে। তারিণীখুড়োর এসে পৌঁছতে সন্ধে। আমি সন্ধের ছিরড়ে অন্ধকারে সামন্তবাড়ির উঠোনের কাদায় তারিণীখুড়োকে আছড়ে আছড়ে কাঁদতে দেখেছি। বিশাল শরীর, বয়েস বছর চল্লিশ। আছাড়ি-পিছাড়ি করছিল কাদা মেখে। দেখেই বোঝা গিয়েছিল, ছেলের থেকে বাপের শরীরের তাকত অনেক বেশি।

ছেলের জায়গায় সামন্তবাড়িতে কাজে বহাল হয় তারিণীখুড়ো। আস্তে আস্তে দূরের গ্রাম থেকে ঘরসংসার গুটিয়ে নিয়ে আসে এই গ্রামে। শিবশঙ্করের দয়ায় এই বাস্তুজমি পেয়ে এখানে ঘর বানায়। তার মৃত্যুর পর এই ঘর ভোগ করবে তার বংশধররা। অবশ্য ইদানীং চারখানা ঘরই তারাই দখল করে আছে। কয়েক মাস ধরে সে তো পড়ে আছে, ওই দাওয়ায়, রোদ্দুরে, বৃষ্টিতে। ওকে নড়ানো যায় না।

এক ছোকরা ফুট কাটল, নড়ানো যাবে না কেন? যতই ভারি হোক, দশ জনে ধরে নিশ্চয়ই ঘরে তোলা যায়। মরার পরে তো ধরে তুলতেই হবে। তুলে নিয়ে গিয়ে পোড়াতে হবে।

একজন বলল এখন টানাটানি করতে গেলে যদি ফুড়ুত করে প্রাণপাখি উড়ে যায়।

—সে না হয় এখন। আগে কেন ঘরে তোলা হয়নি? খোলা বারান্দায় পড়ে আছে তো কয়েক মাস।

দুচার মিনিট গুজগুজ-ফিসফাস ছাড়া কথা নেই। একটা দাঁড়কাকের যাচ্ছেতাই কর্কশ ডাক কানে ঘা মারছিল। আগে কেন ঘরে তোলা হয় নি—এই সঙ্গত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে তারিণীর বাড়ির লোকরা। তারা হয়তো বলবে, তারা ভেবেছিল—খোলা বারান্দার আলোবাতাসে তারিণীর উপকার হবে। সে যা হোক, চন্দ্রকান্তর অন্তত এ প্রশ্নের ঠিক উত্তর জানা নেই। গায়ে যখন তাকত ছিল, অনেক পাপ-কাজ করেছে তারিণী। নিজের জন্য করে নি, করেছে শিবশঙ্করের খুশির জন্য, আনন্দ-উল্লাসের জন্য। তারিণীর সেই সব জঘন্য কাজের প্রতি তার বাড়ির লোকদের হয়তো সমর্থন ছিল না। তখন তাদের সাধ্য ছিল না তারিণীকে বাধা দেবার। এখন রোগে, বয়েসের ভারে তারিণী দুর্বল অসহায় হয়ে পড়ায় তারা বোধহয় ভাবছে, যত তাড়াতাড়ি আপদ বিদেয় হয় ততই ভাল। বয়েস, মানে সময়, দীর্ঘ সময়, সবকিছু নিংড়ে নিয়ে গেলে মানুষের কী দশা হয়, চন্দ্রকান্তর জানা আছে। তার নিজের বয়েস আশি। ছোকরাদের প্রশ্নে বাধা পেয়ে এবং একটু দম নেবার জন্য থেমে চন্দ্রকান্ত এসব ভাবছিল।

বয়স্ক একজন বলল, মাস্টের, তুমি তারিণীর জীবনবেত্তান্ত শোনাচ্ছিলে, শোনাও।

আবার চন্দ্রকান্তর মওকা। বলছিল, শিবশঙ্কর আমার বন্ধু ছিল বললে লোকে হাসবে। বন্ধু ছিল না ঠিকই। ছোটকত্তা আমার বন্ধু হবে কেমন করে? তবে ইসকুলে এক ক্লাসে পড়েছি কয়েক বছর—একথা তো মিথ্যে না। কাছ থেকে দেখেছি। সামন্তবাড়ির বড়কত্তা তখন বেঁচে নেই। মেজকত্তা ছিল শান্তশিষ্ট, আর শিবশঙ্কর যৌবনে খ্যাপা, লম্পট। লোকটা মরে গেছে কত বছর হল। তার সম্পর্কে খারাপ কথা আর বলতে চাই না।

ছেলের জায়গায় সামন্তবাড়িতে কাজে বহাল হওয়ার পর শিবশঙ্করের প্রতি তারিণীর এক তাজ্জব মনোভাব হয়। নিজের মনে শিবশঙ্করকে মুকুন্দর-জায়গায় বসায়। একজন বাড়ির কাজের লোক আর একজন বাড়ির কত্তা—দুজনকে এক জায়গায় ভাবা যায় না। তবু দুজনের একই বয়েস ছিল, বাইরের আদলে মিলও ছিল এক-আধটু। তাই তারিণীর ওই তাজ্জব মনোভাব।

শিবশঙ্কর সেটা টের পেয়েছিল। টের পেয়ে গিয়ে তার সব অপকর্মের দোসর, সব কুকীর্তির সহায় করে নিয়েছিল তারিণীকে। আর তারিণী ছোটকত্তার ছায়া হয়ে গিয়ে অন্ধস্নেহে দিনের পর দিন লম্পটের ক্রিয়াকলাপ না দেখার ভান করেছে, চোখ বুজে থেকেছে।

একবার তারিণীর ধুম জ্বর। শিবশঙ্কর তার বিছানার দুহাতের মধ্যে এসে বলেছিল, কেমন আছ? জ্বরের ঘোরে তারিণী নাকি তখন ছোটকত্তাকে দুতিনবার মুকুন্দ বলে ডেকেছিল। আমি তো ওখানে উপস্থিত ছিলাম না। আমি অন্যের কাছে শুনেছি।

এখন যেমন, অত বছর আগেও এই গ্রামে মাছ ধরার মোটামুটি তেমনই সব কায়দা ছিল। ছোটকত্তা চিতলমাছের পেটি খেতে ভালবাসত। আমি তারিণীকে চিতলমাছের জন্য টেটা হাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জলের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আষাঢ়ে এখনকার মতোই ঢল নেমেছে। নদী, খাল-বিলের পাড় ভেসে জল ঢুকছে মাঠে। সন্ধেয় যখন মাঠের জল সবে গোড়ালি ছাড়িয়ে উঠছে, তারিণী গিয়ে দাঁড়িয়েছে একটা সুবিধেজনক জায়গায়। নড়াচড়া করছে না মোটেই। তরতর করে জল বেড়ে যাচ্ছে। এভাবে ঘণ্টা তিনেক। যখন জল হাঁটু ছাড়িয়ে উঠেছে, তারিণীর পাঁচ-সাত হাত তফাতে একটা ইয়া চিতল। জলের তলায় মাঠের ঘাস তখনো সবুজ। চিতলটা অল্প জলে আহ্লাদে ওলট-পালট খাচ্ছে। মাছটার রুপোর পাতার মতো পেটের ওপর চাঁদের আলো। সেই পেটে তারিণী ঘ্যাঁচ করে টেটার আল গেঁথে দিয়েছে। আমি তারিণীকে সন্ধেয় মাঠের জলে গিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি, আর রাত বাড়লে চিতল গেঁথে নিয়ে আসতে দেখেছি। মাঝখানেরটা নিজের চোখে না দেখলেও, জানি এইরকমই।

একজন, তার বয়েস চন্দ্রকান্তর থেকে অন্তত দশ বছর কম, কিন্তু দাঁত না থাকায় কথা অস্পষ্ট, ফোঁস-যাওয়া গলায় চেঁচাল, খুব তো কাব্যি করচ মাস্টের। ছোটকত্তার সঙ্গে তারিণীর কুকীর্তির কথা তো কিছু বললে না।

অনেকক্ষণ একটানা কথা বলে চন্দ্রকান্ত কাশছিল। বিড়ি ধরিয়ে দু'টান দিতে কাশি আরো বাড়ল। দু'মিনিট পরে সামলে নিয়ে আবার বলছিল, লোকটা মরছে, তাই তার অপকর্মের কথা ঢাকনা খুলে বলতে চাই নি। জানি তো ঢাকনা খুলে খোঁচা মারলে কেউটে ফণা তোলে। যাক, তবু একটা মোক্ষম অপরাধের কথা বলি, যা থেকে ছোটকত্তা আর তার সাকরেদ তারিণীর কুকর্মের আন্দাজ পাওয়া যাবে।

গ্রামের পুব প্রান্তে একখানা খড়ের ঘরে পদ্ম নামে একটি কমবয়সী বিধবা থাকত। তার স্বামী সুন্দরবনে কাঠ না মধু কী আনতে গিয়েছিল আমি জানি না, তবে লোকটা আর ফেরে নি। দুটো ছাগলের দয়ায় পদ্ম পেটে ভাত জোটাত। ভাল দুঃখী মেয়েটার দুটো ছাগল ছিল। ছাগলের দুধ বেচত, একা থাকত। এক রাত্তিরে শিবশঙ্কর তার ঘরে ঢোকে। অনেক চেষ্টা করেও মেয়েটাকে বাগে আনতে না পেরে শিবশঙ্কর হাতের সরু স্টীলের ছড়ির ঘায়ে পদ্মর মাথা ফাটায়। মেয়েটা মরে গেছে বুঝতে পেরে শিবশঙ্কর সরে আসে। এসে তরিণীকে বেত্তান্ত জানায়।

তখন জৈষ্ঠের শেষ বা আষাঢ়ের শুরু। তেমন ঢল নামেনি। নদীর পাড় ভাসেনি, তবে পাড়ের মাটির চাংড়া ভেঙে ভেঙে পড়ছে নদীতে। বেত্তান্ত শুনে তারিণী সেই রাতে একা চলে যায় গ্রামের পুব সীমানায়। পদ্মর লাশ কাঁধে নিয়ে পুবপাড়ার খালের ধার দিয়ে নদীর দিকে জোর পায়ে হাঁটতে থাকে। রাত বেশি, কেউ কাছে ধারে ছিল না, একটা কুকুরও না। সেই সময়ে তারিণী ঘুঙুরের আওয়াজ শুনতে পায়। যেন তার চারপাশে অনেক নটী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নৃত্য করছে। তারার আলোয় চারপাশ দেখতে চেষ্টা করে তারিণী। কোনো নৃত্যপটীয়সী নজরে আসে না। তখন ব্যাপারটা মগজে ঢোকে। ধানগাছের নৃত্য। হাতখানেক উঁচু হয়েছে চারপাশের খেতের আমন ধানের তেজী গাছ। আধা-আঁধার রাতের আউলবাউল বাদলা বাতাস। আহ্লাদে ডগমগ ধানগাছ দুলে দুলে নাচছে। তার ঝুমঝুম শব্দ।

নদীর পাড়ে গিয়ে একটা পড়ন্ত মাটির চাংড়ার সঙ্গে পদ্মর লাশ কাঁধ থেকে জলে ফেলে দেয় তারিণী। স্রোতে দূরে টেনে নিতে না নিতে পদ্মর লাশ নিয়ে কচ্ছপদের কাড়াকাড়ি।

ফেরার পথে ঢল নামে। ধূর্ত তারিণী আবার পদ্মর ঘরে যায়। হোগলার বেড়া সুতলির বাঁধন খুলে কাত করে নামিয়ে দেয় বাইরের দিকে। তুমুল বৃষ্টির জল অবাধে ঘরে ঢোকে। রক্তের দাগ, আঙুলের ছাপ ধুয়ে যায়। ওসব থাকলেও কিছু হত না। যেমন হয়ে থাকে, দারোগা ছিল ছোটকত্তার ইয়ারদোস্ত।

আজ নয়, তারিণীর মৃত্যুর দিনে নয়, অন্যদিন নানাবিধ মজলিসি কথার মধ্যে চন্দ্রকান্তকে বলতে শোনা গেছে—একটা লেখক ছিল, ঠিক আমার

বয়িসী, বইটই লিখে গেছে। তার নাম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তার বইয়ের কোনো কোনো জায়গা আমার প্রায় মুখস্থ।

বোঝা যায়, একটা বৃত্তান্ত ফলাও করার সময় কথা বলার ঢঙ থেকে বোঝা যায়, চন্দ্রকান্ত বুড়োর বই পড়ার বাতিক ছিল।

তো সে যাই হোক, এক ছোকরা লুকিয়ে বিড়ি টানছিল, যখন চন্দ্রকান্তর কথার বেশ মিলিয়ে যেতে সময় লাগছিল তিন চার মিনিট। বিড়িটা ফেলে দিয়ে সেই ছোকরা মুখ তুলে বলল, এতসব আপনি জানলেন কেমন করে?

সত্যি গোপন করতে না হলে, মানে মিথ্যে বলতে না হলে, সহজে কথা বলা যায়। চন্দ্রকান্ত খুব সহজ গলায় বলল, আজ আর বলতে বাধা কী? সব আমি শুনেছি তারিণীর কাছে। এক সময়ে তারিণীখুড়োর সঙ্গে আমার খুব ভাব ছিল।

চন্দ্রকান্তর কথা শেষ হতে না হতে একটা ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা পাঁচ বছরের ছেলের চিৎকার, ন্যাংটো।

ছেলেটা আঙুল দিয়ে তারিণীকে দেখাচ্ছিল। মরার ঠিক আগে তারিণী বোধ হয় শেষবার ঈষৎ নড়াচড়া করেছিল। কুচকিতে জড়ানো ন্যাকড়ার ফালিটা আলগা হয়ে যথাস্থান থেকে সরে গেছে।

নারীকণ্ঠের চাপা কান্না শোনা গেল। তারিণীর দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহিতা কন্যার গলা বোধ হয়।

চন্দ্রকান্ত উঠে দাঁড়াল। একদম নতুন গলায় বলল, খুড়ো তাহলে সত্যিই চলে গেল।

হাতের ইশারায় ছোট ছেলেটাকে কাছে ডাকল চন্দ্রকান্ত। তারিণী ন্যাংটো হয়েছে বলে লজ্জায় অধোবদন ছেলেটা খানিকটা কাছে এলে চন্দ্রকান্ত কেবল তাকে নয়, সবাইকে বলল, একশো বছর আগে যখন জন্মেছিল তখনো তারিণী ন্যাংটো ছিল। নিষ্পাপ। পাপ তো ঢুকেছিল পরে। ন্যাংটো মানে নিষ্পাপ, নিষ্পাপ মানে পবিত্র।

গট আপ

কিন্নর রায়

সহদেব, সহদেব নয়

সহদেব কুণ্ডু যে কিনা কাযদা করে অটোগ্রাফের খাতায় এস কুণ্ডু বলে ইনিসিযাল দেয়, তার মিঠুন-চুলে বাবের ঢিমে আলো লেগেছিল। নটার পর কলকাতা যখন গভীর রাতের পথে ক্রমশ উন্মত্তকামিনী হয়ে ওঠে, তখন এই বারটিতে—যা কিনা ধর্মতলার খুবই কাছাকাছি, অবিরাম পানীয় স্রোত।

শ্রাবণে তেমন বৃষ্টি নেই, মাঝে মাঝে বজ্র-বিদ্যুৎসহ আকাশ ভেঙে পড়লেও গরম কমে না। এবং দেড বোতল 'সোনালী ঈগল' বিযার খাওযার পর ফেনায়িত সহদেব কিঞ্চিৎ অ্যালকোহলে সামান্য ভারি, কামানো লালচে মুখশ্রী, চোখে আষাঢ়-শ্রাবণের গঙ্গার গেরুয়া-লালিমা—যেন বা কোটালের বর্ণ।

এযার কণ্ডিশনে ঘাম জমে না। তবে কপালের ওপর ঝুরো চুলেরা ছড়িয়ে যায় প্রায ভুরু পর্যন্ত। সেখানে ধনুক যেন, এমন বোমবেথার ওপর শাদাটে ফ্যাটফ্যাটে সেলাইযের দাগ। নেহরু-কাপের কোযালিফাইং ম্যাচে চীনের পেনালটি বক্সের মধ্যে ঢুকে হেড করতে গেলে ওদের ডিফেণ্ডারও একই সঙ্গে হেড করতে ওঠে—ফলে সংঘর্ষ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পতন নয়। তার সামনের ওপর পাটির দুটি দাঁত সহদেবের কপালের মাংসে গতি এবং প্রতিরোধে বিঁধে যায়। বল ক্লিয়ার হযে গেছে পেনালটি বক্সের বাইরে। কর্নারও নয়, থ্রো-ইন। গোটা সল্টলেক স্টেডিযাম যেন বা জলকল্লোলের গর্জনে ধ্বনিত হতে হতে সারা মাঠ জুড়ে সহদেব তথা ভারতীয ফরোয়ার্ড লাইনের ব্যর্থতায় কেমন ধীরে

আছড়ে পড়ে। তারপর সহদেবের নামে হয়ত গোলকানা বিশেষণটিও জুটে যেতে থাকে। কিছু খিস্তি, অপ্রিয় কথার ঢেউ। তবু ভাগ্য ইট পড়েনি। এখানে তো কোনো সবুজ গ্যালারি নেই, তাই গ্যালারি থেকে ইটও ছুটে আসে নি।

এবং স্পট জাম্পে ব্যর্থ সহদেব কুণ্ডু—স্ট্রাইকার—ব্যর্থতার ধুলো মেখে মাঠে গড়াগড়ি দিতে দিতে বুঝতে পারে আসলে হিসেবে গোলমাল হয়ে গেছে। দেড় সেকেণ্ড আগে লাফাতে পারলেই তার মাথা ছোঁয়া বল চীনের জালে জড়িয়ে যেতে পারত। কোচের জায়গায় বসা উত্তেজিত জামালদা মাথায় হাত দিয়ে প্রায় চুল ছেঁড়ার ভঙ্গিতে তীব্র হাত-মুখ নাড়ায়—যা কিনা টি, ভি-র ক্লোজ সার্কিটের পর্দায় আর দূরদর্শনের প্রথম চ্যানেলে চলতি খেলার গতির সঙ্গে ইনসেটে চৌকো খোপে দেখিয়ে দেয়া হয়েছিল প্রায় তিন সেকেণ্ড ধরে। জামালদাও কি খিস্তি করছিল!

আর মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা সহদেব সুযোগ নষ্টের গ্লানিতে এবং নিজের যন্ত্রণা বোঝানোর জন্যে উপুড় হয়ে মুণ্ডহীন পশু যেন বা এমন ভাবে ছটফট করতে করতে শরীর নাড়িয়ে আসলে গোটা মাঠকেই তার দিকে আনতে চাইছিল। যেমন কোনো শক্ত ফাউলের পর রেফারির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তারা করে থাকে। সহদেব বুঝতে পারছিল তার ভুরুর রোমরেখা পেরিয়ে রক্তের ধারা নেমে আসছে চোখের পাতার ওপর। সেই উষ্ণতায় যন্ত্রণা ছিল। এবং খেলা সাময়িকভাবে থেমে গেলে, স্ট্রেচারে মাঠের বাইরে যেতে যেতে সহদেব দর্শক আসন থেকে শুনতে পেয়েছিল—শালার নকশা—গ্যালারি শো—চিরকালের গোলকানা শালা, অনিলের অতো সুন্দর লব করা বল। হাতের আঙুল দিয়ে নিজের কপালের রক্ত এনে সহদেব তার রং দেখতে পেয়েছিল। একটু চ্যাটচেটে, গাঢ় লাল। এবং রক্ত দেখলে খুব স্বাভাবিক মানুষের মতোই তার ভয় আসে। তিনটে স্টিচ নেয়ার পর মাঠে শেষ পনের মিনিট সহদেব প্রায় অপ্রতিরোধ্য ছিল। বারে বারে দুলে উঠছিল চীনের প্রাচীর। কিন্তু সহদেব গোল পায় নি। তার পাঞ্চ গোলকিপারকে বিট করেও সেকেণ্ড বারে লেগে ফিরে এলো। আর অনুতোষের অমন সুন্দর সেন্টার অনিল ঠিকমতো চিপ করতে পারলে খেলার ছবিই বদলে যায়। সে ম্যাচে ২-০ গোলে ভারত হারে অথচ কম করেও ৪-২ গোলে জেতার কথা ছিল ভারতের। পরদিন খবরের হেডলাইনে, দৈনিকের প্রথম পাতায় প্রায় এরকম ধরণেরই কোনো মন্তব্য ছিল।

আর এখন সামনের নিচু টেবিলে ভাজা মুরগীর ঝাল ঝাল স্বাদে, যা কিনা অ্যালকোহলিত জিভের টাকনা ছাড়াতে মশলা হিসেবে কাজ করে এবং ভিনিগারে ভেজানো ঝাঁঝহীন ঈষৎ টকটক পেঁয়াজের গোল গোল লালচে কুচি অথবা ছোট প্লেটে রাখা লালচে খোলাটি পর্যন্ত ছাড়ানো বাদামে স্বাদ বদল করতে করতে সহদেব মনীশকে বলতে চাইছিল আজকের এই ম্যাচে যে দুটো নিশ্চিত বল বাইরে মেরেছে, তা আসলে পোকা মিত্তিরদের অনুরোধে। নয়ত তলিয়ে দেখলে আদেশেও।

বিয়ারের সফেন লম্বাটে কাচের গ্লাসে বারের আলো ডুবে যেতে যেতে ভেসে ওঠে। মনীশ তার পাতলা হয়ে আসা লালচে চুল বাঁ হাতের পাঁচ আঙুলে নিজের মাথার মাঝখানে ফাঁকা হয়ে যাওয়া জায়গাটিতে সেট করতে করতে এবং টাক ঢাকা পড়ে গেছে—এই কাল্পনিক স্বস্তিতে বিয়ারে লম্বা চুমুক দিয়ে বলে—তুই যে পোকা মিত্তিরদের সঙ্গে আছিস, তাতে কি তোর গত বারের বাকি পেমেন্টটা পাবি? ক্লাবের গভর্নিং বডির ইলেকশনে পোকাদারা কি আসতে পারবে পাওয়ারে, নাকি অখিল সাঁমুই আর তার গ্রুপ—

লাইটারের নীলচে আগুনে কাগজ আর তামাকের পোড়া ধোঁয়া ভেতরে টানার ব্যবস্থা করে, ব্যাগিস-এর ঢোলা, বড় বুক পকেটে সিগারেটের প্যাকেট, লাইটার রাখতে রাখতে সহদেব আসলে একটু যেন উত্তেজিত ভাবেই বলতে চাইছিল—ছাখ আমাকে সই করিয়েছে চাঁদু মল্লিক। পোকাদা আর চাঁদুদা এক গ্রুপে এখন, এক জোট। তুই তো জানিস চাঁদুদা খুবই ভালো খেলত একসময়। ইণ্ডিয়া খেলেছে। মারডেকা ট্রফিতে চাঁদুদার গোল আছে। আসলে আমাকে চাঁদুদা পোকা মিত্তিরের সঙ্গে থাকতে বলেছে। আমার পেমেন্ট কাটা যাবে না।

পেলেই ভালো—বলতে বলতে মনীশ বিয়ারে লম্বা চুমুক দিল। লাগের গত তিনটে ম্যাচে মনীশ দলের জামা গায়ে পরে সাইড লাইনে বসে আছে। আগের গোটা চারেক ম্যাচে—কোনোটাই তেমন ইমপর্টান্ট নয়—সুফল জোয়ারদার ওকে দশ বা বারো মিনিটের জন্যে মাঠে নামিয়েছিল। ওর পজিশনে পাঞ্জাব থেকে আসা দলবীর। নামে পেমেন্টে গ্ল্যামারে দলবীর তো তারকা ফুটবলার।

সিগারেটের ধোঁয়ায় এক ধরণের আচ্ছন্নতা থাকে, এবং যদি তা অ্যালকোহলের সঙ্গে মিশে যায়, তবে আরও ভারি, গম্ভীর হয়ে ওঠে। শেষ পাঁচটি ম্যাচে সহদেব কোনো গোল পায় নি। আর ইদানীং দৈনিকের

পাতায় পাঞ্জাব থেকে আসা দলবীর, কুয়েত থেকে খেলতে আসা সালাউদ্দিন এবং কর্ণাটকের বেঞ্জামিনকে নিয়েই জয়জয়কার।

দলবীরের পাঞ্চ, গতি, স্কিল, সালাউদ্দিনের দম, গোলক্ষুধা, বেঞ্জামিনের টাইমিং, স্পট জাম্পে নিখুঁত হেড দেয়া—এসবই দৈনিকের বিষয়। এমনকি অফসেটে ছাপা ক্রীড়া সাপ্তাহিকের রঙিন মলাটে সালাউদ্দিনের হাসির ক্লোজআপ—'আপনি কেমন আছেন সালাউদ্দিন' এই হেডিংয়ে মলাট কাহিনী হয়ে যায়। ভেতরে তিনজন সুন্দরী বান্ধবীর সঙ্গে সালাউদ্দিন। তার প্রিয় খাবার, প্রিয় পানীয়ের তালিকা। দৈনিক কিছু বেহিসেবী জীবনের ছবি। হুল্লোড়মাচানো সালাউদ্দিন—সবই এক্সক্লুসিভ। 'কলকাতা ময়দানে জেট-যুগ' এই নামের কভার স্টোরিতে বল নিয়ে দৌড়ে যাওয়া দলবীর যেন বা কোনো বেগবান অশ্ব। আর 'ঘরের ছেলে বেঞ্জামিন'—এই শিরোনামের মলাট-গল্পে কতদিন কলকাতার ময়দানে ফুটবল খেলার স্বপ্ন দেখছে বেঞ্জামিন, তা নিয়ে সাতকাহন গপপো। সেখানে সহদেব বহুদিন ফ্রেমের বাইরে।

—অত শিওর থ্রুটা তুই বাইরে মারলি! লোকে ফিল্ড গট আপ ধরেই নেবে। সাপোর্টারবা তো চেল্লাচ্ছেই। আর কাগজঅলারা ভাবছিস ছেড়ে দেবে। এমনিতেই তো ফ্রেণ্ডস ইউনিটির সঙ্গে ২—২ অ্যাবসার্ড। ওরা গোল দিল, আমরা দিলাম। আবার আমরা দিলাম, তারপর ওরা শোধ দিল। দু দুটো শিওর নেট তুই বাইরে মারলি! এমনিতেই তো সবাই তোকে গোলকানা বলে। এখন আরও বলার সুযোগ পেল। পোকাদাদের কথা মতো ড্র করালি, অখিল সাঁপুইদের টাইট দেয়ার জন্যে! জুবিলি ইয়ার ট্রফি ঘরে না এলে অখিল সাঁপুই হ্যাটা হবে। মেম্বাররা, সাপোর্টাররা, পেট্রনরা খিস্তি দেবে। তাতে কার লাভ! ক্ষতি তো ক্লাবেরই হচ্ছে। রোজ কাগজে কাগছে কেচ্ছা।

সিগারেট যত ক্ষয়ে আসে আগুনে, নেশা তত গাঢ় হয়।—দুটো হুইস্কি বলবি? বলতে বলতে পুরনো সিগারেটের দগ্ধ শেষটুকু অ্যাশপটে মুচড়ে দিয়ে সহদেব নতুন সিগারেটে চলে গেল।

বিয়ারের পর আবার হুইস্কি। গোলমাল হয়ে যাবে সহদেব। তারপর তুই হিন্দমোটর ফিররি। অতটা রাস্তা।

পাগল নাকি, এমনিতেই আজ পুলিশ গার্ড নিয়ে মাঠের বাইরে এসেছি। সমানে ঢিল আর খিস্তি পড়ছিল। লীগ টেবিলে 'বাঙারাখী-র পজিশন এক নম্বর, সেইখানে দু দুটো পয়েন্ট যাওয়া - পাড়ায় ঢুকলেই এখন কেলাবে

আমায়। আমি ভাবছি তোর ফ্ল্যাটে দিন দুই। হাওয়াটা একটু পাতলা হলে।

মনীশ প্রায় দুবোতল বিয়ারের পর হুইস্কি খাবে কি খাবে না—এই দোটানায় ছিল। শনিবারের বড় ম্যাচের পর কাল রবিবার ছুটি। একটু বেলায় ঘুম থেকে উঠলেও চলে। রবিবার ক্লাবে প্র্যাকটিস থাকে না। ভোরে ময়দানে আসার দরকার নেই। লেকে গিয়ে পুরনো ক্লাবে একটু ছোটাছুটি, গা-ঘামানো, ফ্রি হ্যাণ্ড একসারসাইজ করে নিলেই চলবে। নয়তো সাঁতারও কাটা যেতে পারে। সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলো তো ঘড়ির কাঁটা ধরে। ঠিক পাঁচটায় অ্যালার্ম বেজে উঠলে তাড়াতাড়ি উঠে মুখ-হাত ধুয়ে সামান্য ব্রেকফাস্ট। দাড়ি কামিয়েই ময়দানে। সুফল জোয়ারদার ভীষণ ডিসিপ্লিনড সব ব্যাপারে। পৌঁছুতে দেরি হলে আর প্র্যাকটিস দেবেন না। ট্রাক স্যুট পরে দৌড়, পি, টি—সব পর পর। তারপর বল নিয়ে দৌড়নো। গোলে পাঞ্চ করা। প্র্যাকটিস শেষ হলে ক্লাবে স্নান। ওখানে মেসে দুপুরের খাবার খেয়ে অফিস।

বেলা দেড়টা দুটোর পর সহদেব বা মনীশ অফিসে থাকে না। হয় প্র্যাকটিস, নয় খেলা, নয়তো ক্যাম্প। চাকরি পেতেও ইন্টারভিউ বোর্ডের সামনে ঘামতে হয় নি। তবে এই জায়গায় নিজেদের খেলা এবং নামকে নিয়ে আসতে যথেষ্ট ঘাম রক্ত দিতে হয়েছে। পায়ে চোট, বুকে চোট, মাথা ফাটা।

দুটো ম্যাকডোয়েল হুইস্কি বলে মনীশ চুপ করে গেল। দুবোতল বিয়ারের পর একপেগ একপেগ হুইস্কি কিছুই নয়। তবু সারাদিনের মাঠের উত্তেজনায় তার দুচোখে ক্লান্তি ছিল, আজও জার্সি পরে সাইড লাইনে—আগের কয়েকটা ম্যাচের মতো। এর থেকে সুবধনী স্পোর্টিং-এ সই করলে মন্দ ছিল না। আসলে গত বারের ক্লাব ক্যাপটেন, এবারে ক্লাবের জুবিলি ইয়ার, শুধু শুধু সুবধনীতে গিয়ে যদি নিজেকে ফিট করতে না পারি—এমন ভেবে মনীশ দল বদল করে নি। তাকে তেমন কোনো বড় অফারও দেয়নি ক্লাব, তার ওপর দলবীর আসার ব্যাপারটি কিন্তু তার জায়গায় দলবীরই বা কি খেলল। আজ অবশ্য গটআপ ম্যাচ। এমনকি ডিসিপ্লিনড সুফল জোয়ারদারও জানতেন—রাঙা বাখী ফ্রেণ্ডস ইউনিটিকে দুগোল দেবে, ফ্রেণ্ডস ইউনিটি দুগোল শোধ করবে—সাপোর্টার, ক্লাবপ্রেমী দর্শকরা যতই চিৎকার করুক না কেন।

হুইস্কি এবং বিল দিয়ে গেলে মনীশ সোডা মিশিয়ে একটা বড় চুমুক দিল। সহদেব আস্তে খায়। আজকে তার দুটো পাঞ্চ বাইরে, পাড়ায় কালকে পরশু তরশু পরপর আওয়াজ খেয়ে যেতে হবে। অথচ তারাই একদিন কোনো বড় ম্যাচে গোল পাওয়ার পর তার ছবির গলায় মালা আর মালায় ভরিয়ে রাখে। বড় বড় হাতে লেখা পোস্টারে তার নামের পাশে—যুগ যুগ জিও। আকাশ নীল আর শাদা—এই দু রঙে 'বাঙা বাখী'র যে জার্সি, পতাকা, সেই রঙের পতাকা আকাশের গায়ে, বাড়ির মাথায় মাথায়! পতাকার ভেতরে সূর্য। টাটকা মালা দোলে পতাকার গলায়।

কলকাতার মাঠে বড় দলে ভালো পেমেন্ট নিয়ে টপ ফর্মে একজন ফুটবল প্লেয়ার কত বছর খেলতে পারে? তিন, পাঁচ, সাত! সত্তর হাজার থেকে এক লাখ দশ পনের কুড়ি হাজার টাকার বার্ষিক ক্যাশ এবং তার সবটাই ব্ল্যাকে। কারণ কলকাতার মাঠে ফুটবল তো এখনও প্রফেশানাল বলে ঘোষিত হল না। নিশ্চিত চাকরি। এদেশ ওদেশ—বিদেশ ট্যুর। গিফট—নানা ধরণের—গোল পেলে, লীগ চ্যাম্পিয়ান হলে, ট্রফি জিতলে।

বিয়ারের তেতোটুকু হুইস্কির ঝাঁঝে এবং কষায় হারিয়ে অন্যরকম হয়ে যায়। সঙ্গে সিগারেট পোড়ে। আজ সকালের একটি দৈনিকে প্রথম পাতায় সহদেব কুণ্ডু হাসছিল. তার মায়ের পাশে—এ ম্যাচে আমরাই ফেবারিট বলে—হেডিংও তাই ছিল। অথচ তাকেই বল বাইরে মারতে হলো।

এই ব্যর্থ পাঞ্চে কিছু অপমান থাকে। (১) দলবীর এখনও পর্যন্ত যে ভাবে গোল করছে তা তাকে দিয়ে গোল করানো হচ্ছে—এবার লীগে টপ স্কোরার হওয়া কেউ তাকে আটকাতে পারবে না। আটটা ম্যাচে এগারোটা গোল পেয়েছে দলবীর, তার মধ্যে একটি হ্যাট্রিক। এ দৌড়ে এর পরেই সালাউদ্দিন—নটা। ফ্রেণ্ডস ইউনিটের ইরানী খেলোয়াড়টি সালাউদ্দিনের গায়ে গায়ে, তারও নটি গোল। সেখানে লীগে গত দু বছরের বেস্ট স্কোরার এখন পর্যন্ত সহদেব চারটে গোল দিতে পেরেছে।

(২) কালকের কাগজগুলো তাকে কেউ ছাড়বে না (৩) সে কি করে পাড়ায় ফিরবে?

অ্যালকোহল গলা থেকে বুক বেয়ে গভীরে নেমে গেলে এক ধরনের জ্বালা থাকে। তারপর সেই জ্বালাটুকু কখন যেন যন্ত্রণা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে মস্তিষ্কের গভীরে—সহদেব টের পায়, আসলে এর আগেও সে বহুবার পান করতে করতে এ ব্যাপারটি টের পেয়েছে। লীগ টেবিলে পিছিয়ে পড়া, পোকা মিত্তির,

চাঁদু মল্লিক, সুফল জোয়ারদার—সকলের কথায় বাইরে বল মারা—অথচ এই থুতে পা ঠেকালেই গোল হয়, ভাবতে ভাবতে সহদেব গাল কামড়ে ফেলল।

কেউ গাল দিলে নাকি গালে কামড় পড়ে, বিশেষ করে খাদ্যহীন মুখগহ্বরে—এমন কথা সহদেব শুনে আসছে সেই ছোটবেলা থেকে। এখন এই প্রায় রাত দশটায় দু বোতল বিয়ারের পর, সামনের ভাজা চিকেনের খালি প্লেট, ভিনিগার ভেজানো শূন্য পেঁয়াজ-পাত্র এবং প্রায় খালি হয়ে আসা হুইস্কির গ্লাসে মিশে যাওয়া আলোর দিকে তাকাতে তাকাতে সহদেব বড় করে শ্বাস ফেলল। মনীশের পজিশনে নিয়মিত খেলছে বলবীর, গোল পাচ্ছে, তাকে দিয়ে গোল করানো হচ্ছে। টানা চার বছর 'রাঙারাখী' আর 'সবুজ সাথী'তে খেলা মনীশ পেট্রোল পাম্প করেছে। তার নিজের মারুতি, গোলপার্কে বারো শ স্কোয়ার ফিটের দামী ফ্ল্যাট। মোটা টাকা লগ্নী আছে এন. এস, সি. ইউনিট্ ট্রাস্ট এল আই সিতে এবং অনেক মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত বাঙালির মতো তারও বেশ লামসাম অ্যামাউন্ট 'সঞ্চয়িতা'-তে গেছে। তাছাড়া ব্যাঙ্কে ভালো চাকরি মনীশের। আগেকার ফুটবলারদের মতো খেলা চলে গেলে খাব কি? তার এই দুশ্চিন্তাবোধ আসার কোনো কারণ নেই। তবে খেলা না থাকলে কাগজে নিয়মিত ছবি, সাক্ষাৎকার, বান্ধবী, গুণমুগ্ধ ফ্যান—এসবই হারাতে হবে।

সহদেব আরও একটা হুইস্কি চাইছিল। মনীশ রাজি হয় নি। বলল, চল বাড়িতে একটা বোতলে কিছুটা আছে। গিয়ে খাব।

সহদেব তার কথা বিশ্বাস করতে চাইছিল না। সে তলিয়ে যেতে চাইছিল। সাজানো বল ঐ ভাবে কেউ বাইরে মারে। তাও ফ্রেণ্ডস ইউনিটির মতো টিমের সঙ্গে। গতবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হওয়ার পর সারা রাত ক্লাবে উৎসবের ফোয়ারা আর আলোয় ভেসে পরদিন অফিস না গিয়ে বিকেল বিকেল তাদের হিন্দমোটরের বাড়ি যাওয়ার সময় সে আর মনীশ মারুতিতে পাশাপাশি। লীগ চ্যাম্পিয়ান টিমের ক্যাপটেনের একটা আলাদা মর্যাদা থাকে। স্টেশন থেকে তাদের বাড়ি যাওয়ার দুপাশে শুধুই নীল শাদা পতাকারা—যেন বা আকাশ থেকে নেমে এসে শূন্যে দোল খাচ্ছে। তার মাঝখানে সূর্য। পতাকার গলায় মালা।

বাড়ির সামনে, গলির মুখে ইটের বেদী করে বাহারি রঙিন কাগজে তাকে ঢেকে তার রঙিন ছবি অফসেটে ছাপা ক্রীড়া সাপ্তাহিকটি থেকে কেটে নিয়ে

দরমার ওপর সুন্দর করে সাঁটা পাশাপাশি রাঙারাখীর অন্যান্য খেলোয়াড়েরা —সুবীর, কল্যাণ, অনুতোষ, হরিদেব প্রসাদ, আমিনুল্লা, অনিল, সবার বড় ছবিটি মনীশের। হাসছে। তার উজ্জ্বল দাঁতের সারিতে যে কোনো মালটি ন্যাশনাল কোম্পানির টুথপেস্ট-বিজ্ঞাপন হতে পারে।

আওয়ার হিরোজ—এই ক্যাপশনে তারা সবাই—রাঙারাখীর খেলোয়াড়েরা। সকলের গলায় মালা। মাইকের আকাশ ফাটানো চিৎকার। যেন বা চোদ্দ পার্বনটি এভাবেই জুড়ে গেল হিন্দমোটরের মানুষের জীবনে।

আর আজ, সহদেব জানে কোনো নেড়ি কুকুরের গলায় তার ছবিটি অবধারিত ভাবেই ঝুলতে পারে এবং শালা গোলকানা! টাকা খেয়েছে ফ্রেণ্ডস ইউনিটির কাছ থেকে—এমন শব্দাবলী শোনার জন্যেও তার কান তৈরি হয়ে আছে। সঙ্গে ইটের টুকরোও হয়তবা।

—তো মনে আছে, বিরাশিতে খিদিরপুরের হয়ে রাঙারাখীকে গোল দিলি। ঐ এক গোলেই হেরে গেল রাঙারাখী। তোর ঐ গোলেই রাঙারাখী সেবার লীগ চ্যাম্পিয়ান হতে পারে নি। পরদিন স্টেটসম্যান তোর ছবি ছেপে দিয়ে লিখল—'জায়েন্ট কিলার'। তোর নামে গোটা ময়দানে গুজব ছড়িয়ে যায়, তুই আসলে ফ্রেণ্ডস ইউনিটির পাঁড় সাপোর্টার। সেবার ফ্রেণ্ডস ইউনিটি লীগ পেল। পরে রাঙারাখীতে আসার পরও সেই বদনাম যায় নি তোর।

আজকে এই গোলটা না দিয়ে। মনীশ শেষ তলানিটুকু সিপ না করে ঢক করে খেল। তারপর মুখের ভাঁজগুলো নানা ভাবে ভেঙে, কিছুটা বিরক্তি এনে, একটা সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়া টানল।

নিজের নামে স্টেটসম্যানে বিশেষিত ঐ শব্দটি সহদেবের সেই প্রথম শোনা।

—তুই কিন্তু প্যাঁচে পড়বি। সুকলদা, পোকাদা, চাঁদুদা সবাই যাই বলুক না কেন, অখিল সাঁপুই আর তার গ্রুপ এখনও পাওয়ারে। এই যে তুই শিওর নেট করলি না, তাতে কিন্তু সাপোর্টাররা আরও কনফার্ম হবে তুই আসলে ফ্রেণ্ডস ইউনিটির।

বিল মিটিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে আসতে তেমন সময় লাগে না। বাইরে প্লেট রঙের মারুতি ছিল। মনীশ চালাবে। তার আগে বার থেকে দুপা বেরিয়ে ফুটপাতের ওপর পানের দোকানে বরফে শোয়ানো পান পাতারা। এই ঠাণ্ডা পান একটি খাবে মনীশ। আর একটি সহদেব।

কলকাতা আলোয়, রঙে, হুল্লোড়ে তেমনই প্রাণবতী। একটু আগে এক পশলা হয়ে গেছে। সিনেমার বিশাল হোর্ডিংয়ের গায়ে স্বল্পবাস নায়িকাকে যেন বা আরও ভিজে ভিজে দেখতে পেল সহদেব। এবং তাদের মাকড়ি বাঁক নেবার পরই গত কাল রিলিজ হওয়া সিনেমার হিরোর গলায় দীর্ঘ মালা। একদিনে ভক্তবৃন্দের মালা শুকোয় নি। তার প্রায় লেপটে আঁচড়ানো চুলে—মনে হতে পারে খুব তেল মেখে চিরুণী দিয়ে পেছন দিকে টানা হয়েছে—আসলে এর একটা ইংরেজি প্রতিশব্দ আসছে, যা এখনই সহদেবের পেটে আসছে, মুখে আসছে না—বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে যাচ্ছে।

পরদিন সকালে মনীশের গোল পার্কের ফ্ল্যাটে একটু বেলাতেই ঘুম ভেঙে মনীশ যে প্রভাতী বাংলা দৈনিকটি নেয়, তার প্রথম পাতায় বক্স করে কাল গট আপ ম্যাচ নিয়ে ছি ছি ছি চোখে পড়ল সহদেবের। খবরের কাগজের বাঁ দিকে প্রধান খবর গট আপ ম্যাচ। ভেতরে 'সম্পাদকীয়' 'গট আপ ম্যাচ আমাদের লজ্জা।' এবং ভেতরে সাত ও আটের খেলার পাতায় এ নিয়ে বিশেষ সম্পাদকীয়, রিপোর্টিং। স্কুল জোয়ারদারের সাক্ষাৎকার।

'আমার ছেলেরাই আমায় ডুবিয়েছে'—এই হেডিংয়ে সুফলদার লেখা পড়তে পড়তে সহদেব বার বার চোয়াল শক্ত করে ফেলছিল। তার সামনে ভোরের চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। এবং সহদেবের চান্স মিস করাটাকে তিনি সেন্ট পারসেন্ট, চান্স বলেছেন। ফিফটি ফিফটি বা সিক্সটি ফরটি নয়।

প্রথম পাতায় বক্স 'খেলার পর মদের টেবিলে' এই হেডিংয়ের বক্স আইটেমটি পড়ে সহদেব সত্যিকারের ঠাণ্ডা হয়ে গেল। যে বারটিতে তারা কাল মদ্যপান করেছে, তার একটি রসালো বিবরণ বক্স করে ছাপা হয়েছে। স্টোরিতে তার নাম আছে। মনীশের নাম নেই, তবে বিবরণে প্রায় ধরেই নেয়া যায় যে সেই সঙ্গী মনীশই। বারের নাম নেই, লোকেশন রয়েছে। এবং সব চাইতে হাইট ব্যাপারটি হলো—সহদেবদের সঙ্গে তাদের এক বান্ধবীকেও দেখা গেছে। রাগে দুমড়ে-মুচড়ে মেঝের ওপর ছিঁড়ে ফেলেছিল খবরের কাগজ। ফ্যানের হাওয়ায় সরতে সরতে তারা যেন কোথায় চলে যাবে। আজ রবিবার, প্র্যাকটিস নেই। সহদেব ঠিক করল এ কাগজটির স্পোর্টস এডিটরকে ফোনে ধমকাবে।

নতুনের আয়োজন

মিড ফিল্ডে অনেকটা সুইপার ব্যাকেব মতো তোমায খেলাব। যেমন জুলিযেন ক্যামিনোকে একবার ইস্টবেঙ্গলের প্রদীপদা—

একটু আগেই প্রাকটিস শেষ হযেছে। ময়দানেব সবুজে সূর্য তাব সমস্ত তাপ, বোদ নিবে লাফিয়ে পডেছে। আমাদেব প্রশান্ত, সুদীপের মতো মিড ফিল্ডাব নেই। বলবীর, সালাউদ্দিন, বেঞ্জামিন—তিন জনকেই তো খেলা ধরাতে হবে। মাঠেব ওপর চিৎ হযে শুযেছিল সহদেব। তাব বুটে, হোর্সে কাদা, ঘামে ভেজা জার্সি পডে আছে একটু দূরে—কুণ্ডলী পাকিয়ে। ওসব অতুল মালি ঠিক ঠিক তুলে বাখবে। খালি গাযে বুকেব ওপর ঘাম এবং ধুলো, তার ওপব সরু সোনার চেনটি নিজস্ব বর্ণালীতে উজ্জ্বল। এবং চেনেব সঙ্গে ঝোলানো গুরুদেবেব লকেটটি এই সূর্যেব দীপ্তিতে আলাদা বোনো রং পায না। কাঁধে মাথায, হাতে পাযে চ্যাটচ্যাটে ঘামেব সঙ্গে ধুলো জডিযে গেছে। ভালো কবে চান না কবলে হবে না।

মনীশ আজ প্র্যাকটিসে আসে নি। নতুন একটা ব্যবসাব কথা ভাবছে মনীশ। মাশরুম। এখনও এনিযে ওযেস্টবেঙ্গলে তেমন চিন্তা ভাবনা হযনি। একটু স্যাঁতসেঁতে, গ্রীন হাউজ তৈবি করে প্রোডাকশান চালু কবতে পারলে মানি ফ্লো যা হবে—বলতে বলতে মনীশ তাব হাত চেপে ধরেছিল। আমবানিবা মাশরুম মার্কেটিংযে নেমেছে। আবও বিগ ইণ্ডাস্ট্রিযাল হাউসগুলো আসবে। ব্যাপারটার সম্ভাবনা আছে। অনেক, অনেক টাকা।

হিন্দমোটর থেকে বোর্জ প্র্যাকটিসে আসতে বেশ অসুবিধে। বেহালা চৌবাস্তাব কাছে একটা সাডে সাতশো বা হাজাব স্কোযাব ফিটের ফ্ল্যাট নিলে তাব কুলিযে যায। ভাবতে ভাবতে সুফলদার দিকে ফিরল সহদেব। প্র্যাকটিশেব পর একটা ভি ডি ও ছিল—উরুগুযে বনাম ইতালি। ওয়ার্ল্ড কাপেব কোযার্টাব ফাইনাল। আগেব দিন ভি ডি ও ক্যাসেটে টিগানাব খেলা—ওহো! ফ্রান্সের এই খেলোযাডটি—যাব গায়ের রঙে বক্তে চেহারায আলজেরিযা মিশে আছে। এমন একজন মিড ফিলডার! নিশ্চযই বেকেন বাওযাব নয, কিন্তু টিকানাও গ্রেট আর্টিস্ট।

সুইপার ব্যাক খেলতে গিযে তাকে যে যে অসুবিধেব সামনে পডতে হবে এক দুই বা ক-খ হিসেবে সাজালে বা ক্রমান্বযে এভাবে আসবে—গোল পাওযার খুব অসুবিধে হযে গেল। তাছাডা বেঞ্জামিন তো তাব জাযগাতে খেলবে।

দুটো তিনটে ম্যাচ ভালো খেললেই ও জায়গা থেকে বেঞ্জামিনকে সরানো শক্ত হবে। ভিন রাজ্য, ভিন দেশী প্লেয়ারদের আজও অন্যরকম গ্ল্যামার। তাকে প্রচুর দম রাখতে হবে—আক্রমণে এবং আত্মরক্ষায়—সমানতালে নেমে উঠে খেলায় সামান্য ভুলেও টিম ডুবে যাবে?

গোল দিতে পারলে কাগজে নাম ছবি। বড় ম্যাচে গোল পেলে স্যুট লেংথ, টেলিভিশন, মোটর সাইকেল, নগদ টাকা। সেখানে মিড ফিলডার, সে বড় জোর একটা ফ্রিকিক, পেনালটি বা সাডেন ডেথ মারবে। কখনও বরাত জোরে একটা দুটো গোলের শিকে তার ভাগ্যে ছিঁড়লেও ছিঁড়তে পারে।

সুফলদা ইণ্ডিয়া খেলেছেন। চাঁদুদার মতো অতবড় প্লেয়ার তিনি নন। বড় ম্যাচের আগের আগের দিন কোচের কথা মতো—যে কোচ তাঁকে কিশোরবেলা থেকে বলে লাথি মারতে শিখিয়েছেন, ইনি ক্লাব কোচ নন—বাঁকে করে জল নিয়ে তারকেশ্বর—শেওড়াফুলি থেকে পায়ে হেঁটে। কার্টিলেজ ছিঁড়ে গেল। অপারেশন করেও বেশি দূর এগনো যায় নি। তবু সুফলদা কোচ হিসেবে সার্থক। ভোকাল টনিকে টিমকে একস্ট্রা এনার্জি দিয়ে দেন। দল ট্রফি পায়।

প্র্যাকটিশের পর গ্লুকোজের জল পাওয়া যায়। শুয়ে আধশোয়া অবস্থায় সকলেই বিজ্ঞাপনের এনার্জি শরীরে ঢুকিয়ে নিচ্ছিল। রোদ, তীব্র—ক্ষমাহীন। ক্লান্তিতে এলানো শরীর তৃষ্ণায় পানীয় প্রত্যাশী ছিল। এখন তা সাময়িক বিরতি পেয়েছে।

আকাশে মেঘ ছেয়ে আসছিল—এবর্ষা ঋতুতে যেমন হয়ে থাকে। ঘাস মাটি অথবা প্রকৃতির ওপর থেকে নিজেকে তুলে সহদেব অফিস যাওয়ার কথা ভাবছিল। কলকাতার ফ্ল্যাটটি তৈরি করাতে গেলে এখনও অন্তত তিন বছর ফর্মে থাকতে হবে সহদেবকে টাকার হিসেব তাই বলে।

জুবিলি ইয়ার, গভর্নিং বডির নির্বাচন, পোকা মিত্তির চাঁদু মল্লিক ভার্সেস অখিল সাঁপুই এ সবই বাঙা বাখীর লীগ পারফরমেন্সকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এবং সহদেব সুইপার ব্যাক হিসেবে প্রায় ম্যাচেই নিজেকে খুঁজে পায় না। দৈনিক কাগজগুলো তার সম্বন্ধে লেখে—বুড়ো ঘোড়া সহদেব দম পাচ্ছে না। অথচ সহদেবের তো এখনও তিরিশও হয় নি। তার ফুটবল কেরিয়ারের গোল্ডেন ইয়ার চলছে তো তিন বছর ধরে। আসলে বেঞ্জামিনকে রেগুলার ফরোয়ার্ড লাইনে এস্টাব্লিশ করার জন্যে এটুকু ছলনার হয়ত প্রয়োজন ছিল।

কর্মকর্তা—অখিল সাঁপুই, দর্শক সমর্থকদের চাপে সহদেবকে পেছিয়ে খেলতে হবে।

শেষ নৌকো

বড় খেলায় 'জ্বলে ওঠার' একটা ভাষা ইদানীং বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার কল্যাণে খবরের কাগজের বাংলায় জুড়ে গেছে। বিটার্ন লীগে ফ্রেণ্ডস ইউনিটির সঙ্গে খেলায় এক গোলে পিছিয়ে থাকা রাঙা বাখীর সুইপার ব্যাক সহদেব কুণ্ডু প্রকৃত অর্থেই হয়ত জ্বলে উঠতে চেয়েছিল। তার দমে, হয়ত কোনো কোনো ক্রীড়া সাংবাদিক একে ডোপ করা দম বলতে পারতেন—গোটা মাঠ ছত্রখান হয়ে যাচ্ছিল। আসলে দলবীর, সালাউদ্দিন এবং বেঞ্জামিন তিনটি ক্ষুধার্ত বাঘ – যাদের গোল ক্ষুধা অসম্ভব—মনে রাখা ভালো, গোল ক্ষুধা শব্দটিও বাংলা জার্নালিজমের দৌলতে পাঠকরা জেনেছেন, জানছেন—তাদের বলের যোগান দিচ্ছিল সহদেব। দিতে দিতে নিজেও নিচ্ছিল। অপমান, তার সঙ্গে কলকাতায় একটা ফ্ল্যাট করতে হবে—এ জন্যে অন্তত তিনটে সিজন টপ কর্মে থাকা দরকার—এমন তৃষ্ণায়, উত্তেজনায় সহদেব ছুটছিল।

অ্যাটাকটা হয়েছিল মাঝ মাঠ থেকে। গভর্নিং বডির ইলেকশনে চাঁদু মল্লিক, পোকা মিত্তির জিততে পারে নি, তার পেমেন্ট আর মোটে দু হাজার টাকা বাকি। লীগ শেষ হওয়ার আগেই ফুল পেমেন্ট হয়ে যাবে, এমন কথা পাওয়া গেছে। সে টাকায় ফ্ল্যাটের অ্যাডভান্স করে দিয়েছে সহদেব। সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে করে, হাত-পা নেড়ে নেড়ে ভোকাল টনিকে গোটা দলকে অতিরিক্ত রক্ত আর অক্সিজেন দিচ্ছিলেন সুফলদা। ব্যাক লাইন থেকে লম্বা সেণ্টার করল হরিপ্রসাদ, বল ধরেই বন বন করে দৌড়ল সালাউদ্দিন, গোটা মাঠ তখন গর্জনে গর্জনে ফেটে পড়ছে।

দু জনকে কাটিয়ে সালাউদ্দিন মাইনাস করল সহদেবকে। তারা সকলেই তখন দেলেক্রেয়ার ঘোড়া। কিংবা ঘাসভূমির কেশর ওড়ানো বন্যতা। বল ধরে নিয়ে, সেণ্টার লাইন পেরিয়ে ফ্রেণ্ডস ইউনিটির ডিফেন্সলাইনে পৌঁছে উঁচু করে বল বাড়াল বেঞ্জামিনকে। বেঞ্জামিন ফাঁকায়। রেডিও এবং টি ভি ঘোষকের গলায় ঝড়ের সংকেত। এই গোল হলো, গোল হলো বুঝি।

রাঙা বাখীর সাপোর্টাররা জেনে গেছে গোল হয়ে গেছে। বেঞ্জামিন নিজে শট না নিয়ে মাইনাস করল সহদেবকে। বাঁ পায়ে চিপ করল সহদেব, যা তার কাছে প্রায় জলভাতের ব্যাপার। মার্বেল যে ভাবে পিলে গড়িয়ে যায়, বল

তেমনি করেই ঢুকে গেল ফ্রেণ্ডস ইউনিটির গোলে। গোলকিপার প্রবীর, লেফট ব্যাক স্নেহাশিসের কিছু করার ছিল না।

তবু গোলের বাঁশী বাজল না।

বাজল অফ সাইডের বাঁশী। ফ্রেণ্ডস ইউনিটির ফ্রি কিক। অফ সাইডে সহদেব। গোটা মাঠ বুঝি ঝড়ে ভেঙে পড়বে। আর জমা ক্ষোভ এবং রাগে—অপমানে সেই প্রথম এবং হয়ত বা শেষবারের মতো রেফারিকে চড় মারল সহদেব। হাতের চেটোর টানে হাওয়া কেটে গালে মারতে যতটুকু শক্তি লাগে, সহদেব তার থেকে বেশি জোরেই হয়ত মারল।

তার মুখ থেকে অস্ফুট কু-কথা বেরিয়ে আসল, ঘাড় বেঁকে, চুল ঝেঁকে এলো সামনে।

গোটা গ্যালারি মাঠে ঢুকে পড়েছে। পুলিশ। লাঠি, টিয়ারগ্যাস, ইটের টুকরো। খেলার পাতার ছবি, খবর অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল।

নিয়ম মতো লাল কার্ড দেখে সহদেবের কিছু করার ছিল না। একজন পুলিশ, কর্মকর্তা তাকে টেনে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

সমর্থকের প্রবল খিস্তির ফোয়ারার মধ্যে সহদেব কিছুতেই বোঝাতে পারছিল না—আসলে সে ইচ্ছে করে অফ সাইডে যায় নি।

আমার চোখে মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতায় নাট্যমঞ্চে ও চলচ্চিত্রে শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয়-দক্ষতা হৃদয়ঙ্গম করার আগেই তাঁর নাম ও অভিনয়ে পারঙ্গমতা সম্পর্কে আমার খানিকটা পরিচয় ও কিছুটা অভিজ্ঞতা ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে 'চিত্রবাণী' নামক একটি সাময়িক পত্রিকায় মনোরঞ্জনবাবু সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। পরবর্তীকালে সেটি অবলম্বনে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ 'বহুরূপী' পত্রিকার একটি বিশেষ সংখ্যায় একটু সংক্ষিপ্ত আকারে তা পুনর্মুদ্রিতও হয়েছিল। বাড়িতে হাতের কাছে দুটি পত্রিকাই না পাওয়ায় স্মৃতিমন্থন করে তাঁর জন্মশতবর্ষে লিখিতভাবে এই শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হল।

প্রয়াত মনোরঞ্জন ভট্টার্যের পিতৃনিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার কামারখাড়া গ্রামে. পরে সেটির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় স্বর্ণগ্রাম। সেই গ্রামটি ছিল বর্ধিষ্ণু এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর শিক্ষিত লোকদের বসত। তারই মাইলখানেক দূরে আদারাড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে হয়েছিল আমার জন্ম এবং সেখানেই ৭।৮ বছর বয়স পর্যন্ত আমার জীবন কাটে। কামারখাড়া গ্রামে একটি বাঁধা স্টেজ ছিল। সেখানেই মাঝে মাঝে গ্রামবাসীরা নাটক অভিনয় করতেন। অল্প বয়স থেকেই নাটক সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল বলে সেই স্টেজে হয়তো দু'একটি নাটকের অভিনয় দেখেছিলাম। তার ভাষা ভাষা

স্মৃতিটুকুই মনে আছে, কিন্তু কারা সেখানে অভিনয় করতেন তা মনে রাখা সম্ভব নয়। আমার বিশ্বাস সেই গ্রামের মঞ্চেই মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয় জীবনের হাতে-খড়ি। আমি বালক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ছিলেন তখন পূর্ণ যুবক।

তিনি বি এস সি পাশ করেছিলেন কোন্ কলেজ থেকে আমার জানা নেই। শুনেছি অংকে তাঁর বিশেষ দখল ছিল। সেই কারণেই হয়তো নাট্যজীবনে তাঁর সেই বৈজ্ঞানিক মনটি কাজ করত। বি এস সি পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি এম. এস সি ক্লাসেও ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯২১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ ছেড়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন'এ যোগ দেন। কিছুকাল কলকাতার উত্তর জেলা কংগ্রেস কমিটিতে কাজ করার পর ঢাকায় ফিরে যান।

তাঁর ছাত্রজীবনে বিক্রমপুর ছিল অনুশীলন সমিতির একটি বড় ঘাঁটি। সেসূত্রেই ঢাকা জেলার অনুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সমিতির প্রখ্যাত নেতা প্রতুল গাঙ্গুলী ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিশের দশকের শেষ দিকে ঢাকার নাট্যপ্রেমিক জমিদার ব্রজগোপাল দাস উৎসাহী হয়ে ঢাকা শহরে 'পিকচার হাউস' সিনেমা হলে 'লায়ন থিয়েটার' নামে একটি পাবলিক থিয়েটার চালাতে প্রয়াসী হন। সেই থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে আহ্বান করা হয়। তাতে যোগ দেবেন কিনা যখন তিনি ইতস্তত করছিলেন, তখন প্রতুল গাঙ্গুলি তাঁকে বলেন তার আগেই তো মনোরঞ্জন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত 'নাট্যমন্দির'-এ অভিনয় করেছেন, ঢাকায় যখন একজন উদ্যোগী হয়ে সেরূপ থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর হয়েছেন, তখন তাতে যোগ দিয়ে তাঁকে উৎসাহিত করাই তো উচিত। যতদূর মনে পড়ে তিনি অভিনেতা হিসেবে 'লায়ন থিয়েটার'-এ যোগও দিয়েছিলেন। কিন্তু থিয়েটারটি বেশিদিন চলে নি।

১৯৩০ কিংবা তার কাছাকাছি কোনোকালে শিশিরকুমার যখন তাঁর থিয়েটারের দল নিয়ে আমেরিকায় গিয়েছিলেন তখন সেই দলে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে ফিরে 'শ্রী' সিনেমা হলে শিশিরকুমার যখন 'নাট্যমন্দির' পুনরুদ্বোধন করেন তখন সেখানে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অভিনয় করেছিলেন কিনা মনে নেই। প্রসঙ্গত বলা দরকার আমেরিকায় গিয়ে শিশিরকুমার ব্যর্থ হয়েছিলেন বলে এদেশে পত্র-পত্রিকায় প্রচার চলছিল। পরবর্তীকালে মার্কিন পত্র-পত্রিকায় তাঁর দলের অভিনয়

সম্পর্কে যেসব প্রশংসা বেরিয়েছিল শিশিরকুমার তার কাটিংস আমাকে দেখিয়েছিলেন। এই প্রচারের মূলে ছিল দেশে শিশিরকুমারের খ্যাতিতে অন্যান্য থিয়েটারের মালিকদের যাঁরা ঈর্ষান্বিত ছিলেন তাঁদের সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলি।

এরপরে 'স্টার থিয়েটার' ভাড়া নিয়ে শিশিরকুমার যখন 'নবনাট্যমন্দির' খোলেন তাতেও মনোরঞ্জনবাবু যোগ দিয়েছিলেন কিনা এত বছর পরে তা স্মরণে নেই। পরবর্তী সময়ে শিশিরকুমার যখন 'নাট্যনিকেতন' থিয়েটারে 'শ্রীরঙ্গম' নাম দিয়ে নাট্যশালা খোলেন সেখানে শিশিরকুমারের পাশে অনেক নাটকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে অভিনয় করতে দেখেছি।

নাট্যজগতে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য 'মহর্ষি' নামেই খ্যাত ছিলেন। মহর্ষি বলতেই মনোরঞ্জনবাবুকে বোঝাত। এই 'মহর্ষি' আখ্যাটি তিনি কী করে পেলেন তাঁর নিজের মুখেই সে কাহিনী শুনেছি। শিশিরবাবু যখন যোগেশ চৌধুরীর 'সীতা' নাটক অভিনয়ে উদ্যোগী হন তখন বাল্মীকির ভূমিকায় কাউকেই তিনি উপযুক্ত অভিনেতা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। রসরাজ অমৃতলাল বসু শিশিরকুমারকে খুব স্নেহ করতেন। তিনি শিশিরকুমার প্রযোজিত নাটকের মহড়ায় প্রায়ই উপস্থিত থাকতেন। একদিন মনোরঞ্জনবাবুকে শিশিরকুমার ডেকে পাঠালেন। শিশিরকুমারের ডাক পেয়ে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য পরের দিনই 'নাট্যমন্দির'-এর মহড়ায় উপস্থিত হলেন। শিশিরকুমার তাঁকে দিয়ে 'বাল্মীকি' চরিত্রের খানিকটা পড়তে দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর তাঁকে বলা হল পরের দিন খবর দেওয়া হবে। অমৃতলাল শিশিরকুমারকে পরামর্শ দিলেন, 'শিশির একেই তুমি বাল্মীকির ভূমিকায় নামাও, কারণ এর বলার ভঙ্গিতে বাঙালের একটু টান আছে, বাল্মীকি তো অরণ্যে বাস করতেন, নাগরিক সভ্যতা ও ভাষার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। একেই মানাবে'। অমৃতলালকে শিশিরকুমার খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। সুতরাং তাঁর কথাই শিশিরকুমার মেনে নিলেন। এরপরেই শিশিরকুমার প্রযোজিত 'সীতা' নাটকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাল্মীকির ভূমিকায় অবতরণ। এই কাহিনী বলতে বলতে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য হো হো করে হেসে উঠে বললেন—'আমি আবার মহর্ষি হলাম কবে? আমি ঋষিই নই তো মহর্ষি। আমি নিতান্ত ছাপোষা সংসারী লোক।'

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসি চল্লিশের দশকের গোড়ায়। অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে আমার লেখা প্রথম নাটক 'অন্তরাল'-এর পাণ্ডুলিপি

নিয়ে ১৯৪২ সালের গোড়ার দিকে তার কাছে যাই। তিনি 'রূপবাণী' সিনেমা হলের পাশেই তিনতলার 'ফ্ল্যাটে' থাকতেন। সেটি সাধারণত 'রূপবাণীর ফ্ল্যাট' নামেই পরিচিত ছিল। এর আগে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ ছিল না। ঘরে ঢুকে তাঁকে প্রথম প্রণাম করলাম। তিনি একটু বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন এবং বসতে বললেন। ঘরে আসবাবপত্র সামান্যই ছিল। নিজের পরিচয় দিয়ে খানিকক্ষণ আলাপ করার পর তাঁর হাতে পাণ্ডুলিপিটি দিয়ে সেটি পড়ে তাঁর মতামত জানাতে অনুরোধ করলাম। তিনি সাদরে আমার পাণ্ডুলিপিটি গ্রহণ করলেন। তারপরে বাংলা থিয়েটারে তখনকার অভিনীত নাটকগুলি সম্পর্কে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর চলে আসি। দিন সাতেক বাদে আবার তাঁর কাছে যাই। যেতেই তিনি আমার হাতে পাণ্ডুলিপি ফেরৎ দিয়ে চুপ করে বসে রইলেন। পাতা উল্টিয়ে দেখলাম স্থানে স্থানে তিনি লেখার পাশে লাল পেন্সিলের চিহ্ন দিয়েছেন। বুঝলাম নাটকটি তিনি মন দিয়েই পড়েছেন। প্রত্যক্ষভাবে তাঁর মতামত জানার আগ্রহ প্রকাশ না করে পরিবর্তে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম যে কোনো পাবলিক থিয়েটারে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিনয়ের জন্য নাটকটি নিয়ে উপস্থিত হওয়া যায় কি না। উত্তরে তিনি বললেন, 'আপনি যে চিন্তা নিয়ে নাটক লিখেছেন সেটা গ্রহণ করতে থিয়েটারের মালিক গোষ্ঠী কেন, কোনো নামকরা অভিনেতাও এখন পর্যন্ত আসেন নি। আপনাকে আরো পঁচিশ-ত্রিশ বছর অপেক্ষা করতে হবে।' আমি একটু হতাশ হয়ে বললাম—'যদি শিশিরভাদুড়িকে দিই।' তিনি বললেন—'আপনারা তাঁকে যতটা প্রগতিশীল মনে করেন, ততটা তিনি নন। তবে তাঁকেই দিয়ে দেখতে পারেন তিনি কী বলেন।' প্রসঙ্গত বলা দরকার, তাঁর কথা অনুসারে আমি কয়েকমাস বাদে নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকে পাণ্ডুলিপিটি দিয়েছিলাম। তখন নাটকটির নাম ছিল 'দাবি'। পরে নাটকের নাম পরিবর্তিত হয় 'অন্তরাল'-এ। শিশির-বাবুর কাছে তখন ঘন ঘন যেতাম। পাণ্ডুলিপিটি পড়ে শিশির বাবু আমাকে বলেছিলেন 'শ্রীরঙ্গম'-এর আর্থিক অবস্থা একটু ভালো হলে তিনি সেটি প্রয়োজনা করবেন। দু'বছর অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম 'শ্রীরঙ্গম'-এ নাটক অভিনীত হবার সম্ভাবনা নেই তখন 'প্রগতি শিল্পী সংঘ' নামে একটি নতুন নাট্যসংস্থা গঠন করে 'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চ ভাড়া নিয়ে সেখানেই অভিনয় করালাম এবং নাটকটি প্রকাশিত হবার পর নাট্যাচার্য শিশিরকুমারকেই উৎসর্গ করলাম।

১৯৪১ সালের ২২ জুন হিটলারের নাৎসীবাহিনী কর্তৃক সোভিয়েট ইউনিয়ন আক্রান্ত হবার পর বাংলায় গঠিত হয় 'ফ্যাসী বিরোধী লেখক সংঘ।' এর আগেই বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'মাটির ঘর' নাটক নিয়ে এক বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পারিবারিক বিপর্যয়ে বিভ্রান্ত গৃহস্বামী বলেন, 'ভগবান, তুমি একটি স্টুপিড'। এ নিয়ে হিন্দুসমাজের সনাতনপন্থীদের কলরব শুরু হয় যে থিয়েটারে নিরীশ্বরতাবাদকে প্রচার করা হচ্ছে। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তখন সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তার জবাব দেন যে গৃহস্বামী ভগবানে বিশ্বাস করতেন বলেই তাঁকে স্টুপিড বলেছেন এই কারণে যে পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য গৃহস্বামী দায়ী নন, ভগবান তাঁর সংসারে এই পারিবারিক বিপর্যয় কেন ঘটালেন। দীর্ঘ প্রবন্ধে নাটক সম্পর্কে আরো আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় আলোচিত হয়েছে। সেটি পড়ে আমার মনে হয়েছিল, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের চিন্তাধারা প্রগতিশীল। ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘ সংগঠকদের প্রধান ব্যক্তি-দের মধ্যে একজন ছিলেন প্রয়াত চিন্মোহন সেহানবীশ। ঐ সংগঠনের আমিও সদস্য ছিলাম। চিনুবাবুকে বললাম, মনোরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘে টেনে আনার চেষ্টা করতে। তদনুযায়ী চিনুবাবু তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁর প্রস্তাবে মনোরঞ্জনবাবু সম্মত হন এবং ফ্যাসী-বিরোধী লেখক সংঘে যোগ দেন। বলা দরকার, এই ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘই পরবর্তীকালে রূপান্তরিত হয়েছিল ভারতীয় গণনাট্য সংঘে। এই সময়ে ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের নতুন ধারায় সাংস্কৃতিক আন্দোলন—যার মূলে কাজ করেছিল গণচেতনা। এই ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘ কর্তৃক অভিনীত হয় বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' ও 'জবানবন্দী', মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথী', বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরি', সুনীল চট্টোপাধ্যায়ের 'কেরাণী' (এটি অভিনীত হয়েছিল কিনা ঠিক মনে নেই)। আমি তখন ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘের সভ্য হয়েও তাঁর সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত থাকি নি। তাঁর কারণ এখানে ব্যাখ্যা করার নয়। আমি দর্শক হিসেবে এসব নাটকের অভিনয় দেখতে উপস্থিত থাকতাম। ফ্যাসীবিরোধী লেখক সংঘ কর্তৃক অভিনীত মনোরঞ্জনবাবু তাঁর 'হোমওপ্যাথী' নাটক ছাড়া অন্য কোনো নাটকে অভিনয় করেন নি। মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন শ্রীরঙ্গম' এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 'শ্রীরঙ্গম' এ অভিনয়ের জন্য 'দেশবন্ধু' [একটি বিদেশি নাটক অবলম্বনে] 'বন্দনার বিয়ে' শীর্ষক দুটি নাটক এবং তার আগে ১৯৩৪ সালে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে 'চক্রব্যূহ' নামে একটি নাটক মনোরঞ্জনবা

দিয়েছিলেন নাট্য নিকেতনে। দুটি নাটকই শিশির ভাদুড়ি কর্তৃক 'শ্রীরঙ্গম'-এ প্রযোজিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম নাটকটি দর্শকরা তেমন নেন নি। সামাজিক নাটকটি বন্ধ হয়েছিল স্ত্রী চরিত্রে প্রধান অভিনেত্রী মলিনা দেবী প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হওয়ায়। 'নাট্যনিকেতন'-এ 'চক্রব্যূহ' কতদিন চলেছিল বা দর্শকরা কতটা নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা নেই, কারণ সেই অভিনয় দেখার সৌভাগ্য হয় নি। এ ছাড়া অন্য কোনো নাটক তিনি লিখেছিলেন কিনা আমার জানা নেই।

এরপরে আসে 'নবান্ন' নাটকের পালা। দেশে শুরু হয় প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ, যাকে বলে পঞ্চাশের মন্বন্তর। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' লিখিত ও অভিনীত হওয়ার আগেই মন্বন্তরকে কেন্দ্র করে প্রথমে এই দৃশ্যে 'অভিযান' নামে একটি নাটিকা লিখি এবং দর্জিপাড়ার রবীন্দ্রসঙ্গীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংলগ্ন 'বমেশচন্দ্র স্মৃতিভবন'এ অভিনীত হয়। তারপরে সেটির সঙ্গে আরো তিনটি দৃশ্য যুক্ত করে নাম দিই 'দীপশিখা'। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য উক্ত সংগীত বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই ১৯৪৩ সালে ২২ অক্টোবর 'রঙমহল'এ অভিনয় করে সে নাটক। অভিনয়ের আগে একটি স্বল্পকালীন বক্তব্যে সভাপতিরূপে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের চরম দুর্দশা ও তারই ত্রাণ তহবিলে অর্থসংগ্রহের জন্য যে এই নাটকটি উপস্থিত করা হচ্ছে তা সংক্ষিপ্ত ভাষণে ব্যক্ত করেন।

এবার বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' পর্ব সম্পর্কে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন। 'নবান্ন'ই বাংলাদেশে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অভিধায় প্রথম অভিনীত নাটক। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য তখন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলাশাখার সভাপতি। তিনি 'নবান্ন নাটকের কোনো ভূমিকায় অবতীর্ণ হন নি। তিনি ছিলেন প্রধান উপদেষ্টা। সুধী প্রধানের লেখায় ও তার মুখ থেকে পরে জেনেছি 'নবান্ন' নাটকের মূল পাণ্ডুলিপিতে শেষ দৃশ্য ও গোডার দৃশ্য দুটি ছিল না। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নাকি বলেছিলেন, নাটকে শুধু দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের চিত্রই এল, নতুন কিছু তো বলা হল না। তখন বিজন ভট্টাচার্য নবান্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে শেষ্য দৃশ্য এবং ৪২-এর আগস্ট আন্দোলনকে মাথায় রেখে তার কিছু আভাস দিয়ে প্রারম্ভিক দৃশ্যটি শুধু 'Action'-এ যোগ করে। 'নবান্ন' অভিনয়ে যে চট ব্যবহার তাও নাকি মনোরঞ্জনবাবুরই পরামর্শে। তার কারণ 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য যে দৃশ্যপট প্রয়োজন ছিল তা তৈরী করতে যত টাকার প্রয়োজন, ততটা ব্যয় বহনের আর্থিক সামর্থ্য সংস্থার ছিল না। 'নবান্ন'

উপস্থাপনে প্রত্যক্ষভাবে আমার ভূমিকা না থাকলেও নেপথ্যে থেকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনে যথাসাধ্য সাহায্য করতাম।

এরপরের পর্ব হল গণনাট্য সংঘে আমার 'বাস্তুভিটা' নাটক। মন্বন্তরের পটভূমিতে হিন্দী চলচ্চিত্র 'ধরতী কি লাল' অভিনয়ের জন্য প্রখ্যাত লেখক ও চলচ্চিত্রকার খাজা আহম্মদ আব্বাসের কাছ থেকে বোম্বাই যাওয়ার জন্য শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্যের ডাক আসে। তাঁরা তিনজনই বোম্বাই চলে যান। সেসময় বাংলাদেশে গণনাট্য সংঘের নাট্যবিভাগে নাটকের অভাবে নাট্যপ্রযোজনার অংক প্রায় শূন্য। ১৯৪৬-এর শেষ দিকে তখনকার গণনাট্য সংঘের সাধারণ সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষ ও সুধী প্রধানের বিশেষ অনুরোধে গণনাট্য সংঘে যোগ দিই। আমাকে নাট্যশাখার সম্পাদক করা হয়। নাট্যশাখাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ ও সুধী প্রধানের ঐকান্তিক চেষ্টা ছিল। এসময় আসে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত কলকাতা, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দেশভাগ করে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন এবং পূর্ববঙ্গ থেকে ছিন্নমূল হিন্দুদের উদ্বাস্তুরূপে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়-গ্রহণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা। তখন আমি দেশভাগের বেদনাকে রূপ দেবার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চরিত্র নিয়ে লিখি 'বাস্তুভিটা' নাটক। এটি প্রথম অভিনীত হয় 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট'-এ দীপায়ন সংঘ কর্তৃক ১৯৪৭ সালের ১৫ অক্টোবর। চারুপ্রকাশ ঘোষ আমন্ত্রিত হয়ে সেই অভিনয় দেখেছিলেন। চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতেই নাট্যশাখার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সহ কয়েকজন উপস্থিত থেকে যখন আলোচনা করতে চান যে নবান্নের পরে গণনাট্য সংঘের কী নাটক ধরা উচিত তখন চারুপ্রকাশ ঘোষ 'বাস্তুভিটা' অভিনয়ের প্রস্তাব দেন। মনোরঞ্জনবাবু তখন আমার পাণ্ডুলিপি দেখতে চান। পরের দিনই রূপবাণী ফ্ল্যাটে তাঁকে পাণ্ডুলিপি দিয়ে আসি। পড়ে তিনি চারুবাবুকে বলেন, এই তো যোগ্য নাটক। এ নাটকই ধরা উচিত। শুরু হয় 'বাস্তুভিটা'র মহড়া। মনোরঞ্জনবাবু স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে নাট্যনির্দেশনার দায়িত্ব নেন এবং প্রধান চরিত্র মহেন্দ্র মাস্টারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মনে পড়ে 'বাস্তুভিটা' মহড়ার সময় প্রায় প্রতিদিনই একটা জায়গায় এসে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসত ও চোখ জলে ভরে যেত। পরে তিনি বলতেন, অভিনয়ই বা করব কী, শেখাবই বা কী! অভিনয় করতে করতে যখন কেঁদে ফেলি তখন কি অভিনয় করা যায়, না শেখানো যায়! সে কথাগুলি আজো আমার কানে বাজে। মনোরঞ্জন

ভট্টাচার্যের জন্মস্থান পূর্ববঙ্গে। দেশভাগে বেদনাহত তিনিও ছিলেন। কাজেই 'বাস্তুভিটা' নাটকে বাস্তুত্যাগের বেদনা তাঁর অন্তরকে স্পর্শ করত। মহড়া চলার সময় 'মহেন্দ্র মাষ্টার'-এর অবিবাহিতা কন্যা 'কমলা'র ভূমিকায় মনোরঞ্জনবাবুরই সম্পর্কিত ভাগ্নী অনু বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জায়গায় এসে এমনভাবে সংলাপ বলত যে তা মনোরঞ্জনবাবুর মনঃপূত হত না। একদিন অনুকে তিনি বললেন 'নাট্যকার এখানে কি বলতে চেয়েছেন তুই সেটা বুঝে বলছিস না কেন? ধর্, তোকে একা পেয়ে 'শচীন' জোর করে একটা চুমো খেয়েছে'—একথা শুনে অনু তো লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলে বাঁচে। অনুর এই অবস্থা দেখে মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'আরে বোকা, তুই তো কিছু জানিস নে। When you act, you are neither he or she, but it'—কথাটি ঠিক উপলব্ধি করতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, বুঝলেন না You are to impersonate you'. আমি তখন বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলাম। নাটক লিখি, কিন্তু অভিনয় সম্পর্কে আমার অজ্ঞতা দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন কিনা জানি না। আমাকে বুঝিয়ে বললেন, Impersonate করার অর্থ হল একজন যখন মঞ্চে অভিনয় করে তখন সে স্ত্রী বা পুরুষ কিছুই থাকে না, যে ভূমিকায় অভিনয় করে সেই ব্যক্তিমাত্র সে। তখন আমার মনে পড়ল যাত্রার আসরে নারীর ভূমিকায় কোনো পুরুষকে এমন অভিনয় করতে দেখেছি যে অভিনয় করার সময় তাকে মনেই হতো না সে পুরুষ। থিয়েটারেও আমার তেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এমন কি ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দীপায়ন সংঘ যে 'বাস্তুভিটা'র প্রথম অভিনয় করেছিল, সেখানেও স্ত্রীভূমিকায় পুরুষরাই অভিনয় করত। পরবর্তীকালে আমি যেসব তরুণ তরুণীকে অভিনয় শিখিয়েছি, মনোরঞ্জনবাবুর সে কথাগুলো তাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছি।

এ 'বাস্তুভিটা'র কয়েকটি অভিনয়ের পর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি অভিনয়ে যোগ দিতে অসমর্থ হন এবং তখন মহেন্দ্র মাষ্টারের ভূমিকায় আমাকেই অভিনয় করতে হত।

এরপরে আমার সম্পাদিত দীনবন্ধুর মিত্রের 'নীলদর্পণ' নিয়ে বিতর্ক ও আমার 'তরঙ্গ' নাটক অভিনয়ের পালা। সুধী প্রধান আমাকে গণনাট্য সংঘে নিয়ে গিয়েছিলেন সংঘ কর্তৃক 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের ব্যবস্থা করার জন্যে। তার আগেও একবার তিনি আমার কাছ থেকে 'নীলদর্পণ'-এর কপি চেয়ে

নিয়ে গণনাট্য সংঘকে দিয়ে অভিনয় করাবার চেষ্টায় ব্যর্থ হন। 'বাস্তুভিটার পর ঠিক হয় 'নীলদর্পণ'ই ধরা হবে। আমেদাবাদে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় উৎসব থেকে ফিরে এসে '৪৮ সালের গোড়ায় 'নীলদর্পণ' মহড়ায় ফেলা হয়। সবাই উৎসাহিত হয়ে ওঠেন আর মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য নেন গোলকের ভূমিকা ও নাট্য নির্দেশনার দায়িত্ব। বেশ কিছুদিন মহড়া চলার সময় বোম্বাই থেকে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র কলকাতায় ফিরে এলেন। আমার সম্পাদিত 'নীলদর্পণ' দেখে শম্ভু মিত্র বলেন, গণনাট্য সংঘ কর্তৃক এভাবে নীলদর্পণ উপস্থিত করার সার্থকতা নেই। তখন শম্ভু মিত্রকে 'নীলদর্পণ' সম্পর্কে তাঁর পরিকল্পনা উপস্থিত করতে বলা হয়। কিন্তু সে পরিকল্পনা সর্বসম্মত না হওয়ায় 'নীলদর্পণ' মহড়া বন্ধ রেখে বিতর্ক শুরু হয়। তখন গণনাট্য সংঘের নবাগত উৎসাহী সভ্যদের ধরে রাখার জন্য ধরা হয় আমার 'তরঙ্গ' নাটক। বলা দরকার যে 'নবান্ন' নাটকের অভিনেত্রী শোভা সেন ছাড়া আর কোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীরই সহযোগিতা তাতে পাওয়া যায় নি। এমনকি শ্রদ্ধেয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যেরও নয়। তবে দর্শক হিসেবে তিনি সে নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন, এবং অভিনয় শেষে আমাকে বলেছিলেন—'এরা তো ভালোই করল, আমি না থাকায়ও কোনো ক্ষতি হয় নি।' ইতিমধ্যে শম্ভু মিত্র ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে গিয়ে ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠীর সৃষ্টি করেন। তখনও কিন্তু মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সর্বভারতীয় সভাপতি। লিখিত বা মৌখিকভাবে তাঁর পদত্যাগের কথা তিনি জানান নি। 'বহুরূপী'তে যোগ দিলেও গণনাট্য সংঘের প্রতি মনোরঞ্জনবাবুর অনুরাগ ছিল। প্রসঙ্গত বলা দরকার আমার সম্পাদিত 'নীলদর্পণ'-এর প্রথম অভিনয় গণনাট্য সংঘকে দিয়ে করানো সম্ভব হয় নি। 'নীলদর্পণ' প্রথম অভিনীত হয় ১৯৫০ সালে আমারই প্রতিষ্ঠিত সংস্থা 'নাট্যচক্র'-এর প্রযোজনায় শিয়ালদহে নেতাজী ইনষ্টিটিউটে, যাতে গণনাট্য সংঘের নবান্নকালীন অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন সুধী প্রধান, শোভা সেন, বিজন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ বসু প্রমুখ।

এর মধ্যে ডিক্সন লেনের চারুপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে এক বিষাদময় ঘটনা ঘটে। ১৯৪৮ সালে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনে প্রতিনিধিরূপে যাঁরা এসেছিলেন গণনাট্য সংঘ থেকে তাঁদের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়। সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র বসুর ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সুভাষপন্থীদের মত গৃহীত না হওয়ায় অসন্তুষ্ট একটি দল ক্ষিপ্ত হয়ে বাইরে থেকে ব্রেনগানে

গুলি চালায় যাতে নিহত হয় গণনাট্য সংঘের একনিষ্ঠ কর্মী সুশীল মুখোপাধ্যায় ও চারুপ্রকাশ ঘোষের মামাতো ভাই ভবমাধব ঘোষ। আমি কার্যব্যপ দেশে গিয়েছিলাম ঢাকায়। ফিরে এসে শুনি, গুলি থেকে অল্পের জন্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রাণরক্ষা পায়।

ইতিমধ্যে 'শ্রীরঙ্গম'-এ তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান' অভিনীত হয়। সে নাটকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন। যদিও নাটকের প্রযোজনে সে চরিত্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল না। রূপবানী সিনেমার পাশেই ছিল একটি রেষ্টুরেন্ট। সেখানে প্রায় রোজই সকালবেলার দিকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী ও 'দুঃখীর ইমান' খ্যাত কালী সরকার মিলিত হতেন এবং নাটক ও অভিনয় সম্পর্কে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। আমিও যেতাম সেখানে তাঁদের সেই আলোচনা শুনতে। সেখানেই তুলসী লাহিড়ী ও কালী সরকারের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়।

নাটকে ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করেই তাতে যা উপার্জন হত তা দিয়েই তিনি পরিবার প্রতিপালন করতেন। গণনাট্য সংঘ বা বহুরূপীতে তিনি অভিনয় করতেন অর্থপ্রাপ্তির আশায় নয়, তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারার অনুকূল ক্ষেত্র পেতেন বলে। যতদূর মনে পড়ে 'বহুরূপী'র নিউ এম্পায়ারে অভিনীত শম্ভু মিত্রের 'উলুখাগড়া' নাটকের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন। অন্য কোনো নাটকে করেছিলেন কিনা আমার মনে পড়ে না। 'বহুরূপী'তে যোগ দিয়ে তিনি তার সভাপতি ও উপদেষ্টারূপে কাজ করতেন। 'বহুরূপী'র সভাপতি হন বন্ধুবর গঙ্গাপদ বসু ১৯৫৪ সালে মনোরঞ্জনবাবুর মৃত্যুর পর। 'দুঃখীর ইমান'-এ করালী নাম্নী এক মহিলা অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। করালীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমিও পরিচিত ছিলাম। করালীর অভিনয়-প্রতিভাকে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য সর্বদাই প্রশংসা করতেন এবং তাঁকে নিয়ে সময় সময় নাটক সম্পর্কে আলোচনা সভায়ও যেতেন।

এবার আসা যাক তাঁর অভিনয় ও সে সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রসঙ্গে। তাঁর কালে থিয়েটারে এবং চলচ্চিত্র জগতে মনোরঞ্জনবাবু, নরেশ মিত্র, যোগেশ চৌধুরী ও তুলসী লাহিড়ী খুবই স্বাভাবিক অভিনয় করতেন—একথা কোনো একটি সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধেও লিখেছিলাম। একদিন তাঁর বাড়িতে অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে তাঁকে বলেছিলাম, 'আচ্ছা, ব্যবসায়িক থিয়েটারে অভিনেতারা সবগুলি শব্দের উপরই অনাবশ্যক অত্যধিক জোর দেন কেন?' হেসে মনোরঞ্জনবাবু উত্তর দিলেন—'বুঝলেন না, তারা

শব্দগুলোকে একটু পোক্ত করেন।' ব্যক্তিগত আলাপে মনোরঞ্জনবাবু এমনই রসিকতা করতেন। আর একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'শিশিরকুমারের অভিনয় সম্পর্কে আপনার মতামত কি?' তিনি অন্য কোনো মত প্রকাশ না করে বললেন, 'He can make something out of nothing' অর্থাৎ চরিত্রে কিছু করার না থাকলেও তিনি তাঁর অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রটিকে জমিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আমার সে শক্তি নেই, চরিত্রে কিছু করার থাকলেই আমি তা করতে পারি নইলে নয়।' বলা বাহুল্য শিশিরকুমার ও মনোরঞ্জনবাবু উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। অন্য কোনো থিয়েটারে নিযুক্ত না থাকলে অভিনয়ের জন্য শিশিরকুমারের কাছ থেকে ডাক এলে সর্বদাই তিনি তাতে সাড়া দিতেন।

একদিন মনোরঞ্জনবাবুর বাড়িতে বসে থিয়েটারে নানা অভিনেতার অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে আমি তাঁকে বললাম, 'আমার দেখা অভিনেতাদের মধ্যে অনেকেই যেন স্থানে স্থানে আবেগে ভেসে যান, এটা হয় কেন?' তিনি বললেন, 'আমাদের দেশে ঐতিহাসিক নাটক, এমনকি সামাজিক নাটকের সংলাপেও অত্যধিক আবেগপ্রবণতা থাকায় অধিকাংশ অভিনেতা প্রয়োজনাতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ করে থাকেন।' আমি বললাম, 'শিশির ভাদুড়ির অভিনয়ে তো ততটা আবেগ প্রাধান্য দেখি না।' তিনি বললেন, 'শিশিরকুমার বিচার না করে আবেগের বশবর্তী হয়ে অভিনয় করেন না বলেই তা হয় না'। কথাটা আরও একটু পরিস্কার করে বুঝবার জন্য তাঁকে বললাম, 'অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমি আপনার কাছে নাবালক, কথাটা আর একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়।' তিনি বললেন, 'Emotion should be restrained by reason.' Emotion বা আবেগ হচ্ছে হৃদয়বৃত্তির ক্রিয়া, আর Reason বা যুক্তি হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়া। এই দুটি ক্রিয়া অন্বিত না হলে নাটকের কোনো চরিত্রকে দর্শকদের কাছে যথাযথ পৌঁছে দেওয়া সম্ভব নয়।' তখন আমার মনে হল মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিনয় দেখে আমার যে মনে হতো স্বাভাবিক তাঁর অভিনয়ে হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিও সমভাবে কাজ করত। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর প্রায় কুড়ি বছর পরে বিদেশী একটি পত্রিকায় অভিনয় সম্পর্কে একটি প্রবন্ধে পড়েছিলাম, 'Emotion must be rationalised' পড়তে পড়তে মনোরঞ্জনবাবুর কথা মনে পড়ছিল।

একদা চলচ্চিত্র জগত সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে মনোরঞ্জনবাবু বললেন, 'গণনাট্য সংঘে যোগ দেওয়ায় চলচ্চিত্র জগতে কমিউনিস্ট নামে

আমি চিহ্নিত।' সে জগতে তখনো কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ প্রবল। পারতপক্ষে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর ডাক পড়ত না। কোনো ভূমিকায় অল্প টাকায় অভিনয়ের জন্য কাউকে খুঁজে না পেলে তখনই তাঁকে ডাকা হত। তুলসী লাহিড়ীও তাঁর চলচ্চিত্র জীবনে এরূপ ঘটনা ঘটে ছিল বলে আমাকে বলেছিলেন। মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের বাড়িতে অধ্যাপক নিকল-এর 'The Theatre and Dramatic Theory' বইটি দেখে পড়ার জন্য নিতে চাইলাম। তিনি বললেন—'নিতে চান নিয়ে যান, তবে বাংলা থিয়েটার সম্পর্কে এ বই পড়ে বিশেষ লাভ হবে না। এ বইয়ে প্রধানত পাশ্চাত্যের নাটক ও থিয়েটার সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা বা ভারতীয় নাটক নিয়ে আলোচনা নেই বললেই চলে। মূলত পাশ্চাত্য রীতিতে বাংলা নাটক লেখা হলেও সমকালীন বাঙালী জীবনের রুচি, চেতনা ও আচার আচরণের দিকে লক্ষ্য রেখে নাট্যকারদের নাটক রচনা করার সময় পাশ্চাত্য রীতির সঙ্গে নতুন সংযোজনও করতে হয়েছে।' মনোরঞ্জনবাবু তাঁর নাট্য চিন্তা ও শিল্পভাবনা সম্পর্কে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখেছিলেন যেগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ভারতীয় গণনাট্য সংঘ কিংবা প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ কর্তৃক। হয়তো সে সংকলনটি আমার ঘরেও আছে। হাতের কাছে না থাকায় সংকলনটির নাম বলা সম্ভব হল না।

কত নাটক ও চলচ্চিত্রে তিনি যে অভিনয় করেছেন তার তালিকা এতই দীর্ঘ যে সেগুলির নাম মনে রাখা আমার সম্ভবও নয় বা স্মৃতিচারণে তার প্রয়োজনও নেই। সে কাজ গবেষকদের।

শিশিরকুমার যে মনোরঞ্জনবাবুর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন তার নিদর্শন পাই তাঁর মৃত্যুর পরে। এবছর যখন দু'জনেরই জন্মশতবার্ষিকী তখন বুঝতে হবে দুজনেরই জন্ম একই বছরে। কিন্তু হয়তো জন্মসূত্রে মনোরঞ্জনবাবু শিশিরকুমারের চেয়ে কয়েক মাসের বড় ছিলেন। মনোরঞ্জনবাবুর মৃত্যু খবর পেয়ে আমিও গিয়েছিলাম তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। তেতলা থেকে মনোরঞ্জনবাবুর মৃতদেহ তখন নিচে নামানো হয়েছিল। দেখলাম শিশিরকুমার এসে মনোরঞ্জনবাবুর পাদস্পর্শ করে প্রণাম জানালেন।

'বাস্তুভিটা' নাটকে যে ক্ষুদ্র ভূমিকাটি তিনি সানন্দে লিখে দেন তাতেই তাঁর সামাজিক দায়বোধের যথেষ্ট পরিচয় রয়েছে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অন্ধকারে নিমজ্জিত না হয়ে অবশ্যম্ভাবী ভবিষ্যতের আলোর দিকে তিনি দৃষ্টি রেখেছেন। এর থেকেই তাঁর গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টির উদাহরণ মেলে। শুধু বাংলা নাট্য সাহিত্য সম্পর্কেই নয়, অভিনয় ও নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁর কাছে আমি এতটা ঋণী, যে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তাই সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষে তাঁকে গুরুর আসনে রেখে এই সামান্য স্মৃতিচারণের দ্বারা আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলাম।

অনুলিখন : সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্নের কাছে

আফসার আমেদ

মৌলবি সওগাত মাঝে মাঝেই একটা স্বপ্ন দেখে। দেখে, সে বেহেস্তে আছে। বেহেস্তের হুরিরা তাকে ঘিরে নাচছে। অপূর্ব দেখতে তাদের। টানা চোখ। এলো চুল। ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। দু-হাত নাচের ভঙ্গিমায় আছে। স্বপ্নের মধ্যে মনে পড়ে যায়, সিনেমার পোস্টার দেখা হিরোইনদের। সে ত সিনেমা কখনো দেখেনি। তবে চলাফেরা করতে করতে কারো বাড়ির জানালা দরজা থেকে টি.ভি চোখে পড়েছে। টি ভি দেখে বুঝে নিয়েছে সিনেমা কী বস্তু। স্বপ্নটা তাকে দেখতে হয় মাঝে মাঝেই। আর দেখতে হয় বেহেস্তের নর্তকীদের। যারা তাকে ঘিরে নাচতে আসে। কখনো এলোচুল, কখনো বেণী করা চুল, কখনো খোপা করা। কখনো বা চোখে কাজল দেয়া, কখনো বা সুর্মা টানা। তাকে ঘিরে নাচছে, আর গাইছে। গানগুলো অনেকটা হিন্দিগানের মত শোনায়। রেডিও মাইক থেকে যা সব তার কানে ভেসে আসে।

আসলে কেতাবে তেমনই লেখা আছে। বেহেস্তে চিরশান্তি। যা খেতে চাইবে হাতের কাছে চলে আসবে। কেউ বুড়ো হবে না। চিরযৌবন। বেহেস্তে সুন্দরী নর্তকীরা নৃত্য বাদ্য গীতে মনোরঞ্জন করবে।

দুনিয়াতে আল্লা বান্দাদের পরীক্ষা করতে পাঠিয়েছে। চোখের পলক পড়ার মত দুনিয়ার বান্দার জীবন। সেই জীবনের মধ্যে বান্দা কতখানি সৎ

থাকতে পারে, তারই পরীক্ষা। সিনেমা থিয়েটার দেখবে না, নাচ গান করবে না, দেখবে না। চুরি চামারি করবে না। মিথ্যে কথা বলবে না। অবৈধ যৌনাচার করবে না। মানুষের মনে দুঃখ দেবে না। পাশের বাড়ির কেউ খেতে না পেলে তাকে খেতে দিতে হবে। এসব পরীক্ষায় উৎরে গেলে তবে সে বেহেস্তে যেতে পারবে। আশ্চর্য মদির পরিবেশ সেখানে। আলোর ঝরনা। প্রাচুর্যে ভরা। সেই বেহেস্তের চিরশান্তির কথা ভেবেই, দুনিয়ার এসব খেলাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে হবে। আর মৌলবি ধর্মের মেরুদণ্ড—মানুষকে ধর্মে আনে, ধর্মগ্রন্থে বর্ণীত বিধান বিধি সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। তার পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়, কানের কাছে রেডিও নিয়ে গান শোনা, নাটক দেখা। কিংবা যাত্রা পুতুলনাচের আসরে যাওয়া। কিংবা সিনেমায় গিয়ে বসে সিনেমা দেখা। বান্দারা এমন ভুল পথে যায়। তারা তত আত্মসংযমী নয়। তাদের এই পথ থেকে ফেরানোর দায়িত্ব তারই। দুনিয়ায় বান্দাদের বেপথুগামী করার জন্যে শয়তানরা নানা ফাঁদ পেতে রেখেছে, এগুলো হল সেই সব ফাঁদ।

মৌলবি সওগাতের বয়স খুবই কম। পঁচিশ ছাব্বিশ। এই বয়স পর্যন্ত কোনো সিনেমা থিয়েটার যাত্রা ভাঁড়নাচ পুতুলনাচ এসব কিছুই তার দেখা হয় নি। মাঝে মাঝে শুধু রেডিওর গান শুনতে পায়। নানা বাড়ি থেকে রেডিওর গান ভেসে আসে। কানে তুলো দিতে পারে না। তাছাড়া রেডিওটা সে ত চালাচ্ছে না। তবে শুনেছে। এবং এই গান-টান তাকে বিচলিত করে, এটা মৌলবি অস্বীকার করতে পারে না। এমন কি কোনো গান তার গলায় মনে গেঁথে যায়। দোয়া দরুদ আওড়াবার ফাঁকে গানটা বেরিয়েও আসতে চায়। তখন তওবা তওবা করে গানটাকে বাইরে আসতে দেয় না সওগাত। সে দোয়া দরুদ পড়তে পারে। এবং সুর করেই পড়তে পারে। পড়েও তাই।

দুপুর, জোহরের নামাজ পড়ার পর, মসজিদে একাই বসেছিল বেছানো জায়নামাজে। চৈত্রদিন। বাইরে সব খাঁ খাঁ করছে। খরতপ্ত দিন। হাত পাখাটা নিয়ে টানতে টানতে একটু আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। তখনই প্রায়-দেখা স্বপ্নটা দেখে ফেলল সওগাত। বেহেস্তের হুরিরা তাকে ঘিরে নাচছে, গাইছে। তন্দ্রাটা কেটে গেলে শুনেছিল রশিদচাচার বাড়িতে রেডিওটা জোরে জোরে বাজছে। তাতে গান হচ্ছে। এই গানটা বেহেস্তের নর্তকীদের সুরের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল।

প্রায়ই দুপুরবেলা রশিদচাচাদের বাড়িতে সে যায়। রুটির ব্যবসা আছে।

কাঁচা পয়সার ব্যবসা। পাকা বাড়ি করেছে। ইলেকট্রিক নিয়েছে। রশিদচাচার বউকে সে মা বলে। এ জন্যে ও বাড়িতে খাতির খুব সওগাতের। সে যে দলিজের কুঠরিতে থাকে, সেখানে বিদ্যুৎ নেই। বৈদ্যুতিক পাখা নেই। আহ্, এই পাখার তলায় থাকাটা খুবই আরামদায়ক। মাঝে মাঝেই দুপুরবেলা ওদের বাড়ির একটা ঘরে পাখার তলায় শুতে যেতে হয়। বেশ লাগে কিন্তু। সে কোনো কোনোদিন না গেলে, বাচ্চাদের দিয়ে ডাকায় রশিদচাচার বউ। তার পাতানো মা।

মসজিদের ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শোনে সওগাত। জায়নামাজ থেকে উঠে পড়ে। বাইরে খাঁ খাঁ করছে রোদ। অসহ্য গরম। বৃষ্টিহীন আগুনে পুড়ছে গ্রাম। বাঁশবেড়িয়া। বাঁশবেড়িয়া গ্রামে ছ-মাস হয়ে গেল তার। এখানের মসজিদে আজান দেয়, নামাজ পড়ায়, আর বাচ্চাদের আরবি পড়ায়। এই গ্রামের বাড়ি বাড়ি সে পালা করে খায়। পালা করে এরা মসজিদের হ্যারিকেনে কেরোসিন দিয়ে যায়। তার দলিজের কুঠরিতেও হ্যারিকেনের তেল জোগায়। চাঁদা তুলে দেড়শ টাকা মাইনে দেয়। সওগাতের বাড়ি হুগলিজেলার খানাকুলে। আছে, হাওড়া জেলার শ্যামপুরে। মাসে দেড় মাসে সওগাত বাড়ি যায়। বাড়িতে বউ ছেলেপুলে আছে তার। আরো একশ টাকা তাবিজ বেচে রোজগার করে সে। মিলাদ মহফিলে বক্তৃতা দিলে সিজিনে তিন চারশ টাকা রোজগার করতে পারে। এক রোজার সিজিনে, দুই মহরমে। আরো নানা টুকিটাকি আছে। ঈদুজ্জোহায় কুরবানিতে, প্রতি গরু পিছু আটটাকা পায় সে জবাই করে। তাছাড়া কারো বিয়েতে বিয়ে পড়ানো। বিশ পঁচিশ টাকা প্রতি বিয়েতে আসে। সে যা রোজগার করে তা অতি সামান্যই। বছরের হিশেবে চার হাজার টাকা মত। মাসে তিনশ কুড়ি পঁচিশ টাকা আয়। নিজের খরচ এখানে নেইই। সব টাকাটাই বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। শুধু গুড়াকু লাগে। আট আনা গুড়াকুতে চারদিন চলে যায়। সাবানও লাগে না। কারো বাড়ি থেকে কাপড়-ধোয়া সাবান চেয়ে নেয়। নিজে ধুয়ে নেয়। এমনি করে গায়ে মাখা সাবানও চার-পাঁচদিন অন্তর এর ওর বাড়ি থেকে চেয়ে নেয়। এই বাঁশবেড়িয়া গ্রামের, এই পাড়ার মসজিদ পাড়ায় যারা একটু সচ্ছল পরিবার, তাদের থেকে সাবানটা, তেলটা, মাজনটা চেয়ে নিতে পারে।

হাতে পয়সা থাকে না তার। দোকান থেকে যে একটু মুড়ি মিছরি কিনে খাবে, তারও পয়সা তার থাকে না। অথচ তার সম্মান ভীষণ। তার পাশ

দিয়ে কেউ গেলে, তাকে মাথা নিচু করে যেতে হয়। লুকিয়ে সিনেমায় যায় পাড়ার বউ-ঝিরা। বউ ঝি-রা ঘাটে যায় লজ্জা সহবত নিয়ে। বাপের বাড়ি থেকে বউদের নিয়ে আসা হয় রিকশায় শাড়ি মুড়ে।

চার বছর হল বিয়ে করেছে সওগাত। পাঁচটা মসজিদ সে ছেড়েছে। ছ নম্বর মসজিদ বাঁশবেড়িয়ার সেখ পাড়ায়। এখানে ছ-মাস হয়ে গেল আছে। মসজিদে ভোর থেকে পাঁচবার আজান দেয়। আর নামাজ পড়ায়। মসজিদে নামাজ পড়তে আসে খুব কমই। চারজন বুড়ো পড়তে আসে। বৃষ্টি বাদলে তাদের মধ্যে দুজন একেবারেই বেরয় না। বাড়িতে নামাজ পড়ে নেয়। এক-জনের হাঁপানির টান আছে। একজন বেঢপ মোটা। চলাফেরায় খুবই কষ্ট। আর দুজন বুড়ো, কিন্তু ডাঁটো। ঠিক চলে আসে মসজিদে। প্রায় দুজনকে নিয়ে তাকে নামাজ পড়াতে হয়। অথচ পাড়ায় পুরুষমানুষের সংখ্যা ত কম নয়! তারা যদি নিজে থেকে না এসে নামাজ পড়ে, কাঁহাতক বলে বলে পড়াবে? প্রথম প্রথম বলেছেও। কিন্তু কাজ হয় নি। যেমন ছিল, তেমনই আছে। আর ত তারা বাচ্চা নয় যে ধরে খেদিয়ে মসজিদে নামাজ পড়াতে আনবে? সওগাতেরই সব সমবয়সী। কেউ চাষে খাটে, মাটি কাটে। কেউ রাজমিস্ত্রি, রং মিস্ত্রি, যোগাড়ে, ঘরামি। দু-চারজন ছেলে-ছোকরা আছে, তারা কলেজে পড়ে। সওগাতের সঙ্গে তাদের বয়সের তফাত এমন কিছু নয়। সওগাতের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। তার লম্বা চেহারা। আজানুলম্বিত তার লেবাস। লুঙ্গি পরে। মাথায় সব সময় একটা গোল টুপি থাকে,—লুচির মত। চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। তার পোশাকে-আশাকে চুলে চেহারায় কোনো বাহার নেই। যেমনটা এই পাড়ার ছেলে-ছোকরারা পোশাকে-আশাকে চুল ছাঁটায় চেহারায় জেল্লা আনতে পারে, তার সবটাই তাদের বিপরীত। তারা যে কথাবার্তা বলে, মেলামেশা করে, তাদের সঙ্গে সেই সমবয়স্ক মেলামেশা করতে পারে না সওগাত। বরং ওরা যেসব কথাবার্তা বলে, পাশে গিয়ে বসলে প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে দেয় তারা। কিংবা চুপ করে যায়। বুকের কাছে রেডিও বাজাতে থাকলে, রেডিও বন্ধ করে দেয়। বিড়ি সিগারেট খেলে, বিড়ি সিগারেট লুকিয়ে ফেলে, অথবা নিভিয়ে ফেলে।

তার সমবয়সী যুবকদের সঙ্গে সে সহজভাবে মিশতে পারবে না। তাদের সঙ্গে বসলে, ধর্মের কথা বলতে হবে। দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। দোয়া দরুদ গুন গুন করে আওড়াতে হবে। কখনো তসবি হাতে নিয়ে গুনতে হবে।

দুপুরের নামাজের পর জায়নামাজের পাটিতে বসে বসে ঝিমিয়ে পড়েছিল

সওগাত। তন্দ্রার ভেতর দিয়ে স্বর্গের নর্তকীদের নাচ গান তাকে ঘিরে শুরু হয়ে গিয়েছিল। মাঝখানে তন্দ্রাটা কেটে যায়। দেখে যে সে ঘেমে নেয়ে গেছে। বুকের লোমের ভেতর কিলবিল করছে ঘাম। কপাল জুড়ে ঘামের কণা। স্বপ্নটা দেখার পর মনটা তার বড় বিষণ্ণ হয়ে ওঠে। চারদিকে সবকিছু রোদে পুড়ছে। মসজিদের ভেতর সে একা রয়েছে। বাইরে কোনো বাড়ির রেডিয়োতে গান বাজছে। সওগাতের বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ। চাল চলনে ভাবিক্কি ভাব আনে বলে তিরিশ বত্রিশ দেখায়। খুব ছোটবেলায় সে অনাথ হয়েছিল। দশ বার বছর থেকে এক মাদ্রাসায় বিনে পয়সায় খাওয়া থাকা পড়াশোনা করতে পায়। তারপর সে মৌলানা হাফেজি পাশ করে। বারো বছর থেকে লুঙ্গি আর লম্বা জামা পরে আসছে। সিনেমা যাত্রা থিয়েটার সে কোনোদিন দেখতে যায় নি। নিজের ঘরে বসে শুয়ে ইচ্ছে মত রেডিও বাজায় নি।

বড় কষ্ট হয় তার। তার বয়সিদের সঙ্গে মিশতে পারে না। সকলেই তাকে এড়িয়ে চলে। বিড়ি সিগারেট খায়, তাও লুকিয়ে। সওগাত বিড়ি সিগারেটের নেশাও ধরতে পারল না। কেতাবে নিষেধ আছে, নেশা হারাম। তাই সে বিড়ি সিগারেটের নেশা করতে পারে নি। গুড়াকু নেয়। এটা নেশার মধ্যে পড়ে না তেমন। কেন না, এখন ত বাপ ছেলে মেয়ে সকলে একসঙ্গে গুড়াকু নেয়। গুড়াকুটা যেন দাঁত মাজা। অথচ সওগাত জানে, এটা যথার্থই নেশার বস্তু। সকাল বিকেল নিতে না পারলে একেবারেই চলে না। তিন চারবার গুড়াকু নেয় সে। সকালে উঠে একবার। তারপর গোসলের সময় একবার। বিকেলে একবার। তারপর রাতে। নেশাটা একেবারে তাকে পেয়ে বসেছে। নিলে তবে শান্তি। মাঝে মাঝে খুব শখ যায় সিগারেট খাবার, কিন্তু খেতে পারে না। মৌলবি নেশা করে, এটা জানতে পারলে, বদনাম রটবে। হয়ত মসজিদ থেকে তাকে তাড়িয়েও দেবে। আর সকলে করলে দোষ হয় না। এমন কি রশিদচাচাও বিড়ি খায়। তার ছেলে রওশনও সিগারেট খায়।

পাশের গ্রামে যাত্রা হলে সে যায় না। দূরের মাইক থেকে যাত্রা আসরের গান, অভিনয় ভেসে আসে। সে গান আবার মুখে মুখে ছড়ায়। দলিজের কুঠরিতে সে নিঃসাড়ে পড়ে থাকে। যাত্রা আসরে যাওয়ার তার কোনো পথ নেই। সিনেমায় যাবার কোনো পথ নেই। অথচ কেন যে মনে হয়, দেখি। দেখা আর হয় না। মসজিদ আর তার থাকার ছোট ঘরটুকু আর ঘর মসজিদের

বাইরে সামান্য খোলা জায়গায় তার চলাফেরা—পাড়ার মধ্যেই। মুরগি জবাই করে দেয়। কারো পেট ব্যথা, বাতাস লাগলে জল পড়ে দেয়, তেল পড়ে দেয়, নুন পড়ে দেয়, চিনি পড়ে দেয়! পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ার বাদে তাকে কোরাণপাঠ, মুখস্ত করতে হয়। মিলাদ মহফিলের বক্তৃতা মুখস্থ করতে হয়। অনেকটা সময়ই সে একা একেবারে। চারটে দেওয়াল তার চারপাশে। এই গরমের মত মাঝে মাঝে এই সব তার কাছে অসহ্য মনে হয়। নিজেকে প্রবোধ দিয়ে নীরব থাকতে হয়। প্রবোধ পায়, বেহেস্তে গিয়ে সে সুখ পাবে। নাচ গান নাটক থিয়েটার পাবে। ভাল ভাল খাদ্য-পানীয় পাবে। বেহেস্তের হুরিরা তাকে ঘিরে নৃত্যগীত করবে। তাই এই স্বপ্নটা সে মাঝে মাঝে দেখে থাকে।

সে অতি দরিদ্র। দুটি মাত্র তার লুঙ্গি আছে। একটা পাঞ্জাবি। গেঞ্জি কিন্তু একটা। প্রায় ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই চপ্পল। কোনমতে তার সংসার চলে। সহজেই নিজের ঘর সংসারে চলে যেতে পারে না। অথচ সারাদিন তার বউ ছেলেমেয়ে সংসারের কথা মনে থাকল না, রাতে হঠাৎ মনে হল। মনটা ছটফট করতে লাগল। তার বিবিকে কাছে পাবার জন্যে মনের ভেতর প্রবল কষ্ট হতে লাগল। কিন্তু সে যেতে পারবে না। তার যাওয়া অত সহজ নয়। যাওয়া আসায় তার বারো চোদ্দ টাকা খরচ হবে। সে টাকা হাতে থাকে না তার প্রায়ই। ঘরে বিবি সংসার, এক দেড়মাস ছেড়ে থাকা যে কি কষ্ট, তা জানে সওগাত। সে জানে, তার দৈহিক কামনাকে কতখানি প্রশমিত রাখে। এ পাড়ার কোনো যুবতী বউ-ঝি যখন কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় সে অনুভব করতে পারে। কেউ বাচ্চা কোলে মাথায় ফুঁ দিতে আসে। কেউ তাবিজ নিতে আসে। কেউ জলপড়া তেলপড়া নিতে আসে।

আর এও জানে, তাদের মধ্যে তীব্র ভক্তি তার প্রতি। অদ্ভুত তাদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গি। যত সমস্যা মেয়েদেরই। স্বামী আসছে না কেন, তার জন্যে তাবিজ নেয়। স্বামী বশ করার জন্যে চিনি পড়ে নিয়ে যায়। শবরৎ করে খাওয়াবে। মেয়ের বিয়ের পাকা কথা ভেঙে যাচ্ছে, তার জন্যে তাবিজ। গর্ভবতীরা নীল ডোরের গিঁট পড়ে নিয়ে যায়। কোমরে পরবে। মেয়েদের কাছাকাছি মুখোমুখি তাকে হতে হয় প্রায়ই। আর যুবতীরাই বেশি। কারণ, তাদের সমস্যাই বেশি। বয়স্কাদের আর কামনা বাসনা আশা আকাঙ্ক্ষার পূরণ অপূরণের সমস্যা নেই। সওগাত বড় ধন্ধে পড়ে যায়।

এই সব যুবতীদের আত্মসমর্পণের ভঙ্গি তাকে বিচলিত করে। নিজের চোখকে শাসন করে রাখে। হাতদুটিতে কাল্পনিক বেড়ি পরিয়ে রাখে। কারো স্বামী আসতে শুরু করলে, এরা মসজিদে সিন্নি দেয়। স্বামী বশ হলে সিন্নি দেয়। মৌলবির প্রতি তাদের অসীম ভক্তি শ্রদ্ধা।

এও জানে, এদের মধ্যে কাউকে কাউকে তার এত ভাল লেগে যায় যে, সে রাতে স্বপ্নে দেখে। জেগে থেকে কল্পনায় ভাবে। এবং মনে প্রাণে এক প্রেম অনুভব করে। মনকে শান্ত রাখা বড় শক্ত। তার স্বপ্নের ভেতর তার বিবি, এই মেয়েরা ও বেহেস্তের নর্তকীরা একাকার হয়ে যায়। দিনমানে তার বিবিকে দেখতে পাওয়া ও কাছে পাওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় না। সে এ পাড়ার সে-সব যুবতী বউঝিদের দেখতে পায়। দেখতে দেখতে এক অসহ্য ঘ্রাণ অনুভব করে সওগাত। সওগাত জানে, এটা হওয়া তার ঠিক নয়। কিন্তু যা মনে হয়, তাকে কী করে সরাবে? না হয় সে সিনেমা দেখতে গেল না, না হয় সে যাত্রা দেখতে গেল না, না হয় সে কানের কাছে রেডিও বাজাল না,—কিন্তু কামনার অনুভব তার পক্ষে সরিয়ে ফেলা খুবই কঠিন। কেন না, এদের চোখে অদ্ভুত ভক্তি। তাকে এরা কেউই অবহেলার চোখে দেখে না। মৌলবি বলে, তাদের এক ধরনের ভক্তি শ্রদ্ধার সন্ধান পায় সে।

যেমনটা রশিদচাচার ঘরে স্বামী-পরিত্যক্তা নাজমাকে সে দেখে। সওগাতকে কুরে কুরে খায় নাজমা। তার প্রতি নাজমা কতখানি আসক্ত সেটা বুঝতে পারে সওগাত। আর বিশ পঁচিশ মাইল দূরে সওগাতের ঘরবাড়ি বিবি সংসার। নাজমা তাকে অসম্ভব বিচলিত করে। তার সৎ থাকার কথা, সে সৎ থাকে। সে দেখে, অনুভব করে, কিন্তু তার স্খলন হতে নেই। তার স্খলন হয় নি। অনুভব করে, দেখে, আর কুরে কুরে খায় তার সবকিছু।

যেমন করে কুরে কুরে খায় গান শোনা নাটক সিনেমা দেখার লোভ। এখনকার সময়ের যুবকদের সঙ্গে মেলামেশার লোভও তাকে কুরে কুরে খায়। আর একটু সুখ, পয়সাকড়ির লোভও তার থাকে। বৈদ্যুতিক পাখার তলায় চিরকাল যাপন করবার লোভ হয় তার। একেবারেই দীনদরিদ্র সে। তার খড়ের চাল ফুটো হলে সারানো মুশকিল হয়। তার বাপের বাড়ি থেকে প্রায়ই এটা ওটা এনে সংসারে টেপাগোঁজা দেয়। মুরগি পোষে, ছাগল পোষে। এটা ওটা গাছ লাগায়। সওগাত আল্লার পথে চলে গিয়ে, অন্য কোনো হাতের কাজ শিখে ভাল রোজগারপাতি করার পথ বন্ধ। একজন

রিকসাওয়ালা তার চেয়ে অনেক বেশি রোজগার করে। তার সংসারে দারিদ্র। প্রতিদিন দু-বেলা খাওয়া জোটানোই মুসকিল। অথচ এই রশিদচাচার ছেলে কাঁচা পয়সায় সংসার সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে ভরিয়ে রেখেছে। লেখাপড়া তেমন শেখে নি। নামাজ রোজা করে না। তারই ভাগ্যে এত সুখ। রাতেরবেলা কারখানা থেকে ফিরে পাকাবাড়িতে বৈদ্যুতিক পাখার তলায় শোয়। রূপসী বিবি আছে। খুব সুন্দর সুন্দর খাবার-দাবার হয়। খুশবু বাতাসে বয়ে বেড়ায়।

এটাই দুনিয়ায় সুখের মায়া। আল্লার এবাদত ভুলিয়ে দেয়। অথচ সওগাত আল্লার পথে থাকে, তার জন্যে কোনো সুখ নেই। প্রবোধ দেয় মায়া বলে। কিন্তু সহসাই মনটা খারাপ হয় তার প্রায়ই।

মসজিদ থেকে নেমে রোদে পুড়ে যায় সওগাত। খরতপ্ত রোদ। চারপাশ অগ্নিদগ্ধ হচ্ছে। দলিজের কুঠরিতে তার বাস। সেখানে এখন গেলে গরমে ছটফট করতে হবে। এই দুপুরে ত প্রায়ই সে চলে যায় রশিদচাচাদের ঘরে। পাখার তলায় শোয়। ওদের বাড়ি থেকে রেডিওর গান ভেসে আসছে। আর সেই নাজমার মুখ। যার চোখে দেখে আত্মনিবেদনের ভাষা। সে ত নিজে গান শুনবে না? পাশের ঘরে বাজলে, তার কানে আসবে। তাতে তার কোনো দোষ নেই। আর নাজমাকে দেখবেই যা। সে কোনো পাপের কাজ করতেই পারে না। দলিজের গরমে প্রানকে কষ্ট না দিয়ে যদি সে পাখার তলায় গিয়ে শোয়,—তার প্রাণ চাচ্ছে বলেই শোয়। প্রাণে কষ্ট দেবে কেন? এটা ত আল্লারই প্রাণ। বড় একা থাকতে হয় তাকে। রশিদচাচার ঘরে গেলে তার নিঃসঙ্গতা কাটবে। আসলে সে নাজমাকে দেখবে বলেই যে যাচ্ছে তা নয়, তার একা থাকাটা দুঃসহ বলেই যাচ্ছে। তাতে কোনো দোষ নেই। সত্যিই সে বড় একা। আর এই যে পুকুর, ঘাট মাঠ প্রান্তর গাছপালা আগান বাগান আছে এসব তার কী কাজে লাগে? এসব কিছুই সে সাধারণের মত ব্যবহার করতে পারে না। এসবের ভেতরও সে বিচ্ছিন্ন। এখানে রশিদচাচার ঘরে সে যায়, তাদের বাড়ির লোকজনদের কাছাকাছি থাকে, নিঃশ্বাস প্রশ্বাস পায়, তার ভাল লাগে। আরাম করে ঘুমতে পারে। বালিশে আতরের গন্ধ থাকে।

ঘুঙুর বাজার মত দুপুর। ঝুম্ ঝুম করে বেজে চলেছে। ঘরের দালানে বসে রশিদচাচার বিবি পান সেজে খাচ্ছিল। দালানেও পাখা। টানা চারখানা ঘর। দালানে সাইকেল দেখতে পায়। তাহলে রশিদচাচার ছেলে

রওশন দুপুরে বাড়িতে ফিরে এসেছে। রওশনের ঘরের দরজা ভেতর থেকে খিল দেয়া বোঝা গেল। ঐ ঘরেই রেডিও বাজছে।

'এস বাবা, এস বাবা,—ভাবনু ছেলেটা আজ এল না কেন? গরমে ঢের কষ্ট পাচ্ছে। মা বলেছ যখন—ছেলের মতন চলে এলে, বেশ কেমন ভাল লাগল বল ত। জানটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়।'

শিরদাঁড়া হিম হয়ে যায় সওগাতের। শেষদিকের ঘরের চৌকাঠে দুপায়ে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাজমা। বিনিদ্র চোখ। আলুথালু বেশ। তারই জন্যে প্রতিটি মুহূর্ত প্রতীক্ষা করেছিল।

'এই যে বুবু—' সওগাত স্বাভাবিক স্বরে নাজমাকে সম্বোধন করে। 'আপনি নিদ যান নি? গরমে একটু নিদ গেলে ভালই লাগে।'

শরীরে কাপড় টানাটুনি করে চাপা দেয় নাজমা। 'আপনি শুবেন ত?'

'হ্যাঁ, তুই ও-ঘর থিকে বেরিয়ে আয় দিনি। ব্যাটা শুবে।' রশিদচাচার বিবি বলে।

তাতে রেগে যায় নাজমা। 'ওরে ব্বাস, ব্যাটা শুবে বলে, এক্কেরে জান ছিঁড়াছিঁড়ি করচে!' চৌকাঠ থেকে নাজমা নেমে, দালানের অন্যপ্রান্তে গিয়ে একটা গোটানো দোলা পেতে তাতে বসে, গা দুলুনির মত দুলতে থাকে।

ঘরে ঢোকে সওগাত। খাটে গদি আঁটা বিছানা। তোষক চাদর। বালিশের ওয়াড়ে গোলাপফুল আঁকা। একটু আগে এই বিছানায় স্বামী পরিত্যক্তা জোয়ান আগুনের মত মেয়েটা শুয়েছিল। সে জানে, সে বিছানায় শুয়ে থাকলে বার বার ঘরে এসে ঢুকবে মেয়েটা। তার প্রতি আকৃষ্ট, এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না সওগাতের।

জামাটা খুলে খাটের ডাণ্ডিতে রেখে গেঞ্জি গায়ে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে মৌলবিসাহেব। দেওয়ালে একটা ঘড়ির পেণ্ডুলাম শব্দ করে চলেছে। আর দেওয়ালে কিছু শিল্পকর্ম। সূচসুতো দিয়ে তৈরি ফুল পাখি আঁকা। এটা নাজমারই তৎপরতা। নাজমার স্বামী আর একটা বিয়ে করেছে বলে, তার স্বামীর ঘর আর যায় নি। নতুন বউয়ের বেশি আদর। ওখানে নাজমার চরম অবহেলা।

মনে খুব কষ্ট পায় সওগাত। প্রতিটি মুহূর্ত তাকে 'তওবা' 'তওবা' বলে দিন কাটাতে হয়। মন যা ভাবে, মন যা চায়, মন যা পাবার জন্যে আকুল হয়, সবেতেই তাকে বিরত থাকার জন্যে 'তওবা' করতে হয়। কোনোটাই

চাওয়া যাবে না। নাজমাকে পাশে বসিয়ে হাত ছুঁয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে খুব ইচ্ছে করে সওগাতের। প্রাণের চাওয়াটা পূরণ করতে সে সাহস পায় না। ভেতরে ভেতরে সে ভীষণ ভেঙে থাকে। কিন্তু পারে না।

চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে পাখার বাতাসে আরাম পাচ্ছিল সওগাত। বালিশের ওয়াড়ের ফুলটা ছুঁতে তার ইচ্ছে করে! ছোঁয়। একটা লম্বা চুল হাতে উঠে আসে। নাজমার মাথার চুল। বেশ লম্বা। কেয়োকার্পিনের গন্ধ। বেশ মনমাতানো খুশবু।

খোলা দরজায় ঠক ঠক করে নাজমা।

কাত হয়ে মুখ ফেরায় সওগাত।

নাজমা ওখান থেকে দাঁড়িয়ে থেকে বলে—'মা শুধোতে বলল, একটু শরবৎ খাবেন?'

'না শরবৎ নয়, একটু পান হলেই চলবে।'

'পান ত খাবেন, একটু শরবৎ খান।'

সওগাত চুপ করে থাকে। রাজি আছে। চলে যায় নাজমা।

বিছানায় অসম্ভব নাজমার গন্ধ। শুয়ে থাকে কোনো আধমরা জীবের মত সওগাত। যার কোনো কামনা-বাসনা নেই। লোভ নেই। রক্তমাংস নেই। মৃতের মত নির্জীব পড়ে থাকে।

বিছানায় পড়ে পড়ে ভাবে সওগাত, বড় তার মনবেদনা। বিমর্ষ সে। তাকে ঘিরে নাজমার এই নিবেদন বিষণ্ণ করে তোলে। সাধারণের জীবন তার নয়। অনেক মৌলবি এইভাবে তাদের এবাদত নষ্ট করে। তারা দোজখবাসী হয়। তারা কোনো গুনা করলে তার শাস্তি কঠিন, কঠোর। সচেতন স্থির থাকতে চায় সওগাত। নাজমা তাকে কখনো ভেঙে দিতে না পারে তার জন্যে, তার মনের ভেতর কঠিন প্রহরা বসায় সওগাত। নাজমা যদি তার বিছানায় তার গায়ের পাশে এসে শোয়, তাহলেও সে অনমনীয় কঠিন থাকবে। তাকে জড়িয়ে ধরতে এলে তাকে সরিয়ে দেবে দু-হাতের শক্তি দিয়ে। তার মুখের দিকে মুখ নামিয়ে আনলে সে চুম্বন দেবে না। সওগাতের হাত দুটি ধরে নাজমা তার বুকের ভেতর টেনে নিলে সে তার হাত দুটি সর্বশক্তি দিয়ে ছাড়িয়ে নেবে। শরবৎ দিতে এলে তাকে তক্ষুণি ফিরে যেতে হবে। পান দিতে এলে, পান দিয়ে তাকে চলে যেতে হবে। পশ্চিমের জানালার রোদ যদি বিছানায় এসে পড়ে, জানালা বন্ধ করে দিতে এলে, জানালা বন্ধ করে নাজমাকে চলে যেতে হবে। জানালা বন্ধ করার শব্দে

সওগাতের ঘুম ভেঙে গেলে, সওগাত যদি দেখে, নাজমা দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, তাহলে সওগাত পেছু থেকে ডাক দিয়ে নাজমাকে কাছে ডাকবে না। লোডশেডিং হয়ে গেলে হাত পাখাটা যদি হাতের কাছে দিতে আসে তার হাত ধরবে না। তাকে কাছে বসাবে না। তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে না। সে জানে, নাজমাকে বিছানায় বসিয়ে রেখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায় অনেকক্ষণ। এবং সে জানে, নাজমার পান বাড়িয়ে দেবার হাত, এবং দেহলতা গাছের পাতা খসে পড়বার মত নিশব্দ সজ্জায় থাকে। সে যদি হাত ধরে টানে, তার বুকে একে মিশে যাবে। আরো আরো আরো অভ্যন্তরে চলে আসবে তার। এও জানে, তার অভ্যন্তরে চলে এলে সে শান্তি পাবে। ভেতরের বেদনা তার জুড়োবে।

হাতে শরবতের গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাজমা। বিছানায় উঠে বসে হাত বাড়িয়ে শরবৎ নেয় সওগাত। শরবৎ খায়। প্রাণটা তার জুড়িয়ে যায়। বলে ওঠে, 'আল্লা তোমার ভাল করুক। আমি তোমাকে দোয়া করছি।'

এই কথায় চোখের পাতা ওঠে পড়ে নাজমার। বাড়ানো হাতের মুঠোর ভেতর ঘামে ভেজা পানের খিলিটা নিয়ে মুখে পোরে সওগাত। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। নাজমার দিকে তাকিয়ে থাকে না। এবং পান মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ে সে। পান চিবোতে চিবোতে চিৎ হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে থাকে। সে জানে, তার বিছানার কাছে তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এখনো নাজমা। তাকে চোখ বুঁজে পড়ে থাকতে হবে।

নাজমা চলে গেল। নাজমা চলে গেলে জানান দিয়ে যায়। অসতর্ক যেন দরজায় ধাক্কা দিয়ে ফেলেছে, এমনিভাবে নাজমা সাড়া রেখে চলে যায়।

সওগাত চোখ বুঁজে পড়ে থাকে। শরীর নিথর, নিশ্চুপ। এখন সে জেগে জেগেই বেহেস্তের স্বপ্নটা দেখে। সেই নর্তকীটা তার চারপাশে চলাফেরা করছে। তার গায়ের ঘুঙুর বাজছে ঝুম ঝুম। টানা চোখ। উন্নত বুক। নাচ আর গানে তাকে আপ্লুত করবে এখনই। হাত দুটি নানা মুদ্রা ও ছন্দে ভরে উঠছে। পায়ে ধরে রাখছে তালছন্দ। কণ্ঠসুধা অপূর্ব সুরে-কথায় ঝরতে থাকবে। নর্তকীটা আবার একটা সোনার রেকাবি ধরে ধরে তার সামনে আনে। তাতে অপূর্ব সব খাবার দাবার। বেহেস্তের আলো অদ্ভুত। অদ্ভুত রং মেশানো আলো। রত্নখচিত। রত্নগলা আলোকপ্রভা। রূপকথার মত দেশ। প্রাসাদ আছে। বাগান আছে। ফুলের গন্ধ আছে। শীতলস্নিগ্ধ আবহাওয়া।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে রোদ এসে বিছানায় পড়েছে। রোদ লাগছিল সওগাতের গায়ে। ঘুঙুর পায়ে যেন নাজমা ঘরে ঢুকল। জানলাটা বন্ধ করল। বড় আয়নাটার কাছে দাঁড়াল। তারপর কয়েকবার ঘরে চলাফেরা করল। তারপর লোডশেডিং হয়ে গেল। নাজমাকে বিচলিত হতে দেখা গেল। ফুল ছবি আঁকা তালপাখাটা পেড়ে এনে, বিছানার বাড়ে কাত হয়ে বসে সওগাতকে হাওয়া করতে লাগে।

সওগাত চোখ খুলে, স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। নাজমার ঠোঁটে বাঁকা হাসি। রহস্যাবৃত হাসি। সেই হাসির রহস্যে আমন্ত্রণ লুকিয়ে আছে।

সওগাত বলল—'আমাকে সেবা করে তুমি কী পাও?'

'তুমি যে আমার।' আবার সেই হাসি।

'তুমি শুধু আমারই।' হাত বাড়ায় নাজমার দিকে।

নাজমাও হাত বাড়িয়ে দেয়।

নাজমার হাত ধরে টানতেই, নাজমা তার বুকের কাছে চলে আসে। এবং একটা পাখির মত মনে হয় নাজমাকে। নাজমার বুকে মুখ ডুবিয়ে দেয় সওগাত। অদ্ভুত সুন্দর নাজমার বুক। নাজমা তার নরম দুটি হাত দিয়ে তার পিঠে বিলি কাটছে। মুখ ডুবিয়ে ঘাড়ে চুম্বন করছে। নাজমার চুলগুলি এসে পড়েছে সওগাতের মাথায়, পিঠে, ঘাড়ে। কেয়োকার্পিনের গন্ধ। চুলগুলো রেশ, এবং ঝাড়। মুখ ডুবিয়ে ঘাড়ে ঠোঁট দিয়ে চুমু খেলে নাকটা সওগাতের পিঠে গাঁথে। টিকলো নাক। আর কপালটা আরো নীচে পড়ে। কপালে আছে কালো কাজলের টিপ। টিপটা বুঝি নষ্ট হল। চুম্বনে ভিজে যায় ঘাড়। বার বার চুম্বন করতে থাকে। নাজমার বুকের ভেতর তার মুখ আর হাতদুটি নিয়ে যায়। সওগাত তার মুখ আর হাত দুটোতে নাজমার হৃদ্‌স্পন্দন ধরে রাখতে পারে। নাজমার শরীরের গন্ধ পায়। ক্রমশ সে নাজমার শরীরের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। নাজমার চুলগুলি তার পিঠে ছড়িয়ে পড়ে। শিরশিরিনি পায় সওগাত।

'তুমি আমার?' মুখ ডুবিয়ে প্রশ্ন করে সওগাত।

'আমি তোমারই। তুমি আমারই।'

'তুমি চুলে সুগন্ধি তেল মাখো?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি গায়ে সুগন্ধি সাবান মেখেছ। খুব সুন্দর গন্ধ।'

'হ্যাঁ গায়ে হাতে মুখে দিয়েছি। ডুবে ডুবে গোসল করেছি। যা গরম!'

কেউ আর কোনো কথা বলে না।

সওগাত নাজমার বুকে মুখ আর হাত দুটি মিশিয়ে নিঃসাড়ে থাকে। শুধু হৃদ্‌স্পন্দন শুনতে পায়। আর চোখে জেগে ওঠে বেহেস্ত। নর্তকী যেন তার বাহুতে ধরা দিয়েছে। টানা চোখ। গুরু বুক। উজ্জ্বল রঙ। কাঁচুলি। অপূর্ব সংগীত বাজছে। যেন স্বর্ণবেণু উড়ছে চারপাশে। আলোর রুশনি। মদিরতা ও প্রাচুর্যে ভরে আছে সমস্তকিছু।

তার দু-হাতের মধ্যে নাজমা নমনীয়। আত্মসমর্পণে গলে আছে। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। কাজলের ফোঁটাটা একটু মুছে গেছে। চোখ দুটো বুঁজে আসছে যেন। আধবোঁজা স্ফুরিত, কম্পিত নাকের পাটা। ঠোঁট দুটি কাঁপছে। একটা মাটির তালের মত তার বাহুর মধ্যে ধরা পড়ে আছে নাজমা। হাত দিয়ে কাছে টানলে নাজমা আরো কাছে চলে আসে। সওগাতও নাজমার কাছে চলে আসতে পারে। আনন্দে ছটপট করে সওগাত। কোনো তার দুর্ভাবনা নেই আর। কোনো একাকিত্ব নেই। সমস্ত ঐশ্বর্য যেন সে হাতের মুঠোয় পেয়ে গেছে। আনন্দের অনুভূতি তার সমস্ত চৈতন্য জুড়ে। নাজমা তার কোলের কাছে। দু-হাতের বন্ধনে নিজের বুকের কাছে টেনে এনেছে। নাজমার বুকের মধ্যে তার মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে সওগাত। নাজমা তার ডান হাত দিয়ে সওগাতের বুকে বিলি কাটছে। নিশ্বাসের শব্দ। হৃদ্‌স্পন্দন। বেহেস্তের আবহ চারপাশে।

নাজমার সঙ্গে তার কতদিনের বন্ধন। কতদিনের চোখে চোখ রেখে একাত্ম হওয়া। কত অভ্যস্ত বোঝাপড়া। এতদিন ছিল যেন বন্ধন। সারেক কোনো সময় থেকে আসলে বন্ধন ছিল। এখনো আছে। অনন্তকাল থাকবে।

কাচের চুড়ির শব্দ বাজে নাজমার হাতে। তার বুকে বিলি কাটবার সময় হাত নাড়া খায়। চুড়ি বেজে ওঠে। চোখের তারা কেঁপে যায়। ঠোঁটের কোণা ভিজে ওঠে। নাজমা সওগাতের গলায় বার বার চুমু খাচ্ছে। এবং কণ্ঠা ভিজে উঠেছে সওগাতের, নাজমার ঠোঁটের স্পর্শে। গলায় ভিজে সুড়সুড়ি পায়।

ফট করে সওগাতের ঘুম ভেঙে যায়। সে নিজেকে দেখে, চিৎ হয়ে সেইভাবেই সে শুয়ে পড়ে আছে। কখন লোডশেডিং হয়েছে। ঘেমে নেয়ে গেছে। সারামুখে ঘাম। কণ্ঠায় ঘাম গড়িয়ে এসে কিলবিল করে। সুড় সুড়

করছে। দেওয়াল ঘড়িটার পেণ্ডুলাম একই ছন্দে যাওয়া আসা করছে। দেওয়ালে টিকটিকি পোকা ধরছে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে বিছানার পায়ের দিকে। গ্রীষ্মের দিন জলেপুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ ঘুমের মধ্যে সে আসলে স্বপ্ন দেখছিল। বিছানায় সে আসলে একা।

বিদ্যুৎ এল। পাখাটা আবার চলতে শুরু করল। সারা শরীর ঘামে চটচট করছে। ঠাণ্ডা বাতাস পেয়ে ঘামগুলি মরছে। ধীরে ধীরে শীতল হয়ে উঠল ঘরের ভেতরটা। তার ঘরের ভেতর আর কেউ নেই। দেয়ালে দুচারটে টিকটিকি ও পোকামাকড় আছে। পাশের ঘরে টেপরেকর্ডারে গান বাজছে। বাইরের গাছপালা মাঠ-ঘাট প্রান্তর আগান-বাগান ডাঙা সে সবেতেও তার অনধিকার। বিচ্ছিন্ন। সে শুয়ে শুয়ে, জেগে জেগেই স্বপ্নটার কাছে যেতে চাইল। বেহেস্তের স্বপ্ন। সে যা খেতে চাইবে, তার হাতের কাছে এসে ধরা দেবে। চারদিকে আলোর রুশনি। ফুলের বাগিচা। বেহেস্তের নর্তকীরা নৃত্য বাদ্য গীতে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে। এছাড়া তার কিছু আর নেই।

পৌষ-পরবের কুশীলব

ভগীরথ মিশ্র

বর্তন লোহারদের ট্রাক এসে পৌঁছুলো হাড় মাস্‌ডা বটতলায়। আর ঠিক সেই মুহূর্তে এক দশাসই হনুমান আছড়ে পড়লো শিবমন্দিরের চুড়োয়। বর্তনরা দৃশ্যখানা দেখলো। তখন ঠায় দুপুর।

হনুমানটার বিশাল বপু। বেজায় তাগড়া। শিবমন্দিরটা বহুকালের পুরোনো। বেঢপ উঁচু।

এককালে চুন-সুরকির প্লাস্টারের ওপর চিকণ পালিশ ছিল। চাঁপা-হলুদ রঙের পালিশ। তেলতেলে মসৃণ। রঙ-টঙ চটে গেলেও ঐ তেলতেলে ভাবখানা এখনো রয়েছে। দীর্ঘদিন বৃষ্টির জল খেয়ে তার গায়ে জমেছে পুরু শ্যাওলা। অত উঁচু মন্দির, কিন্তু তার বেয়াড়া গড়ন। মাটি থেকে হাত তিরিশেক খাড়াই দেওয়াল। চুড়োটা কাছিমের পিঠের মতো ঢালু। মাঝে কোনও ঢাল নেই। ধাপ নেই। খাঁজকাটা, বাঁকচুর কিচ্ছু নেই। এমন কি দরজার মুখে জগমোহনও নেই। গম্বুজাকৃতি চুড়োর মধ্যিখানে এক বিশাল ত্রিশূল। আকাশের দিকে উদ্ধত। ঐ ত্রিশূলের গোড়ায় খানিক চক্রাকার কারুকার্য।

মন্দির থেকে হাত বিশেক তফাতে এক পুরোনো তল্লা-বাঁশের ঝাড়। বেশ পাকা পাকা তল্লা-বাঁশ, হলুদ হয়েছে। হনুমানটা অনেকক্ষণ ধরে দোল খাচ্ছিল একখানা তল্লা বাঁশে চড়ে। খুব মজা পেয়ে গিয়েছিল ব্যাটা। একটা পাকল

গোছের বাঁশের আগার দিকে চড়ে বার বার ঝুলে পড়ছিল। বাঁশের নাম তল্লা। আগায় ধরে বেঁকিয়ে গোড়ার সাথে লাগিয়ে দিলেও ভাঙবে না। বরং খুব দামী স্প্রীং-এর মতো বাঁশখানা হনুমান শুদ্ধু নেমে যাচ্ছিল মন্দিরের চুড়োয়। চুড়োর হাত-তিন-চার ওপর থেকে ফের ফিরে যাচ্ছিল স্বস্থানে। নিশ্চয়ই খুব মজা লাগছিল হনুমানটার। মন্দিরের চার পাশে যাদের বসবাস, তারা বললো, সেই সকাল থেকে হনুমানটা খেপে খেপে দোল খাচ্ছিল বাঁশে চড়ে। একসময় হনুমানের শরীরের বাড়তি বলপ্রয়োগে বাঁশখানা অনেকখানি নেবে এলো। এবং প্রায় অর্ধ-গোলাকার হয়ে তার ডগাখানি হনুমান শুদ্ধু মন্দিরের চুড়ো ছুঁলো। আর হনুমানটা চক্ষের পলকে ত্রিশূল খানাকে জাপটে ধরে বাঁশখানা ছেড়ে দিল। বাঁশের ডগা স্বর্গে উঠে গেল তৎক্ষণাৎ। হনুমানটা ত্রিশূল আঁকড়ে ধরে দেখলো সেই দৃশ্য। পরক্ষনেই, বর্তন লোহারদের আকাশ-ফাটানো স্লোগানে, চমকে তাকালো বটতলার দিকে।

আগামীকাল, একত্রিশে ডিসেম্বর, রাজ্যব্যাপী ভোট। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুরের শয়ে শয়ে ক্ষেত মজুর এখন নাবাল খাটতে গেছে পূবের জেলা-গুলিতে। বর্ধমান-হাওড়া-হুগলী—এসব এলাকায় কাজও মেলে, মজুরের দরও বেশী। পশ্চিমা মজুরের কদরও খুব। চাষের মরসুমে যারা গিয়েছিল, তারা ফিরে এসেছে ভাদ্রের শেষে। আবার গিয়েছিল অঘ্রাণে। অধিকাংশ এখনো ফেরে নি। ধানকাটার মরসুম শেষ হয়ে এলো। কিন্তু বেশির ভাগ মজুর ফিরবে না। নাবাল দেশে মাটি যেন সোনা। সেচের জল অঢেল। সেখানে আমন ওঠার সাথে সাথেই রবি চাষ শুরু হয়ে যায় সেচের জলে। মজুররা থেকে যায় সেই কারণে। এমন বেয়াড়া সময়ে ভোট হলে তাই নেতাদের বিপদ রাখবার ঠাঁই হয় না। বহু নিশ্চিত ভোট নষ্ট হয়ে যায় শুধু বেয়াড়া মরসুমটার জন্য।

একদিন বর্তনের দলের নেতারা মিটিং ডাকলো উলুবেড়িয়া বাজারে। মাইক হাঁকড়ে বললো, ভোটের আগের দিন দেশে ফিরে যা সব। বহু ভোট নষ্ট হয়ে যাবে।' 'কি কইবে যাব আইজ্ঞা? মালিক ছাড়বেক ক্যানে? এখন ক্ষেতে-মাঠে কত কাজ। তা বাদে, দু'পিঠের বাসভাড়া, দু'দিনের মজুরী।'

নেতারা বললো, 'সে সব আমরা দেখছি। মোট কথা সবাইকে ভোট দিতে হবেই। ভোট দেবার অধিকার যে কত বড় অধিকার, সে তো তোরা বুঝলি না। এই দুনিয়ায়, শুধু ভোট দেবার অধিকার চেয়ে কত মানুষ লড়ছে, মরছে। আচানক ব্যাপার, দিন কয় বাদে মালিকরাই বলল্যাক কথাটা। যা

তোরা দেশে। ভোট দিয়ে আয়। আগের দিন যাবি। ভোটের পরের দিন ভোরে এসে মাঠে নামবি। দু'পিঠের ভাড়া পাবি। দু'দিনের মজুরীও। তোদের নেতাদের সাথে মিটিংয়ে ঠিক হয়েছে এসব। জ্বালাতন। এ এক নতুন নিয়ম চালু হলো দেশে। তোরা ভোট দিবি, আমাদের কি তার খরচ বইতে হবে! জুলুম আর কাকে বলে।

প্রথম প্রথম রাজি হয়নি মালিক পক্ষ। কিন্তু কিছুদিন বাদে যখন মালিক-দের দলের নেতাদের কাছ থেকেও একই চাপ এলো তখন আর সামাল দেওয়া গেল না।

বর্তনের গেরস্থ একদিন শুধোলো, 'কাকে ভোট দিস্?' বর্তন লোহার ততদিনে বুঝে ফেলেছে প্রশ্নের তাৎপর্য। দাঁত গিজুড়ে বললো, 'তুমার-আমার একদল।'

মিছে কথাটা না বললেও ক্ষতি ছিল না। কারণ তদ্দিনে সব দলের পৃথক পৃথক চাপে মালিক পক্ষ নীতিগতভাবে মেনেই নিয়েছে ব্যবস্থাটা। দু'দিন সবেতন ছুটি। যাতায়াতের ভাড়া। এ তাদের দিতেই হবে। তোমাদের জমিনে যারা বারো মাস ঘাম ঝরায়, তাদের এই সামান্যতম গণতান্ত্রিক সুযোগটুকু ব্যবহারের পথ করে দিতে হবে বৈকি। নইলে যদি ঐ অছিলায় আচমকা লেবার বয়কট হয়? তখন কেঁদে কূল পাবে না।

উলুবেড়িয়ায় রাতের ট্রেনে চেপে, শেষরাতে বাঁকুড়া ইস্টিশনে নেমেছে বর্তনরা। পার্টি-কর্মীরা মোতায়েন ছিল। ভোর হতে না হতে পায়দলে এনেছে গোবিন্দনগর মাঠে। তখন সকাল সাতটা। বাঁকুড়া শহর থেকে গোবিন্দনগরটা বেশ দূরে। নতুন বাসস্ট্যাণ্ড গড়ে উঠছে সেখানে। এখনো শেষ হয়নি। চারপাশে বিশাল খাঁ-খাঁ ডাঙা ছিল। কিন্তু বর্তনরা দেখলো, মাঠখানাকে চেনা দায়। সারা মাঠ জুড়ে গিজগিজ করছে মুনিষ-কামিনের দল। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে প্রতিটি দলের ট্রাক সারবন্দী দাঁড়িয়ে। ট্রাকের মাথায় যে যার দলের ফেস্টুন।

কাতারে কাতারে নারাল মজুর, হৈ-হৈ করে এগিয়ে যাচ্ছে নিজেদের দলের ট্রাকের দিকে। স্থানীয় নেতা ও দলের কর্মীরাই বেছে নিচ্ছে নিজের দলের মানুষ-জনকে। কেউ কেউ ফেস্টুন দেখেই শ্লোগান দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে। সারা গোবিন্দনগর জুড়ে যেন এক বিশাল মেলা বসেছে। শ্লোগান পাল্টা শ্লোগানের বাণ ডেকেছে চারপাশে। ভোট দিবেন বাঁচতে, হাতুড়ি-তারা-কাস্তে। ভোট দিবেন কী-সে, কাস্তে-ধানের শী-ষে। এই,

কেউ খাবে আর কেউ খাবে না, তা হবে না, তা হবে না। থাকতে দুধে-ভা—তে ভোট দিন হা—তে। দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে বর্তনদের শরীরে শিহরণ জাগে। ইস্, কি এক পরব লেইগেছে গো—দেশে।

তালডাংরার মানু ঘোষ বর্তনদের চেনে। ছুটে এসে পুরো দলটিকেই পাকড়াও করে সে। অত দেরি ক্যানে রে? চল্, চল্। হাড়মাস্ড়ার ট্রাক হু-ই খাড়া আছে উদিগে।

বর্তন লোহার বললো, 'দাঁড়া বাপু। ভোখে জীবন যায়। আগে দু'টো পেটে পুরি।'

হৈ-হৈ করে তেলেভাজার দোকানে ঢুকলো বর্তনের দল। মুড়ি আর চপ কিনে, শালপাতায় মেখে, কোঁৎ কোঁৎ করে খেতে লাগলো গ্রোগ্রাসে। আসার সময় তো মালিক বাসভাড়া বাদেও একদিনের মজুরী আগাম দিয়েছে। চিন্তাটা কি!

লাল ধুলো উড়ছে। নাবাল মজুররা গিজ গিজ করছে মাঠময়। সব দলের নেতা কর্মীরা হন্তদন্ত হয়ে ছোটাছুটি জুড়েছে। মাইকে ঘনঘন ঘোষণা চলছে। কোন্‌দিকের ট্রাক ছেড়ে যাচ্ছে। কোন্ দিকের ট্রাক অল্পবাদে ছাড়বে।

বর্তনদের মুখে খুশীর ঝলক। লঙ্কা-পায়রার মতো উড়ে বেড়াচ্ছে ওরা মাঠময়। চারপাশে চেনামুখ অনেক। রতনপুর, তালডাংরা, মড়াশোল, হাড়মাসড়া, চোখরাঙ্গা—সব গাঁয়ের মানুষ ঘোরাঘুরি করছে কাছে পিঠে। দেখাশোনা, কোলাকুলি, কুশল-বিনিময়। ফুর্তির বাণ ডেকেছে মানুষগুলোর চোখেমুখে। শীতের সকাল নরমপায়ে দুপুরের দিকে এগোচ্ছে।

দুই

বাঁশটা হাতছাড়া হতেই হনুমানটা মুহূর্তের জন্য কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেল। ভীষণ বোকা বোকা লাগছিল ওকে। ত্রিশূলটাকে দু'হাত দিয়ে অল্প ঝাঁকালো বার কয়। চূড়োর অর্ধ গোলাকার ভূঁই। পুরু শ্যাওলায় ঢাকা। পা দিতেই হড়কে গেল বার দুই। পশুসুলভ অনুভূতি থেকে সে বুঝলো, ঐ কাছিমের পিঠের মতোন ঢালু ও শ্যাওলাময় জায়গায় হাঁটতে যাওয়া বিপজ্জনক। এবং উঁচু চূড়ো থেকে পাকা চাতালে লম্ফ মারাও আত্মহত্যার সামিল। ত্রিশূলটাকে ছেড়ে দেওয়াও মূর্খামি। কাজেই ত্রিশূলটাকে দুহাতে শক্ত করে চেপে ধরে সে পরিস্থিতির অগ্র-পশ্চাৎ ভাবতে বসলো।

হাডমাসডার বটতলা। এখানে থেকে লোহার পাডা মাইলটাক। মাঝে এক বিশাল ধানের ক্ষেত। ট্রাক থেকে নেবেই চাবপাশে তাকায় বর্তন লোহাব। বটতলার দিকে চোখ পডতেই ওব চক্ষু চডকগাছ। আই ব্যস! এ যে আইজ্ঞা যজ্ঞ লেইগেছে। শুধু এখানেই নয়, ট্রাকে চডে আসতে আসতেও বর্তনরা দেখেছে, প্রায় সাবা পথ জুডে উল্লাস। ঝাঁ-ঝাঁ করে ছুটে চলেছে ট্রাকগুলো। ট্রাকেব মাথায চডে নাবাল মজুররা উল্লাসে ফেটে পডছে। স্লোগানে স্লোগানে আকাশ-বাতাস মাতোযাবা। হাডমাসডার তাবৎ নাবাল-ফেরৎ মজুব-কামিন থানা গেডেছে বটেরতলায়। কেউ নিজেদের ঘবে অবধি যায নি। তারা এখন ঘবে গিযে করবে কি? খাওযা-দাওযার ব্যবস্থা তো বটতলাতেই। আজ দু বেলা। কাল দুপুরে। ঘব-সংসার ফেলে কতদিন বিদেশ-বিভুঁইয়ে বযেছে লোকগুলো। আচমকা পৌঁছে তাবা খাবাব জোগাড কবতে পাববে কেন? নেতাবা বুঝেছেন ব্যাপাবটা। সেই কারণেই প্রতি পাডাব জন্য কিছু কিছু ববাদ্দ কবেছেন। বিবেচনা আছে বলতে হবেক। বর্তন মনে মনে লক্ষবার সাধুবাদ জানায। প্রতি পাডায একজন নেতা আছে দলেব। ঐ নেতার ওপবই সবকিছুব ভাব। শুধু বরাদ্দের টাকায অত মানুষের তিন-বেলা হয না। পাডাব নেতাবা তাই সম্পন্ন গেরস্থদেব দোরে দোবে ঘুরে সংগ্রহ করেছে কিছু চাল-ডাল। কেউ ইচ্ছেয দিযেছে। কেউ অনিচ্ছেয়। ঐ দিয়ে সবাইযের খিঁচুডি ভোজের ব্যবস্থা। দেখেশুনে বর্তন লোহার তাজ্জব বনে যায়। পাযে পাযে এগিযে যায বটতলায। দূব থেকে হেতম সিং হেঁকে ওঠে, 'ই বর্তন তুই ইখেনে ক্যানে বে? তুযার পাডায তো পৃথক বান্নার বেবস্থা হইযেঁছে। 'ভা-গ্।'

হেতম সিং-এর বগডটা বুঝতে পারে বর্তন। সেও মজা করে জবাব দেয়, 'হউ। খুডা গ', আমি দু'থানেই খাবো।' বলতে বলতে মিষ্টি হাসে বর্তন। বসে পডে হেতম সিং-এর পাশটিতে। বলে, 'কদ্দিন বাদে দেখা হল্যো। আগে টুকচান বসি তুমাদ্যাব পাশ। সুখ-দুখেব কথা-টথা কই। চুটা-ফুটা থাইক্‌লে দাও একটা। ই ট্যাপকা, সুফলকে বল্যে দিস, যাচ্ছি টুকচান বাদে। খাবো উখ্যেনে।'

ট্যাপ্‌কা হল বর্তনের পডশী। সে ধবেছে লোহাব পাডার পথ। বললো, 'জলদি আইসো। খিঁচ্‌ডি ফুবাই গেলে কেউ দায়ী হব্বেক নাই।'

বর্তন মৌজ কবে চুটায টান মারে। নীলচে ধোঁওযা ছাডে। শীতের সোনালী বোদ্দুর মিঠে গন্ধ ছডায চাবপাশে। বটের ঝাঁকডা ডালপালায়

ছাঁক্‌নি গলে দু দশ দানা সোনার টুকরো ঝরে পড়ে মাটিতে। মানুষগুলোর গায়ে-মুখে-পিঠে।

বটের তলাটা জুড়ে দখল নিয়েছে বহু মানুষ। পাশাপাশি পাড়া থেকে খেজুরপাতার তালাই এনে পেতে দিয়েছে পার্টির লোক। কোত্থেকে একটা সস্তা ট্রানজিস্টার এনে গাছের তলায় বসিয়ে দিয়েছে কেউ। চড়া গান বাজছে। বসে-শুয়ে গল্প-গুজব জুড়েছে সবাই। রঙ-তামায় মশগুল। কাল সারারাত ট্রাকের মাথায় জেগেছে যারা, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে অকাতরে। তাস খেলছে কেউ কেউ। টোয়েন্টিনাইন। চারজনে খেলছে। পাশে তিনগুণ লোক সাপোর্ট দিচ্ছে। সহর্ষে তুরুপ করছে, মাটিতে তাসশুদ্ধ ইয়াব্বড চাপ্পড় মেরে। সাপোর্টারদের উল্লাসে আকাশ-বাতাস উতরোল।

অল্প তফাতে তালা পুকুরের পাড়। সার সার অর্জুন গাছ। গুঁড়িতে অজস্র কুঁজ। কুঁজের গায়ে বিকট চোখ। অর্জুনগাছের তলায় সার সার মাকড়া পাথরের উনুন। ধোঁয়া উঠছে আকাশ চিরে। কালো কুচকুচে কড়াইতে খিচুড়ি চড়েছে। খিচুড়ি তো নয়, চালে-ডালে হলুদ ভাত। ব্যস, গরমা-গরম ওতেই মাৎ। ওরই গন্ধে ম-ম করছে শীতের বাতাস। মেজাজ ঠিক রাখা দায়।

বর্তন চুটা খেতে খেতে চারপাশের সবাইকে দেখছিল। নির্বাক হাসি বিনিময় করছিল এর-ওর সাথে। অনেক চেনা লোক চারপাশে। অকারণ ঘুরে বেড়াচ্ছে। হেসে গড়িয়ে পড়ছে পর্যাপ্ত কারণ ছাড়াই। ফুর্তির সায়রে ভাসছে সব। বটের ডালে চড়ে বসেছে তিলক লোহার। গান ধরেছে উচ্চস্বরে। টুশু গান। বর্তনের দিকে চোখ আড়ে সে : তুই অ্যালি ভাই, আর একজন কৈ / আমি ভিজাঁই ছিল্যম চিড়া-দৈ / তুই আইলি ভাই আর একজন কৈ। ওদিকে তাসের আড্ডায় জমে গেছে ভালুক লোহার। এককালে প্রাণের বন্ধু ছিল দুজনায়। এখন দু'জনেই মিছরির ছুরি। ভালুককে দেখা ইস্তক কৌশল্যাকে খুঁজতে লেগেছে বর্তন। জমায়েতের মধ্যে নিঃশব্দে চিকনি চালাচ্ছে দু'চোখ। কৌশল্যার সাথে নারালেই ভাব হয়েছিল বর্তনের। সে এখন ভালুক লোহার গৃহিণী। ফি-বছর ওরা অন্য জেলায়, অন্য নারালে চলে যায় খাটতে।

প্রচণ্ড উল্লাসে তুরুপ করলো ভালুক। চারপাশে জয়ধ্বনি দিচ্ছে সাপোর্টাররা। পিটখানা কুড়িয়ে নিতে নিতে নজর পড়ে যায় বর্তনের ওপর। হেই—। কখন এইলি ? বর্তন দূর থেকে হাসে। হাতের ইঙ্গিতে বোঝায়, এক্ষুনি।

তাসশুদ্ধ বাঁ-হাত সজোরে নেড়ে বর্তনকে কাছে ডাকে ভালুক। বর্তন হাসে। হাতের মুদ্রায 'তিষ্ঠ' ভঙ্গি এনে নিবস্ত কবে ওকে।

চুটাখানা শেষ কবেই উঠে দাঁডায় বর্তন। চলি খুডা। ভালুক না ডাকলেও একসময পাযে পাযে ওর কাছে যেতোই বর্তন। অন্য এক তাগিদ আছে যাওযাব। কৌশল্যা।

ভালুক লোহার আডচোখে চাইলো। পাশে দাঁডিযে থাকা বর্তনকে দেখলো।

বললো, 'তুমাব তো এই বটতলায থানা গাডায কথা লয। বেপাডায নামা ক্যানে? ধান্দাটা কি বটে?'

ছেলেবেলাব প্রাণের স্যাঙাত, এমন কথা বললে সেটাকে নেহাত বগড বলেই ধবে নেওযা উচিত। কিন্তু ভালুক লোহাবেব ক্ষেত্রটাই আলাদা। তাব কথায গুপ্ত বিষেব সন্ধান পায বর্তন।

তাও হেসে শুধোয, 'কৌশল্যা আসে নাই?'

'কৌশল্যা?' চকিতে তাস থেকে মুখ তুললো ভালুক। পলকেব তবে বর্তনকে দেখলো। ফিক কবে হাসলো।

বললো, 'কৌশল্যা তো যায নাই নাবালে। উযাব বাডিতে আছে। আট মাসেব পুযাতী। এই দিল্যম গুলাম। সামলাও হে—।'

কৌশল্যাব বাপেব বাডি বিবডদা। এখান থেকে মাইল সাত-আট। কিন্তু বর্তন লোহাব সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে গেল সেখানে। কৌশল্যাকে দেখলো। তার পোয়াতী শরীবেব চেকনাই, লজ্জায ভারি হযে আসা চোখের কোল, ডিমালু গেঁডি-হাসের মতো দুলে দুলে হাঁটা, সব নিবিখ কবলো লোভী লোভী চোখে। তাবপব ফিবে এল বটতলায। ভালুক তখন প্রলয তক্ক জুডেছে প্রতিপক্ষ ভীম সিং-এব সাথে। সে নাকি কঠিন মুহূর্তে গুরুত্বপূর্ণ ভুলটি করে, ফেব শুধবে নিতে চায। হায রে, তাও কি হয! ভালুক লোহার প্রবল বেগে দু'হাত নাড়তে থাকে ভীম সিং-এব মুখেব ওপব। হয না। দুনিযাব কুথাও নাই হয সিট্যা।

বটতলা থেকে চোখ চাবালেই চাবপাশে কখু মাঠ, খাঁ-খাঁ। ডাঙা-ডুংবী খাঁ-খাঁ। ন্যাডা শালেব বন। গাছেব তলায অজস্র শুকনো পাতা। হাওযায উডছে।

বর্তন নডেচডে উঠলো। পা-বাডালো লোহাবপাডাব দিকে। বুকেব মধ্যে চিন চিন ব্যথা।

হেতম সিং পিছু থেকে হাঁক মারে, 'ইখ্যেনে চাট্টি খিঁচুড়ি খেইয়েঁ যা ভাইপো। হে-ই ভাইপো।'

বর্তন জবাব দেয় না। সে পায়ে পায়ে এগোতে থাকে বাড়ির দিকে।

ঘরে পৌঁছে বর্তন দেখে, বুড়ি মা দাওয়ায় বসে বসে ক্ষণ গুনছে।

বর্তনকে দেখে বুড়ি খনখনিয়ে ওঠে 'কুথা ছিলি বাপ ইতোক্ষণ? দুনিয়ার মজুর-কামিন ফিরেৎ এল্যো ঘর, আমার ঘরেরটি আর নাই আসে। চেইয়েঁ চেইয়েঁ চোখের জল মইরে যায়, বাপ।'

বর্তন হাসে। মোটা চাদরখানা ছুঁড়ে দেয় দাওয়ায়। গায়ের গেঞ্জিটা খুলে ফেলে। বলে, 'সিনান্‌টা সেইরে আসি। উদিকে খিচুঁড়ি খাবার ধুম লেইগে গেছে।'

তিন

শীতের দুপুরে লোহার পাড়ায় মৌলতলার বাতাস উতরোল। খিচুড়ি-ভোজ জমে উঠেছে। মৌল গাছের তলায় শালপাতার পাত পেড়ে বসে গেছে সবাই। সুফলের দল পরিবেশন করছে। গরম-খিঁচুড়ি সাপ্‌টে খাচ্ছে। সপাৎ-সপাৎ আওয়াজ উঠেছে হাওয়ায়। গন্ধ ছুটেছে দিগ্বিজয়ে।

বর্তন পৌঁছুনো মাত্রই হৈ-হৈ করে উঠল অনেকে। 'হেই বর্তন—। বট্‌তলায় খিঁচ্‌ড়ি দিল নাই তুয়াকে? মেইরে খেদালো?'

বর্তন টিটকিরিগুলো উপভোগ করে। দাঁত গিঁছড়ে হাসে। বলে, 'উখ্যেনেও খেয়েঁছি হে। ইখ্যেনেও খাব।'

'উখ্যেনে কলাটি ছাড়াঁই দিয়েছে তুয়াকে। বইসে যা শালা। আর ডাঁট মাইত্তে হবেক্ নাই।'

বর্তনের লালচে চুলের গোছা বেয়ে টপটপিয়ে জল ঝরছে।

সুফল লোহার হাসি মুখে অভ্যর্থনা জানায়, 'বইসে যাও পাতা লিয়ে। দেরি কিসের?'

'তুমরা খাবে নাই?' নেহাৎ ভদ্রতা বশে শুধোয় বর্তন।

'আমাদের খাবার ঠিক আছে? দুটা বাউরী পাড়ার অর্ধেক লোক নামে নাই ইখনতক্কো।'

'বল কি।' বর্তন অল্প বিস্ময় বোধ করে, 'বিকাল যে গড়াঁই গেল।'

'আর বিকাল।' সুফলের ঠোঁটে উদার হাসি, 'কাল রাতে যারা বাসে

চইডতে পাবে নাই, উয়াবা আব বাসও পাবেক নাই। সব বাস চইলে যাবেক কলেজ মাঠে ভোটবাবুদের বইতে। উযাত্তাব রেলই ভস্তা। মার্টিন রেলে আসতে পারে বর্ধমানেব কিছু মজুব। হাওডাব মজুরেরা আইবেক খডকপুর হইযেঁ বড বেলে।'

'যেদিকে রেল নাই?'

'কি করে—।' সুফল কিঞ্চিৎ অনিশ্চিত, 'পার্টি কুনো বেবস্থা কইব্‌বেক নির্ঘাৎ। টেবাক ভাডা কইরে বা অন্য কুনো উপাযে—। অত মানুষ, না ক্বিরল্যে তো—।'

কথাবার্তার ফাঁকে শালপাতা টেনে নিযে বসে গেছে বর্তন। সুফল খিচুডি ঢেলে দিল পাতে। অন্যদের ফেবাব সমস্যা ভুলে খুব অল্প সমযের মধ্যেই একবাশ হলুদ খিঁচুডির মধ্যে আকণ্ঠ ডুবে গেল সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আবো একখানা ট্রাক এসে থামলো হাড-মাসডা। বটতলায।

চঞ্চল হযে পডে সুফল। চেঁচিযে বলে জগৎ বাউরীকে, 'খিঁচডির শেষ কডাটা নামলো হে? এ টেরাকে বোধ লেয বাউবী পাডায় বহুৎ লোকই নাইম্‌লো। জ্বাল লাগাও, জ্বাল লাগাও।'

খেয়ে দেযে উঠে দাঁডালো বর্তন। পেট চিডচিড করছে। যেন হার্ড-পাম্প দেওযা ফুটবল। পেটে হাত বুলোতে বুলোতে এক অন্য জাতের তৃপ্তি। কাবণ, এই ভবপেট নিযে সাত-তাডাতাডি মালিকেব ক্ষেতে নাবতে হবে না আজ। নুয়ে নুযে সাঁঝপহর অবধি ধান কাটতে হবে না। এখন একটা চুটা ধবিযে মৌজ কবে টানতে থাকা। তাবপব মউল গাছেব তলায টান টান হযে শুয়ে থাকা, রোদ্দুরে পিঠ ঘুবিয়ে। ইতিমধ্যে তাসের আসব সাজিয়ে বসে গেছে কেউ কেউ। অতি চ্যাংডারা খো-খো খেলার প্ল্যান ভাঁজছে। পেটেব ভাব অল্প কমলেই নেমে পডবে ওরা। বর্তন চাটাইতে লম্বা হযে শুলো। পাশে বসেছিল তিলক লোহাব। চাপা গলায বললো, 'সইনঝায় পচাই চলবেক। জানো ত?'

'পচাই!' বর্তন নডেচডে শোয, 'পচাই কুথা মিলবেক?'

'আছে।' চোখ টিপে হাসে তিলক. 'সুফল বইললো। মোট আশি কেজি চাল উঠেছিল চাঁদায। তাব ষাট কেজি খিঁচডিতে লেইগেছে। বিশ কেজিব পচাই বসেছে পশুপতি লোহাবেব দোবে। পশুপতিব হাতেব পচাই। বেপাবখান্ বুঝ তেবে।' পাশ দিযে হনহনিযে যাচ্ছিল সুফল লোহার।

ব্যস্ততার মধ্যেও নির্বাক হাসি বিনিময় হয়। সুফল বলে, 'বইসে বইসে কি করিস, তিলক?' তিলক লোহার হাসে।

বলে, 'ভাবছি মার কথাই হে।'

চলতে চলতে মনের পুলকে গান ধরে তিলক লোহার 'আহা, মন সবে না শ্বশুরঘর য্যাতে। ও তুই কি দিলিভাই পাতে। মন সবে না শ্বশুরঘর য্যাতে।' গাইতে গাইতে সুফলের দিকে বাঁ হাতখানা উদাত্তভাবে মেলে ধরে তিলক লোহার, 'ও তুই কি দিলি ভাই পানপাতে—'। দু'চোখ নতুন আধুলির মতো চকচক করে ওঠে। বর্তন লোহারের বুকখানাও তিড়িং তিড়িং নৃত্য জুড়ে দেয়।

পাশ ফিরে শোয় বর্তন। শীতের বিকেল দ্রুত নরম হয়ে আসে। শুকনো হাওয়ায় ঠোঁট ফেটেছে। ধুলো উড়ছে। নরম লাল ধুলো। আয়েসে বুঁজে আসে চোখ। বুকের মধ্যে পরবের বাদ্যি বাজে। টুসু পরব আসছে। আর ক'দিন বাদে। এমনি সময়ে কৌশল্যার কথা মনে পড়ে।

সন্ধ্যে নাগাদ পশুপতির উঠোনে পচানির আসর জমে ওঠে। পশুপতি লোহারের তৈরি পচানি এ তল্লাটের সেরা। একখানা মাটির মালসা নিয়ে বসে গেল বর্তন। চোঁ-চোঁ চুমুক মারে মালসার মুখে। ভেতরটা গরম হতে থাকে। অন্ধকার নেমে আসে। ধেয়ে আসে কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়া। নেশা জমতে থাকে। হু-হু হাওয়ায় ভেসে আসে টুসু গানের সুর। বর্তনের চোখের সামনে ছবি তৈরি হতে থাকে। একের পর এক ছবি। পৌষ-পরবের ছবি। কৌশল্যাকে নিয়ে পোরকুলের মেলায় যাওয়ার ছবি। শিলাবতী নদীর জলে টুসু ভাসানের ছবি। এক মালসায় ছবিখানা জমে। পরের মালসায় ভেঙে যায়।

উঠোনের এককোণে মাধো সিং চোঁ-চোঁ পচানি গিলছে। ব্যাপারটা প্রথম নজরে আসে পশুপতির। মাধো সিং হলো বিরোধী দলের। বর্তনদের যারা বিরোধী দল, তারা সংখ্যায় কম। তারা আজ ভোজের ব্যবস্থা করেছে আশু রায়ের খামার বাড়িতে। মাধো সিং দুপুরের খাওয়া ওখানেই খেয়েছে। কিন্তু ওদের জন্য সন্ধ্যেয় বুঝি পচানির ব্যবস্থা নেই। সেই কারণে পচানি-খোর মাধো পায়ে পায়ে এসে বসে গেছে উঠোনের এক কোণে।

পশুপতি চিৎকার করে ওঠে, 'তুই শালা গাছেরও খাবি, তলারও কুড়াবি? শালা ধান্দাবাজ। ভাগ্, জলদি ভাগ্।'

পশুপতির চিৎকারে সবাই ঘুরে তাকায়। পরিস্থিতিটা বোঝবার চেষ্টা করে।

মাধো সিং-এর মুখে বোকা বোকা হাসি। বোঝা গেল, পশুপতির বাখান্‌গুলো তার কান ভেদ করে অন্দর অবধি পৌঁছায় নি। একখানা চেরা লকড়ি নিয়ে চরম রোষে ছুটে যাচ্ছিল পশুপতি লোহার। বর্তনরা হাঁ-হাঁ করে ওঠে, থাম্‌, থাম্‌। মারিস নাই। বেচারি আশা লিয়ে আঁইছে। না হয় খেইলোই দু' মালসা পচানি।'

শীতের রাত গাঢ় হতে থাকে। নেশাটা ক্রমশ জমতে থাকে। দু'চোখ লাল হয়ে ওঠে। ঠোঁট জোড়া ফুলে ওঠে। মুখের হাসিটা ক্রমশ নিষ্পাপ হয়ে আসে।

উঠোনের ঐ কোণে জড়ানো গলায় গান ধরেছে তিলক লোহার। রাজাকাটার গাঁজা দোকানে / নেশা ল্যাগে গেল একটানে—।

দু'হাত সামনে মেলে দিয়ে গাইছে তিলক। চারপাশে কেউ কেউ আলগোছে ঠোঁট মেলাচ্ছে। কেউ বা উরুতে আলতো চাপড় মেরে মেরে তাল দিচ্ছে। অকারণে চিল্লিয়ে উঠছে কেউ কেউ। মনের খুশিতে। কাল সকালে ভোর ভোর ওঠা নেই। শীতে দলদল থরতে থরতে, শিশিরে ভেজা ঘাসের ঝাড় দু'পায়ে ঠেলতে ঠেলতে, মালিকের ক্ষেতে যাওয়া নেই। দিনভর নুয়ে নুয়ে ধানকাটার বালাই নেই। আহ্‌-হা। কি মজা হে!

একসময় তিলক লোহার উঠে দাঁড়ায়। টলতে টলতে এগিয়ে যায় মাঝ উঠোনে। সহসা আকাশের দিকে মুষ্টিবদ্ধ দুটো হাত তুলে চিৎকার করে ওঠে, 'একটা লয়, কাল দুট্টা ভুট দিবো হে—।'

চার

সকালবেলায় মউলতলায় একটিই আলোচনার বস্তু। কাল দুপুর থেকে হনুমানটা ঠায় বসে আছে। কিছুতেই নামতে পারে নি। খুব মুষড়ে পড়েছে বেচারা। ভোখে-শোষে হয়ত বা কাহিল। দু'চোখ জুড়ে ভয় আশঙ্কা। মউলতলায় পৌঁছেই কথাটা কানে আসে বর্তনের। পাড়ার ছেলেরা নামানোর চেষ্টা করেছে অনেক। একখানা তল্লা বাঁশ পাঁচ-ছ'জনে মিলে বেঁকিয়ে তার ডগাটি মন্দিরের চুড়ো অবধি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু গাছের গোড়ায় টান দিয়ে লম্বা বাঁশের ডগা অতখানি বাঁকানো যায় নি। একটা আছোলা বাঁশ কাঁধে করে বয়ে এনে ঠেসিয়ে দিয়েছিল মন্দিরের গায়ে। ঐ বেয়ে নেবে আসবার জন্য বারবার পীড়াপীড়ি জুড়েছিল। প্রবল চিৎকারে সাহস জোগাচ্ছিল নীচ থেকে। সাহস তাতে করে বাড়ে নি ওর। তার

বদলে ভয় বেড়ে গেছে আরও। বার দুই ভেংচি কেটে সে সংশয়ে দুলতে দুলতে আঁকড়ে ধরেছে ত্রিশূলখানাকে। খাদ্য হিসেবে কাঁচা পেয়ারা, ছুঁড়ে মেরেছে চুড়ো লক্ষ্য করে। তাতে বেচারি দ্বিগুণ আতঙ্কে ত্রিশূল ধরে দাপাদাপি জুড়েছে। শেষমেষ মুরুব্বিরা ধমকে তাড়িয়েছে বাচ্চাদের, 'রেহাই দে উয়াকে! তুয়াদ্যার উপ্‌কার উয়ার সইবেক নাই। শেষমেষ ভয়ের তানে যেদি লম্ফ-টম্ফ মারে, ত' ছাতি ফেইট্যে মরবেক।'

গতকালের পচানির ঘোরটা পুরোপুরি কাটেনি। শরীরখানা বেশ হাল্কা ফুরফুরে লাগছিল বর্তনের। বহুদিন অত বেলা অবধি শোবার সুযোগ পায় নি। আলসেপনা শরীরখানা মহুলের তলায় থাপ্‌না করে সে হনুমানের সংকটঘটিত আলোচনা শুনতে থাকে নিবিষ্ট হয়ে।

হনুমানকে নিয়ে গবেষণা এগিয়ে চলে। কেউ কেউ বলে, 'চূড়া থিক্যে সাহস করলে ঝাঁপটা দিতে পারলে সরবেক নাই। বড় জোর ঠ্যাং-ঠুঙ্গা মচকাবেক।' 'কিন্তু সে সাহস কি উয়ার হবেক? অবোধ জীব। উয়ার উপর ভয় পেইয়েছে।'

ভোট শুরু হয়ে গিয়েছে ভোর সাড়ে সাতটায়। লোহার পাড়ার সবাই ভোট দেবে হাড়মাসড়া গার্লস স্কুলে। কিন্তু সে এখন নয়। দুপুরের পর। বড়সড় ঘরের গিন্নি-বান্নিরা খাওয়া-দাওয়া সেরে তখনি আসবেন ভোট দিতে। সুফল লোহারের নির্দেশ, বর্তনরাও ঐ সময়েই ভোটের লাইনে দাঁড়াবে।

হাতে তাই অঢেল সময়। বর্তন ভাবলো, কি করা যায় অতিরিক্ত অতোখানি সময় নিয়ে? কি করা উচিত।

গেরস্থের গরুর গোঠ লাল ধুলো উড়িয়ে চলেছে জংগলের দিকে। তাদের গলার ঠরকা ঠর্ ব্‌র্—ঠর্‌র্‌র্ বাজছে। খেজুর রসের হাঁড়ি নামিয়ে ঘরে ফিরছে নয়ন দাস। একটা ফেতি-কুত্তা খান চার-পাঁচ বাচ্চা নিয়ে ঘুরঘুর জুড়েছে মউলতলায়। বাচ্চাগুলো মায়ের বাঁটে মুখ দিয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে।

মউলতলায় রান্নার আয়োজন শুরু হয়েছে। উনুনে আগুন পড়েছে। চাল-ডাল ধোওয়া চলছে। দুপুরেও খাওয়া-দাওয়া করবে, নারাল মজুরদের দল। বিকেল থেকে ট্রাক বোঝাই শুরু হবে হাড়মাসড়ার বটতলা থেকে। নারাল মজুর ফিরে যাবে নারালে। কাল ভোরের মধ্যে হাজির হতে হবে মালিকের ক্ষেতের পাশটিতে।

বর্তন পায়ে পায়ে গেল পশুপতি লোহারের উঠোনে।

আসাটা বৃথায় যায় নি। বর্তন দেখলো, সকাল বেলাতেই পশুপতির

উঠোনে বসে গিয়েছে পচাইয়ের আসর। গত রাতের অবশিষ্ট পচাইয়ের কথাটা মনে ছিল অনেকেরই। সকাল না হতেই তারা ভনভনে মাছির মতো ভিড় করেছে। কেউ কেউ রাতে ঘরেই ফেরে নি। চাদর মুড়ি দিয়ে কুকুর-কুণ্ডলি হয়ে রাত কাটিয়ে দিয়েছে পশুপতির দাওয়ায়। সকালে উঠে ফের মালসা নিয়ে বসেছে। বর্তনও একটা মালসা নিয়ে বসে গেল।

দুপুর বেলায় ভরপেট খিঁচুড়ি খেয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ালো বর্তনরা। ভদ্দর ঘরের বউ-ঝি, গিন্নিবান্নিরা খাওয়া-দাওয়া সেরে, মুখে পানের খিলি গুঁজে, পাটভাঙা কাপড় পরে, পায়ে আলতা লাগিয়ে হেলতে দুলতে আসছে দল বেঁধে। বর্তনদের প্রায় পুরো পাড়া তার আগেই এসে—দখল করে নিয়েছে লাইন। জ্যাম করে দিয়েছে বুথ-ঘরের মুখ। হল্লা বাধিয়েছে অকারণে। দু'তিনটে হোমগার্ড আর চৌকিদার মিলে লাইন ঠিক করতে হিমসিম খাচ্ছে। এ এক মজার খেলা। বর্তনরা জানে। অকারণে লাইনের মধ্যে ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতি,-ধাক্কাধাক্কি। শীতের বিকেলেও সবাই ঘেমে-নেয়ে একসা। ভদ্দর ঘরের বউঝিরা অমন ভিড়ভাট্টায় দাঁড়াতে চাইছে না। সামনের থেকে আচমকা ঠেলায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে যাচ্ছে লাইন। মা-জননীদের অনেকেই নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে ভয়ে ভয়ে দেখছে অশান্ত লাইনের ভাব-গতিক। ওদের দলের কর্মীরা হাজার বুঝিয়েও ওদের লাইনে ভেড়াতে পারছে না। এ দৃশ্য বর্তনদের কাছে নতুন নয়। তারা জানে, লাইনে যারা কোনো গতিকে দাঁড়িয়েছে তারাও টিকবে না বেশিক্ষণ। কারণ ইতিমধ্যে মা-জননীদের পেছনেই ওরা দাঁড় করিয়ে দিয়েছে বাউরী পাড়ার জনা ত্রিশ-চল্লিশ মেয়েকে। সামনের পেছনের দু'দিকের ঠেলায় ওদের বারোআনা একটু বাদেই বেরিয়ে যাবে লাইন থেকে অত ধকল ওইসব আয়েশী শরীরে সইবে না। গাল পাড়তে পাড়তে ধরবে যে যার ঘরের পথ। কর্মীরা হাজার মেহনত করেও তাদের ধরে রাখতে পারবে না।

বর্তন যখন ভোট দিয়ে বেরোলো তখন ডালে-পালায় বেলা। রোদ্দুরের রঙ লালচে। হাতে আর সময় নেই। এখনই ট্রাকে রওনা না দিতে পারলে বাঁকুড়ায় রাতের ট্রেন ধরতে পারবে না। মা এবং পিসি এখনো রয়েছে লাইনে। তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে দৌড় দিল হাড়মাসড়ার বটতলার দিকে।

বটতলায় জনা পঞ্চাশ লোকের জটলা। একখানা ট্রাক বোঝাই হয়ে রওনা দিয়েছে আধ-ঘণ্টাটাক আগে। ঐ ট্রাক না ফিরে আসা অবধি বর্তনদের অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

লাল-চাকিব মতো সূর্য ডুবছে তালাপুকুরেব পশ্চিমপাড়ে। পাখি-পাখাল দল বেঁধে উড়ে চলেছে যে যাব আস্তানাব দিকে। হিমেল হাওয়া বইতে শুরু কবেছে। বটতলায় এবং আশে পাশে অসংখ্য এঁটো শালপাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। দূবে এঁটো-কাঁটার দখল নিযে ঝগড়া লাগিয়েছে একপাল কুকুর। দেখতে দেখতে বর্তনেব মনখানা ভাবি হযে আসে। ইস্, কত জলদি ফুরাই গেল, আনন্দেব মেলাটি! আবার তাকে ফিবে যেতে হবে পরবাসে। কাঁধ দিতে হবে জোযালে। সেখানে সকাল থেকে সন্ধে অবধি মালিকের ক্ষেতে হাড়ভাঙা খাটালি।

তিলক লোহাব যাবে বর্ধমান। বাঁকুড়া অবধি এক ট্রাকে। বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে রয়েছে সে। ডুবন্ত সূর্যের ম্লান আলো তার মুখের এক পাশে পড়েছে। ধীবলযে গান ধরেছে তিলক লোহাব, এতবড় পৌষ-পরবে রাখিলি মা পবেব ঘবে / পবেব মা' কি বেদন বুঝে, পুড়াই মারে অন্তরে। গানখানা শুনতে থাকে বটতলাব তাবৎ-নাবাল মজুব। গানের করুণ সুরখানা বুকেব মধ্যে ঘাই মাবতে থাকে নিঃশব্দে। টুসুর মাস চলছে। সন্ধে হলেই ঘবে ঘবে টুসু-পূজা, টুসু-গান। দিনকয বাদে পৌষপরব। টুসুর ভাসান। এখ্যান পরবে আস্‌কা-পিঠাব ধুম। কাঁসাই নদীর দহে পোরকুলের টুসু মেলা। এই,সব কিছু পেছনে ফেলে এদেব চলে যেতেই হবে এক অদৃশ্য শেকলেব টানে।

দুটো মাত্তব দিন। গানে-গল্পে, বঙ-তামাশায, ভুরি-ভোজে আব আলসেপনায স্বপ্নেব মতো কেটে গেল। হায, স্বপ্নটা কেন স্থায়ী হয় না। কেন ফি-মাসেই ভোট ডাকেন না বাবুরা? দু'দিনের শেকল টিলা ছুটি। ট্রাকেব মাথায় চড়ে, সাবা অঙ্গে লাল ধুলো মেখে, হৈ-হৈ কবে ঘবে ফেরা। দিনভর বঙে-বসে, মজে থাকা। মউলতলায়, শালপাতার পাত পেড়ে, খিচুড়ি-ভোজ। সন্ধ্যেবেলায অঢেল, পচানীব মাতাল আসব। আ-হা, কেন ডাকেন না বাবুরা। বর্তনদেব সারামুখ জুড়ে এখন স্থাযী বিষাদ।

ট্রাক ফিরে এলো। ভনভনে নীলমাছিব মতো রঙ। তাব গর্জন কেঁপে ওঠে বটতলাব লাল মাটি। নেতাবা তাড়া লাগান্, উঠ্, উঠ্, উঠ্। জলাদ কর্ বে। তুযাত্তাবকে ছেঁইড়ে, আবো চাব ট্রিপ মাবতে হবেক ইযাত্তাব। উঠ্, উঠ্, উঠ্।

ট্রাকে চড়বাব পূর্ব-মুহূর্তে, ঘনিযে আসা সন্ধেব আলো-আঁধাবিতে, বর্তন দেখলো বিপন্ন হনুমানটি শ্যাওলা-ধরা মন্দিবেব চূড়োয একতাল পাথবের মতো স্থিব। এখন তাব নিষ্প্রভ চোখের মণি জোড়ায মৃত্যুর ছাযা দুলছে। সন্ধে নামছে। চাবদিক থেকে ঘনিযে আসছে কাকেব ডানাব মতো অন্ধকাব। একটু একটু করে নিঃসাড়ে ঢেকে ফেলছে ওব সারা শরীব। জন্ম মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে বসে রযেছে অবোলা জীবটি। কে জানে, ক্ষণিকের উচ্ছ্বাসে নেবে পড়া ঐ শ্যাওলা-ধরা পিচ্ছিল চূড়ো থেকে জীযন্তে তার মুক্তি ঘটবে কিনা।

সকালে অনেকে বলছিল, লম্ফ দিলে হনুমানটা নাকি বেঁচে যেতেও পাবে। বড় জোব ঠ্যাং-ঠুং মচকাবে। বর্তনেব মনে হল, প্রতি মুহূর্তে এমন নিদারুণ-ভাবে বিপন্ন হয়ে থাকাব চেয়ে ওব লম্ফ দেওয়াই সংগত।

পদ্মপুরাণ

রাধাপ্রসাদ ঘোষাল

দিগন্ত রেখায় একটি লাল গামছা পেতে শুয়েছিল বনমালী।

তার পাঁচ বছরের মেয়ে আরিতুস তখন বাঁধের কোলে পদ্মবিল থেকে ফুল তুলে এনে চাক ভেঙে ভেঙে পদ্মচাল খাচ্ছিল। ছোট একটি ঘাঘরা ফ্রক তার গায়ে। যখন বাপ শুয়ে থাকে বাঁধের ওপর—তখন পড়ন্ত বিকাল। সে নেংটি ইঁদুরের মত টুকটুক চোখে ছুটে দৌড়ে বেড়ায়। শাল গাছে ফুল দেখে। কলকে ফুলের মধু খায়। তাল গাছের মাথায় ডোমচিলের কান্না শোনে।

দূর ইতিহাসের মত অস্পষ্ট এই সাহেব বাঁধ। কোল কেটে জলাশয়—পদ্মের চাষ। গ্রাম বাঁশিবায় শোলে বাঁশির জিভ খসে গেছে—তার বদলে দূরে ওই জঙ্গলমহল, শাল গাছ হাওয়া বাতাসে ঠোকাঠুকি করে বাজে। পদ্ম মানে পয়সা, শাল বেচলে টাকা আসে।—হিসাব-নিকাশ আর ব্যবসা। আরিতুস এসব বোঝে না কিছুই—সে দৌড়ে দৌড়ে আসে। লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বাপের বুকে পড়ে বলে—পদ্মচাল।

তখন শালবনীর পশ্চিমে মানুষজন আলু চাষে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ডাক আসে—গোয়ালতোড়, চন্দ্রকোনারোড, আমলাশুলি, গড়বেতা থেকে। পাঠানকোট, লালিবোম্বাই, নৈনিতাল আলু। অখিল মিস্ত্রীর জমিতে মাটি প্রস্তুতের খেলা চলছিল।

আরিতুস বলল—চ,—সন্ধ্যা হয়ে গেল।

বাঁধের ওপরে ফাঁকা পৃথিবীর হাওয়া বনমালীর শরীরে আসান দিচ্ছিল। সে উঠে বসে দেখল পশ্চিম আকাশ আবছায়ায় তলিয়ে যাচ্ছে। সে মেয়ের হাত ধরে বাঁধ থেকে নেমে আসতে লাগল। আরিতুসের শিশু চোখ এদিক ওদিক দেখে—ইতিউতি চায়। বনমালী স্থির। প্রাজ্ঞ। চোখ দুটি ভুবনের দিকে সোজাসুজি—সে প্রায় দৌড়তে দৌড়তে নামে। কিঙ্করের পোতায় গাই বাঁধা আছে। আঁধার দেখলে অবলা জীব ডরায়—

আবার আলুবিল। ঝুরো মাটির ভেলিতে আলুর কাটা চোখ পুঁতে চাষীরা বুকে মাটি তুলে দিয়েছে। মাটির তলা থেকে সে চোখ উন্মিলিত হয়ে ক্রমশই আকাশের দিকে যাবে। অখিল মিস্ত্রির কথা মনে পড়ে যায় বনমালীর—লোকটার কদমছাঁট চুল। চোস্ত চেহারা। মাজা গায়ের রঙ। পুরুষ কোকিলের মত ফাসা চোখে যেন নীলের বদলে হলুদের লীলা। অবাক হয়—বনমালী,—যে লোকটার বিঘার পর বিঘা আলু চাষ। হাজার হাজার টাকার মাল যার কোলস্টোরেজে যায় তারই একটি পদ্মবিল আছে বাঁধের কোলে। ফুলের কারবার। একটি ব্যবসা অন্যটির দিকে কৌতুকে চায়।

আরিতুস বলল—গরু—

হ্যাঁ মা। এই ত গিয়েই তুলব—চ ত তরসতরি—পা চালিয়ে চ মা।—

মোল গাছে কুঁড়ি লেগেছে। শ্মশানকুলির পাশ দিয়ে ঢিলে রাস্তা—বুড়ি পুকুরের পাড়ে একটা তাল গাছের গোড়ায় আকাশ থেকে চুন পড়ছে, ওপরে তাকালে চারটে শকুন চোখে পড়বে।- বনমালী খুঁটা থেকে গরুর দড়ি খুলে নিয়ে ঘরের পানে ছুটতে থাকে। আরিতুস হাঁ করে আকাশের চাঁদ দেখছে।

বনমালী বলল—আয় মা আয়। শীত নামছে গাছে। এই লে গামছাখান গায় দে—

আবার আলুবিল। মাঠের পর মাঠ—কিঙ্করের পেটা, মহিশোলের ডাক, ডাকাতকালির ছিয়া, বামুনভূমার ছাড়। তারপর জঙ্গল—শাল, ক্যাঁদ, আকাশমণি জঙ্গল উঠছে। শালবনী থেকে ট্রেনের হুইসেল ভেসে আসে। ট্রেন থেকে গার্ডের হাতে পয়সা গুঁজে দেয় লোকেরা। বস্তা বস্তা কাঁচা কয়লা নামে। তাকে গুঁড়িয়ে সোনা করা হয়।

প্রথম যেদিন বনমালী এই গাঁয়ে এসেছিল তখন রেবতীর বয়স আর কত হবে? ১৪? ১৬? ১৮—? এই রকমই। তখন এই চাষ, কারবার

আধুনিক জীবন ছিল না। ভঙ্গভূম পরগণার লোকজনেরা বামুনভূমের এই জঙ্গলে মাঝে মধ্যে ঢুকত কাঠের লোভে। ঐ দিকে কলকাতা, ২৪ পরগণা, চুঁচড়ায় কাঠ চালান যেত। এইদিকে ক্ষীরপাই, ঘাটাল, আরামবাগ। আদিবাসী সাঁওতালরা আদিবাসীর মত ছিল।—রাজনীতি জানত না। বনমালী রাতারাতি এখানে পালিয়ে এসেছিল একদল লোকের সঙ্গে। তার পেছনেও একটা ইতিহাস—সে চুরি করেছিল। গাছে তখন কাজুবাদাম পাকছে। দলকে দল মেয়ে, বউ, লোকজন জঙ্গলে ঢুকে ঠিকে চুক্তিতে বাদাম তুলত আর জমা দিয়ে পেত পয়সা। তখনই রেবতীর বাপ বনমালীকে কইমাছ ধরার মত একদিন খপ করে ধরল। বাকবিতণ্ডা অনেক হয়েছিল—কিন্তু কোনই ফল হয়নি। রেবতীকে বিয়ে করে শ্বশুরের ভিটায় রয়ে গেল বনমালী। ৪ বছরের মাথায় শনি জন্মাল। তার দু'বছর পরে আরিতুস। ভাইবোনে ওরা লাউডগার মত বাড়তে লাগল।

সমগ্র পৃথিবীর সমস্ত পুরুষ এক রকমের নয়। বনমালীর ধাত আলাদা। সে চাষের কাজ জানে না—তবু করে। টাকা উপায়ের পথ পায় না তবু হাঁটে। এমনিভাবে আগে যেখানে ধান আর গম ছাড়া আর কিছু ফলতো না সেখানে ক্রমেক্রমে আলু চাষের ঢেউ উঠল। হাজার শিখিয়েও বনমালীকে কাজের লোক হিসাবে তৈরি করা গেল না। এদিকে সংসারের এক একটি পেট বড় হচ্ছে। রেবতী শুধু মুখ ঝামটা দেয়। একদিন ঘরে এসে বলল, তমাকে অখিল কামার ডেকেছে—

অখিল কামার হাপরে হাওয়া ঢেলে আগুন লাগাতে জানে। হাতুড়ি পিটে লোহাকেও সোজা করতে জানে। তার ধানের চাষ। গমের চাষ। আলুর চাষ। সূর্যের মত রক্তাক্ত ষাঁড়া মোরগ ঘরে খামারে চরে বেড়ায়—সে মালিক। বনমালী এসে হাতজোড় করে বলল—এঁজ্ঞে—

অখিল মিস্ত্রি বলল—পদ্মচাষের তদারকি—পারবি—

খুব পারব—

উঃ—মুখের কথাটি যদি না থাকত তবে শিয়ালে টানত তোকে। ত শুন—ঐ সাহেববাঁধ, ঐ দেখ—চোখে পড়ছে—

বনমালী তাকিয়ে দেখে—উঁচু বাঁধ। গাছ। দিগন্ত। সে বলল—হ্যাঁ—

গরমেন্টের ডাক ধরেছি আমি। এখন থেকে বাঁধের জলে পদ্ম চাষ হবে। গাছের গোড়া নিকাতে হবে। পদ্ম ফুটলে তুলে তুলে ঝুড়ি ভরে শালবনীতে

আড়তে দিয়ে আসতে হবে। হিসাবে কিন্তু ভুলচুক হয় না যেন। তাইলে কিন্তু বেটাকে জেলে পাঠাব।

সেও বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল। আরিতুস এখন ১৫ বছরেরটি, আবার শীত—আলু বাড়ছে মাটির নিচে। চলছে ব্যবসা। মাঝে মাঝেই অখিল মিস্ত্রী বনমালীকে ডাক দেয়।

বনমালী হাত জোড় করে এসে দাঁড়ায়। অখিল বলে—পদ্ম চাষে লোকশান। ঐ বিলে এবার ভাবছি পানিফলের চাষ দিব। —কথা শুনে বনমালীর মুখ কালো হয়ে যায়! সে বলে—এই বছরটা দেখই না। আমি ভাল পদ্ম তুলব দেখ—

ভর দুপুরে রেবতী পদ্মপাতায় ভাত বেড়ে দেয় বনমালীকে। সে খায়। শুকনো পদ্মপাতার থালা করে করে বেচতে যায় রেবতী। পদ্মপাতায় পয়সা ভাল। কাজঘরের জন্য লোকের কাছে চাহিদা আছে। ভাত খেতে খেতে বনমালী বলে—আর দুটি ভাত। আর আলু চটকা দে—

রেবতী বলে—পদ্মডোবে যখন নামবে দেখেশুনে শুষার করে নামবে বাপু। বাঁধের মাথায় সাপ থাকে। পদ্মগোখরো। গভীর রাতে হিসহিস করে গিয়ে পদ্ম গাছের গোড়ায় পাঁকের নিচে ঢুকে থাকে। তাই ত পদ্মপাতার গায়ে এত বিষের খেলা—পাতাগুলি কেমন নীলপদ্ম। দেখই ত—

শনি আর আরিতুস ভাইবোনে তারাও খেতে বসেছে। শনি ইস্কুলে পড়তে যায়। আরিতুস মায়ের হাতের শুষার করে। বিকালে বাপের সাথে বাঁধ ধারে যায়। বনমালী ভাত খেতে বসে ইদানিং কেমন যেন ফসফস করে শব্দ শুনতে পায়। যত ভাত খায় তত সেই পদ্মগোখর সাপটি ফসফসায়। পদ্মপাতায় ভাত বসলেই তার এই মতিভ্রম। আসলে তা নয় যত বয়স বাড়ে তত হসফস করে বনমালী। পদ্মবিলে পদ্ম ফোটে। বনমালীর মাথার চুলে সাদা ছোঁয়া লাগে। তার বয়স বেড়ে যায় হু হু করে। পদ্মডোবে নামলে আজকাল তার শীত পায়।

সকালে গত রাতের বাসি ভাত খাচ্ছিল। ইচ্ছে হল বউকে সবকিছু খুলে বলে। তারপর ভাবল নাহ্র—মেয়ামানুষ ইসবের কি বুঝবে! নিজের ভেতরেই থাক। শনি স্কুলে গেল। আরিতুস বাপের সঙ্গে ভাত খেয়ে নিল। সেও যাবে সাহেব বাঁধে। আধ কোমর জলে নেমে পদ্মপাতা তুলবে। রেবতী বলল—ওলো, চোখের মাথা ঠিক রেখে পদ্মপাতা তুলবি। পোকো-খাওয়া পাত তুলে তুলে ঘরে লে আনিসনি। ঝ্যাঁটা পিটা করব তকে।

বড় হয়েছে আবিতুস। সে আর বাপের হাত ধরে হাঁটে না। নেংটি ইঁদুরের মত দৌড়াদৌড়ি করে না। ধীর মন্থর পায়ে সে বাপের পিছে পিছে হাঁটতে থাকে। চোখ দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে গাছ, পাখি ষাঁড়—বিশ্ব-সংসারকে। নয়মন্তী খালের মত বাঁকা—টানা সেই চোখ দুটি এখন বকনা বাছুরের চোখের মত জীবদান পেয়েছে। বিস্ময় ধরেছে। দিগন্ত রেখায় লাল গামছা পেতে শুয়ে আছে বাপ বনমালী। অর্জুনগাছের ছায়া এসে পড়েছে শরীরে। এক কোমর জলে নেমে বেছে বেছে পদ্মপাতা তুলছিল আবিতুস।

হাই উঠল—আড়মোড়া ভেঙে বিছানো গামছায় উঠে বসল বনমালী। বাঁধের ওপরের বাড়তি হাওয়ায় আরাম লাগে। আজ পদ্মফুল তোলা নেই। গাছের গোড়ায় নিকান দিয়েছে দিনা দুই আগে। আজ তাই আর জলে নামল না বনমালী। উঠে বসে আকাশপানে তাকিয়ে দেখল রোদ মধ্যগগনে উঠে গিয়ে কড়া চোখে বাঁধের দিকে তাকাচ্ছে। পদ্মডোবের দিকে তাকিয়ে বনমালী দেখতে পেল মেয়ে আবিতুসকে—

চারদিকে ঘেরা বাঁধ। লোকচলাচল এদিকে নাই। তবু বনমালীকে রোজই আসতে হয়—এই পদ্মবিলটির যত্নআত্তি, তদারকির ভার তার উপর। অখিল মিস্ত্রী মাসে মাসে হিসাব বুঝে নেয়। এক পয়সার এদিক ওদিক চলে না। তাই বনমালীকে রোজই আসতে হয়—পাছে না চুরি হয়ে যায়, ফুল-পাতা—মাছ।

বনমালী দেখল—মেয়ে আবিতুসের পদ্মপাতা টুঙে নেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেছে। ঘাটলার মত একটা জায়গায় বড় পাথরের চাঁই আছে। সেই পাথরে পদ্মপাতার বোঝাটা বাঁধা। আবিতুস বুকের ওপর থেকে গামছা নামিয়ে খালি গায়ে বাঁধের জলে ডুবছে উঠছে। মেয়ের রঙ কালো—তাই একটি পানকৌড়ির মত লাগছে তাকে। মুগ্ধ চোখে হাঁ করে তাকিয়ে দেখতে লাগল বনমালী।

কবে কবে তার আবিতুস এত বড় হয়ে উঠল। সে যে ঘুম থেকে জেগে উঠেছে—তা জানান দিল না মেয়েকে। ডাকল না। দেখতে লাগল—আবিতুস নাইছে। ভরা শরীরে তার পনেরটা বছর কেমন বেড়ে উঠেছে। যেন হাওয়ায় দুলছে দুটি পদ্মকুঁড়ি। মানুষের শরীরেই পদ্মের বিভিন্ন বয়স বিভিন্ন মুদ্রায় জেগে ওঠে এই সরল সত্য টের পেল বনমালী। ভেতরে ভেতরে বনমালী—যেন আবিতুস, আবিতুস, আবিতুস বলে আদর খেলতে লাগল। একসময় আবিতুসই বুকে গামছা বেঁধে উঠে আসে। ততক্ষণে আবার গামছা

পেতে দিগন্তরেখায় শুয়ে পড়েছে বনমালী। আবিতুস কাছে এসে ডাকে, ঘরে যাবি ত—

গাছে পকা লাগেনি ত, দেখলি ভাল করে—

হ্যাঁ। লাগেনি—

ফুল তুলতে হইচে নাকি—

ভরে আছে ফুলে—আর অনেক কুঁড়ি—

অ। —এই বলে বনমালী একবার যেন অচেনা চোখে তাকাল মেয়ের দিকে। আবিতুস বুঝল না। শীতের মাঠে ঘাসের আয়োজন—বাপবেটিতে হাঁটতে হাঁটতে দুপুর ঝুলে পড়ল।

গভীররাতে গ্রাম বাঁশিরায় শোলে অপরূপ জ্যোৎস্না নামে। আঁধার যেমন কালো ভয়ঙ্কর তেমনি কখনো অনিন্দ্যসুন্দর। আকাশের ছাদ ফেটে শীতের হিম ঠাণ্ডা নামছে পৃথিবীতে। ভারি কষ্টের সেই ফোঁটা। আবিতুস ঘুমিয়েছিল বান্না দুয়ারে মাদুর পেতে। শনি মাঝরাতে গুটিগুটি পায়ে এসে ঠেলা দিয়ে জাগায় আবিতুসকে। বলে—চ—

বাঁশপাতালি চোখ ছটফটিয়ে তাকায় আবিতুস। বলে—কি?

কি আবার?—চ—

আবিতুসের মনে পড়ে যায়। সে ধড়ফড় করে উঠে পড়ে। একটা ছোট চটের ব্যাগ হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শনির সঙ্গে। শনি ১৭ বছরের ছোঁড়া। গায়ে গতরে উঠতি বল, চোখে সাহস। এক হাতে লাঠি অন্য হাতে বিড়ি ধরিয়ে ফুঁকতে থাকে।—

আবিতুসের গলা কেঁপে যায়, দাদা—ভয় লাগচে যে রে—

শনি ফিসফিসিয়ে বলে—চুপমার। কথা করিসনি। কউ জানবে নি। ই নিশাভর রাতে আবার কে দেখতে পাবে।

নরম জ্যোৎস্নায় আবছা আঁধার। যেন প্রকৃতির জন্য চাঁদের চোখেও কিছু সন্দেহ ছিল। মাঠের পর মাঠে প্রসারিত আছে লোভ। আলু বিলে সবুজ গাছের নিচে আটার লেচির মত গোল গোল আলু। মাঠের পর মাঠ—। পোতার পর পোতা—। জোতের পর জোত—।

শনি বলল -আমি হাতে করে মাটি সরাব আর তুই আলু তুলবি। তরসতরি হাত চালাবি। ভয় পাবিনি একদম। মনে রাখবি—বুকের ভিদরে ঠাকুর আচেন।

চতুর্দিকে লাট হয়ে আছে জ্যোৎস্না। আলুবিলে নেমে যায় শনি। পিছে

আরিতুস—শীতে হিটি হিটি করে কাঁপে। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কিছু নেই, কেউ নেই, শুধু আলুবিল। আদিগন্ত পৃথিবীর এই কৃষিক্ষেত্রে বসে হাতে করে মাটি খুলছিল শনি। যেন গুপ্তধনের মত টেনে টেনে বের করে আনছে মাটির গর্ভ থেকে। মায়ের বুকে বাচ্চার মত শেকড়ে বাকড়ে আঁকড়ে আছে। টেনে টেনে ছাড়িয়ে আনছিল শনি।

এমন সময় যেন আকাশ থেকে পড়ল একটি বাজ। হঠাৎই অতর্কিতে একটা বাঁশের লাঠি শনির পিঠে ঠেকিয়ে কে বলে উঠল—ব্যাটা চোর—

আরিতুস কি করবে ভেবে উঠতে পারল না। বুক তার ধসড়াতে লাগল। কিন্তু জাগালদারকে দেখে শনি তেমন ভয় পেল না। শুধু আলু খোঁড়াটি স্তব্ধ হয়ে গেল।

জাগালদার মন্মথ শিকারী বলল—শালা—টাকা দে—

আজ যে নাই মন্মথকা—

তবে শালাশালিকে পঞ্চাতে জমা দিই। বিচার হবে। মার খাবি। জরিমানা দিবি—

হাতে পায়ে ধরতে লাগল শনি। কাকা গ, ঘরে ভাত নাই। নাইলে এ ই চুরি—ছ্যা ছ্যা! বাপকে আমাদের ত চেন। সে কেমন মানুষ। আজকের মত ছেড়ে দও।—

ঠিক আছে তবে একটা বিড়ি দে—টাকা না হয় কাল সকালে লুলকার দকানে যখন চা খেতে যাব তখন লুকিলুকি আমার হাতে গুঁজে দিয়ে এসবি। এখন যা, ব্যাগ লিয়ে যা—আমাকে একটা বিড়ি দিয়ে যা। ঠাণ্ডায় লেশা করি—তাও যদি না থাকে তবে এই গেঞ্জি তললাম পিঠটা চুলকে দে।

অগাধ জলে যখন গলা ডুবিয়ে দিল বনমালী তখন শুধু চোখ দুটি জলের ওপরে। ঠোঁট ডুবে আছে। মাথাটি ফুটে আছে পদ্মফুল হয়ে। অজস্র শ্বেতপদ্মের সঙ্গে এক সমতলে এসে বনমালীর মাথা ফুটে আছে। এক ঝলক দেখে কেউ ফুলগুলির থেকে মানুষের মাথাটিকে আলাদা করতে পারবে না। প্রসারিত হাত-দুটি পদ্মপাতার মত ভেসে আছে—আর তার মাঝে মগজটা ফুল হয়ে ফুটেছে। চোখ তুলে দেখার চেষ্টা করল মনমালী। দেখল নিজের ভ্রূর উচ্ছ্বাস রক্তপদ্ম হয়ে জ্বলে উঠেছে। রাত্রে ইদানিং ঘুমের ভেতর সে এইসব দেখে।

সকালবেলায় একটা খেজুর পাতায় বোনা পাটিতে আলু মেলে দিয়ে রোদ খাওয়াচ্ছিল রেবতী। কাদামাটি পলিমাটি ঝরে ঝরে পড়ছে—এক একটি আলু যেন সোনার বলের মত ধকধকিয়ে উঠছিল। বনমালী শুধু তাকিয়ে

দেখল—কাউকে জিজ্ঞেস করল না কোত্থেকে এল এত আলু। সে জানে এ সংসারের লোকজনেরা তার কথামত সৎ পথে চলবে না। যে আলুর আরামবাগ, আসানসোল, হলদিয়া চালান যাবার কথা—সেই আলুই কেমন নিজের ইচ্ছায় প্রতিবেশীর ঘরে উঠে এসে হি হি করে হাসছে। বনমালী কোন কথা না বলে ভাত খেতে বসে গেল। একটি মাত্র কাঁসার থালা, একটি গ্লাস—একটি এ্যালুমিনিয়ামের বাটি আছে তাদের। এইগুলিতে খায় ঘরের বড় ছেলে শনিরাম। তাই আরিতুস, রেবতী আর বনমালী ভাত খায় পদ্মপাতায়। একটা সুবিধে আছে—মাজ বে, ধোওবে নাই। খেয়ে-দেয়ে ঘাট কোলে ফেলে দিয়ে এলেই হল। তারপর কুত্তায় টেনে নিয়ে যাবে।

আরিতুসও বসেছে বাপের পাশে। খেয়ে-দেয়ে সে যাবে পদ্মপাতা তুলতে। বনমালী ভাত খেতে খেতে শুনতে পেল কোথায় যেন একটা পদ্মগোখরো ফঁস ফঁস করে গজরাচ্ছে। ফুলছে—ফুলছে—ফেটে পড়ছে। কিন্তু ভয় পেল না বনমালী—তার ঢের বয়স হল। এ বয়সে ভয় মানায় না। রোজই খেতে বসে পদ্মপাতা থেকে ভাত তুলতে গেলেই সে যেন এই গোখরো সাপটির ডাক শুনতে পায়। কিন্তু কোনদিন দেখেনি। এই ডাক শোনাতে পারেনি কাউকে। শুধু নিজে শুনেছে এই পদ্মবিলাপ।

অদ্ভুত জীবন এই মানুষের—এত আশা আকাঙ্ক্ষা লোভের জীবন। অথচ কত একঘেঁয়ে। বহুকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছে, অথচ স্বপ্নসত্যহীন। বাঁধের পিঠে গামছা পেতে শুয়ে থাকে বনমালী। সেই একফোঁটা আরিতুস বড় হয়ে পদ্মবিলে নেমে গিয়ে পাতা তোলে। নগ্ন হয়ে স্নান করে যৌবন ধোয়। কাচাকুচি করে। পুরুষ মানুষ বলতে তা একমাত্র বনমালী দেখতে পায়।

একদিন সন্ধ্যায় বনমালী ঘরে ঢুকে শুনল রেবতী গজরাচ্ছে। গ্রীষ্মকালের সাঁজ-বিকালে পৃথিবীময় শুধু হাওয়ার খেলা চলে। সেই অপরূপ মনোমুগ্ধকর হাওয়া থেকে ঘরে ঢুকে যেন বনমালীর মুখে তেত স্বাদের শুক্তো পড়ল। সে বলে উঠল—কি রাতদিন গজগজ কর বলদিনি—

—বলি মেয়েটার যে এত গুলান বয়স হল—এবার গস্ত করতে হবেনি? ডোবাধার থেকে হাঁস তাড়িয়ে উঠে আসছিল সন্ধ্যায়। কে একজন মন্দ লোক এসে তাকে জড়ি' ধরেছিল। অসব্য করবার মতলব। নিজেই ছাড়ি' লিয়ে ভাগ্যিস বেচারি দৌড়ে উঠতে পেরেছিল। আমি রেগে গিয়ে মরনীর চুলের ঝুঁটি ধরে মারলম। বসে বসে কাঁদে বটে। সত্যিই ত অর কি দোষ? দোষ ত আমাদের। আমার—তমার—

বনমালী দেখল ঝুজকা আঁধারে ঘরের এককোনে থম হয়ে বসে আছে আবিতুস। একটু আগে কাঁদছিল এখন একেবারে চুপ। এক পশলা বৃষ্টির পর আকাশ যেরকম থম হয়ে থাকে। ঘরে ঢুকে শনিরাম যখন শুনল সে বোনের দিকে তাকিয়ে হুঙ্কার ছাড়ল—শালা বেজন্মাকে চিনতে পারলিনি—কুন শালা সাত বাপের বেটা, একবার দেখি দে—সে শালার মাথাটা যদি না ছিঁড়ে আনতে পারি আমি।—শনিরাম চোটপাট করতে থাকে। তাকে অবিশ্যি মানায়। পার্টি পঞ্চায়েতের সঙ্গে এই বয়েসেই উঠে বসে সে। দহরম মহরম ভাল। ছেলেকে কাছে পেয়ে ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে চোখের জল ঢালতে থাকে রেবতী।

এইভাবেই চলছিল জীবন। একদিন সন্ধ্যায় অখিল মিস্ত্রী এসে বলল—কি হে বনমালী পদ্মচাষে ত পড়তা নাই হে। এবার তুলে দি' নাকি। পানিফল দিব ভাবছি—

কেনে গ কর্তা—

সরকারকে ত বছরিক হাজার টাকা করে গুনাগার দিতে হয়। উঠে আমার হাজার টাকা? ঘর থিকা দিয়ে দিয়ে আর কতকাল বল?

না দাদা—' এবার ডোবার সংস্কার করতে পারলে ভাল হয়। নতুন বীজ আনতে শহর থানি—। পানিফল দিলে ত ছেলেছোকরারাই তুলে খেয়ে দিবে—

ত কি দামে বিকায় এখন পদ্ম?

১০০ টা শ—

শুন বনা—

কি দাদা—?

কাল সকালেই আমার ঘরে ১০৮টি তাজা পদ্ম পাঠি দিবি দিনি—

কি হবে?

কি আবার দুগ্‌গা পূজা—নীলপদ্মের বদলে সাদা পদ্মই দুব মাকে—। রামচন্দ্র ১০৮টি নীল পদ্ম দিয়ে পূজা দিয়েছিল—তার মনোবাছনা পুরিয়েছিল মা। আমাদের অকালের দেশ—সাদা পদ্মই ভাল।

পরদিন ভোর ভোর এসে সে বেছে বেছে ১০৮টি ভাল পদ্ম তুলল নিজে। পদ্মের কাঁটায় যেন হাত ছড়ে যাচ্ছে। রক্ত পড়তে চায়। ডাঁটা শুদ্ধ ফুল—সর্বান্ত ফোটা নয়। আধফোটা—ফুটি ফুটি করছে এমন ফুল। আজ ডোবার জলে ফেলে রাখলে কাল সকালেই থোকা হয়ে ফুটবে।

জলখাবারের বেলা উতরে যায়। বনমালী ঘরে ফিরে এল। দুহাতে তার দুঝাড় পদ্ম। স্নান সেরে সিনান ভাত খেতে বসল—মাড়ভাত। খেলে ভাল ঘুম হয়। ইচ্ছে খেয়ে-দেয়ে একচোট ঘুম দিয়ে পড়ন্ত রোদটিকে মাথায় রেখে সে বেরবে চাদারিলা। তিনটি গায়ের পরের গাঁ—অখিল মিস্ত্রীর বাস। হালে সে নাকি পাকার বাড়ি হাঁকিয়েছে। দেখে অবাক হবে—।

এই ভেবে খেতে বসল বনমালী—নীলাভ মেঘবর্ণের পদ্মপাতা—আকাশ-পথের-মত সুনীল। যেন ভাত নয় সেই পদ্মপাতা থেকে শরৎকালের ভাসন্ত পেঁজা তুলোর মত মেঘ দারকা দারকা তুলে তুলে খাচ্ছিল বনমালী। আর যাবে কোথা—সেই অদৃশ্য আকাশমুখো বিষবান গোখরর ডাক শুনতে পেল সে। পদ্মরাগে পদ্মবিলাপ। যেন ভাত নয়। গোখরো সাপের ছোবলই খাচ্ছিল বনমালী।

এমন সময় আবিতুস বলল—আমার কাপড়টা ছিঁড়ে গেচে—কিনে আনবি বাপো—

হ্যাঁ মা আর দুদিন যাউ—

মায়ের জ্বর হইচে—

উ সেরে যাবে' খন—

শুনলি ত দাদা ইবার পার্টি ভোটে দাঁড়াবে। পঞ্চাতে জিতবে। আমাদের আর অভাব থাকবে নি—

সে ত ভাল কথা—উ গেল কুনদিকে—

সাইকেল লে শালবনী চলে গেল। বলেনি ত কিছুই। তুই কখন ঘুরবি—

সে সনঝা হয়ে যাবে রে মা—

লে তবে ঘুমি পড়—গড়িয়ে নে একটুন। দখিন দুয়ারে মাদুর পেতে দিই—

হাঁ মা দে। বালিশটা দিবি ত মাথায়—

দখিন দুয়ারে মাদুর পেতে একটা তেলচটা বালিশ এনে মাথার সিথানে ফেলে দিয়ে আবিতুস জগৎ সংসারের মানুষের মত চলে গেল চোখের সামনে থেকে।

দিন আর রাত্রির সন্ধিক্ষণ এই দুপুর। ঘুমের ভেতর বনমালী অলৌকিক দর্শন করল। সে দেখল রোজকার সকালে ভাতের পাতার সেই পদ্মগোখর সাপটিকে। পদ্মডোবায় নেমে সে যখন পদ্মগাছের গোড়ায় নিড়ন দিচ্ছে তখন

বাঁধের উপরকার অনন্ত নীল আকাশ মাছরাঙা পাখির মত নেমে এল আকাশ থেকে। সে দুহাত মেলে দিল জলের উপরিতলে, হাত ভেসে রইল পদ্মপাতার মত বিস্তীর্ণ হয়ে। গলা ডোবাল বনমালী। ঠোঁট ডুবল জলে—বাম নাকে, দক্ষিণ নাকে—ঈড়া পিঙ্গলায় হাওয়া বইছে। চোখ ওপরে তুলে একবার আকাশ দেখার চেষ্টা করল সে, কিন্তু চোখে পড়ল কপালের উর্দ্ধাংশ একটি পদ্মফুলের মত ফুটছে।

তারপর—। বনমালীর চোখ জলের তলের সঙ্গে এক হয়ে ছিল। আবার সে ওপরে তাকিয়ে নিজের মাথাটি দেখতে গেল। অমনি তার চোখে পড়ল—সেই পদ্মগোখরো হিলবিল করে এসে তার রক্তপদ্ম হয়ে ফুটে ওঠা মগজটিতে বারেবারে সজোরে দংশন করছে। ভয়ে আঁতকে উঠল বনমালী—অচৈতন্য হয়ে জলের তলায় যেন বিলীন হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরে এলে সে তাকিয়ে দেখল সেই সাপ চলে গেছে। মগজে দিয়ে গেছে তার বিষ। তাই রক্তপদ্ম লাল হারিয়ে নীল হয়ে ফুটে আছে।

আচমকা ভোজসভায়

অরুণ মিত্র

কে আমায় ডাকল
এই ভোজসভায় ?

আমি ক্ষেতের কত ফসল দেখেছি
অবাক হয়ে দেখছি কতরকম।
মানসম্ভ্রম আমি বুঝিনি,
শরীরটা আমার কে বাঁচায়
ভেবে আমি দিশেহারা সবুজে সবুজে সোনায়,
আমি অবুঝের মতো
পাকায় হোক বা কাঁচায় হাত দিতেই
রক্তের গন্ধ
যেন শিকার ধরার কল নড়ে যায়।

অথচ কিনে কেটে কারিকুরি করে উনুনে চাপালে
কিম্বা ঠাণ্ডা মেশিনে আদর খাওয়ালে
ভোল বুঝি এমন ধারাই পাল্টায়,
আমি তো চিনতেই পারছি না,
খুনখারাপির ফসল এত আহ্লাদী হয়
প্লেটের ওপর, ডিশের ওপর, বোলে।

আ কী ঝলমলে সন্ধে।
কালীপাহাড়ীর ফটক খোলা,
গন্ধে ভুরভুর বাতাস,

ঝাড়বাতির নিচে ওই টেবিলে সাজানো
একের পর এক কত যে চেনাই যায় না
ধুলো ধুয়ে শাপমন্যি ঝেড়ে অন্যরকম।
আমি ঢুকেছি আমি বেদম খাব।
আমি খাব কিন্তু বসব কোথায়,
কোথায় আমার চেয়ার,
কই পেয়ারের বুলি?

কে আমায় ডাকল এই ভোজসভায়?

মানুষ-কি জন্ম নেবে

মণীন্দ্র রায়

এত উচ্চাবচ আজ সময়ের পথ-পরিক্রমা
কখনো আশার চূড়া, কখনো-বা ছেঁড়ে অন্ধকূপে।
নিত্য তথ্য বুলেটিন—ঘোষণার নেই দাঁড়ি-কমা—
মানুষের মেধা, স্বপ্ন, বদলে যাবে রোবটের রূপে?
অথবা মানুষই তার উদ্‌গতির হঠাৎ ঝাঁকিতে
ছিটকে পেয়ে যাবে অন্য অন্বেষার প্রজন্মের সাধ—
দ্রুত বদলের রাশিপুঞ্জ ঈষানে নৈঋতে
হয়তো ডাস্টার দিয়ে মুছে ফেলবে পুরনো বিষাদ।

কিছুই আশ্চর্য নয়। কেনই-বা হবে? শস্য, ঘর
প্রাক-ইতিহাস থেকে মানুষেরই সৃষ্টির দলিল।
কতো দাবানল, কতো বিষখাদ্য, ভূকম্পে কবরে
পার হয়ে আবক্ষার উল্লম্ফনে তারা, মনঃশীল,
এসেছে একালে। হাঁটে স্নায়ু-শিরা তারের উপরে।
…মানুষ কি জন্ম নেবে রেশমকীটের রূপান্তরে!

সে-ই থেকে

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

হাওয়ার আকাশ ভাসে মেঘের ডানায়।
গা ছেড়ে দিয়েছে গাছ ফুরফুরে তুফানে
মাটি থেকে তুলে নিতে পা
মোটরটাযারে ঘষে সাঁ-সাঁ আওয়াজে
পিচের রাস্তার স্পিড্ ক্রমশ দুদ্দাড
ল্যাম্পপোস্ট ছিটকে যায় বিপরীত বেগে
যেন মাইলস্টোন
চৌখুপি আলোর চোখ বাড়ি-বাড়ি
সারি-সারি
ভারি অন্ধকারকে বলে, খালি বলে, গা-তোল গা-তোল।
কেবল আমার মন অন্ধকার বিশমণ পাথর।

অথচ আমার মনে হাওয়া ছিল একদিন
ফুরফুরে তুফানে ছিল খেলা
অথচ আমাব মনে গাছ ও আকাশ ছিল
ডানা ছিল
মোটররাস্তার দ্রুত গান ছিল মনে।
চৌখুপি আলোব চোখ এ-বাড়ি সে-বাড়ি
অন্য অনেকের মনে কাবও-কাবও মনে
কড়া নেড়েছিল সে-ই মন—
গা-তোল গা-তোল শব্দ টুপ দিযেছিল ডুব কোটবে গহ্বরে গর্তে
গিলে ফেলেছিল অন্ধ গভীব পাতকুযো
কযেকটা কুযোব ব্যাঙ দিয়েছিল অভিশাপ বুডবুডি কেটে।
এ-আকাশ ওই গাছ সে-ই থেকে গুনছে কালবেলা
অনন্ত উডন্ত বেগ আলো-হাওযা বুকে বযে বেডাচ্ছে পাথর
স্থাবব জবব অন্ধকাব।

এবং আমাব মন অন্ধকাব বিশমণ পাথব।

সুখের দেশে সুখে থাকো

গোলাম কুদ্দুস

হ্যালো ?
কাকে চাই ?
হ্যাঁ, আমি, কথা বলছি ?
কে ? পাঞ্চালী ?
এতদিন পর বাবাকে মনে পড়ল মা ?
কোথা থেকে ফোন করছিস ?
সানফ্রান্সিসকো ? না ? তবে ?
ও, তোরা নিউইয়র্কে এসেছিল ? বেশ।
আমরা কেমন আছি ? ভালোই আছি।
মা'র খবর চাইছিস ?
তিনি তো গতমাসে গত হয়েছেন।
হ্যালো ! হ্যালো ! চুপ করে গেলি কেন মা ?
কথা বল ! কাঁদছিস ! কেঁদে কী হবে মা ?
কী বললি ? একটাও খবর দিইনি কেন ?
তোর মা আমাকে মানা করেছিলেন যে,
তোদের সুখে ব্যাঘাত ঘটাতে চান নি,
সুখের দেশে তোরা সুখে থাকলেই আমাদের সুখ।
মা'র একখানা ফটো ? আচ্ছা, পাঠিয়ে দেবো।
কী বললি, এরপর নিয়মিত খোঁজখবর নিবি ?
তুই আমায় হাসালি পাঞ্চালী !
দেখবি বিং হয়ে যাচ্ছে, ধরার লোক নেই।

এই দিনে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

চতুর্দিকে জঞ্জালের স্তূপ যতোই সরানো যায়
ততো যেন আরো জমে ওঠে। টলমলে জল
কিংবা সেই জলে শ্বেত পদ্ম ভেসে যাওয়া

কেউ কি দেখেছে এই দিনে ? মনের ভিতরে
যতো আলো তার চেয়ে বেশী অন্ধকার,
যেন কী রকম এক সূচীভেদ্য ধূম্রজাল
সৃষ্টি করে আহত পৃথিবী। বড়ো আশা ছিল
অপসৃয়মান কালে দৃশ্যে দৃশ্যে নবীন উন্মেষ,
অথচ কেবল জমে শোকচিহ্ন, ধুলো কালি বালি।

এরকম সময়েই পথে পথে বাধার প্রাচীরে
মাথা ঠেকে যায়। মনে হয় সব কিছু কেড়ে নিয়ে তবু
কারা যেন আরো বেশী চায়, সংহতির চিহ্নগুলো
ধুলো হয়ে ঝরে ঝরে পড়ে। শোক একদিন
শেষ হবে কিন্তু ধ্বংস বড়ো ভয়াবহ যদিও প্রত্যহ
সূর্যোদয়ে সূর্যাস্তেও মানুষের নিবিড় মমতা
তুচ্ছ করে হিংসার ভ্রূকুটি। অবিরাম আত্মদানে
জেগে ওঠে লোকশক্তি, ভগ্নস্তূপে সংসার সাজায়।

দেখা হয় না

কৃষ্ণ ধর

দেখা হবার আশায় সারাদিনমান পথে পথেই কাটে
কখনো দেখা হয় না
এত বিরাট শহরে উত্তর থেকে দক্ষিণে, পশ্চিম থেকে পুবে
পথে পথে ক্ষ্যাপার মতন টহল দেওয়া
কখনো দেখা হয় না, দেখা হবার নয়।
কৃষ্ণচূড়া ফুটে ঝরে যায়, খর গ্রীষ্ম যায়
হেমন্তেও দেখা মেলে না তার।
কেন যে এই পথে পথে খোঁজা সেও ঠিক জানে না
কখনো কোনো দেয়ালে ভেসে ওঠে কোনো আঁকিবুকি

খুব নজর করে দেখে সে যদি মিলে যায় কোনো স্বাক্ষর
কত বর্ষার জল ধুয়ে নিয়ে গেছে পরিচিত সব চিহ্ন

ক্ষতস্থানগুলোতে তবুও প্রলেপ পড়েনি
এভাবেই কাটল গোটা দশক পথে পথে
দেখা হবার আশায়
কখনো দেখা হয় না, দেখা হবার নয়
নিরুদ্দিষ্টদের একজন হয়ে সেও বুঝি একদিন
এভাবেই হারিয়ে যাবে অগণিত মানুষের ভিড়ে
দেখা হয় না, দেখা হবার নয়

তবুও হিম ভোরে অবিচল সত্য হয়ে থাকে সূর্যোদয়।

প্রতীক্ষা, প্রাণের-ই খরায়

সিদ্ধেশ্বর সেন

তোমাকে পেয়েছি প্রাণের-ই খরায়
তাপিত জয়ে !

তাই কি আঁধার আষাঢ় এসেছে, শ্রাবণও
হৃদয়ে নেমে,

কেন আশ্বিনও তবে উন্মুখ, এই
নীলোৎপলের
দৃষ্টিকে নিতে এমন হেনে !

তোমার দ্বীপের নির্জনাশিলা পাথর-চূড়ায়
আমার মনস্কামনা—

কখনো কি ছিলে অনুর্বরে, বন্দিনী, নাকি
আমিই সঁপেছি
তোমায় বীজান্তরে

গ্রাস করে নিতে—
মরু-রাবণের সীমা

তোমাকেই পায়, হারিয়েও, তাই
হরধনুভাঙা পণের প্রতীকে
জ্বলদচি এ তনু

আকাশে ওঠায় তোরণ—
দুই কূলে এই দ্বন্দ্বে, সেতুবন্ধে, ফেরাতে
মর্ত্য প্রতিমা

বর্ণে-বর্ণে চৈতন্যের শিখরে, আদিগন্তে
বেঁধেছি আমার প্রতীক্ষা
—রামধনু ॥

কোনদিকে কোথায়

চিত্ত ঘোষ

এই এক মথিত ভীষণ দ্রুত গতিবেগ
দরজা ভাঙে, অনাবৃত করে কামজ সুখের দৃশ্য
কিংবা সেই খুনী রাগ তাকে হত্যা করে।
কেউ কেউ অন্ধকারে তাই সাপের ছোবল নেয়।
হাতের মুঠোয় আছে বাদামী শর্করা দানা
নকল ডাক্তার বসে সারাদিন প্রেসাক্রপসন
আর জাল ওষুধের সুনিশ্চিত প্রাতাক্রয়া জেনে
যুবক-যুবতীগণ নিবিড় উলঙ্গ হয়ে দর্পণের কাছে যায়।

শব্দের শরীরে এই সময়ের দাগ ধরে গেছে—
কোনদিকে কোথায় সেই আবশ্যক ঠিকানার খোঁজ
রাত্রিদিন দৃশ্য ও অদৃশ্য হাত ছাঁচগুলো ভাঙে।
রাস্তার ট্রাফিক জ্যামে নষ্ট সময়ের জন্য ট্রেন ছেড়ে গেল।
কতিপয় দুঃসাহসী অভিযাত্রী, পর্বতআরোহী
উঁচু থেকে নীচে পড়ে হাত পা ভেঙে প্রতিবন্ধী হয়।

সুপ্রাচীন ফটকের গম্ভীর ঘণ্টার শব্দ তবু কারা শোনে
প্রচ্ছন্ন পাতাল রেল ধরতে গিয়ে অস্থিরতা ট্রেনে কাটা পড়ে!

সে

তরুণ সান্যাল

কে কাকে কখন কেমন মানুষ বলে
অতি উৎসাহে, সে শুধু বয়সী ফিকির
ক্লাশে ভালো ছেলে সাত চড়ে নেই সাড়াও—
কিছু বালিকার মনেও ঝিকির-মিকির,
এবং কিশোরও, ডাকাবুকো, দেরী করে
ঘরে ফিরলেও ঘাড়-বাঁকা এক ঘোড়া,
গলির খেলায় চৌকোশ স্ট্রাইকার
দু-পায়ে পেলে বা মারাদোনা এক জোড়,
এবং যুবকও, দু-হাত আগুনে সেঁকা
ব্যাস্টিল শীতপ্রাসাদ তাকেই ডাকে
সাত সতেরোয় ভোলে না, সে এক পুরুষ
তারই বুকে মুখ তরুণী বয়স চাখে।

ব্যাস বা হোমার দেখতে শিখিয়েছিল
ট্রয়ে দেউরিতে কর্ণ না পাঁচ ভাই।
নাকি ট্রায়ারের ব্রজবালিকার পাশে
হেঁটে যেতে গেয়ে উঠেছে লা মার্সাই,
তারও বিঠোভেন বাখ রবীন্দ্রনাথ
শিষ্টরা যাকে বলেন ইনার লাইফ
মায়াকভস্কিরও সেথো, অর্থাৎ তারও
প্রবল বর্ষা বাদলের ড্রেন পাইপ,
এবং বুড়োও, পার্কে কখনো শোনে
চরিতামৃতর মহিমা বা পরিতাপ
আর ভাবে ঠিকই বয়সে শ্রীচৈতন্য
বেঁচেছেন নীল সমুদ্রে দিয়ে ঝাঁপ।

এবং হাটুতে ভারী হয় অমাবস্যা
ভেবেছিল হবে বাদামী ঘোড়ার সওয়ার,
তাই হাড়ে পাশা মটকায় পূর্ণিমা

খোযাবি ভাঙা, না খোঁয়ার ভাসানো জোযাব,
না কি হযে ওঠে দোমেটে পুতুল শুধুই
যে পুতুল ভেঙে দু পাঁচ পুতুলও গড়া
যারা একই সুর ইন্টারন্যাশনালে
যে যার মতোই ভরে নেয় মাঠো ঘড়া,
কে কাকে কখন কেমন মানুষ বলে
সাফল্য তাকে শোনায় এমন বাঁচাও
শিশুশিক্ষার খোলা বইয়ে রাখা চোখ
বিজলী চুলোয কাঁচা বাঁশে যার খাঁচা।

শ্মশানচণ্ডাল

সুনীলকুমার নন্দী

তোমার শরীরে, শরীরের প্রতিটি মুদ্রায়
মিশে যেতে-যেতে
আমি
কেমন অদ্ভুতভাবে অনুভব করি
স্রোতেব উজানে সেই ভোর, ভোরের বিস্তার, সোনারোদ
নরম শিউলির গন্ধে, কাশফুল
নদীর কিনার ব্যাপ্ত মাইল-মাইল, জলে
ভবাটান, খাল বেয়ে
বিলের সবুজে-মেশা আশ্বিনের নীল, পদ্মে
বোধনেব সুর,
ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ঘরে ফেরা, মিলিত উৎসব
ধরে-রাখা
চিকন পল্লবে-ঘেরা আমার মাযেব মুখ,
শীতল গভীব—
আগুনে ভাসিয়ে দিয়ে, শ্মশানচণ্ডাল
আমি
খুঁজে পাইনে দীর্ঘদিন তেমন আশ্রয়, কোনো ভূমি।

দিগ্বিজয়ের পতাকা

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

যখন দিগ্বিজযেব পতাকা হাতে ছিল
সবাইকে নতজানু হতে দেখেছিলে
বৃক্ষশীর্ষে নদীজলে শস্যক্ষেত্রে বা গৃহস্থেব কুটিবপ্রাঙ্গণে
সূর্যালোকের ক্রমবিস্তাবই কি
এই দিগ্বিজযের অগ্রদূত ?

পার্বত্যএলাকা বা সমতলভূমিতে
অশ্বাবোহণে যখন চলমান
তখন অশ্বেব খুবেব শব্দ বা হ্রেষাধ্বনি
নির্জন প্রান্তবে সরব হলে
সেও কি দিগ্বিজযেব সূচনা ?

শ্বাপদসঙ্কুল অবণ্যে গাঢ পত্রাচ্ছাদিত বৃক্ষছাযাব
দৃষ্টিহীন অন্ধকাব সডকেব দুটি পাশে
ভযঙ্কব অবণ্যপ্রাণীদেব ভীতিপ্রদ কণ্ঠস্বব
তখনও অশ্বাঢ ভূমি, আব
নিষ্কম্প কণ্ঠের বাচালতা দিগ্বিজযেব ঘোষণা ?

এখন সূর্য নামে পাটে
নিস্তবঙ্গ জলে চলে খেযা পাবাপাবের তবী
আকাশেব পক্ষপটে শেষ পাখিরা ক'টি কালো বেখা মাত্র
তুমি ইতিমধ্যে নিজেই নতজানু
দিগ্বিজযেব পতাকা নিক্ষেপ কবেছ অদূবে বৃক্ষশীর্ষে
অসংখ্য পত্রেব আডালে
নিজেই পল্লব হযে আত্মগোপন কবেছে পবিশেষে।

পরিক্রমা

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

যে জীবন আমি চিনি, জানি,
তার ফুল আর কাঁটাভরা ডালগুলো মাঝে মাঝে আছড়িয়ে পড়ে
একটু চমকে যাই, কেঁপে উঠি, তবু ভালো লাগে।

চলেছি তো ভুবনরেখার আড়াআড়ি—
হাজাক লণ্ঠন তুলে
কেউ কেউ প্রশ্ন করে : কোথা থেকে এলে ?
এসেছি যে রাতনিশুতের মাঝামাঝি
চাঁদের গহ্বর থেকে একমুঠো আলো হাতে নিয়ে,
সেই কথা বলি।

আমি যা কখনো টের পাইনি স্নায়ুতে,
অনুভবে, মেধায়, মননে,
তাকে আমি জানাবো কী ক'রে ?
লতাগুল্মময় বন, তারপরে বাঁধানো সড়ক, তারপর
মাঠের ওপরে সব বেঁচে থাকবার ঘরবাড়ি—

এতেই তো হবে মনে হয়।
এখনো জানি না, তবু জীবনের মাঝ দিয়ে দৌড়ে চ'লে যাই॥

জাহাজি সংবাদ

শিবশম্ভু পাল

কবিতা কজন পড়ে ? বিশেষত আবর্তের রঙিন সংকট—
এই হিংটিংছট

আবর্ত স্রোতের গল্পে, ছিটকে যায় পাতালের রাঘববোয়াল
হয়তো দু-একটা ক্রোধ, দু-একটা সুখী অন্তরালে।

আদার ব্যাপারি যারা, কী হবে জাহাজ নিয়ে মাথাব্যথা ক'রে ?
আবর্ত দূরেই ছিল খরোষ্ঠী অক্ষরে।

অথচ ঘটনা এই, মাছের সাঁতারে, জয়ে-পরাজয়ে, ক্ষোভে
হিস্তা আছে তোমাদেরও লোক-উৎসবে।

এ বং ঘটনা হচ্ছে, জাহাজের খবর বলতে যা তোমরা বোঝ
জানো তার সঠিক ওজন ?

কী করে জানব বলো, অনন্ত বর্ণাভিজাত্য, সে দোষ আমারই,
মূলত আমিও কিন্তু আদার ব্যাপারি।

এখন গ্রহের ফেরে আবর্তের বর্ণমালা প্রাকৃতে বদলায়—
সরে এসো জাহাজঘাটায়।

রক্তে, জন্মদিনে

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

বাঙময় শাখায় ডালে সম্পূর্ণ ঐ গাছ
মর্মরিত বাহু ও শরীরে মনে তুমি গোটা নারী।
তোমার বাড়ির নিচে ফুটপাতে করি পায়চারী
সন্তর্পণে। তবুও দুপায়ে—রক্ত-মাখামাখি কাঁচ।

রক্ত কিছু নয়, রক্ত তোমারও ভিতর ঢালি রোজ,
তা তো রক্তকরবীর মতো লাল শিমূল পলাশ
যেমন আশ্চর্য সূর্যে জ্বলে-ওঠা মানুষের লাশ
চেনা যায়, যারা কালই হয়েছিল হঠাৎ নিখোঁজ।

এ পৃথিবী যা, তোমার মতো লাগে—গোধূলিজগৎ,
কিংবা অন্তরৌদ্রে ছেঁড়া বাঙামেঘ প্রথম কিশোরী,
যার লজ্জাবস্ত্র আমি দুই হাতে আগ্‌লিয়ে ধরি—
ও-রক্ত আনন্দে মুক্ত জননীর মতন মহৎ।
যুদ্ধে দিই রক্ত, দিই প্রেমে গুপ্ত রক্তের সাগর।

শব্দের কঙ্কাল নয়, নেমে এসো মুখের ভাষায়
চুম্বনে মৃত্যুর মাটি কামড়ে বাঁচি তোমার আশায়—

তুমি সে রক্তের ডাক সারারাত রক্তে কোজাগর।

বলছো এখন

মানস রায়চৌধুরী

আমার শুধু ঘরের দেওয়াল শেওলা-পড়া দাওয়া
মাথার ওপর ঝুরঝুরঝুর শুধু বালির পতন
সারা শরীর মেলে ধরেই সে সব দেওয়া নেওয়া
ভাঙা দেওয়াল, আমার শুধু দৃশ্যে অচেতন।

জানালা দিয়ে যেটুকু রোদ বিছানা দেয় ধুয়ে
সেইটুকু তো পরিচ্ছন্ন বাদবাকি সব নোংরা
তুমি আমায় নরম হাতে গিয়েছ হাড় ছুঁয়ে
রক্তে এখন শুধু বাজে মাদলে তালডাংরা।

তালডাংরা শাল মহুয়া ছাড়িয়ে মানভূম
বুকে কাপড় জড়িয়ে হাঁটছে হাটের বৌঝি
আমার দিকে ফিরবে যারা তাদের কুমকুম
দুই ভুরুর মাঝে জ্বলছে দীপ্ত জলদর্চি।

আমার শুধু মাটির দেয়াল, আমার ভাঙা কুয়ো
জলের মধ্যে মুখের ছায়া দেখতে লাগে ঘোর
অতঃপর আলিঙ্গনে ফিরবে ওকি, ও
তালডাংরা মুণ্ডাপাড়ায় এখন ভীষণ সোর
সে সোরগোলে বিপর্যস্ত বিদায় হবে গৃহী
অসংকোচ শরীর ছুঁয়ে বলছো, এখন ছিঃ!

লাল-নীল রঙ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাঙা কাঁচবোতলকাগজ-বিক্রিবির ডাক নিয়ে যেতে যেব কাশির দমক।
কাশতে কাশতে বসে পড়ছে, লাল-নীল রঙ ধরে ধরে উঠছে মুখখানা।
এইটুকু রঙিণ ছবির মাথা-পাশ ছিঁড়ে বয়ে উঠল দশমুখো গান।
খোলা খোয়া-পিচে ঘা দিয়ে ঘা দিয়ে উঠছে তার বেলোয়ারি।

পেরিয়ে যেতে গিয়ে পুরোনো কাগজের মতো পড়্‌পড়্‌ করে ছিঁড়ে পড়ল
আস্ত গাছতলাখানা—এমনি একা হয়ে তবে কোথায় যাই এখন?
গান আর কাশির দমকে মিলে একটানা ঘন ক্ষুব্ধ রঙ।
ভাঙা কাঁচবোতল কাগজের আগাগোড়া মূর্তি গোটো হয়ে বসে আছে—

চুল যেন কাঁচকাগজের শিষ, লাল-নীল রঙে মুখ ভর্তি।
গোপন হয়ে হয়ে বলছে, মারো, মারো—এক বেঘত গলির লক্‌আপে
দাগা দিয়ে ভরে রাখো আস্ত গাছতলাটুকু ছিঁড়ে,
যত মারো, দশমুখ গানের ভেতরে আমি লাল-নীল রঙ হয়ে যাই।

দোয়েল, তোর গান

রণজিৎ সিংহ

আকাশের প্রথম আলো তোর। আলোয় ফুটে ওঠা
গাছপালা তোর। নদীর পাড়ের ঢেউয়ের আলতো শব্দ তোর।
আর এই ফুল, এও তোর। তোরই গানে জেগে উঠল
পৃথিবী। আমাদের সুন্দর পৃথিবী। কোথাও কোনো দুঃখ
নেই। পৃথিবী ভরে, দোয়েল, তোর গান।

আমার সন্ধান

অতীন্দ্র মজুমদার

সারাজীবন ধরে আমি খুঁজি একটা সূর্যমুখী ফুলের চারা
আমার বুকের বাগানে রোপণ করবো ব'লে।
বাগানের মাটি শুকিয়ে-যাওয়া সমুদ্রের নুনে পোড়া

তবুও তার ফুলে-ওঠা হলুদের গায়ে হাত বুলিয়ে দেবে
উজ্জ্বল আকাশের বিশুদ্ধ নীলিমা।

দেখো, এখন ঝাপসা সময় ধীরে ধীরে স্বচ্ছতার দিকে এগোয়
শরীরের বসনা পান ক'রে নিতে চায়
নিরন্তর বয়ে-যাওয়া সংগ্রামের মন্থনে লব্ধ অমৃত,
ছায়াপথের অরণ্যে জ্বলে নক্ষত্রের দাবানল
রাতের হাওয়ার ঝাপটা তাকে ছড়িয়ে দেয়
গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে

সূর্যের আলোর শুশ্রূষা আস্তে আস্তে মুছে দেয়
জীবনের সব যন্ত্রণায় আহত ক্লিষ্ট মুখ
মার-খাওয়া যৌবন আবার নিয়ে আসে
মাঝরাতের কর্পূরের গন্ধ
প্রত্যূষের গুহা থেকে উড়ে আসে হাজার হাজার প্রজাপতি

এখন আমি খুঁজি সেই হরিৎ দ্বীপের জ্বলন্ত সূর্যমুখী
যার পাপড়িতে গর্জন করে
তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত হা-ঘরে শিশুর
প্রতিবাদী মুখ।

পাতালগঙ্গা

অমিতাভ দাশগুপ্ত

এক তীরে মাটি চৌচির করে তুলেছি পাতালগঙ্গা—
তৃপ্ত হবে না, তৃষ্ণা?
এ জল কুমারী—যুযুধান লাখো মানুষের
ঘামে অশ্রুতে রক্তে ফেনিল নয়,
একে পান করো
যতক্ষণ না নেমে আসে মহামরণ
প্রবীণ শান্ত ঘোর পিঙ্গলবরণ।

পিতামহ, দুটি চোখ মেলে চাও,
ছাখো, আমাদের গাণ্ডীব
শায়কে ছোটায় খরার মাটিতে বন্যা,
বধিরের কানে তোলে টংকার,
মূকের কণ্ঠে ভাষা,
পাথরের বুক ভেঙে হানে জিজ্ঞাসা।

দুই কষ বেয়ে রক্ত গড়ায় তাতে মেশে সূর্যাস্ত,
দাউ দাউ জ্বলে ওঠে শেষ শরশয্যা,
হাড়সার দেহে, জীর্ণ অস্থিমজ্জায়
আমরা এখনো রণক্ষেত্রে,
হেরে যাবো বলে আসিনি,
বাঁ হাতেও পুজো দিইনি মোহনডাকিনীর,
বিকোইনি চড়া নিলামের হাঁকে
পাঁচে না দশে না বিশে না,
একটানে মাটি চৌচির ক'রে তুলেছি পাতালগঙ্গা—
শান্ত হবে না, তৃষ্ণা?

প্রত্যয়

রঞ্জন ধর

৩

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে বিছানায় নরেশকে না দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে পলা। একটু অপেক্ষা করে উঠে পড়ে। দরজাটা খোলা, মুখ বাড়িয়ে বারান্দায় লক্ষ্য করে। নরেশ বারান্দার মেঝেতে বসে কপাল চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। আহা রে! কী অসহায় বুকভাঙা কান্না। মুহূর্তে পলার বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। সহ্য করতে না পেরে সে ছুটে গিয়ে নরেশের পাশে মেঝেতে বসে পড়ে। তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেও কেঁদে ফেলে।

'এভাবে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।' এক সময় নরেশ বলে।

'তুমি অত হতাশ হচ্ছ কেন', পলা শাড়ির আঁচল দিয়ে নরেশের চোখ মুছে দিয়ে বলে, 'ঠিক একটা-না-একটা উপায় বের হবে—দেখো তুমি। দুঃখকষ্ট কারুর জীবনে চিরদিন থাকে না।'

'মিথ্যে আশা।' মরীয়ার মত শোনায় নরেশের কণ্ঠস্বর, 'বাঁচার কোন পথ নেই।' তার দৃষ্টি সরাসরি পলার চোখে। ভয় পেয়ে যায় পলা। অমন ক্ষ্যাপাটে চাউনি সে আর কখনও নরেশের চোখে দেখেনি।

তবু সান্ত্বনা দেয় পলা। বলে, 'আশাটুকু বাদ দিলে আর যে কিছু থাকে না।'

'তিনদিন তুমি কিছু খাওনি, ভুলে গেছ?' নরেশ বলে।

'তাতে কী হয়েছে, এতে এখন আমার আর কষ্ট হয় না।'

'কিন্তু আমার হয়। নিজের অক্ষমতার জ্বালায় আমি মরে যাচ্ছি। আমার একটা মাত্র মেয়ে, তার কী অবস্থা হয়েছে—' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ে নরেশ।

পলা বুঝতে পারে, নরেশ তার মনের সব জোর হারিয়ে ফেলেছে। এখন সে-ও যদি তার মত ভেঙে পড়ে, তাহ'লে পাপুর যে কোন ভবিষ্যৎ থাকবে না।

নরেশ বলে, 'পলা, তুমি পাপুকে নিয়ে তোমার দাদার কাছে চলে যাও। এখন মান-অপমানের কথা ভেবে লাভ নেই।'

তুমি?'

'আমার কথা ভাবতে হবে না।'

'না, তা হয় না। এর চেয়ে না খেয়ে এখানে থেকে একসঙ্গে মরব।'

পলা নরেশের একটা হাত চেপে ধরে। একজনের হাতের উত্তাপ আর একজনের দেহে সঞ্চারিত হতে থাকে। দুঃখকষ্টের অতলে নেমেও সহমর্মিতা আর একাত্মতার গভীর অনুভূতি নিয়ে দুজন সংলগ্ন হয়ে বসে থাকে।

পলা বুঝতে পারে তাকে আর নিশ্চেষ্ট থাকলে চলবে না। সেটা বুঝতে পেরেই সে শান্তির মাকে সব খুলে বলেছে। আশ্বাসও পেয়েছে তার কাছ থেকে।

দু'বছর নরেশের ফ্যাক্টরি বন্ধ। এই দুটো বছর যে কেমন করে কেটেছে! ধীরে ধীরে হারিয়েছে তারা সর্বস্ব। তবু পলার একটি মাত্র আশা, যদি আবার ফ্যাক্টরি খোলে হয়ত সব ফিরে পাবে সে। প্রথম প্রথম নরেশ বাইরে থেকে এসে বলত, 'মনে হচ্ছে এবার খুলবে, আসছে সপ্তাহে মালিকের সঙ্গে মিটিং আছে।' এমনি কত মিটিংয়ের কথা হল, কিন্তু মিটিং নাকি হয়নি, ফ্যাক্টরিও খোলেনি দু'বছরের মধ্যে। আর কি খুলবে? নরেশ নিজেই এখন সন্দেহবাদী হয়ে উঠেছে। চুপচাপ বসে থাকে, কী যেন ভাবে দিনরাত। ভয় হয় পলার, কারণ তার কানেও খবরটা পৌঁছেছে। নরেশের সঙ্গেই কাজ করত ঘোষবাবু, তিনি নাকি আত্মহত্যা করেছেন।

মানুষ একনাগাড়ে ক'দিন উপোস করতে পারে? বিশেষ করে পাপুর মত আট বছরের একটা বাচ্চা মেয়ে! প্রথমদিকে খুব কান্নাকাটি করত। ঘরে কেন খাবার নেই এটা তাকে কিছুতে বোঝানো যেত না। পরে অবিশ্যি সে তার নিজের মতন করে কিছু বুঝে গেছে। মাঝে মাঝে বলত, 'মামণি, আমরা বড্ড গরীব হয়ে গেছি—তাই না?' সে তো দেখেছে, কেমন করে

ঘরের অনেক আসবাব, গয়নাগাটি, রেডিও, হাতঘড়ি সবই বিক্রী হয়ে গেছে। এখন আর বিক্রী করার মত কিছু নেই।

শেষটায় আগের বাড়িটাও ছাড়তে হল। আড়াইখানা ঘরের খোলামেলা বাসা ছেড়ে এখন বস্তীর এই একঘরের বাসা—এসবেসটসের ছাউনি, ইলেকট্রিসিটি নেই। ভাড়া আশি টাকা, তা-ও বাকি পড়েছে তিনমাস। প্রথমদিকে এই বাসায় মানিয়ে নিতে কী কষ্টই না হয়েছে! ঘরের সামনে কাঁচা ড্রেন, চার-পাঁচ ঘর মিলে একটা পায়খানা। পাপুকে নিয়েই সমস্যা, সে এসেই কান্না জুড়ে দিয়েছিল—'এ নোংরা বাসায় থাকব না।' তার বাবা তাকে বোঝায়—'মামণি, লকআউট উঠলে আবার আমরা আগের বাসায় ফিরে যাব।' মেয়ে কিছুতেই মানতে রাজি নয়, তার চিৎকার—'কেন লকআউট উঠছে না। ওকে উঠতে বল, আমরা ভাল বাসায় ফিরে যাব।' ওর ধারণা লকআউট একটা মানুষ। বেশ কয়েক রাত্রি পলার নিজেরঘুম হয়নি। পরে অবিশ্যি সবই গা-সহা হয়ে গেছে। মানুষ অবস্থার দাস—কথাটা বোধহয় খুব সত্যি। নইলে বস্তীর পরিবেশে থাকার কথা কি পলা কখনো ভাবতে পেরেছে।

নরেশ মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে বলে, 'ফ্যাক্টরি আর খুলবে না। কিছু টাকা পেলে ব্যবসা করব।'

কিন্তু টাকা সে পাবে কোথায়? এই দু'বছরে তো ধারকর্জ কম হয়নি। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন কারুর কাছ থেকে নিতে বাকি নেই। এখন আর কেউ ধার দেয় না। যদি দেয়, সেটা ধারের নামে ভিক্ষা। তারা জানে, নরেশ আর কোনদিন ফেরৎ দিতে পারবে না।

একদিন নরেশ বাড়ি ফিরে জানাল তার বন্ধু সঞ্জীব এই সময়ে তাকে একটু সহানুভূতি পর্যন্ত দেখাল না। তার মানে আর একদিন উপোস।

নরেশ বুঝতে পারে না যে, এটাই স্বাভাবিক। এখন তার সঙ্গলাভের মধ্যে আনন্দ নেই। উল্টে সবাই ভয় পায় কখন সে তাদের কাছে টাকা চেয়ে বসে। অতএব এখন তাকে তারা এড়িয়ে চলতে চাইলে দোষ দেওয়া যায় না। ঠিক এই জন্যই পলা তার দাদার বাসায় যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাদা কিছু বলার আগে বৌদিই সংসারের অনটনের গাওনা গাইতে শুরু করে দেয়। কারণ বৌদিরও ভয়, সে হয়ত টাকা চেয়ে বসবে। এ পাড়ায় আসার পর, একদা আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবের যে-সমাজে সে বাস করত, সেই সমাজ থেকে সে ছিটকে সরে এসেছে। এরা এখন আর সেই সমাজের কেউ নয়।

কিন্তু নিজেরা আজ বিত্তহীন হয়েও পারছে না এই বিত্তহীন পাড়ার মানুষজনের সঙ্গে নিজেদের মেলাতে। প্রথমদিকে একটা মিথ্যে অহমিকা আর আত্মগরিমার মুখোস পরে থাকতে হয়েছে। নিজেদের দুরবস্থা যতটা চেপে রাখা যায় প্রতিবেশীদের কাছে। কিন্তু তা কি সম্ভব? দারিদ্র্য গোপন রাখা যায় না। ক্রমে সবাই জেনেছে, আর পলার পক্ষে সেটা ভালই হয়েছে বলতে হবে। পলা জানত না যে, তার ঘরে রান্না হয় কিনা, পাপুর খাওয়া হল কিনা, সেই ব্যাপারে পাশের ঘরের ভাড়াটে শান্তির মা'র নজর ছিল।

'মাগো, ভিতরে আসবাম?'

বাইরে থেকে শান্তির মা'র ডাক শুনে বিছানায় উঠে বসে পলা।

'এস, শান্তির মা।'

পলা তাকে এ-ভাবেই সম্বোধন করে। সে-ও তার মত আশি টাকা ভাড়া দিয়ে থাকে এ-বাড়িতে, তবু তাকে 'আপনি' করে বলতে পারেনি পলা। কারণ, সে জানে, শান্তির মা অশিক্ষিত, তাছাড়া পেশায় ঝি। শান্তির মাও এইজন্য কিছু মনে করে বলে মনে হয় না পলার। সে যেন এতেই অভ্যস্ত।

শান্তির মা ভিতরে আসে। একটি ইতস্তত করে বলে, 'মাগো, দুঃখকষ্ট কী জিনিস আমি জানি। জীবনে অনেক দুঃখকষ্ট সইছি। দেইখ্যেন আপনের কষ্টও খাইকব না।' এটুকু ছিল তার ভূমিকা। এরপর এক কেজি চাল ও আধ কেজি ডাল-এর দুটো প্যাকেট পলার সামনে রেখে বলল, 'এরে রাইন্ধা মাইয়াডারে খাওয়ান, আপনেরাও খান।' পলা স্তব্ধ হয়ে শান্তির মা'র মুখের দিকে তাকিয়েছিল, আর তার দু'গাল বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এসেছিল চোখের জলের ধারা। শান্তির মা বলে, 'কাইন্দেন না, সব ঠিক অইয়া যাইব।'

শান্তির মা রেল লাইনের ও-পাড়ে ফ্ল্যাট বাড়িগুলিতে কাজ করে। স্বামী নেই। এক মেয়ে। তার রোজগারে দু জনের সংসার কোনপ্রকারে চলে যায়। শান্তির মা-ই একদিন বলেছিল, 'তিন বছরের মাইয়াডারে বাইথ্যা মানুষডা চইল্যা গেল, হেই থাইক্যা আমি অরে মানুষ করতাছি। অখন বার বছরে পা দিল।'

শান্তির মা যে-দায়িত্ব পালন করছে, পলা তো তা পারছে না। নরেশের ঘাড়ের ওপর সে যে বোঝার মত চেপে রয়েছে! আজ যদি নরেশের কিছু ঘটে (ভগবান না করুন), তা হলে? শান্তির মা-এর মত পলা কি পারবে পাপুকে মানুষ করে তুলতে? এই স্কুলফাইনাল পাশ বিদ্যে তার কোন্ কাজে

লাগবে? সত্যি ভদ্রলোক হবার অনেক বিপদ। নরেশের অফিসের নিচু পদের ওয়ার্কার শিবরাম এ-পাড়াতেই থাকে। সেই খুঁজে দিয়েছে বণ্ডেল গেটের পাশের বস্তীতে এই ঘর। লকআউট হবার পর শিবরাম মেট্রো রেলে মাটি কাটার কাজ করছে, আর তার স্ত্রী ঘুঁটে বানিয়ে বিক্রি করছে। তারা অন্তত খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। কিন্তু ভদ্রলোক হয়ে নরেশ যেমন মাটি কাটতে পারে না, তেমনি পলাও পারে না ঘুঁটে বানাতে কিম্বা অন্যের বাড়িতে কাজ করতে।

একদিন পলা হেসে শান্তির মা-কে বলেছিল, 'দাও না আমাকে তোমার মত কোন বাড়িতে একটা রান্নার কাজ জোগার করে।'

তৎক্ষণাৎ শান্তির মা জিভ কেটে জবাব দিয়েছিল, 'কী যে কন মা, লোকের বাড়িতে কাজ করবেন আপনে।'

একদিন পলা শান্তির মাকে ডেকে বলল, 'শান্তির মা, তুমিই বল, আগে তো খেয়ে বাঁচতে হবে। আমার ভদ্রলোকী পরিচয় কি আমাদের খেতে দেবে? আমার স্বামী আমার সন্তান না খেয়ে মরে যাবে, অথচ আমি কিছু করব না?'

রাত বোধহয় ভোর হয়ে এলো, তখনও পলার হাতের মধ্যে ধরা রয়েছে নরেশের হাত। পলা অনুভব করে, এই কঠিন দারিদ্র্যের মধ্যেও তাদের হৃদয়ের ভালবাসায় টান পড়েনি, কেমন করে একজন আর একজনকে সুখী করবে, এর জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকার করে নিতে তারা প্রস্তুত।

পলা বলে, 'ঘরে চল। রাত শেষ হয়ে এলো, একটু ঘুমিয়ে নেমে।'

নরেশের হাত ধরে সে তাকে নিয়ে ঘরের মধ্যে যায়।

দু'তিনদিন বাদে শান্তির মা এসে খবর দেয়। একটা কাজের সন্ধান পাওয়া গেছে। ছোট সংসার—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই কাজ করে, আর একটি কয়েক মাসের বাচ্চা। রান্না এবং অনুসময় বাচ্চার দেখাশোনার কাজ। সন্ধ্যার পর স্ত্রী অফিস থেকে ফিরে এলে ছুটি।

একটু সঙ্কোচের সঙ্গে শান্তির মা বলে, 'রান্না-খাওয়া সাইরা বাড়ি ফিরতে রাইত আট্‌টা অইব। আপনে কি পারবেন? তা অইলে আইজ চলেন, কথা কইবেন। ললিতাদি লইয়া যাইব।'

'ললিতাদি কে?' জিগ্যেস করে পলা।

'হে-অ কাজ করে। এক বাড়ির ছাইলা রাখে। হে-ই খবরটা দিছে।'

পলা সঙ্কল্প ক'রে, এখন থেকে সে-ই সংসারের হাল ধরবে। আর দ্বিধা-

সঙ্কোচ নয়। নরেশকে এখনই সে জানাতে চায় না, আগে তো সব ঠিক হোক।

বিকেলে শান্তির মা'র সঙ্গে এসে একটা পার্কের মধ্যে অপেক্ষা করে পলা। আশে-পাশে অনেক ছেলে-মেয়ের কলকোলাহল। অনেকগুলি পেরাম্বুলেটারে করে শিশুদের নিয়ে এসেছে তাদের বাড়ির কাজের মেয়েরা। পলাকেও কি এমনি ক'রে পেরাম্বুলেটার ঠেলে পার্কে আসতে হবে রোজ?

শান্তির মা বলে, 'অই ললিতাদি।' তার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে পলা দেখতে পায় একটি বছর পাঁচেকের শিশুর হাত ধরে এক প্রৌঢ়া বিধবা পার্কের গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকছে। শান্তির মা'র সঙ্গে পলা এগিয়ে যায়।

দশতলা বাড়ির সামনে এসে ওরা দাঁড়ায়। লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা করে। সঙ্গের বাচ্চাটিকে শান্তির মা'র কাছে রেখে ললিতা পলাকে নিয়ে এসে লিফ্‌টে চড়ে। পাঁচতলায় লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের সামনে এসে কলিং বেল টেপে ললিতা। দরজা খুলে যায়। তাদের সামনে দাঁড়ানো এক বিবাহিতা সুশ্রী মহিলা। হয়ত পলার সমবয়সীই হবে।

'বৌদি, এই এর কথা বলেছিলাম আপনাকে।' ললিতা তার পিছনে দাঁড়ানো পলাকে দেখায়।

মহিলার দু'চোখে একটু বিস্ময়। তার অপলক দৃষ্টি পলার মুখে। পলা চোখ নামায়, এভাবে তাকে কী দেখছেন মহিলা! গত দু'বছরে তার নতুন শাড়ি কেনা হয়নি। ঘরে পরার শাড়িই তার পরে আসা উচিত ছিল, কিন্তু একখানাও আস্ত নেই, কেমন ক'রে পরবে? তাই আলমারি থেকে একটা পুরনো ভাল শাড়ি বের করে পরতে হয়েছে। এটাই বোধহয় ভদ্রমহিলার কাছে বিসদৃশ ঠেকছে। তাই চেষ্টা করেও ভ্রূকুঞ্চন গোপন করা সম্ভব হয় নি।

'তোমার নাম কী?'

মহিলার আকস্মিক প্রশ্নের ধাক্কায় পলা সচকিত হয়। মুহূর্তে নিজেকে সে সামলে নেয়। সে এসেছে ঝি-এর কাজে ইনটারভিউ দিতে,তাকে গৃহকর্ত্রী 'আপনি' সম্বোধন করবেন, তা-ই বা কেমন ক'রে সম্ভব? পলা কি নিজে কখনো তা করেছে?

'পলা।'

ইচ্ছে করেই উপাধিটা অনুক্ত রাখে সে। আবার ভ্রূকুঞ্চন! বোধহয় মহিলার কাছে তার নামটাও ঠিক ঝি বা রাঁধুনীর মানানসই হয়নি। আগে খেয়াল হয়নি, তা হ'লে দামিনী বা কামিনী বললেই চলতো। কিন্তু তার

চেহারা! কথা বলার ধরন! এ-সবের মধ্যে তার যে গোত্রপরিচায়ক ছাপ রয়েছে, তা কি সে অত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে পারবে?

এবার মহিলার সরাসরি প্রশ্ন, 'ললিতার কাছে কাজ সম্পর্কে শুনেছ নিশ্চয়। পারবেতো করতে? ভেবে দেখ।'

'হ্যাঁ, পারব। না পারলে আপনি রাখবেন কেন?'

'টাকার ব্যাপারে যা বলেছি, আপত্তি নেই তো?'

জোর ক'রে সঙ্কোচ কাটিয়ে পলা বলে, 'বড্ড কম বলেছেন। এত কমে পারবো না।'

'তুমি কত চাও?'

'দু'শো।'

মহিলা ললিতার দিকে তাকায়। ললিতা বলে, 'আমি তো আপনাকে বলেছিলাম বৌদি, এর কমে পাবেন না। ছেলে রাখা আর রান্নার আলাদা লোক রাখতে গেলে আপনাকে আরো বেশি দিতে হবে, তার ওপর দু'জনের খাওয়া খরচ। জামা-কাপড়। তাছাড়া ভাল লোক পাওয়াও কম কথা নয়। এ ভাল ঘরের বউ, নেহাত কষ্টের মধ্যে পড়ে কাজ করতে চাইছে।'

'সে আমি বুঝতে পেরেছি।' মহিলা মৃদু হেসে পলাকে বলে, 'ঠিক আছে, এই, টাকাই পাবে। তুমি কবে থেকে আসতে চাও?'

'যেদিন বলবেন। কাল থেকে আসবো?'

'তাই এসো।'

সন্ধ্যার পর শান্তির মা'র সঙ্গে পলাকে ফিরতে দেখে নরেশ একটু অবাক হয়। তার ধারণা হয়েছিল পলা একাই হয়ত কোন আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে।

'কোথায় গিয়েছিল?' নরেশ জানতে চায়।

'আগে খেয়ে নাও, পরে বলবো।'

কিন্তু মুশকিল বাধাল নরেশ। সব শুনে সে ক্ষেপে আগুন।

'তুমি কি ভেবেছ আমি মরে গেছি? আমাকে এভাবে অপমান করার সাহস তুমি পেলে কেমন ক'রে?'

'এর মধ্যে অপমান কীসের?'

'অপমান নয়? তুমি করবে ঝি-এর কাজ, আর আমি তোমার সেই রোজগারের টাকায় খাবো?'

'কেন, ঝি-এর কাজটা অন্য কাজের তুলনায় ছোট কীসে?' পলা এগিয়ে

এসে নরেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবার বলে, 'তুমি অত অবুঝ কেন? তোমারও তো একজন মালিক রয়েছে, তুমি তার ফ্যাক্টরিতে কাজ কর, তেমনি আমিও একজন মালিকের বাড়িতে কাজ করব। তোমার কাজে যদি লজ্জা নেই, আমার কাজে থাকবে কেন? তোমার অফিসের কাজের বিদ্যে আছে, তেমনি আমার যে-রকম বিদ্যে আমি সে-রকম কাজই করব।'

নরেশ শান্ত হয় না, বরং আরও রেগে গিয়ে বলে, 'বেশ, কর। কিন্তু মনে রেখো, আমি না খেয়ে মরব, তবু তোমার ঝি-গিরির টাকায় খাব না।'

ব্যাপারটাকে নরেশ অমন প্রেস্টিজের বিষয় ক'রে তুলবে ভাবতে পারেনি পলা। এ তার নিতান্ত রক্ষণশীল মানসিকতা। এই দুর্দিনে পলা সংসারের হাল ধরতে চাইছে বলে কি তার পৌরুষ ক্ষুন্ন হচ্ছে? না কি তার স্ত্রী ঝি-এর কাজ করতে চাইছে বলে জাত যাবার ভয়! কিন্তু পলার পক্ষে আর পিছু হটা সম্ভব নয়। কাজটা যাই হোক, জীবনে এই প্রথম এক নতুন আত্মবিশ্বাসের আস্বাদ সে পেয়েছে এই কাজটাকে উপলক্ষ ক'রে। এতকাল সে ভেবে এসেছে তার নিজস্ব কোন সত্তা নেই, পরগাছা উদ্ভিদের মত নরেশের ওপর নির্ভর না ক'রে সে বাঁচাতে পারে না তার নিজস্ব শক্তিতে। সে ভাবতে পারেনি তার মধ্যেও আত্মনির্ভরতার শক্তি আছে এবং সেই শক্তির জোরে ক্ষুধার অসহায় শিকার হওয়ার হাত থেকে সে নিজের স্বামী ও সন্তানকে রক্ষা করতে পারে।

পলা নরেশের চোখে নিজের দৃষ্টি রেখে খুব শান্তভাবে বলে, 'লক্ষ্মীটি, রাগ করো না। তোমার কোন ইচ্ছায় আমি বাধা দিই না, তবে তুমি কেন আমার একটা ইচ্ছা মেনে নিতে পারছ না? আমি কথা দিচ্ছি, তুমি আবার কাজে জয়েন করলে আমি এ-কাজ ছেড়ে দেব। কিন্তু এখন আমি ছাড়তে পারব না। এখন যে-অবস্থা চলছে, তা চলতে থাকলে কেউ আমরা বাঁচব না বেশিদিন। আমার স্বামী-কন্যার জীবনের কাছে মিথ্যে মান-সম্মানে কোন দাম নেই আমার কাছে। আমার এ-কাজে তুমি বাধা দিলেও আমি শুনব না। কে কী ভাববে, এই নিয়ে আমার আর ভয় নেই।'

নরেশ নিঃশব্দে লক্ষ্য করে পলাকে। তার মধ্যে আজ সে এক অন্য পলাকে দেখতে পায়, যার ইচ্ছার সামনে আজ এই প্রথম তাকে থমকে দাঁড়াতে হল।

কুমায়ুন—১৯৮৮

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

আজন্ম এ প্রবাসী প্রাণ
তৃপ্তিবিহীন পর্যটনে,
ওলটপালট আপন মনে।

অল্প ঘুমের একটু পরে
ভিতর থেকে পাহাড় ডাকে,
স্বপ্ন দিয়ে স্বপ্ন ভাঙার
প্রাপ্তিটুকু গোপন রাখে।

নিকষ কালো বোরখা-পরা
পাইন বনে অন্ধযুগ,
উঠছি উঁচু চূড়ার দিকে
ঘুরছে রাতের ঊর্ধ্বমুখ।

বিপজ্জনক ডান দিকেতে
খাদের মায়ায় জলধ্বনি,
কৃষ্ণপক্ষ বুকের আকাশ
আড়াই হাজার হীরের খনি।

অনুমানের দরজা ভেঙে
পিরামিডের সাগর চুপ,
তুষার-ঢাকা রাত্রি আঁকা
রূপকথারই ভিন্নরূপ।

একের পর এক সোনার মুকুট
জ্বলে উঠলো প্রান্তময়—
পক্ষীরাজের পিঠে আগুন
কৌসানীতে সূর্যোদয়।

বাড়ির দিকে রাস্তা

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

রোজই দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে
দোলনা পার্কের কাছাকাছি এই গাছতলায়।
বলি, 'যাচ্ছ কোথায়?'
সংক্ষেপে সে উত্তর দেয়, 'বাড়ি।'

উত্তরের ভঙ্গি থেকেই বুঝতে পারি, শব্দটা সে
আলতো করে ছুঁড়ে দিচ্ছে মেঘলা আকাশের দিকে।
যেন কোথায় বাড়ি, কত দূরে, সে নিজেও জানে না
অথচ জানাটা খুবই জরুরি।

সেজন্যে রোজই তাকে পেরুতে হচ্ছে তিনটে ভাঙা ব্রিজ,
চারটে লেবেল ক্রশিং, সতেরোটা চৌরাস্তার মোড়
এবং একই রাস্তার সাতাশটা বাঁক।

ধীরে ধীরে সে জেনে নিচ্ছে এইসবের রহস্য। এবং
জানতে জানতে, ঘুরপাক খেতে আবার ফিরে আসছে
দোলনা পার্কের কাছাকাছি এই গাছতলায়।

ইদানিং সে হনহন করে হাঁটছে এবং দেখতে পাচ্ছে,
নিজের ছায়া সাত ভাঁজ করে বেশির ভাগ মানুষই
সেই ছায়ার ভেতর ঘুমোচ্ছে।

মনে হচ্ছে, এইবার সে কোনো একটা বাড়ির দরজায়
কড়া নেড়ে বলে উঠবে, 'এই যে, আমি এসে গেছি॥'
এবং বলামাত্র সদর তোরণে ফুটে উঠবে গৃহপ্রবেশের
সবুজ সম্মতি, 'স্বাগতম।'

তেমনই সময়

রবীন সুর

দিনান্ত নয়ানজুলি ঘুম নেই রাত্রির কান্নায
সাঁকোর অস্পষ্ট ছায়া বুকে নিয়ে একা শুয়ে আছে
বাত চরা পাখিদের ছায়া গায় ডানাব পালকে
অন্ধকাব আবো বেশী অন্ধকার বলে মনে হয
কেবল জলের শব্দ জল গন্ধ শান্তির শুশ্রূষা
শিযবে একাকি জাগে বীতনিদ্র বালিশেব পাশে।

শ্রাবণে ময়ুব মেঘ চতুর্দিকে পেখম ছড়ানো
শমিত বৃষ্টির বাত্রি, দুধরঙ হঠাৎ জ্যোৎস্নাব
নিঃশব্দ প্রপাতখানি ফ্রিঙ্গশট দৃশ্যেব মতন
স্মৃতি স্বপ্ন একাকার প্রাত্যহিক দিন যাপনের
হিশেব নিকেশ কষে পাব হয়ে চৈতন্যের নদী
যেখানে সবাই যায, এই বুঝি হয়েছে সময।

কবন্ধেরা কথা বলছে

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

কবন্ধেবা কথা বলছে, চলছে ফিরছে, এ ওর দিকে চেয়ে
ব্যঙ্গকুটিল হাসি দিচ্ছে ছুঁড়ে, ওবা কথা
বলছে, বড়ো নিপুণ এবং শাণিত, ধূর্ততা
ওদেব চোখে, ঘৃণা ওদেব চোখেব তারায, বাঁকা ঠোঁটে, আমি—
দেখছি ভারতবর্ষ জুড়ে মাটি ফুঁড়ে উঠছে কবন্ধেবা,—
মস্তদেহ, মাথা তো নেই, মাংসপিণ্ড সচল. কাজ কবে,
চোখেব গর্তে জ্বলছে আগুন, মুখের গর্তে ঘৃণা,
কবন্ধেবা অন্ধ তো নয, অন্ধ কোবে দেবার প্রতিজ্ঞাতে
উঠছে ওবা ভাবতবর্ষে মাটি ফুঁড়ে, ভারতবর্ষ জুড়ে

ঘৃণা এখন খুব সাবলীল, মৃত্যু এখন সুলভ, না চাইতেই
করুণা তার ঝরছে, মানুষ মরছে, লাশ ঠেলে

চলার মতোন পথ কোরে নিই,
মৃত্যু এখন অসাড় অনুভূতি।
কে কার জন্যে এক মিনিটের নীরবতা পালন কোরবে,? তোমার
উপস্থিতির সাক্ষ্য দেবে এমন সহৃদয়ের
দেখা পাওয়ার আশায় আশায় দিন চলে যায়,
রাত্রি নিয়ে আসে
অনিশ্চিতির শীতল উত্তেজনা, পায়ের নিচে
অবসানের হা-মুখ, সিঁড়ি গর্তে নেমে গেছে

আমার হাতে দলিল আছে মানবতার, পিতৃপুরুষেরা
পাথর এবং কাঁটাবেনাপে বীজ ছড়িয়ে দেখেছে
পাখি তাকে
ঠুকরে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে, তাঁরা
সহিষ্ণুতায় বুক বেঁধে ফের কর্ষিত মাটিতে ফসল বুনে
গিয়েছে নির্দ্বিধায়, তাঁরা মানবতার ফসল তুলবে ব'লে
রোদের, ঝড়ে জলের দিনে অতন্দ্র চোখ মেলে রেখে
সময় হলে ওই ভাবেই আত্মজেরে প্রতিজ্ঞা আরূঢ়
কোরে মরে গেছে, আমার হাতে
স্বাক্ষরিত দলিল, তাকে অরক্ষিত রেখে
মরণ-মার্গে কি ভাবে যাই ?
ঘৃণাকে আগ্রাসী হতে দেখে,
কবন্ধদের চলাফেরায় উপদ্রুত ভারতবর্ষ, দেখে—
নিরুদ্বেগের পাল উড়িয়ে অন্ধ মাঝি, ডাকবো ইতঃস্তত ?
আমার নিষ্ক্রিয়তার ফলে কবন্ধেরা উঠবে মাটি ফুঁড়ে।

বর্ণ-অন্ধ

রত্নেশ্বর হাজরা

যে মানুষ বর্ণ-অন্ধ সে কখনো গেরুয়া চেনে না —
তার
রঙের পার্থক্যগুলো জন্মসূত্রে বোধগম্য নয়

চেনে না টিয়ার রঙ—পাকা ধান গম বা ভুট্টার
গভীর সোনালি—
যে মানুষ বর্ণ-অন্ধ
সাদা কালো বেগুনি হলুদে তার আগ্রহ বা অনাগ্রহ
সমান-সমান।

অনেকে বর্ণান্ধ নয়—তবু তারা গৈরিক চেনে না
বোঝে না সবুজ আর নীলের পার্থক্যটুকু—তারা
বোঝে না সোনালী ধান আর পাকা গমের ফারাক
বোঝে না সকাল বেলা পার্কে বেড়াতে যায় যে-রোদ্দুর—তার
শাদা—আর বিকেলের রোদ্দুরের শাদা
এক রকম নয়।

বর্ণান্ধ মানুষ কোনোদিনই গেরুয়া চেনে না
কিন্তু যারা বর্ণ-অন্ধ নয়
তারাও কি ঠিক-ঠিক চেনে।

আশেপাশের দিনগুলো

ভাস্কর চক্রবর্তী

মেঘ ডাকছে অথবা উড়োজাহাজ ছুটছে আকাশ ফাটিয়ে। কিছু একটা হবে।
মনমেজাজ খিঁচড়ে আছে, সুতরাং
সাদা পাতার সামনে এখন ঝুঁকে থাকার কোনো মানে হয় না আর।
একেকদিন মুণ্ডুটা সত্যিই হাঁপিয়ে পড়ে কীরকম,
হাঁটতে থাকে গঙ্গার ধারে আর ঢেউয়ে দুলতে থাকে সন্ধেবেলা।
একটা করাত এখন একটা সরলরেখাকে আধখানা করছে
কোন্ গল্পটা শেষ পর্যন্ত বাছলেন ডিরেক্টরমশাই?
কয়েকদিন আমার জীবনটাকে আমি খুঁজছি—কতো কিছুই লেখার ছিলো—
বিশেষত অ্যাসিড যখন ছড়িয়ে পড়ছে আমাদের আশেপাশের
দিনগুলোয়, আর আমার মুণ্ডুটা
তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখছে আমাদের মহাশয়-মহাশয়াদের হাজার কেরামতি।

হে রাজাধিরাজ

যশোদাজীবন ভট্টাচার্য

সিংহাসনে বসে আছো দিব্য অহমিকা
মূর্খ স্তাবকের ভিড়ে মূর্খ ততোধিক
কপচাও অমৃতবানী
সবজান্তা প্রাজ্ঞের মতন

পিতার গরিমা নয়
হে রাজাধিরাজ
মাতৃদোষে রাবণ রাক্ষস

অপরাধী তুমি নও
আমরা
নিরন্ন যারা
আজন্ম বেকার
ময়দানে তোমারই সভা
আলো করে সাজাই পসরা

ঘটে যা ঘটুক নিত্য
মানি সব ললাটলিখন
তুমি তো নিমিত্তমাত্র
এপোড়া দেশের
আর কী বা হতে পারে
খরা বন্যা মহামারী
অকালমরণ
এসবই প্রারব্ধ প্রভু
অর্জিত কেবল
তোমার অকাট্য হাসি
আমাদের বাঁচার সম্বল

অতএব নিন্দুকেরা যা বলে বলুক
তুমি শুধু হে প্রিয় জল্লাদ
অনন্ত রাত্রির বুকে
একই সুরে নিরন্তর বাজাও বেহালা

নিরপেক্ষতা

সামসুল হক

আরো কাছে এসে ছাখো কীভাবে ফাটাচ্ছে খুলি নিরপেক্ষ চিতা
ঘিলু ফুটছে গন্ধে ম-ম নবান্নের পিঠের মতোন

জলের ভিতর থেকে মাথা উঁচু ক'রে ছাখো কীভাবে শিশুকে খাচ্ছে
নিরপেক্ষ জল

তার পিতামাতার বিবাহ-বার্ষিকীতে
সন্ধ্যায় নাচার কথা ছিলো তাই শান্ত জলে নাচাচ্ছে হাত-পা

সরে এসে ছাখো গণধর্ষণের রক্তচিত্র কোন প্রক্রিয়ায়
নিজের ধ্রুপদী দেহে টাঙিয়েছে নিরপেক্ষ মাটি

নিরপেক্ষ মহাকাব্য তার মাথা ঠেকিয়েছে উচ্চাসন ঈশ্বরের পায়ে
আরো কাছে এসে ছাখো মহাকাব্যটির আর্ষ কাণ্ড
সিক্ত হচ্ছে নায়কের আর প্রতিনায়কের ঘোড়ার পেচ্ছাবে

সময়ে দুঃসময়ে

বাসুদেব দেব

কেবল অবিরাম ক্ষয় আর মৃত্যুর ছোবলের কথাই মনে রাখি নি
করবী গাছের ছায়া, আমি তোমাকেও মনে রেখেছি
মনে রেখেছি পথের পাশে গজিয়ে ওঠা নতুন চারাটির কথাও

এতোটা বয়স তো আমরা পেরিয়ে এলাম সময়ে দুঃসময়ে,
কতো না লোকের সঙ্গে পা মিলিয়ে

কত বদলেছে আমাদের চেহারা, কতবার বদলালো সরকার
কিন্তু দেখছো তো কত কিছু তবু কিছুটি বদলায় নি
আমরা সেই ছেলেটির হাত ধরেই ছাঁটছি সময়ে দুঃসময়ে
বৃষ্টিভেজা মাটির গন্ধ সে আজও পুরোনো হতে দেয় নি

গ্রীষ্মপ্রধান দেশের দীর্ঘ নিঃশ্বাস কখনো জড়িয়ে ধরে আমাদের
কবিতার বই থেকে খসে পড়েছে কখন ঘাস পাখি আর ফুলেরা
তবু সেই ছেলেটিকে ভিড়ের মধ্যেও হারিয়ে যেতে দিই নি আমরা
সে ব্যক্তিই দুর্গ পতনের ইতিহাস মুখস্ত করতে করতে মুখ তুলে
ঠিকই দেখতে পায় মাঠের মধ্যে বর্ষার ভরা পুকুর, পুকুরে লাল শালুক

জ্বর কপালে রাত জেগে জলপটি দিচ্ছে শান্তি মা আমার
আধপড়া বইয়ের মত আমাদের বিছানার কাছে ঘন হয়ে থাকে স্বপ্ন রাত
এখনো সময়ে দুঃসময়ে যুদ্ধশেষের সেই না দেখা-পৃথিবীর ঠিকানা
আমরা অবিশ্বাসে উড়িয়ে দিই নি ঝড়ো হাওয়ায়
ভাসিয়ে দিই নি বেনো জলে
করবী গাছের ছায়া, আমি তোমাকেও মনে রেখেছি

মৃত্যুবার্ষিকীতে

দেবারতি মিত্র

কাকিনী পত্নীর মৃত্যুবার্ষিকীতে এক রাজা
পিটুলি গাছের ডালে মেটে কলসি বেঁধে
তার গায়ে মেঘ আর কেকাস্বর আঁকলেন,
টানলেন বনের কাজল
যাতে বর্ষা আসে।
সারাটা বছর ভর তাতে বৃষ্টি জমে থাক।
ইহজন্মে কাকেদের বড় কষ্ট,
অন্তত মৃত্যুর পরে ফুটিফাটা রোদে
ঠোঁট, মাথা ডুবিয়ে পর্যাপ্ত জল থাক—
এই বাঞ্ছা তাঁর।

মানুষ ও অমানুষ এবং
আরো নানাবিধ পত্নী ছিল দয়ালু রাজার।

অশোকনগর

তুলসী মুখোপাধ্যায়

গোলাপের গাছ থেকে মরে গেছে গোলাপের বাস
ঝুঁকে আছে দশদিকে শোকাচ্ছন্ন মলিন আকাশ
শুধুমাত্র বেঁচে আছে মন্ত্রহীন বিশীর্ণ শরীর
সুন্‌সান্ চারপাশ, বাজেয়াপ্ত অমল সমীর
উঠোনের তুলসীমঞ্চে উইঢিপি নিয়েছে নিবাস
ভীরুপায়ে ঘোরে ফেরে প্রদীপের ফসিল নিঃশ্বাস
সমস্ত বসত জুড়ে কোথাও নাই খাদ্যকণা
নাই হাসি, নাই গান, নিরক্ত প্রেমের প্রেরণা
ছন্নছাড়া উদ্‌ভ্রান্ত যেন এক শোকের সাগর
মাতৃ মমতার মতো বুকে তবু ঘাই মারে অশোকনগর!
মৃতকল্প অন্ধকারে দশদিকে শ্মশানের পাশা
অশোকনগরে যাবো, অশোকনগরে যাবো—
থেকে থেকে ঘাই মারে শুধু একটা পিপাসা!

শব্দের কুহকে

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

যার গায়ে হাত দেন চেনা গন্ধ
যাকে তুলে চোখের সম্মুখে দোলান
তারই মুখে গভীর চুম্বন-চিহ্ন নখের আঁচড়
দস্যুরা কি কাউকে ভোলে-না

দুর্ধর্ষ পণ্ডিত চান কবি কিছু শব্দ জন্ম দিক
সেই শব্দে প্রাসাদ বানাক
সময়ের প্রথাসিদ্ধ অবয়ব ভেঙে
নতুন শব্দের সঙ্গে কবি ফের বাসর জাগুক

কাঁচি আর ঝুড়ি নিয়ে কবি যান শব্দের বাগানে
এর মধ্যে একটিও কি অপাপবিদ্ধতা নেই
একটিও কি শব্দ নেই যাকে নিয়ে লুটোলুটি
করেনি কবিরা
কুমারী শব্দের খোঁজে কবি যান বনে

মর্মরে কূজনে কিম্বা বাঘিনীর প্রণয়-গর্জনে
সনাতন শব্দাবলী ঘাঁটি গেড়ে আছে
গুপ্তশিকারীর বন্দুকের ভাষা গাছেরাও চেনে
এখনো মেঘের কণ্ঠে গুরুগুরু প্রাচীন ডমরু

যেতে যেতে যেতে যেতে নিশিপাওয়া কবি
ধীরে ধীরে উঠে যান পাহাড়-চূড়ায়
নিচে উপত্যকা জুড়ে অশ্রু আর রক্তস্রোতা নদী
অবিশ্বাসী কুয়াশায় ঢেকে যায় পড়শীর মুখ

অত উঁচু থেকে সমতল-দৃশ্যাবলী নজরে আসে না
অনাঘ্রাতা শব্দের সন্ধানে ভূতগ্রস্ত কবি
ক্রমাগত চড়াই ভাঙেন
শব্দ নয়, কবি অবয়বহীন কিছু দৃশ্য জন্ম দেন।

৮ সেপ্টেম্বর ১৯৮৯

কালীকৃষ্ণ গুহ

এদিকে ভীষণ আলো, ভিড় কোলাহল, রাত্রির বিস্তার—
ওদিকে আবছা এক অন্ধকার নির্জনতা
ভয়ের সঞ্চার করে।
কোনদিকে যাবো ?
গুখু হাঁটি ,

আরো এক ভয়াবহ রাত্রির প্রবাহ ধ'রে হাঁটি।
পাশে কে রয়েছে? সে-ও সঙ্গে হাঁটে।
সে-ও কি সঙ্গে যাবে শতাব্দীর আলো-অন্ধকারে?

ধীরে ধীরে জন্মান্তর ঘটে

অধীনতা

বিজয়া মুখোপাধ্যায়

পেঁপেপাতার করতলে বৃষ্টি
ফোঁটা ফোঁটা, গোল
প্রায় পয়সা
ভরে উঠছে নিশ্চল পাতাহাত
ভারি জল গড়িয়ে মাটিতে

গর্ভিণী হবে তাই
ভিক্ষেপাতা এমন আকাশমুখী

ও সংরক্ষণপ্রতীক, স্ত্রীত্ব
ও কার, একার?

টাল খায় পাতাশিরা, সবুজ লবণ
লাফিয়ে নামে চাবুক
ভর্তার মত বৃষ্টি

নাগিনী পোষ মানে, সঙের উৎসব

শুভ বসু

একদিন সারা কলকাতা জুড়ে
তোলপাড় করে বেড়াত অনেক ঝড়ের কাহিনী
তার অন্তরালে যুগান্তরের মুখরতা ছিল স্পষ্ট

হাজার হাজার নাগিনীর যেন মাথার অনন্যমণি
হয়ে বিদ্যুৎ গাঢ় কৌতুকে চিরে ফেলে দশ দিগন্ত
দেখাতে চাইত ভবিষ্যতের গর্ভে কত কি লুকোনো

হাওয়ার শব্দ কুঁড়িদের মুখে এনে দিত কত স্বপ্নপ্রলাপ :
কয় মুহূর্ত, তারপরেইতো গলি মোড় পাড়া কাঁপিয়ে
বিজয় মিছিল কায়েম করবে সৌরভ

সেই আনন্দে কত মুখে মনে উদ্যত হয়ে উঠত জোকার।

আজ সমস্ত শান্ত' বিশাল হাইবাইজের জেল্লা বাহার
দেখে দেখে বুঁদ বিলকুল, যেন ধন্য জন্ম এইবার—
তাই অনুভব করে ঢুলছে

তোলপাড় করা সেই সব অতি প্রবল নাগিনী
বশ মেনে গেছে, ভয় নেই আর, সেই আনন্দে
দলে দলে সং নানান রকম মুখোশে এবং পোশাকে
বেরিয়ে পড়েছে, খোল কর্তাল বিউগিল ঢোল বাজিয়ে

নানা ঢঙে নানা অঙ্গভঙ্গি সহযোগে জোর জানাচ্ছে
কীভাবে তাদের কব্জায় আজ ভবিষ্যতের বল্গা

বাংলায় ফরাসী বিপ্লব। অমিতাভ গুপ্ত

আমার বুড়ির ঘর, ছোট ছোট বুড়িদের ঘর
আগুনের দোলকের মতো দোলে, বাতাসে বাতাসে পুড়ে যায়

পূর্ববাংলার কোনো অজ পাড়াগাঁয়ে
চাঁচর যেমন জ্বলে সেইভাবে এখানেও কলকাতার কম্পিত জ্যোৎস্নায়
আবীরচূর্ণের মতো রাঙা মানুষেরা
খেলার মাঠের প্রান্তে বিপরীতে বুড়িদের কুটির সাজায়

এবং একটি ছোকরা, রোব্‌স্‌পীয়েরের মতো হেসে
চাঁদের বারুদ নিয়ে যেভাবে দেশলাই জ্বালে দ্বিধায় লজ্জায়
যা তাকে তেমন আর মানায় না বলে
নাগরবৃত্তির চেয়ে গ্রাম্যতাই ঢের ভালো এই ভেবে চাঁচর বাজায়

নিয়ম। প্রণব চট্টোপাধ্যায়

কিছু আছে বড় কঠিন খেলা
যে খেলাতে ফাঁকি চলে না,

বারবার সতর্কতা মেনে নিতে হয়,
বারবার অবস্থান বদলাতে হয়,
এক যুগ জাগরণ চোখে নিতে হয়,
স্পর্ধার পাশাপাশি বড় দরকার বিনয়
অন্নদাতা মাটির বিনয়,
জল আছে, ধুলো আছে, বালি আছে, মাটি আছে
হবে কি ফসল?
রক্তচাপ স্বপ্নময় চাই কর্ষণ প্রবল
তবে তো ফসল!

কিছু আছে বড় কঠিন সময়
যখন সমর্থ বীর্যদানে
অমল সমর্থ প্রসবের দায়িত্ব নিতে হয়,
রুদ্ধবাক কিছু প্রবীণ কথাকে মুক্তি দিতে হয়,
শুভ্র করতলে প্রহর প্রহর ধরে
শিকড়ের অন্তঃস্থলে

ঘর্মাক্ত জল দিতে হয়,
তবে তো সময়ের অহংকার
তবেই তো সময়ের ফসল !

আমার মৃত্যুর গান। নবারুণ ভট্টাচার্য

আমি পৃথিবীর সমস্ত ফায়ারিং স্কোয়াডকে এনে
একটা ময়দানে দাঁড় করাবো
তারপর তাদের সামনে আনবো
একটার পর একটা কবিতা
হয় তারা সব কবিতাকে মেরে ফেলবে
কত কবিও তো মরে গেছে বরফে, সমুদ্রে,
বিদেশে, স্বদেশে
লোরকা-র শরীরেই তো বৃষ্টির ফোঁটার মত
বুলেটের দাগ
ফায়ারিং স্কোয়াড-ই যদি শেষ কথা হয়
মরে যাবে সব কবিতা
আর যদি মিথ্যে হয়
মৃত কবিদের আশীর্বাদে
তাদের প্রত্যেকের বন্দুক নিমেষে বেহালা হয়ে যাবে
তারা বেহালা বাজাতে শিখেও যাবে এক লহমায়
ফায়ারিং স্কোয়াড তখন হবে অনেক অনেক সঙ্গীত
যা নিবেদিত কবিতার প্রতি

তার আগে
পুরনো নিয়মে
বোকা কোনো ফায়ারিং স্কোয়াড
আমাকে যদি সামনে দাঁড় করায়
আমি বলব
চোখ বাঁধবে না
আমি যেন দেখতে পাই
তোমরা বেহালা তুলে নিয়েছ
এবার ছড় টানবে
বাজবে আমার মৃত্যুর গান

ছুঁয়ে আছি তমস্বিনীকে। সব্যসাচী দেব

অন্ধকারের ভিতর হাত বাড়িয়ে আরো গাঢ় তমস্বিনীকে ছুঁয়ে আছি
কতদিন—
বুনো হলুদের জঙ্গল থেকে আচ্ছন্ন গন্ধ উঠে আসছিল,
বাতাস ভারি হয়ে ওঠার আগে
দুপুরের আতপ্ত প্রহর
দুচোখে নামিয়ে আনছিল ঘোর,
তারপর ঐ গোধূলির দিকে সরে-যাওয়া ছায়ার দিকে
তাকিয়ে থাকতে থাকতে
আমি দেখে নিই—
চৈত্রদিনের ফুরিয়ে-আসা, আর চৈত্রের সঙ্গে চলে-যাওয়া বসন্তকে
বিদায় জানাতে গিয়ে আমার শরীর জুড়ে নেমে আসে
ব্যর্থ ঋতুর ভার,
আমি দিগন্তকে খুঁজি, আর সমতলের সীমানা হারিয়ে যায়
সেই হারানো মানচিত্রের মাঝে
অনেকক্ষণ থমকে থাকে আমার চারপাশের কথা, আর পাতাঝরার শব্দ
আমার হাতের উপর···
অন্ধকারকে ভিন্ন করে ছুঁয়ে থাকি তমস্বিনীকে দীর্ঘ অপেক্ষায়।

রেললাইন ও সে / সুরজিৎ ঘোষ

আমি তো যাচ্ছি না, তবে তুমি যদি যেতে চাও বলো,
ট্যুরিস্ট-গাইড্ ম্যাপ এঁকে দেব সমুদ্র অবধি,
কোথায় উঠবে গিয়ে, কোন ঘরে কার ঘরে তাও
পাশে পাশে লিখে দেব, দেখো কোনো ঝামেলা হবে না।
কেবল একপাশে, একটা রেললাইন এঁকে দেব সবুজ কালিতে
শুরু নেই, শেষ নেই, স্টেশন ক্রসিং কিছু নেই
শুধু ধু ধু লাইনের কোল ঘেঁষে
একটি কিশোর মুখ, মনে পড়ে, কিছু মনে পড়ে?

অন্ধ রাতে তীরের দিকে / কৃষ্ণা বসু

অন্ধরাতে তীরের দিকে নৌকো ফিরছে একা,
কোনখানে তীর কোথায় ডাঙা কিচ্ছু যায় না দেখা!
হারাচ্ছে পথ আকুল ব্যাকুল একলা নৌকাখানি,
জল-বাতাসে অন্ধকারে করছে কানাকানি।
অন্ধ মানুষ লাঠি ছাড়াই একলা নেমেছে,
পথের জন্য, পথই তো তার সঙ্গ টেনেছে।
পথ ছাড়া তার আপন কোথায় কোনখানে তার গৃহ?

জলে পড়ে আছে ওই বিপন্ন অর্ধেক ?
গ্রহণ করবে ধারণ করবে থাকবে না সন্দেহ,
এমন তাঁবু কোন মাঠে তার জন্যে পাতা আছে ?
সে জানে না, জানে না সে, কেবল আশায় বাঁচে,
পথের মাঝে পথের শেষে হারানো মুখ পাবে ?
পেতেও পারে,—এই ভরসায় স্বপ্ন পুষে যাবে,
অর্ধ জীবন পার করেছে হন্যে হয়ে খুঁজে,
বাকি অর্ধ তীরের খোঁজে কেবল যাচ্ছে যুঝে।
তীরের কোলে শান্তবাড়ি প্রদীপ জ্বলে, হায়।
তীব্র নৌকা অন্ধকারে তীরের দিকে যায়।

অর্ধেক স্বদেশ / ব্রত চক্রবর্তী

বৃক্ষ জলে পড়ে আছে।
মৃত নয়,
শীতল আহত হয়ে অর্ধেক শরীর
জলের আলস্যে গিয়ে চুপ।
ভঙ্গী নেই, আলোড়ন নেই
শাখায়,
স্বপ্ন নেই আকাশ ছোঁবার,
ঠাণ্ডা স্থির জলে
অসহ্য অসহ্য দিন,
অসহ্য অসহ্য রাত্রি,
একা।
শেকড়ের স্বত্ব নিয়ে অর্ধেক মাটিতে।
সেইখানে লোকালয় এসে
থমকে দাঁড়ায়।
জলে ঝোঁকে, অপচয় দেখে।
ভ্রম ছাখে মূর্খের কৌটায়।
টান নেই,
টানা ও পোড়েন নেই,
ফুল ফোটাবার ফল ফলাবার কোনো
দায় নেই
ছায়ারছাউনি গড়ে আশ্রয় হবার কোনো ভবিষ্যৎ নেই,
ছাখে অর্ধেক ডুবেছে জলে অ-কারণ, অ-বারণ।
হাওয়া সেইখানে এসে মৃদু তিরস্কার করে,
বলে : কিসের-ই বা দোষে

এত বার্তা, ভাষা, বর্ণ, ছবি,
বয়ে বয়ে এনে রোজ কাকে তবে দেব ?
চাঁদ খোঁজে নিটোল চিবুক, চুম্বনের
স্বাদে সম্পূর্ণ আবেশ পেতে জলে যাওয়া চাই।
ফেরে। ক্লান্ত।
খড়কুটো বয়ে-আনা নতুন পাখিরা
বাসা বাঁধবার আগে
ভয় পায়, ভাবে
যদি বৃক্ষ পুরোপুরি টলে যায় জলের বিভ্রমে !
অথচ সংহত, সোজা, একত্রিত হলে
উপেক্ষার মূর্ছা মুছে অর্ধেক জাগালে
সাড়া পড়ে যাবে চতুর্দিকে—
বৃক্ষ জানে, বৃক্ষ ভালো জানে,
তবু সে অর্ধেক জাগাতে গিয়ে দেরি করে, ইতস্তত করে,
হাই তোলে অনিচ্ছায়, ভুল করে, রোজ !
বৃক্ষ জলে পড়ে আছে। মৃত নয়,
শীতল শরীর তার আহত অর্ধেক
অর্ধেক স্বদেশ যেন, আমাদের।
অনাদরে, ঔদাসীন্যে, ভুলে, পড়ে আছে,
ডুবে আছে,
জলে !

এসো প্রাণ / প্রদীপ পাল

এই নিবিতটরেখা মাঝে নির্লিপ্ত যৌবন
অসুখও নেয়না তাকে যেন নিবন্ত আগুন
নর্মদা নদীতীরে নর্ম সহচরী কেঁদে ফেরে
প্রশ্ন তোলে, কেন অবহেলা—কেন নিরাসক্তি
নীল মধুকর যায় নরান্নের নিঃশব্দ বনে
উধাও গান ভেসে যায় অন্ধ নির্বাসনে
দাও চুম্বন চিরসখা, এসো প্রাণ গভীরে
আর্তনাদী কান্নায় চাঁদও লুকায় মুখ দর্পণে
পূর্ণিমা রাত শেষে না—পূর্ণ যৌবন যন্ত্রণা
ফিরে চায় আহ্লাদী রাত, যা সতত অচেনা
নদীতীরে কী গুঞ্জন, জাগো হে যৌবন-প্রিতম্
ঝরে যায় দেস্‌দিমোনার বসন্ত, করো গ্রহণ
প্রান্তমধ্যে একলা শরীর বন্য এবং পতনপ্রবণ
রাত যায়, দিন যায়, বাক্যহীন বাগী বঙ্গন

তমসা পেরিয়ে / বাণী চট্টোপাধ্যায়

একটি শব্দও তেমন করে বেজে উঠছে না

একটি পদও আমাকে মেলতে পারছে না
প্রকৃতির মতোন।
বস্তুত, অশ্রুত একটা সুর গোপনে
আমাকে তাড়না করছে—
এ ঘোর বর্ষণ, আঁধার, বিদ্যুৎ ঝলকানি
কিছুই তাৎপর্য নয়।
এতকাল একটা সম্পূর্ণ ছবিও রাখিনি চরাচরের
যা খুব স্পষ্ট মহৎ ও সুন্দর।
একটি শব্দও কলম থেকে ঠিক-ঠিক এসে বলছে না
অনুচ্চ স্বরে—
'থামো, স্তব্ধ হও।'
অলৌকিক ধ্বনি. প্রকৃতির গভীর অভ্যন্তর থেকে
বেজে উঠছে, এইবার তুমি চলে যাও, মানুষ যেখানে যায়
তমসা পেরিয়ে জ্ঞানের ভবনে।

কে যে হাওয়া দিচ্ছে। দীপেন রায়

কে যে হাওয়া দিচ্ছে কখন হাপরে হাত টেনে
তা নিয়েই সারাদেশ মুখোমুখি বন্নায়
তেতে ওঠে রক্তচক্ষু আদিম চাঁড়াল।
দশজনের একজনও নয়, আমরা তো সাধারণ
তেলঘসা-চেটোয় নিজের কলকেয় ভরি
দু-এক চিমটে দা-কাটা তামাক
কাল মহরমে, আজ বিজয়ায় আমাদের সামাজিকে
প্রতিদিন একই ঘাটের জলে ধুয়ে নিই
জল খাই সে-ও-তো তোমার কলসীর,
স্নান করি একই পুকুরের দুপাড়ে দুজন।
কে যে হাওয়া দিচ্ছে কখন হাপরে

বৃষ্টির প্রতিমা। স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃষ্টির প্রতিমা তুই
চেয়েছিস ফুল-পাতা, সুপ্রভাতি গান
শ্যামল কবিতা
রোদ্দুর মিশেছে তোর জলের ফোঁটায়
প্লাবনভূমির দিকে তাই তোর
যাওয়াটা বারণ
সেই ভালো
বৃক্ষেও মাটিতে থাক, নৌকোও নদীতে থাক তুই
তোর নগ্ন শাসন আর চায় না সমাজ

চিরায়ত। নির্মল হালদার

তুমি চিনতে চাও, পুরনো খড়ে লেগে থাকা জল
আমি খুঁজি, পুরনো খড়ের মধ্যে একটি ধান
মহাপ্রলয়ের পরেও, ধান ও জলের ধ্বনি আমাদের আশ্রয়।

চিকিৎসক ডেকো। সুবোধসরকার

তোমার কাছে কখনো আর ভিক্ষা চাইবো না
গাছের নীচে দাঁড়াবো আমি বলবো ছায়া দাও
বলবো জল ঝিনুক খুলে আমাকে নাও ডেকে
কিন্তু আর তোমার কাছে ভিক্ষা চাইবো না।
বন্ধ ঘর, আমাকে তুমি বন্ধ করে রাখো
ওগো আমার দাঁড়িয়ে থাকা ব্যর্থ আলমারি
খোলো তোমার দরজা আমি ভেতরে ঢুকে থাকি
মৃত্যু হলে আমার তুমি চিকিৎসক ডেকো।
জলের কুঁজো, তোর শরীর বিরাট হয়ে যাক্
তাহলে আমি তোর ভেতরে রাত্রিবাস ক'রে
ধন্য হবো, তোর স্নেহের ঠাণ্ডা জল দিয়ে
আমার ক্ষতস্থান ধোয়াবো, ধোয়াবো সব ব্যথা।
ব্যথা কি ধুয়ে যায় কখনো? ব্যথা চিরস্থায়ী
সেখানে দেখি ফুল ফুটেছে, চোখের মতো ফুল
কুসুম, যদি মানুষ হও একটি কাজ ক'রো
মৃত্যু হলে আমার তুমি চিকিৎসক ডেকো।

উপত্যকা। অশোক চট্টোপাধ্যায়

আমি এই উপত্যকা আগে তো দেখিনি কোনদিন
এতো ছবি এতো গান এতো গল্প এতো অহং ভরা
এতো ঢেউ এতো স্রোত এমন শ্যামল বৃন্ত কোন পুষ্প
মাতালো এ বসুন্ধরা! কে আজ হয়েছে স্বয়ম্বরা?
পূর্বপুরুষের কোন ছবি নেই, স্থবির জ্যোতিষী
অতীত ভবিষ্য নয় এ অতি কঠোর বর্তমান
সম্মুখে ব্যাদিত যূপ আমার শোণিতে রাঙা হবে
বলেছে প্রাচীন স্বরে লাল নীল পাখি সত্যপ্রাণ
পৃথিবীর ভালবাসা ক্রমশ ফুরোয় পর্দা পড়ে
ঐখানে প্রস্তুত মৃত্যু সব খেলা নিমেষে ভণ্ডুল

এখানে আমাকে কিছু ভালবাসা রেখে যেতে হবে
মৃদু কিছু কণ্ঠস্বর যূপকাষ্ঠে কিছু লাল ফুল

বাতিদান, অ্যালবাম ইত্যাদি । অজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

ফু দিয়ে নিভিয়ে বাতিদান
প্রান্তরে উধাও হল হাওয়া ,
স্টিললাইফ
নৈশগন্ধকের ঘ্রাণে স্পঞ্জের নিভৃতি
অ্যালবাম থেকে ঝরে পড়ছে ধ্বস্ত স্মৃতি তসর নম্রতা

কেউ বুঝি এসেছিল
কেউ গেছে ফিরে ,
বেতের টেবিলে কাপ, পিরিচে জুড়োনো
যা আছে তা ফ্যাকাশে বিন্যাস ।
যে আছে তার অবয়ব গুহাচিহ্ন, ভরেছে কাঁটায় ।
বাতিদান নিভে গেলে বিপন্ন রাত্রির
গ্রীবা অভিঘাতে দোলে ,
কেউ বুঝি খুঁজেছিল নিরালম্ব প্রহর ছাপিয়ে
প্রতীকে আবদ্ধ হাত—জমে থাকা কালো অ্যালবামে ।

কলকাতা কলকাতা তবু । সত্য গুহ

আমার গা-কাঁপ লাগে, কলকাতায় পা দিতে না-দিতে
ঘটে গেছে ঐকান্তিক ইচ্ছার পতন, অনিকেত
গাছের নিকটে গাছ স্বর্গোদ্যানে—সাপ প্ররোচনা
দারুণ আলিঙ্গনে কলকাতার নেশা স্বতোজ্বল
দিনে দিনে কালকেতু বাড়ে, তার চোখের সামনেই
ঝড়ে ওপড়ানো বট-অশ্বত্থের ভাঙাশাখা—বীজ
রোয়া পেয়ে চারদিকে গা-গতরে শ্রীতে মাত্রাহীন
উদ্বাস্তু বাঘেরও দুই জলাভূমিময় জলছাপ ,
কালীবাড়ি, বেশ্যাবাড়ি, কেরাণী প্রাসাদ, হাইকোর্ট
মানুষ মানুষকে খেয়ে ফুলে ফেপে ঢোল আর খ্যাতা
স্তন সন্তানের মুখে ঠেসে মা-বালিকা পায়ে চাকা
লোহাবক্ষ দ্বারে দ্বারে—জিরাফের গ্রীবা পানা হাত
বঙ্গদেশ ভরা কলকাতায় আমার বেলা পড়ে
হায় স্মৃতি, জানা হোলো, একখানা লকলকে জিভ

রক্তের তৃষ্ণায় বাড়ছে ক্রমাগত—জবচার্ণকের
চরিত্রটি জলজ্যান্ত ইটকাঠ ক্যাকটাসে বনেদী

কলকাতা কলকাতা তবু—তিলোত্তমা—জন্ম প্রযোজনে
ভণ্ড আসে, ঈশ্বরচন্দ্রও আসে—স্বভাবে বিদেশী ॥

পুনঃ পুনঃ পুড়ি যেন । অমরেশ বিশ্বাস

শঙ্খচিল ভেবে ভুল করে সাড়া দিয়ে উন্মাদের ডাকে
অনুতাপ কেন ? গ্রন্থি ছিন্ন করে ফেলে দাও জলে

মেঘের প্রকৃত বিচারে এই অহমাপ্ত জীবনযাপন
এই শূন্য-করে-দেয়া খেলা করিকে মালিয়ে নিতে হয়।

তবু বলি, কী যে মহৎ কর্ম করেছো জলের অতলে ডুবিয়ে
ধুয়ে মুছে আমি নতুন আবার। যৌবনের রক্তস্নাত ডানা
তাও ধুয়ে নেবো। আকাঙ্ক্ষিত চুম্বনে কেউ তৃপ্তি দেবে দ্রষ্ট ঠোঁটে
আমি যাব ক্রীতদাস। মুগ্ধ হবো, স্নিগ্ধ হবো জ্যোৎস্নার প্লাবনে।

শোনো, আমি এক উন্মাদ কাঙাল। পাশাখেলা চিরকাল
আমার অস্থিতে। সভ্যতার অগ্নিরীতি জানা নেই বলে
নিজে পুড়ি, পোড়াই কখনও দ্যুতিমুগ্ধ পতঙ্গের অতিশয় প্রেম।
পুনঃ পুনঃ পুড়ি যেন, কখনও না হুঁশ এসে চুরি করে সমস্ত আগুন।

জামশেদপুরে বসন্ত । কমল চক্রবর্তী

মনে আছে একদিন ফুল হাতে মঞ্চে দাঁড়িয়েছি
ব্রোঞ্জে-ঢালা তোমার জীবনী ঘিরে
কথকথা, টুসুগান, বিবাহ রাত্রের কালো ট্রাঙ্ক
আজ দেবতার ঘাড়ে গোলা মাংস, রক্ত বিনি ঝিনি
টানা নয়, আফ্রিকান আদিম গোরিলা
ঝোলা হাত, নুয়ে পড়া গোক্ষুরের খুলি
পলাশ ফুটেছে যত তার চেয়ে ঢের বেশি গন্ধক-মঞ্জরী।

আগুনে হাল্লাক ছোট বড় নানান মেধার শুধু সাপ
সর্পধজ্ঞ শেষ হলে মাটি ফুঁড়ে আকাশ চিরোয়
ফার্নেস যেমন নাচে, কোকওভেন, উত্তরের ছিটিয়াল স্ল্যাগ
কালো হয়ে গুঁড়ি মারছে হাওয়া আকাশ-কুসুম লালে ক্রিমসান ছিটে
শেয়াল হাপায়, শকুনের মাপে চিতা নয় ভয়ে উড়ে যায় মরপাখি।

আগুনে ভল্লর গিরিনাচ লাশ হেলে দোলে
নারী শিশু বিজ্ঞান-পিপাসু ক্রীতদাস মহাভোজে বসেছে দেবতা
মানুষের সোনা মোড়া যতি চিহ্ন ঢের
মানুষের ঘাড়ে রোঁয়া ফুল্ল স্বচ্ছনারী
মানুষের জ্ঞান ঋদ্ধ আদিম স্পর্দ্ধা
পোড়াও হাল্লাক টাটাবাবা আগুন জ্বেলেছে বনে বনে।

সংসদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

* বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫,০০
* রামায়ণ কৃত্তিবাস বিরচিত ৪০,০০

যতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত

* তন্ত্রের কথা ১০,০০
* উপনিষদের কথা ১০,০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত

* ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য ৪৫,০০

ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

* উপনিষদের দর্শন ২০,০০
* ঠাকুরবাড়ীর কথা ২৫,০০
* The Challenge to India ৪৫,০০

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রচিত

* তে হি নো দিবসাঃ ৪০,০০
* Keats Twory to Poetry ৩০,০০
* Swami Vivekananda and Indian Nationalism ৪৫,০০
* India Works Freedom ৭০,০০

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী রচিত

* রাজনীতি ১৫,০০

বৈদ্যনাথ ঘোষ রচিত

* কল্পান্ত ২০,০০

ডঃ সুধাংশুবিমল বড়ুয়া রচিত

* রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি ২৫,০০

সাহিত্য সংসদ

৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ভাস্কর শিল্পী

রামকিঙ্করের

'অসাধারণ সৃষ্টি রূপে পরিচিত

সাঁওতাল পরিবার

(ব্রোঞ্জ বেপ্লিকা)

বিধান নগর

বিদ্যুৎ ভবন প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত করে কলকাতার

তিনশ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে পশ্চিম বাংলায় সংস্কৃতি

জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

সংগ্রহ করুন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমি প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

* প্রসঙ্গ বাংলাভাষা ১৪৲
* সুকুমার : লীলা মজুমদার ১০৲
* সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত ৩০৲
* কলকাতা তিন শতক : কৃষ্ণ ধর ১২৲
* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত ২৲
* প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ ৪৫৲
* সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ ৫০৲
* আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০৲
* আকাদেমি পত্রিকা ২ অন্নদাশঙ্কর রায় সম্পাদিত ১০৲

প্রাপ্তিস্থান

১। আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-৭০০০২০

২। কলকাতা ইউনিভারসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউন্টার, ৭ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩

৩। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩

৪। মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭০০০৭৩

৫। দে বুক ষ্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ ৪০৭৩ / ৮৯

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরণের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে—অতিব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর মিলন স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে; খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ, ৪০৭৩।৮৯০

সংগ্রহ করুন

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি
প্রকাশিত গ্রন্থরাজি

* প্রসঙ্গ বাংলাভাষা ১০৲
* সুকুমার : লীলা মজুমদাব ১৪৲
* সুকুমাব পবিক্রমা : পবিত্র সরকাব গম্পাদিত ৩০৲
* কলকাতা তিন শতক : কৃষ্ণ ধর ১২৲
* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমাব দত্ত ২৲
* প্রেমচন্দ নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ ৪৫৲
* সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাসংগ্রহ ৫০৲
* আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশঙ্কর রায সম্পাদিত ১০৲
* আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশঙ্কর বায় সম্পাদিত ১০৲

প্রাপ্তিস্থান

১। আকাদেমি দপ্তব, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র, ১।১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু বোড, কলকাতা-৭০০ ০২০

২। কলকাতা ইউনিভাবসিটি ইন্সটিট্যুট হল কাউণ্টার, ৭ বঙ্কিম চাটুজে স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

৩। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কললাতা-৭০০ ০৭৩

৪। মনীষা গ্রন্থালয প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাত-৭০০ ০৭৩

৫। দে বুক স্টোব, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আনন্দধারার বই

কলিকাতা তারিখ অভিধান ॥ দিব্যেন্দু সিংহ ॥ ৫০·০০ টা

তিনশ বছরের কল্লোলিনী কলকাতা। তার সমাজ-শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি আমাদের পরম গর্বের। একদিনে নয়, কালে কালে তিলে তিলে বহু জন্ম-মৃত্যুতে, প্রাণপাত-পরিশ্রমে, সংস্কার-আন্দোলনে গড়ে ওঠা এই তিলোত্তমা নগরীর প্রতিটি দিনে কোন কোন সালে কী ঘটেছিল, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে এই মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থ।

'কলকাতা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে তাঁদের বইগুলোর মধ্যে শ্রীদিব্যেন্দু সিংহের বইটি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করবে নিজস্ব অধিকারের দাবীতে।'

—নিশীথরঞ্জন রায় (ভূমিকা)

"বইটি একদিকে যেমন কলকাতার সময়ানুক্রমিক ধারাবাহিকতাকে একটি সূত্রে বাঁধার প্রয়াস, তেমনি অগণিত অজ্ঞাত তথ্যের আকার-গ্রন্থ।...নির্দেশিকা অংশে 'কলকাতার প্রথম', 'পত্র-পত্রিকা' 'প্রতিষ্ঠান' 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন / উদ্বোধন এবং কলকাতার ব্যক্তিত্ব'—শুধু নির্দেশ-পঞ্জী নয়, উল্লেখ্য সংযোজন।"

—সন্তোষকুমার অধিকারী

"অসামান্য, অবিশ্বাস্য তোমার বই—'কলিকাতা তারিখ অভিধান'। আমি অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। এ তোমার বিদ্যার পরিচয় শুধু নয়, এ তোমার পরিশ্রমের বাহবা নয়, এ তোমার সাধনার বিরাট প্রকাশ।"

—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আনন্দধারা। ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

পরিচয়

৫৯ বর্ষ ৪ সংখ্যা নভেম্বর ১৯৮৯ অগ্রহায়ণ ১৩৯৬

প্রবন্ধ

ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বয়ঃপ্রাপ্তি দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী
অনুবাদ : তরুণ বসু ১

শিক্ষা-অশিক্ষা সুধীর চক্রবর্তী ১১

রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি গুণময় মান্না ৬৯

আলোচনা

চিরস্মরণীয় রামমোহন ক্ষিতীশ রায় ৬৫

গল্প

নুনা সামাটের গল্প অনিল ঘড়াই ৩৫

কবিতাগুচ্ছ

নন্দদুলাল আচার্য অনন্ত রায় নীরদ রায় মল্লিকা সেনগুপ্ত
প্রতিমা রায় জয়দেব বসু বিপুল চক্রবর্তী রাহুল পুরকায়স্থ
অনীক রুদ্র অনুরাধা মহাপাত্র সুব্রত রুদ্র রেণুকা পাত্র
অনন্ত দাশ অশোক দত্তচৌধুরী চৈতালী চট্টোপাধ্যায় সুব্রত
সরকার শক্তিপদ মুখোপাধ্যায় জয়া মিত্র ৫৩-৬৪

পুস্তক পরিচয়

নানারঙের দিন ইন্দ্রাণী ঘোষাল ৮১

সংস্কৃতি সংবাদ

পরিচয় দপ্তরে ননী ভৌমিক অনুরাধা রায় ৮৫

বিয়োগপঞ্জি

'লা পাসিওনারা' অমিতাভ দাশগুপ্ত ৮৭
ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল অপূর্ব কর ৮৯
সবলা বসু অনিরুদ্ধ সেন ৯১

প্রচ্ছদ

পূর্ণেন্দু পত্রী

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় বর্ণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা ১৭ থেকে প্রকাশিত।

ভারতে বুর্জোয়াশ্রেণীর বয়ঃপ্রাপ্তি

দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী

[নেহরু জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে নানা অনুষ্ঠান হচ্ছে—বেতার দূরদর্শন ইত্যাদিতে প্রচার হচ্ছে তাঁর বাণী, 'ভারত আবিষ্কার'-এর চিত্ররূপ ইত্যাদি। প্রখ্যাত মার্কসবাদী বৈজ্ঞানিক তথা ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বী 'সায়েন্স অ্যাণ্ড সোসাইটি' (নিউ ইয়র্ক) পত্রিকার দশম খণ্ডে নেহরুর 'ভারত আবিষ্কার' বইটির একটি সমালোচনা লেখেন ১৯৪৬ সালে। এখানে তার অনুবাদ ছাপা হলো। এক্সাসপ্যারেটিং এসেজ' (পুণা, ১৯৫৭) বইতে পুনর্মুদ্রণের আরও কিছু মন্তব্য সংযোজন করেন। প্রবন্ধের শেষে সেটিও দেওয়া হয়েছে।

'সরকারি মার্কসবাদী' (অফিসিয়াল মার্কসিস্ট) বলতে কোসম্বী বোঝাতেন তদানীন্তন "সি'পি আই-এর বিভিন্ন অংশ, কংগ্রেস সমাজবাদী, মানবেন্দ্রনাথ রায়পন্থী ও অসংখ্য ছোট ছোট বামপন্থী গোষ্ঠী"।

সম্পাদক, পরিচয়]

অতীত ও বর্তমান ভারত প্রসঙ্গে জবাহরলাল নেহরুর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত বইটি প্রকাশিত হলো। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে লেখকের উল্লেখযোগ্য কীর্তি ও যুদ্ধের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে বিরাট আশা জেগেছিল এই বইটি বহুলাংশে তার ন্যায্যতা প্রমাণ করে। তাঁর কর্মজীবন এতই পরিচিত যে এখানে আর কোনো মন্তব্যের অবকাশ নেই, যাঁরা তা জানেন না তাঁরা এই বইটির মতোই লেখকের আত্মজীবনীটিও পড়ে নিতে পারেন। পণ্ডিত জবাহরলালের থেকে ভালোভাবে ভারতকে আর কেউ চেনেন না। হিন্দি ও উর্দু এই দু-ভাষাই যে তিনি চমৎকার বলতে পারেন—হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীরা সে-কথা স্বীকার করেন। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, কারণ তাঁর শিক্ষাদীক্ষা ইংল্যাণ্ডেই। আলোচ্য বইটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এক প্রচণ্ড সওয়াল, কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা হলো, একটাই পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কৃতিগত ও রাজনীতিগতভাবে ভারতের ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা বইটির উচ্চাশী পরিধির মধ্যে পড়ে। কাজটি আরো বেশি উল্লেখযোগ্য, যখন বিবেচনা করা হয় যে, বইটি মূলত শেষ করা হয়েছিল কারাগারে বসে, পরিস্থিতি যখন খুবই বেদনাদায়ক, এবং লেখক সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, হিটলারতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে তাঁর সাহায্য ছাড়াই, যদিও

তিনি নিজে সর্বদাই ফ্যাসিবাদের ও ফ্যাসিবাদ যা কিছুর প্রতিনিধিত্ব করে তার অটল প্রতিপক্ষ। এমন সমর্থ একজন মানুষকে বিনা বিচারে বন্দী করে রাখা হলো আর নিরাপদে গদিতে বসে [দ্বিতীয় মহা-]যুদ্ধ লড়ার জন্যে ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো যথেষ্ট সংখ্যক ব্রিটিশ দালালকে—ভারতের জনগণের পক্ষে এর পরিণতি হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা আর ভারতীয় ব্যবসাদারদের একটা বিশাল অংশ যখন তাঁদের পকেট ভরাচ্ছেন বিপুল পরিমাণ কাগুজে মুদ্রায়, তখন অধিকাংশ জনসাধারণ ভোগ করছে মুদ্রাস্ফীতি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও ঘাটতি। যুদ্ধচলাকালীন ভারতের ঘটনাবলির প্রত্যক্ষদর্শী হবার দুর্ভাগ্য যার হয়েছে এমন কোনো সংবেদনশীল মানুষের পক্ষে আমেরিকানদের কাছে এর অর্থ বোধগম্য করে ব্যাখ্যা করা সাধ্যাতীত।

বইটি অবশ্যই সাধারণ পাঠককে পড়ার জন্যে সর্বতোভাবে সুপারিশ করার যোগ্য। বর্তমান লেখক [কোসম্বী] একথা পরিষ্কারভাবে জানাতে চান যে তিনি এই গ্রন্থকারের একজন নগণ্য অনুরাগী। ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর জন্যে একথা বলে রাখছি, কারণ এই লেখাটির বড় অংশই ব্যাপৃত হয়েছে কয়েকটি ভুল ধরিয়ে দেওয়ার কাজে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে দু-চারকথা বললেই চলে, কারণ যে-সমস্ত তথ্যসূত্র আমাদের হাতে আছে তা নিতান্তই অল্প এবং যাঁরা সারাজীবনই এ বিষয়ে গভীর চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন তাঁদের পক্ষেও সেগুলি ব্যাখ্যা করা প্রহেলিকার সামিল। এ বাবদে আমরা অবশ্য লেখককে দায়ী করতে পারি না। কতক দিক দিয়ে এটা দুর্ভাগ্য যে লেখক প্রাচীন ভারতীয় তথ্যসূত্রগুলিকে বিচার করে অধ্যয়নের অবসর পান নি, তাঁকে খুব বেশি করে নির্ভর করতে হয়েছে ব্রিটিশ লেখকদের তুলনায়-সহজপাঠ্য বিবরণের উপর। যাই হোক, [এই খামতি] মার্জনা করা যায় এই বিবেচনায় যে, ভারতীয় রাজবন্দীদের হাতের কাছে আকর-গ্রন্থের সংগ্রহ থাকে না বললেই চলে।

বইটির একটি দিক পাঠকের কাছে আশ্চর্যজনক ঠেকতে পারে। তা হলো বহু অপব্যবহৃত শব্দ "জাতি" (race) সম্পর্কে [লেখকের] বিচিত্র মনোভাব. পৃষ্ঠা ৩৮৬ ও তার পরের পৃষ্ঠায় বর্ণবিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদের তীব্র নিন্দা আছে, কিন্তু পৃষ্ঠা ৩৮৭-এ আমরা দেখি: "মনস্তত্ত্বেরও ভূমিকা আছে এবং জাতিস্মৃতি বহুদিন ধরে থাকে।" জাতিস্মৃতি বলতে কী বোঝায় তা পরিষ্কার নয়, বিশেষভাবে এমন একটা দেশের ক্ষেত্রে যার উজ্জ্বল মৌর্য এবং গুপ্ত যুগও তাদের লিপি সমেত বিস্মৃত, যে-দেশে যে-কোনো সময়কার প্রায় সব গুহাকেই

পৌরাণিক পাণ্ডবদের নামে চাপিয়ে দেওয়া হয় বা কলকাতার এসপ্লানেডে উটবাম (১৮৫৭-র বিদ্রোহের এক জহ্লাদ)-এর মূর্তিকে রাণা প্রতাপ সিংহ বলে নির্দেশ করতে পারে। বিপরীতপক্ষে দেখা গেছে যে, শ্রেণীস্মৃতি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অথবা জাতিস্মৃতি সম্পর্কে নেহরু যা কল্পনা করেন অন্তত তার থেকে লক্ষণীয় রকমের ভিন্ন। যেমন, বোম্বের ব্রিটিশ পুলিশ কমিশনার তাঁর অদক্ষতার দরুনই হোক বা ইচ্ছাকৃত প্ররোচনাতেই হোক, জন-অসন্তোষকে সামাল দিতে গিয়ে (যার পরিণতি হয় বোম্বের শ্রমিক এলাকায় একটা সত্যিকারের রক্তস্নানে) অভিশাপ কুড়িয়েছিলেন ১৯৪৬-এর জানুয়ারির শেষ এবং ফেব্রুয়ারিতে। তবুও সে বছর মে মাসে, বোম্বের ঐ বছরের সর্বোচ্চ ধনী ভারতীয় বিবাহসভায় কংগ্রেস মন্ত্রীদের সঙ্গে তিনিও ছিলেন একজন মাননীয় অতিথি। পৃষ্ঠা ৪৩১-এ আমরা পড়ি "প্রাচীন জাতিদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে এই ধরনের [প্রশান্তির] মনোভাব জাগে"—একথার অর্থ ঠিক পরিষ্কার নয়। নৃকুলবিদ্যায়ও এমন কোনো সাক্ষ্য মেলে না যে, কোনো একটি জাতি (race) অন্য কোনো জাতির তুলনায় বেশি প্রাচীন। ঘটনা এই যে, যদি এই বাক্যটি তিনি ভারতীয় জাতিগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ধরে থাকেন, তাহলেও একথা ব্যাখ্যা করা একান্তই অসম্ভব, কেন অন্তত ১৯৪০ থেকে সেই প্রশান্তিতে ভাঁটা পড়ল, এবং এদেশে তার জায়গায় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অবিরাম আলোড়ন তুলতে শুরু করল।

এই আলোচনার ক্ষেত্রে, এসবের থেকেও অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ—"কেন" এই প্রশ্নটির অনুপস্থিতি। লেখকের ভাবাদর্শের কাঠামোর মধ্যে বিশ্লেষণের চেষ্টা না থাকলে ইতিহাস রচনাকে পরিণত বলে গণ্য করা যায় না। প্রাচীন যুগের ক্ষেত্রে কিছু তথ্যের ব্যাখ্যানে যথেষ্ট অসুবিধা দেখা দেয়, এর সহজ কারণ হলো, ঐ সমস্ত তথ্য সদা-সর্বদা স্পষ্ট নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের ক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে লেখকের এই দৃষ্টিকোণ তর্কাতীত নয়। আরো একটু এগিয়ে জোর দিয়ে একথাও বলতে পারি যে, "জাতি" শব্দটির অস্পষ্ট প্রয়োগ এবং কোনো কোনো সময়ে কেন কতক পরিবর্তন ঘটেছিল এই প্রশ্নের অনুপস্থিতি—এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বইটির আর একটি বিশেষত্ব. শ্রেণী বিশ্লেষণের অনুপস্থিতি। লেখক নিজেকেই একটি প্রশ্ন করতে পারতেন, তার একটা বিরাট সুযোগও ছিল—যেমন, লাভ কার (*cui bono*), ইতিহাসের কোনো পর্বে কোন্ শ্রেণী পরিবর্তন আনলো বা লাভবান হলো? লেখক একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন, যা হয়তো এই প্রশ্ন তুললে স্পষ্ট হয়ে যেতো।

ইংল্যাণ্ডের ইংরেজরা যা নিয়ে গর্ব করে, সেই একই ধরনের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অধিকার ভারতকে দেওয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা মরিয়াভাবে, এবং এখন পর্যন্ত কার্যকরভাবে লড়াই করে চলেছে। এ-ও অবশ্য স্পষ্ট, যে শ্রেণীর ইংরেজরা ভারতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও নাগরিক অধিকার দমন করার জন্যে লড়েছিল তারাই আবার মরিয়া হয়ে যুদ্ধ চালাচ্ছে ইংল্যাণ্ডের নিম্নতর শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে, কিন্তু ইংল্যাণ্ডে শ্রমিকশ্রেণীর চাপ যখন প্রবল হয়ে উঠল তখন বুর্জোয়া মোর্চায় কোনো এক জায়গায় ভাঙন ধরে এবং কিছু স্থানীয় উন্নতি অর্জন করা যায়। বুর্জোয়াশ্রেণীর যে অংশ হারছিল সেই অংশ তখনই অনিবার্যভাবেই লড়েছে উৎপাদনের উপকরণের অন্য আর সব মালিকদের উপর ঐ একই বাধানিষেধ চাপানোর জন্যে। অবশেষে তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা ভদ্রদস্তুর চেহারা দিল। তারা ঘোষণা করল যে, তারা, শাসকরা তাদের স্বকীয় স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী কয়েকটি সংস্কার মঞ্জুর করেছে। ভারতের তরফ থেকে তুলনায় অল্পই শ্রেণী-বিরুদ্ধতা ছিল, যেহেতু ব্রিটিশরা যতটা সম্ভব [এ দেশের] সামন্ততান্ত্রিক এবং ধর্মীয় অধিকার বজায় রাখার সবরকমের ব্যবস্থা নিয়েছে।

এও বলা যায় যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নত আধুনিক মূলধনের অভাব ও ভারতে মুসলিমদের তুলনায়-চরম দারিদ্র্য—এই দুই দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় (নেহরু যা করেন নি) মুসলিম লীগের বিপক্ষে যুক্তি কী (পৃ ৪৬৬), মুসলিম পশ্চাৎপদতার কারণ কী (পৃ ৪৬৮), এবং ভারতে উচ্চ-সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব রয়েছে কেন। নেহরু নিজেই উল্লেখ করেছেন (পৃ. ৪৩৭) যে, ভারতীয় ব্যবসাদারা সিংহলে ঠিক একই ধরনের সংরক্ষণ [নীতি] দাবি করে যা ভারতে ব্রিটিশ ব্যবসার স্বার্থকে দেওয়া হলে তারা সঠিকভাবেই বিক্ষুব্ধ হয়। তিনি নিঃসন্দেহে অবগত আছেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা, বণিক সম্প্রদায়ের পরিপূর্ণ সমর্থন নিয়ে সমতার দাবিতে কঠিন লড়াই করছেন। কিন্তু এই সমতা শুধু শ্বেতকায়দের সঙ্গে সমতা, নিগ্রোদের সঙ্গেও সমতা নয়। প্রাদেশিক বিভেদ ও শিল্পোন্নতির বিচিত্র উপস্থাপনাকে পঙ্গু করে দিয়েছে শ্রেণী বিশ্লেষণের অভাব (পৃ, ৩৯২-৩৯৮)। নেহরু লিখছেন, গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের অধিবাসীরা প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী, বণিক ও নাবিক। এখন একথা অনস্বীকার্য যে, ঐ জেলাগুলির একটা বিশাল সংখ্যক অধিবাসী অবশ্যই ব্যবসায়ী নয়, যদিও উল্লিখিত ওই অঞ্চলের কিছু সংখ্যক মানুষ আজকের

ভারতীয় পুঁজিবাদী শাখার একটা উল্লেখযোগ্য জায়গা দখল করে আছে। তার কারণ এই যে, প্রথমদিকে মুসলমান ব্যবসায়ীদের সংস্পর্শে আসার ফলে এই ছোট অংশটি গোড়াতেই ব্রিটিশদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পেরেছিল এবং পরিচিত হয়েছিল নতুন উৎপাদন পদ্ধতি (অর্থাৎ যন্ত্র ও আধুনিক পুঁজিভিত্তিক উৎপাদন)-র সঙ্গে। এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ, সম্ভবত, অতিক্ষুদ্র পার্সী সম্প্রদায়। তাঁদের আদি-নিবাস ছিল গুজরাটে। সেখানে তাঁরা ছিলেন সবচেয়ে লজ্জাজনক রকমের নিপীড়িত সংখ্যালঘু শরণার্থীদের অন্যতম। আজকের ভারতে তাঁরা সবচেয়ে অগ্রসর, সংস্কৃতিবান্ ও ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়গুলির একটি। এর একমাত্র কারণ: তাঁরা আধুনিক শিল্পভিত্তিক লগ্নী পুঁজিবাদকে গ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে রাজপুতনার মাড়োয়ারীদের ক্ষেত্রে (পৃ. ৩৯৪-৯৬) এই ঘটনা পুরোপুরিই আলাদা। তাঁরা সেই পুরনো কাল থেকেই টাকাকড়ি এবং মহাজনী কারবার নিয়ন্ত্রণ করতেন বটে, কিন্তু কোনো ধরনের রাজনৈতিক অধিকারই তাঁদের ছিল না। যদি একটু কষ্ট স্বীকার করে নেহরু ঐসব নথিপত্র দেখেন তাহলে তাঁর নজরে পড়বে, ভারতে ব্রিটিশ বিস্তারের যুগে ওই জাতীয় মহাজনরা ব্রিটিশদের কতবার সমর্থন জুগিয়েছে। অবশ্য তার থেকেও তিনি হয়তো সাম্প্রতিক-কালের একটি মৌলিক ঘটনা উপলব্ধি করতে পারবেন না। সেটি হলো: আধা-পুঁজি পরিবর্তিত হয়েছে আধুনিক উৎপাদনমূলক টাকায়। এই পরিবর্তন এখন এতই দ্রুত যে, এমনকি ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা সবচেয়ে পশ্চাৎপদ ও অধঃপতিত সেই সামন্ত রাজ-রাজড়ারাও ব্যাপকভাবে পরিণত হচ্ছেন শেয়ার মালিকে। সেদিন চলে গেছে যখন শেয়ার ছাড়া হতো লিখিত মূল্য তিরিশ টাকায়, যা আজকের দিনে (১৯৪৬) এসে দাঁড়িয়েছে তিন হাজার টাকারও উপরে। অথবা যখন একটা স্টক ছাড়া হতো এক-শ টাকায় যার মূলধন পরিশোধ (Capital Repayment) হিসেবে ফেরৎ দেওয়া হতো নিরানব্বই টাকায়। সেখানে আজকের দিনে লভ্যাংশ দেওয়া হয় দেড়শ টাকারও উপরে, যার দাম হয়ে দাঁড়িয়েছে তেইশ-শ (২৩০০.০০) টাকা। ঐ সমস্ত স্টক [কেনা-বেচা] অনেকদিন আগেই শুরু হয়েছে শিল্পের আধুনিকীকরণের তাড়নায়, কিন্তু ওই মূলধনের পুরো পরিমাণ ছিল খুবই নগণ্য। আদি-সঞ্চয়ের রূপান্তরের ও যুদ্ধকালীন সময়ে অনিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি ও মুনাফাবাজির দরুন এখন তা অত্যধিক হারে বেড়ে গেছে।

[পুঁজি-] সঞ্চয়ের ব্যাপারটিকে হিসেবে ধরতে নেহরু যে শুধু অবহেলা

করেছেন তাই নয়, তিনি বুঝে উঠতে পারেন নি এই পরিমাণগত পরিবর্তন ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর চরিত্রে কী গুণগত পরিবর্তন এনেছে। বলা যায়, এই শ্রেণী এখন ক্ষমতায় গেড়ে বসেছে। ভোজসভার কিছু উচ্ছিষ্ট (সাধারণভাবে বাড়তি মুনাফা থেকে পাওয়া) ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে শিক্ষা, বিজ্ঞান গবেষণা ও দাতব্য কর্মের নৈবেদ্য হিসেবে। যথা নিয়মে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সদাচারের প্রাচীন বন্ধন (ও দুর্ভাগ্যক্রমে ন্যায়নীতিরও) যথেষ্ট শিথিল হয়ে গেছে। এই শ্রেণীর মূল চরিত্রের তুলনায় তা কিছুই নয়। এই লোভাতুর অর্থগৃধ্নুতা এখন খুবই স্পষ্টভাবে দেখা যায় কালোবাজারে, আরো বিশাল মুনাফার জন্যে বিশাল পরিমাণ ঘুষ দেওয়া, শেয়ারের ফাটকাবাজিতে এবং তাদের সহ-ভারতীয়দের দুর্দশা এমন কি তাঁদের জীবন সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান অশ্রদ্ধায়। আমাদের কৃষি-শ্রমিক (যাঁরা জনসংখ্যার পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি), কারখানার মজুর এমন কি নিম্ন আয়ের অফিস-কর্মচারী ও বুদ্ধিজীবীদের যে ক্রমিক নিম্নগামিতা তার সঙ্গে উচ্চ-মধ্যশ্রেণীর পকেটে যে সম্পদ গিয়ে ঢুকছে তার ফারাক চোখে পড়ার মতো, যদিও সেই লাভকে লুকিয়ে রাখা যায় (যবে বোনা) সাদা-খদ্দর ও চিরন্তন গান্ধী টুপির লোক-দেখানো সরলতা দিয়ে। ভারতের যে নতুন সংবিধান অর্জনের জন্যে নেহরু ও তাঁর বন্ধুর জীবনের সেরা সময়টা কাটিয়েছেন কারাগারে, সেটি আসবে শুধুই নবগঠিত ভারতীয় মধ্যশ্রেণীর ক্ষমতার স্বীকৃতি হিসেবে।

আসলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মিশনের দ্বিপাক্ষিক আলাপ-আলোচনা ভারতীয় নতুন বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থার স্বীকৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়। পুরোনো অচি ব্যবস্থার তত্ত্ব আর কোনোভাবেই বিনিয়োগ বা রপ্তানিতে একচেটিয়া মুনাফা দিতে পারছে না। যে ব্রিটিশ বুর্জোয়া শ্রেণীকে রপ্তানি এবং বিনিয়োগ করতেই হবে, তারা স্বীকার করেছে যে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর সঙ্গে সমঝোতায় আসা দরকার, তাদেরও মুলধনী মাল প্রয়োজন আছে। এটা অবশ্যই গুরুত্বহীন নয় যে, আধুনিক শিল্পপতি ও দাদনদাররা কংগ্রেসকে (অর্থাৎ, এই লেখায় আমি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস পার্টিকে বোঝাচ্ছি) অর্থ সাহায্য করে. আর ভারতীয় মুসলমান ধনীদের সঙ্গে মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সম্পর্কও লক্ষণীয় রকমের ভালো। বলা যেতে পারে, মধ্যশ্রেণীর রাজনৈতিক সংগঠন দুটির ভেতরের সংঘাতের একটা কারণ এই নয় যে, মুসলিম সংখ্যালঘুরা সারা দেশের জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ সম্পদের এক দশমাংশেরও কম অধিকারী। আরো কথা হলো, মুসলিমদের হাতে যে সম্পদ ছিল তার

মূল ভিত্তি বিনিময়মূলক ছদ্ম-পুঁজি অথবা আধা সামন্ততান্ত্রিক কৃষিজ উৎপাদন। এ দুই-ই ব্রিটিশ সংরক্ষণের মুখাপেক্ষী।

এই সবের প্রেক্ষিতে (নেহরু যা খোলাখুলি স্বীকার করেন নি) ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করাটাও চিত্তাকর্ষক (পৃ ৫২৪ ও পৃ ৬২৯)। নেহরু বুঝতে পারেন নি যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে (মতাদর্শগতভাবে কখনই শক্তিশালী নয়) ১৯৪১ সালে এমনভাবে দমন করা হয়েছিল যে তার আর কোনো কার্যকারিতা ছিল না। এবং আজকের (১৯৪৬) ভারতীয় রাজনীতিতে তাদের শক্তি ক্রমবর্ধমান (যদিও বুর্জোয়া শক্তির তুলনায় তা এখনও কার্যত নগণ্য), তার কারণ একমাত্র এই যে, তারা সত্যিই কৃষি-শ্রমিকদের ও অতিক্ষুদ্র শিল্পশ্রমিক প্রলেতারিয়েতের ভেতরে গিয়ে পৌঁছেছে। ১৯৪৩-এর আগের সময়ের তুলনায় ভারতীয় জনসংখ্যার এই দুটি শাখার ভেতর কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়েরই প্রভাব অনেক কম। কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিটি প্রসঙ্গে (পৃ. ৪৮২-৪৮৪) এও লক্ষ্য করে অবাক হতে হয়, যে-প্রাদেশিক কংগ্রেস সরকারগুলি তখন কর্মরত ছিল তাদের উপর ওই কমিটির সিদ্ধান্তগুলি মনে হয় কোনো প্রভাবই ফেলে নি। কংগ্রেসের কর্মসূচী ও কংগ্রেস মন্ত্রীসভার প্রকৃত কাজকর্ম—এ দুয়ের ফারাকটা অনুধাবন করলে নেহরু বোধহয় লাভবান্ হতে পারতেন। এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই যে, কংগ্রেস আজ যে চেহারায় রয়েছে তাতে তাদের (তার পরিকল্পনা কমিটির মতোই) প্রবাহপতিত হয়ে সমাজবাদের দিকে চলে যাওয়ার সুদূরতম বিপদও আছে। মুসলীম লীগ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে অবশ্য বিশুদ্ধ সুবিধাবাদ ও প্রতিক্রিয়া ছাড়া আর কিছু নজর করা কঠিন। পুঁজি বিনিয়োগের পরিসংখ্যানের গভীরে না গিয়েও একথা বলা যায়—এবং ওই সময়কার সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনের সূত্রে পরখ করা যায় যে, ১৯৩৭-৩৯-এ যখন কংগ্রেস মন্ত্রীসভা রাজত্ব করছিল তখন তাদের [শাসিত] বিশেষ বিশেষ প্রদেশে বেশ কিছু সংখ্যক নতুন শিল্পোদ্যোগ চালু হতে দেখা যায়। বিনিয়োগকারীরা অবশ্যই কংগ্রেসের প্রতি তাঁদের আস্থা দেখিয়েছিলেন—ব্রিটিশরাজ বা কংগ্রেস পরিকল্পনা কমিশন ঘটনার এই দিকটির প্রতি নজর দিন বা না দিন। অবশ্যই আজকের পুঁজির প্রায় বিস্ফোরক বৃদ্ধির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না।

১৯৪২-এর অগাস্টের আলোড়নকারী ঘটনা প্রসঙ্গে (পৃ ৫৭৯-৮০) নেহরু সরাসরি প্রশ্নটির সংসদীয় দিকটি বর্ণনা করেছেন। কিন্তু একজন বাইরের দর্শক একটি লক্ষণীয় দিক দেখে অবাক হতে পারেন, যা এই বইটির আওতায় আসে

নি। বোম্বাই-এ যখন সারা ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠক হলো, সেখানে সদস্যরা জানতেন যে, গ্রেপ্তার আসন্ন। তাঁরা তাই তাঁদের পারিবারিক কাজকর্ম ও ব্যক্তিগত টাকাকড়ির চমৎকার বন্দোবস্ত করে রাখলেন যাতে আগামী দু-এক বছরে কোনো আকস্মিক ঘটনা ঘটলে তার মোকাবিলা করা যায়। এই লেখকের [কোসম্বী] কাছে যেটা লক্ষণীয় মনে হয়, তা হলো এই যে, এই যোগ্য ও উপযুক্ত প্রতিনিধিদের একজনও কংগ্রেস বা সারা জাতির তরফে কোনো সংগ্রামের পরিকল্পনার কথা আদৌ ভাবলেন না, যদিও তাঁরা জানতেন ব্রিটিশ প্রতিপক্ষ আঘাত হানতে উদ্যত। সকলের ধারণা ছিল "মহাত্মাজী আমাদের একটা পরিকল্পনা দেবেন", যদিও তাঁদের গ্রেপ্তার হওয়ার আগে মহাত্মাজীর বক্তৃতা তাঁদের উপরে বিশেষ কোনো ছাপ ফেলতে পারে নি। প্রত্যাশিত গণবিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে সমবেত প্রতিনিধিদের উদ্দেশে মহাত্মাজীর ঐ ভাষণের শুধু যে কোনো বিপ্লবী চরিত্র ছিল না তা-ই নয়, তার মধ্যে কোনো ধরনের সংগ্রামী পরিকল্পনাও ছিল না। বরং বিষয়নিষ্ঠ ভাবে দেখলে মনে হবে এটা নৈশভোজের পর এক আরামদায়ক বক্তৃতারই সামিল। কেন এমন ঘটলো যে, জনসাধারণের সত্যিকারের সংগ্রামের পরিকল্পনা নেওয়া হলো না? এর মানে কি এই যে, উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর মধ্যে তখনকার প্রচলিত মার্কামারা চিন্তা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের ভেতর কার্যত ছড়িয়ে পড়েছিল? হয়তো কেউ লক্ষ্য করতে পারেন যে জাতীয় বিপ্লবী স্তরে এটি যতই বৃথা বলে মনে হোক না কেন, শ্রেণীভিত্তিতে এ-পন্থাটি ছিল বেশ চমৎকার। ব্রিটিশ সরকারের ত্রাস এবং সব নেতার কারাবাস কংগ্রেসকে তার পরের বছরের সমস্ত ঘটনার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিল। ওই একই সময়ে, কারাগার ও বন্দীশিবিরে থাকার চটক মুছে ফেলতে সাহায্য করেছিল ক্ষমতাসীন কংগ্রেস মন্ত্রীদের মামুলি কাজের খতিয়ান। এবং তাতে জনসাধারণের মধ্যে এই সংগঠনের পূর্ণ জনপ্রিয়তা ফিরে আসে। যদি ব্রিটিশরা যুদ্ধে জয়ী হতো তাহলে এ-ও বেশ পরিষ্কার ছিল যে কংগ্রেস জাপানের পক্ষে দাঁড়ায় নি। অন্যদিকে জাপান যদি ভারত জয় করতে পারতো (এবং তারা সঙ্গে সঙ্গেই পুরোদমে আক্রমণ করলে তথাকথিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার পুরোটাই ধ্বসে পড়তো) তারা নিশ্চয়ই কংগ্রেসকে দায়ী করতে পারতো না ব্রিটিশকে সাহায্য করার অভিযোগে। শেষত, গণনিপীড়নের বিরুদ্ধে ঘৃণা বর্ষিত হলো আমলাতন্ত্রের মোটা মাথার উপরে। অন্যদিকে ওই অসন্তোষকে কেন্দ্রীভূত করা ও খোলাখুলি বিচূর্ণ করায় বুর্জোয়া শ্রেণীর কোনো ক্ষতি হতো না।

এই সূত্রে আমরা আবার লেনিনের কথা স্মরণ করতে পারি : "কেবল যখন নিম্নতর শ্রেণীগুলি পুরোনো পন্থা চায় না এবং যখন উচ্চশ্রেণী পুরোনো পন্থায় তা চালিয়ে যেতে পারে না একমাত্র তখনই বিপ্লব জয়ী হতে পারে। এই সত্যটি অন্যভাবেও প্রকাশ করা যেতে পারে : শোষিত এবং শোষক—দু-পক্ষই যখন সঙ্কটে পড়ে তেমন জাতীয় সঙ্কট ছাড়া বিপ্লব অসম্ভব।" ১৯৪২-এ শ্রমজীবী মানুষ যখন দুর্গতি ও দুর্দশার চরম অবস্থায় পড়তে শুরু করেছে, তখন ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির পথে—নেহরুর বই-এ কোথাও এই অনস্বীকার্য তথ্যের স্বীকৃতি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যুদ্ধ চুক্তি, চড়া দাম, ব্যাপক কালোবাজারী করার ক্ষমতা—এগুলি থেকে দাদনদার ও শিল্পপতিরা যা চেয়েছিল তাই পেয়েছিল। এবং, এমন কি যে-নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলি সাধারণত ভারতে অসন্তোষের অগ্রণী বাহিনী, তাদেরও অবস্থার উন্নতি হতে শুরু করেছে, কারণ যুদ্ধ এবং ক্রমবিস্তারশীল যুদ্ধ অর্থনীতির ফলে ব্যাপক সংখ্যক নতুন কেরানীর পদ ও অফিসের কাজ তৈরি হয়েছে। এই ঘটনা এবং আরো একটি সত্য—ভারতে ব্রিটিশরা বিনিয়োগকারীদের সর্বদাই এদেশের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে চলার জন্যে ছাড় দিয়েছে—হিসেবে ধরলে বোঝা যাবে কেন ১৯৪২-এ কোনো পরিকল্পনা ছিল না এবং কেনই বা বিপ্লবের অভিমুখে জনসাধারণের চাপ থাকা সত্ত্বেও তারপরে একের পর এক অচলাবস্থার সৃষ্টি হলো।

নেহরুর ঘাড়ে ইতিহাস চাপিয়ে দিয়েছে এক বিরাট শক্তিশালী সংগঠনের নেতৃত্বের দায়। যেটি এখনও ভারতের অন্য যে কোনো সংগঠনের চেয়ে অনেক বেশি গণসমর্থন পেয়ে থাকে এবং যে-সংগঠন তার অপ্রতিরোধ্য ও যন্ত্রণাময় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে দেখিয়েছে যে, তারা গোটা উপমহাদেশের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দখল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু মার্কসবাদের দিকে নেহরুর ঝোঁক কি পাল্টে যাবে, যখন, যে-শ্রেণী আজ কংগ্রেসকে সমর্থন করছে তাদের স্বার্থের সঙ্গে দরিদ্রতর শ্রেণীগুলির স্বার্থের বিরাট ফারাক হয়ে যাবে, না কি নেহরুর শ্রেণী বিশ্লেষণের অভাব শুধুই (তাঁকে) নিয়ে যাবে মোহভঙ্গের দিকে? মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে একনিষ্ঠ লোক আর কেউ নেই। তাঁকে ভারতের পুঁজিবাদীদের যন্ত্র বলে ঘোষণা করাটা মূর্খতা হবে কিন্তু এই মুহূর্তে একমাত্র এই নতুন বুর্জোয়াশ্রেণী ছাড়া ভারতে অন্য কোনো শ্রেণী নেই, যারা যথেষ্ট বলবান, শক্তিশালীভাবে সংগঠিত এবং এতটাই চতুর যে, নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে তারা মহাত্মাজীর উপদেশে যা কিছু লাভজনক তার সদ্ব্যবহার করে আর সব,

বিপজ্জনক স্পষ্ট উক্তিকে পর্যবসিত করে নেতিমূলক দার্শনিক বিষয়ে। এই বুর্জোয়াশ্রেণীরা চায় নেহরুর নেতৃত্ব, ঠিক যেভাবে ভারতও চেয়েছিল এই শ্রেণীকেই। ভবিষ্যতের এই অশুভ লক্ষণ আমি দেখতে পাচ্ছি, পথের ছাড়াছাড়ি স্পষ্ট [চোখে পড়ে], যা পরিষ্কার নয়, তা হলো : সেই যন্ত্রণার মুহূর্তে নেহরু কোন্ পথটি বেছে নেবেন।

এই সময়ে "সরকারি মার্কসবাদী"দের তত্ত্ব ছিল ব্রিটিশরাজ কখনোই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। "সরকারি মার্কসবাদী"দের সমাধান ছিল. হিন্দু ও মুসলমানদের (কোনো একভাবে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সঙ্গে তাদের সমীকরণ করা হয়েছিল) উচিত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের উৎখাত করার জন্যে জোট বাঁধা। এই দুই পার্টির পেছনকার শ্রেণীকাঠামোর প্রশ্নটি কখনই খোলাখুলি তোলা হয় নি। তার কারণ বোধহয় এই যে, ডব্লু ক্যাণ্টওয়েল স্মিথ-এর লেখাপত্র পড়ে "সরকারি মার্কসবাদী"দের বিশ্বাস হয়েছিল মুসলিম লীগও কোনো এক রহস্যময়ভাবে অন্তরে-অন্তরে ব্রিটিশ-বিরোধী এবং তারাও সমাজবাদের পথেই চলেছে। কার্যকর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার যেটি একটি নিশ্চিত পরীক্ষা—অর্থাৎ সাম্রাজ্যের শাসকরা কতজন নেতাকে বন্দী করেছে বা মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে—সেটি প্রয়োগ করা হয় নি। আপসহীন মনোভাব এবং ব্রিটিশের সঙ্গে সরাসরি সহযোগিতায় (লীগের উঁচুতলার নেতাদের পক্ষে যা ছিল খুবই লাভজনক) এবং দ্বিজাতি তত্ত্ব নিয়ে জেদাজেদিকে উপেক্ষা করাটাই কর্তব্য বলে বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের পাকিস্তান বিভাগের ফলে পাঞ্জাব ও বাঙলার অগ্রগামী কৃষক আন্দোলনে যে পরিপূর্ণ ভাঙন দেখা দিল তার ওপরেও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। আর "সরকারি মার্কসবাদী"রা অবশ্য ১৯৪২-৪৩-এ সাতারা-র কৃষক অভ্যুত্থান (পত্রী সরকার)-কে নেহাৎই ডাকাতি বলে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

অনুবাদ : তরুণ বসু

শিক্ষা-অশিক্ষা

সুধীর চক্রবর্তী

(পূর্বানুবৃত্তি)

আমার এক বন্ধু বলেন, 'বুঝলে, আজকাল কলকাতায় একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে আরেকজন ভদ্রলোকের দেখা কুশল বিনিময়ের বদলে জিগ্যেস করা হয়, 'আপনার টেলিফোন ঠিক আছে তো?' হয়তো একটু অত্যুক্তি কিন্তু অনেকটাই সত্য। আমরা যতটা মানবিক তারচেয়ে বেশি যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছি ক্রমে ক্রমে। একজন শিক্ষক বা অধ্যাপক তাই এখন শিক্ষাসত্রে প্রবেশ ক'রে জিগ্যেস করেন, 'আমাদের নাকি আরেকটা ডি এ অ্যানাউন্স করেছে? কবে থেকে দেবে? তাহ'লে সেন্ট্রাল ডি. এ-র থেকে আমরা আর ক' কিস্তি পিছিয়ে থাকলাম?'

এ সবেরই ফলে যোগ্য শিক্ষক বা অধ্যাপক ক্রমশ গুটিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের বৃত্তে। প্রভাসচন্দ্র চন্দের মত আমার কোনো কোনো সহকর্মী ঢেকে যাচ্ছেন বিস্মৃতিতে। এখানে আমি আলাদাভাবে প্রভাসবাবুকে শ্রদ্ধা জানাই। ছয়ের দশকে তিনি সহকর্মী ছিলেন। বিশুদ্ধ জ্ঞানতপস্বী সরল মানুষ। অবসর নিয়ে কোথায় যে আত্মগোপন করেছিলেন কে জানে? হঠাৎ প্রায় বিশ বছর পরে তাঁকে দেখলাম। শুভ্রকেশ বৃদ্ধ, বয়সের ভারে একটু বুঝি বেঁকে গেছেন। কাঁধে একঝোলা মোটা বই নিয়ে কলকাতা থেকে সটান একেবারে আমার বাড়ি। কী ব্যাপার? ম্লান হেসে বললেন, 'এখন আর আমি আপনার প্রাক্তন সহকর্মী নই। এখন আমি হকার। নিজের বই নিজেই খরচ ক'রে ছেপেছি। কেউ তো ছাপলো না। এক কপি কিনবেন তো কলেজের জন্যে?'

কুণ্ঠিতভাবে বলি, 'আরে বসুন আগে। চা মিষ্টি খান। পরে কথা হবে। কত দিন পরে দেখা বলুন তো?'

প্রভাসবাবু, 'বিশ বছরের কাছাকাছি তো বটেই। মনে পরে সে সব পুরোনো দিনের কথা?'

মনে পড়ে যায় সেই আমার প্রথম যৌবনের অধ্যাপনার দিনগুলো। তখনই প্রভাসবাবু বেশ প্রবীণ। জানতে পারলাম তিন বিষয়ে এম এ। বাংলা, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব আর পারসি। অধ্যাপনা করতেন পারসি ভাষা ও সাহিত্যের। কিন্তু অধ্যাপনা করতে পেতেন কই আর? আরবি পারসির ছাত্রই মিলতো না। তাই বছরের পর বছর কলেজে আসতেন আর বাড়ি যেতেন। ছাত্র নেই।

তাই ব'লে অবকাশটা নষ্ট করেননি। গ্রন্থাগারে সর্বদাই বই ঘাঁটতেন। একদিন কৌতূহল নিয়ে জানতে চাইলাম, 'কি বই এত ঘাঁটছেন? লক্ষ্যটাই বা কি আপনার?'

উজ্জ্বল চোখদুটো মেলে সোৎসাহে বললেন, 'বাংলা ভাষায় আরবি পারসি শব্দের একটা তালিকা আর প্রয়োগের নমুনা তৈরি করছি। বিরাট কাজ। সব বাংলা বইই তো দেখতে হচ্ছে।'

উত্তেজিত আবেগতাড়িত হয়ে ব'লে বসলাম, 'লিখুন আপনি বই, আমি ঠিক প্রকাশক যোগাড় ক'রে দেবো।'

মনে আছে সে কথা রাখতে পারিনি। পাণ্ডুলিপি বগলে ক'রে কলকাতার তাবৎ প্রকাশকের দোরে ধর্না দিয়েছি। কেউ রাজি হন নি। 'ধুর মশাই, এসব বই এখনকার পাবলিক খাবে না' কিংবা 'কে এই প্রভাসচন্দ্র চন্দ? নামই শুনিনি কোন দিন। কি জানি মশাই আপনিই নাম ভাঁড়িয়ে এসব লিখছেন না তো?'—এ জাতীয় ছিল প্রকাশকদের উৎসাহ বাণী।

রাগে হতাশায় ফুঁসে আমি প্রভাসবাবুকে ব'লে বসি, 'কেন মশাই আপনি এত সাবজেক্ট থাকতে পারসি পড়তে গেলেন? হিন্দুর সন্তান তো বড় একটা এসব পড়ে না। কে মাথার দিব্যি দিয়েছিলো আপনাকে বলুন তো?'

: সেইটাই তো বলা মুস্কিল। তবে কি জানেন, আমি বরাবরই একটু কল্পনা-প্রবণ আর আদর্শবাদী। তখনও পার্টিশন হয়নি। আই এ পড়ি ১৯৪০ নাগাদ ঢাকার জগন্নাথ কলেজে। হিন্দু মহাসভার একটা ঘরোয়া সভায় বক্তৃতা করতে এসেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। তিনি কি বললেন জানেন? বললেন, 'হিন্দুর স্বাতন্ত্র্য, হিন্দুর সংস্কৃতির বিশিষ্টতা বুঝতে গেলে আগে ইসলামী সংস্কৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। আরবি পারসি পড়তে হবে। সেই উন্নত ভাষার সাহিত্য আর দর্শন জানতে হবে। আছেন এখানে কোনো ছাত্রবন্ধু যিনি আমায় আজ কথা দেবেন যে আমার পরামর্শমত আরবি পারসি পড়বেন?' আমি আবেগের মাথায় উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমি কথা দিচ্ছি পড়বোই।'

ঃ তারপর ?

ঃ তারপর আর কি ? আত্মীয় স্বজন সকলের অমতে ঢাকায় অনার্স আর এম এ পাশ করলাম। ফার্স্ট ক্লাশই পেয়েছিলাম। কিন্তু দেশভাগ হ'লো হঠাৎ। চলে আসতে হলো। শ্যামাপ্রসাদও অকালে মারা গেলেন। এদেশে অধ্যাপনা করতে করতেই আরো দুটো বিষয়ে এম এ করলাম কিন্তু ঐ দুই বিষয়ে অধ্যাপনা পেলাম না কেননা ঐ দুই বিষয়ে আমার অনার্স নেই। ঐ সাবজেক্টই হয়েছে আমার নিয়তি। যদি বা একটা বই লিখলাম তো প্রকাশকরা ছাপে না। শুধু শুধু দেখুন তো, আপনার কি হয়রানি !

পরে 'হাফিজের কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ' বিষয়ে গবেষণা ক'রে প্রভাসচন্দ্র ডি লিট পান কিন্তু একথাও সত্য যে তিনি বেশির ভাগ অধ্যাপনা জীবনে ছাত্র পাননি, সমগ্র অধ্যাপনা জীবনে প্রমোশন পাননি এবং সারাজীবন জ্ঞানচর্চা ক'রে স্বীকৃতি পাননি।

এদিকে আমার নাকের ডগা দিয়ে কত সাধারণ মেধার অধ্যাপক তাঁদের বিষয়ের নানান চমকদার বা লাগসই বিষয়ে গবেষণা ক'রে চটজলদি ডিগ্রি নিয়ে তরতর ক'রে উন্নতির সোপানে উঠে গেলেন। প্রভাসচন্দ্র আরবি পারশির মত কঠিন ভাষা আয়ত্ত ক'রে, সেই ভাষায় কাব্যসাহিত্য দর্শন প'ড়ে, বহু শ্রমে ধৈর্যে দীর্ঘকাল গবেষণা ক'রে যা লিখলেন তা তাঁকে উন্নতির সোপানে তো নিয়ে গেলই না এমনকি তা মুদ্রিত হয়ে বিদ্বৎ সমাজেরও সমাদর পেলো না। একমাত্র তখন পূর্ব পাকিস্তান তাঁর রচনার ও প্রচেষ্টার কিছু সমাদর করেছিলো। 'বাংলাভাষায় আরবি পারসি শব্দ' তারাই আগ্রহ ক'রে ছাপে। সে দেশে অধ্যাপনার জন্য প্রভাসচন্দ্রের ডাকও আসে। বলতে গেলে তা মাতৃভূমিরই ডাক, কারণ তাঁর আদিবাস্তু তো নোয়াখালিতে। কিন্তু প্রভাসচন্দ্রের আদর্শবাদী মনে এই অভিমান ছিল যে মাতৃভূমি থেকেই তিনি একদা উৎখাত হয়েছিলেন। তারচেয়ে বড় কথা যে-ইসলামি সংস্কৃতির গভীরতা, বৈচিত্র্য ও উদারতা আরবি পারসি সাহিত্যে তিনি উপভোগ করতেন, মুগ্ধ হতেন—সেই ইসলামি জীবনের অন্য এক নগ্নতা, ভয়ংকর দাঙ্গাবাজ জিঘাংসা তাঁকে আঘাত করেছিলো। তিনি সে দেশের সমাদরের লোভ ত্যাগ ক'রে এ দেশের অনাদরের অবমান মেনে নেন।

একদিন স্টাফরুমে তিনি আমাকে পরিতাপের সঙ্গে নিচু স্বরে বলেছিলেন, 'আপনাকে গোপনে বলছি, আমি হিন্দু মুসলমান দুজনেরই কাছে মার খেয়েছি। আমার নিজের দেশের মুসলমানরা বাস্তু কেড়ে প্রাণের ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে

দিয়েছে। এ দেশের মুসলমানরা সারাজীবন আমার প্রমোশনের পথ আটকে রেখেছে। জানেন কি, আমাদের সার্ভিসে আমিই একমাত্র হিন্দু ক্যাণ্ডিডেট ছিলাম? কিন্তু মুসলমান একসপার্টরা বরাবর আমাকে উপেক্ষা করেছেন। আমার ডি, লিট ছিল তবু আমার কেস কখনও প্রমোশনের জন্য বিবেচিত হয়নি। আর দেখুন এদেশে এসে হিন্দুদের হাতেও আমি মার খেলাম। তারা আমার বই ছাপলো না কেন জানেন? তার বিষয় ইসলামি ব'লে। তারা কি জানে আরবি পারসি জীবনদর্শনের সঙ্গে ভারতীয় হিন্দু জীবনদর্শনের কি গভীর মিল? তারা কি বোঝে, যে-ভাষায় তারা কথা বলে তার দশটা শব্দের একটা হলো আরবি না হয় পারশি? হাফিজ মুসলমান ব'লেই এদেশে অচ্ছুৎ থেকে গেলেন?'

শিক্ষা-অশিক্ষার এই মর্মান্তিক বিবরণ শুনে আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। একজন প্রকৃত শিক্ষিত সমন্বয়কামী উদার মানুষের জীবনব্যাপী অনাদর আর অপমান আমাকে তাড়িত করে। আমি অস্থিরতা বোধ করি কিন্তু কিছু করতে পারি না। প্রভাসচন্দ্রের জন্য শুধু আমার মনের গভীরে এক অমলিন শ্রদ্ধার স্মৃতিফলক গ'ড়ে রাখি।

তাই এতদিন পরে বৃদ্ধ ন্যুব্জ প্রভাসচন্দ্র যখন আমার বাড়ি তাঁর নিজের পয়সায় ছাপা বই নিয়ে এসে বলেন 'আমি এখন হকার' তখন সব এলোমেলো লাগে। এই শিক্ষা জগৎ, এই প্রকাশনার জগৎ, এই বুদ্ধিজীবীদের ভদ্রতার ভান আমার চুরমার ক'রে দিতে ইচ্ছে করে। আমি যেন নিজেকেও ছিন্ন করতে চাই। তবু প্রকাশ্যে শান্তচিত্তে তাঁকে সমাদর ক'রে বসাই, ভোজ্যে আপ্যায়ন করি। আমার মনে পড়ে, যখন একসঙ্গে কাজ করতাম মাঝে মাঝে প্রভাসচন্দ্রের বাড়ি গেলে কত সমাদর ক'রে মিষ্টি আর চা বিস্কুট খাওয়াতেন। মানুষটার সরল অকপটতার একটা ঘটনাও মনে পড়লো। একদিন সন্ধ্যাবেলা গেছি তাঁর বাড়ি। দিলেন শুধু চা। বললেন, 'আজকে মিষ্টি পেলেন না, বিস্কুটও না। আজ যে মাসের একত্রিশ তারিখ। একটাও পয়সা নেই।'

প্রকৃত শিক্ষাই মানুষকে এতটা অকপট আর অনর্গলিত করে, সেদিন বুঝে ছিলাম। মানুষটার মধ্যে রসবোধও ছিল। শুধু যে মাঝে মাঝে হাফিজের বা রুমীর রচনা অনুবাদ শোনানোতে তা ধরা পড়তো তা নয়। একদিন স্টাফরুম সংলগ্ন ইউরিনালে আমি অন্যমনস্ক ভাবে ঢুকে পড়েছিলাম পর্দা সরিয়ে। খেয়াল করিনি কেউ সেখানে আছেন। ছিলেন স্বয়ং প্রভাসচন্দ্র।

লজ্জিত বিব্রত হয়ে চলে আসছি তাড়াতাড়ি, প্রভাসচন্দ্র বললেন 'জন্ম যদি তব বঙ্গে তিষ্ঠ ক্ষণকাল'।

আমি হো হো ক'রে হেসে উঠি।

অনেকক্ষণ নিরিখ করেও সেই প্রভাসচন্দ্রকে ফিরে পেলাম না এতদিন পরে। হাফিজের ওপর লেখা তাঁর ডি লিট থিসিস দু ভল্যুমে বার করেছেন। ইংরাজিতে লেখা। একশো পঞ্চাশটাকা দাম। বললাম, 'কলেজ লাইব্রেরির জন্যে নিশ্চয়ই কিনবো, কিন্তু ট্রিপ্লিকেট রসিদ চাই যে?'

অপ্রতিভ না হয়ে বললেন, 'রসিদ বই ছাপিয়ে ফেলেছি। এই দেখুন। এখন কি আর সেরকম হাঁদাগঙ্গারাম আছি ভাবছেন? এখন পাকা সেলসম্যান। বলুন কত পারসেন্ট কমিশন লিখবো। কবে পেমেন্ট দেবেন?' একটু থেমে হেসে বললেন, 'কি পারছি তো? যেতে হবে বহু কলেজে। ঠিক সেলসম্যানের মত হচ্ছে তো কথাবার্তা?'

আমার ভেতরটা হাহাকার ক'রে যেন মুচড়ে উঠলো। এ কেমন শিক্ষা-ব্যবস্থা আর এ কোন্ করুণ শিক্ষাজগৎ আমাদের? পণ্ডিতকে তা ক'রে দেয় বিক্রেতা? শিক্ষক বা লেখক ব'লে যেটুকু গর্বগেরিক আমার ছিলো সেদিন তা মুছে গেল। মনে হলো কলম আছে আমার, আছে কণ্ঠস্বর, কিন্তু আমি আসলে এক জড়বুদ্ধি প্রতিবন্ধী।

জগদ্দল ঘাট থেকে একটা লঞ্চ ছাড়লো চন্দনগরের রানীঘাটের উদ্দেশে। ভট ভট ভটর। কেরোসিন-ডিজেলের ধোঁয়ায় চোখ জ্ব'লে উঠতে অন্যদিকে তাকাই। সেদিকে একডাঁই বাচ্চাদের নামলেখা স্যুটকেস। খুদে পড়ুয়ারা এপার থেকে বাবা, মা কিংবা পরিচারক, পরিচারিকার সঙ্গে লঞ্চে চেপে চলেছে চন্দননগরের নাম-করা কনভেন্টে। তারা আপাতত লঞ্চের জানলা দিয়ে উচ্ছ্রিত জলের উল্লাসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইছে। গানটা অবশ্য ইংরাজি। তাদের ব্যাগ অভিভাবকদের কাছে। স্যুটকেশ লঞ্চের মাঝখানে জড়ো করা। একটা দামী স্যুটকেশের গায়ে ইংরাজি অক্ষরে লেখা আছে প্রিয়দর্শী দাশগুপ্ত। সত্যি আজকালকার বাচ্চা ছেলেমেয়েদের কি সুন্দর সব নাম! কি সুন্দর সব পোষাক আর বই! কি চমৎকার সব সুষম খাদ্য তারা খেতে পায়।

মনে পড়ে যায় কুমড়োর ঘ্যাঁট আর রুটি খাওয়া আমাদের কৈশোর। মনে পড়ে নেকারবোকার কিংবা ফিতে বাঁধা প্যান্টের কথা আর একটা সস্তা টুইলের সার্ট। অবশ্য সেসবই ছিল প্রাণপ্রিয়। যত্নে পাট ক'রে তোষকের

তলায় রেখে স্বয়ংক্রিয় ইস্ত্রির দেশজ ব্যবস্থার কথা ভেবে ভালও লাগে। যাহোক আপাতত ভালো লাগছিলো চুলবুলে কচিকাঁচাগুলোর দারুণ হুটোপাটি। উপভোগ করছিলাম প্রিয়দর্শী নামটি। খেয়াল ছিল লঞ্চ থেকে নামার সময় দেখবো প্রিয়দর্শী সত্যিই কতটা প্রিয়দর্শন।

লঞ্চ থামলো বাণীঘাটে। প্রথমে খুব হুড়োহুড়ি। একটু থিতোলে একে একে এক একটা হাত তুলে নিচ্ছে এক একটা স্যুটকেশ। প্রিয়দর্শীর নাম লেখা স্যুটকেসের ওপর আমার গোয়েন্দা চোখ। হ্যাঁ, এবারে হাত পড়েছে। সোনার রুলি সরু শাঁখা পরা একটা মাখনবরণ হাত। হাত বেয়ে চোখের দৃষ্টি উঠে যায় মুখে। চেনা চেনা যেন। আরে অনিন্দিতা না? একটু গায়ে গতরে, একটু স্বচ্ছল জীবনের মোলায়েম প্রশান্তি সারা মুখে, তবে একইরকমের সুন্দরী রয়ে গেছে। আশ্চর্য যে অনিন্দিতাও সোজা তাকিয়ে আছে আমার দিকে। হঠাৎ দুজনে একসঙ্গে হেসে উঠলাম। অনিন্দিতাই মুখর হলো, 'উফ্, কতদিন পরে দেখা। পনেরোবছর হবে?'

: হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। সেই তো এম এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেল তোমার। আমরা সব গোমড়া মুখে ভোজ খেলাম।

কুল কুল ক'রে হেসে ওঠে অনিন্দিতা। বলে, 'আগের মতই ফাজিল আছো দেখছি।'

ইতিমধ্যে প্রিয়দর্শী নামের সত্যিই প্রিয়দর্শন কিশোরটি মাকে টানতে লাগলো। তার বন্ধুরা নেমে গেছে। আমরাও জনস্রোতের সঙ্গে নেমে কনভেন্ট মুখো স্ট্র্যাণ্ডের পথ ধরি। অনিন্দিতা মুখ নামিয়ে চাপাস্বরে বলে, 'গ্রীট হিম'।

ছেলেটা তোতাপাখির মত আমাকে বলে, 'গুড মর্নিং আঙ্কল। হাউডু'।

আমি সহবৎ মেনে বললাম, 'মর্নিং, হাউ ডু ইয়ু ডু'। এখানেই নিয়মানুযায়ী থামতে হয়। এবারে পরিহাস ক'রে প্রাক্তন সহপাঠিনীকে বলি, 'ইংরিজিতে আঙ্কল মানে অনেকরকম হয়। প্রিয়দর্শীর আমি কে? কাকা না মামা?'

: মামা হওয়াই সবদিক থেকে সেফ।

: তথাস্তু। তা বোন, আমাদের সেই রোমিও ভগিনীপতি এখন কোথায় কর্মরত?

: রোমিও কেন?

: বাঃ ভুলে গেছো? বলতে না তখন তুমি যে, সামনের বাড়ির এক

ন্যাকা ইঞ্জিনিয়ার ছোকরা তোমার শোবার ঘরের ব্যালকনির তলায় দাঁড়িয়ে গুনগুন করে ?

ঃ উফ, হিলারিয়াস। এখনও মনে আছে ?

ঃ মনে থাকবে না ? সব সহপাঠীর বুকে হাফসোল মেরে তুমি তো সেই ন্যাকা ইঞ্জিনিয়ারকেই গাঁথলে। তো সেই রোমিও এখন কোথায় ?

ঃ রোমিওর এখন মাথাভরা টাক, মধ্যপ্রদেশ স্ফীত। তিনি এখন শ্যামনগরের এক জুটমিলের কেষ্টবিষ্টু। আসবে একদিন, বলনা, প্লিজ।

ঃ না। এ বয়সে নতুন ক'রে ভাইফোঁটা নিলে কপাল চড়চড় করবে। যাকগে। কথা হচ্ছে, সেই শ্যামনগর থেকে গুঁতিয়ে জগদ্দল ঘাট। ঘাট পেরিয়ে চন্দননগর। তারপরে কনভেন্ট। তারপর ?

ঃ তারপর গঙ্গার স্ট্র্যাণ্ডের ছায়াছন্ন বৃক্ষতলে উপবেশন ক'রে অন্যান্য জননীদের সঙ্গে বিশুদ্ধ পি এন পি সি। বুঝলে ?

ঃ না। কনভেন্টের ইংরিজি জানিনা তো !

ঃ পি এন পি সি আসলে বিশুদ্ধ বাংলা। মানে পরনিন্দা পরচর্চা ! তাতে কেটে যাবে সময়। তারপরে ছেলেকে টিফিন খাইয়ে বাড়ি, মানে কোয়ার্টার। কর্তার সঙ্গে লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটি। দিবানিদ্রা অর্থাৎ বিউটি স্লিপ। চটকলের আর্দালী বিকেলে ছেলেকে নিয়ে যায়।

স্কুল-গেটে ঢোকবার মুখে প্রিয়দর্শী হাত নেড়ে বললো, 'বাই বাই আঙ্কল, সি ইউ এগেন'। অনিন্দিতা হেঁকে বললে, 'ওয়াটার বট্‌লে স্কোয়াশ আছে, খেয়ে নিস্'। ছেলে বললো, 'খাবো। কিন্তু টিফিনে আলুকাবলি-তেঁতুলজল খাওয়াবে তো ? ঠিক ?' সে স্কুলে ঢুকে গেল।

আমি বললাম, 'আলুকাবলি তেঁতুলজল ? আঃ, সেতো আমরা খেতাম। কনভেন্টের ছেলেমেয়েরা ও সব খায় ?'

অনিন্দিতা বললো, 'আর বোলো না। ছেলেটা একেবারে জংলি ভুত হয়েছে। কিছুতে ভালো জিনিস খাবে না। চীজে অরুচি, আপেল সেদ্ধ 'ম্যাগো', মাংসের স্টু দিলে বমি করবে। কিন্তু লঞ্চঘাটে ঐ যে নোংরা খোট্টাগুলো আলুকাবলি তেঁতুলগোলা দিয়ে বেচে সেটা খাবে চেটে পুঁচে। তবু মাঝে মাঝে ঐ সব ঘুষ দিয়ে ভালো জিনিসটা খাওয়াই। এমন হোপলেস লাগে তখন কি বোলবো।'

আমি বললাম, আসলে ওর অভাবেরই অভাব'।

ঃ তার মানে ?

: তারমানে ঐ যে রবীন্দ্রনাথের 'তাসের দেশ' নাটকে রাণীমা রাজবাড়িতে প্রাণ-হাঁপিয়ে ওঠা রাজপুত্রকে বলেছিলেন, 'বুঝেছি বাছা আসলে তোমার অভাবটা অভাবেরই অভাব। পাওয়া জিনিসে তোমার বিতৃষ্ণা জন্মেছে'— এও তাই। তুমি কি প্রিয়দর্শীর জন্যে কোনো অভাব রেখেছো?

অনিন্দিতা করুণভাবে চেয়ে থাকে। অসহায়। আমি বলি, 'আমাদের ছোটবেলায় সব কিছুর অভাব ছিল। ভালো পোষাকের অভাব, সুষম খাদ্যের অভাব, ভালো বইয়ের অভাব। সেইজন্যে ঐ সবের কবে একটু স্বাদস্পর্শ পাবো ব'লে আমরা লোলুপ হয়ে থাকতাম। জানো, আমার একটা হারমনিয়াম ছিল না তবু খালি গলায় মনের আনন্দে গলা ছেড়ে গাইতাম! পরের বাড়ি গিয়ে রেডিও শুনতাম। কেউ নেমন্তন্ন করলে হাপুসহুপুস ক'রে খেতাম পেট না-ফাটা পর্যন্ত। ভাবতে পারো, জীবনে প্রথম ফাউন্টেন পেন পেলাম পৈতেয় উপহার! বই পড়ার নেশা ছিল তাই পাড়ার লাইব্রেরিতে প'ড়ে থাকতাম। দাদাদের ছোট-হয়ে-যাওয়া পোষাক পরতাম। আর জীবনে প্রথম চাকরি ক'রে প্রথম মাসের মাইনে বাবাকে দিতে বার বললেন, 'একটা ঘড়ি কেন এবার'। উঃ সে কি আনন্দ। এদিকে কলেজে পড়াচ্ছি অথচ ঘন ঘন আদেখলার মত ঘড়ি দেখছি। ভাবতে পারো?'

গঙ্গার দিকে করুণ অসহায় মুখে অনিন্দিতা তাকিয়ে থাকে আর আমি তাকে সেই বেপথু অবস্থায় রেখে বিদায় নিই। সে তো বহু বছর আগেকার কথা। কিন্তু আজও ভুলিনি। জানিনা অনিন্দিতার ছেলে জীবনে কতটা কি করতে পেরেছে। কিন্তু দিকে দিকে এমন তো কতই দেখি যে এমন পুতু পুতু ক'রে বড় হওয়া ছেলেমেয়ে কেমন যেন একলসেঁরে হয়ে যায়। পরিকল্পিত অভিজাত শিক্ষা তাদের আত্মকেন্দ্রিক ক'রে তোলে। দেশ আর দশের লড়াইয়ে তাদের তেমন অংশ থাকে না। এ প্রসঙ্গে আমার ভাগনে কৌশিকের কথা মনে পড়ে। তার যখন মাধ্যমিক দেবার বয়স তখন পৈতে হ'লো। পৈতে উপলক্ষে সে এতরকম উপহার পেলো যে তা দেখে চমকে গেলাম। গল্পের বই, কুইজ পাজ্‌ল্‌। ওয়ারম্যান, স্যুটলেংথ, ক্যারমবোর্ড, পেন সেট, টিউব কালার সেট, ক্রিকেট ব্যাট, ক্যাসেট স্ট্যাণ্ড, ক্যামেরা, স্টিকার, খেলোয়াড়দের পোস্টার, থার্মস ফ্লাস্ক, কোলোন স্প্রে, ভি আই পি ব্যাগ। সে অনেক উপহার খুব তাচ্ছিল্য ভরে নিলো এবং নির্বিকার ভাবে বললো, 'এ আমার আছে। যাকগে, কাউকে দিয়ে দেবো।' এই ভয়ানক আত্মম্ভরিতা, শিষ্টাচারের এতটাই যে অভাব তার মূলে যে ঘোরতর অশিক্ষা তার কথা তাকে

কে বলবে? সকাল হ'লেই তো সে ঘড়ি প'রে, টাই হাঁকিয়ে, বাবার গাড়িতে চ'ড়ে একটা অহংকারী বিদ্যালয়ে যাবে। আমি তাকে ছাদে নিয়ে গিয়ে খুব সংকোচের সঙ্গে বললাম, 'হ্যাঁরে, তোকে তো আমার একটা কিছু দেবার দরকার। তোর তো দেখলাম সবই আছে। কি নেই বল্‌তো? কি নিবি?'

কৌশিক খুব ক্যাজুয়ালি বললো, 'দিতেই হবে? আচ্ছা তাহ'লে মাধ্যমিকের একটা 'লাস্ট টাইম সাজেশানস' কিনে দাও।' আমি হতভম্ব হয়ে আমার ভাগিনেয়র স্পর্ধিত অশিক্ষিত মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

আমার দাদার প্রতিবেশী মিঃ ব্যানার্জির দিকে অবশ্য আমি এতটা বিস্মিত হয়ে চাইতে পারিনি। যোধপুর পার্কের এই অহংকারী কস্ট-অ্যাকাউটেন্ট ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন চায়ের টেবিলে, 'আমার সব রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড ইনভেস্টমেন্ট বুঝলেন?'

'কি রকম?' আমি জানতে চাইলাম।

ব্যানার্জি বললেন, 'আমার ছেলে শৌভিক যখন মাধ্যমিক দেয় তখন চারজন টিউটর রেখেছিলাম। টু হানড্রেড ইনটু ফোর, দ্যাট ইজ এইট হানড্রেড পার মান্‌থ্‌। তার মানে একবছরে ন হাজার দুশো টাকা। ব্যাস, পাশড উইথ স্টার মার্কস্‌। বুঝলেন?'

: বুঝলাম। তারপরে কি করলেন?

: তারপরে উচ্চমাধ্যমিক আর জয়েন্ট এনট্রান্সের জন্যে ছ'জন টিউটর রাখলাম। এবারে একটু বেটার স্টাফ, মানে কলেজ টিচার্স। পার হেড থ্রি হানড্রেড। তার মানে মাসে আঠারোশো। অর্থাৎ আঠারোশো ইনটু চব্বিশ মাস অর্থাৎ অ্যারাউণ্ড চুয়াল্লিশ হাজার টাকা।

: ফলাফল?

: শ্রীমান এখন কানপুর আই আই. টি-তে আছে। সেখান থেকে সোজা স্টেটস্‌ চলে যাবে। টাকা বেড়ি হয়ে যাবে ততদিনে।

আমার মন প্রাণপণে বলে কোনোভাবে ব্যানার্জির এই আত্মবিশ্বাসী স্বপ্নটা কি ভাঙতে পারে না? আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে ব্যানার্জির সন্তান শৌভিক ভবিষ্যতে কেমনতর মানুষ হবে। দেশপ্রেমী, বন্ধুবৎসল, সমাজচেতন, পরোপকারী, পরদুঃখকাতর, ত্যাগী, দয়ালু, দরিদ্র-বান্ধব—এর কোনো একটা বিশেষণ কি তার আচরণ বা কর্ম দেখে বসানো যাবে তার নামের আগে? যদি না যায় তবে এই রেজাল্ট-ওরিয়েন্টেড শিক্ষা কোন্‌ কাজে লাগবে?

বরং আমার ভাবতে ভালো লাগে চাকদহের অরূপ দাসের কথা। অনুন্নত

এক গ্রামের অজানা এক শিক্ষকের সন্তান অরূপ। বাবার অনামী বিদ্যালয়কেই সে বিখ্যাত করে দিয়েছে মাধ্যমিকে প্রথম হয়ে আজ থেকে ছবছর আগে। বালিগঞ্জ নিবাসিনী একজন অরূপের সাফল্য দেখে আমাকে বলেছিলেন, 'এবারে পর্ষদ্ ষড়যন্ত্র করেছে কলকাতার কাউকে ফার্স্ট হতে দেবে না। আপনি ভাবতে পারেন কলকাতায় কত ভালো ভালো ছেলেমেয়ে আছে, তাদের কত টিউটর আছে? কত জ্ঞান, কত সুযোগ। তারপাশে কোথাকার কোন্ চাকদার অরূপ দাস। অসম্ভব।'

মুস্কিল, যে, এবছর সেই অরূপ দাসই আবার উচ্চমাধ্যমিকে ফার্স্ট হয়েছে। এবারে সেন্ট বালিগঞ্জ নিবাসিনীর মন্তব্য শোনা হয়নি এখনও। তবে মনে আছে মাধ্যমিকে প্রথম হয়ে অরূপ যা বলেছিলো। তাকে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন, প্রথম হওয়া উপলক্ষে তার কি বলবার আছে। সে বলেছিলো, আমাদের ইস্কুল যাবার রাস্তাটা খুব খারাপ। বর্ষায় বড্ড কাদা হয়। রাস্তাটা যেন ভালো হয়। আর আমাদের ইস্কুলের কয়েকটা ঘরে বৃষ্টি হলে জল পড়ে। ওগুলো যেন সারানো হয়।

ব্যানার্জির সন্তান শৌভিক আর অরূপ, দুজনের মধ্যে কার শিক্ষা যথার্থ আর ফলপ্রদ?

কিংবা অন্য একটা দিকও ভাবা যেতে পারে। সব সময়ে ফার্স্ট, সেকেণ্ড হওয়া ছাত্রছাত্রীদের কথাই যে আমরা ভাববো বা গুরুত্ব দেবো তার কি মানে আছে? শিক্ষা-অশিক্ষার এই দারুণ দুর্যোগের দিনে সাধারণরাও তো অসাধারণত্ব দেখাতে পারে। দেবদাস ভট্টাচার্যের কথাই ধরা যাক।

তার বাবা ছিলেন বৃত্তিতে পুরোহিত কিন্তু স্বভাবে বাউণ্ডুলে। এদিকে পাঁচ ছটি সন্তান। তাদের মা নেই। তাই সংসারে শ্রীছাঁদ নেই। দারুণ দারিদ্র্য। দেবদাস বড় ছেলে। পড়তো আমাদের কলেজে প্রিইউনিভার্সিটি ক্লাশে। একদিন বেলাশেষের টিউটোরিয়ালে তার শুকনো ম্লান মুখখানি দেখেই মনে হলো সারাদিন কিছু খায়নি। সেকথা জিগ্যেস করতেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। তাকে বাড়ি এনে খাইয়ে দাইয়ে সব বিবরণ জানা গেল।

দেউলিয়া বলে একটা গ্রামে তাদের বাড়ি। সেখান থেকে বাইশ মাইল দূরে এই কলেজ। প্রতিদিন ভোর পাঁচটায় দুটো চিঁড়ে মুড়ি চিবোতে চিবোতে তার স্টেশনের দিকে যাত্রা সুরু। মেঠো পথে চার মাইল। তারপরে ট্রেন। ট্রেন থেকে নেমে আমাদের শহরে আটটা থেকে দশটা দু বাড়িতে টিউশনী। তারপরে সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে চারটে কলেজ করে

আরেকটা টিউশানী সেরে বাড়ির ট্রেন। আবার হাঁটা মেঠোপথে। তারপরে সেই বাউণ্ডুলে সংসার। দুটো ভাতের প্রত্যাশা। 'দেবদাস তুমি তাহলে পড়বে কখন?' প্রশ্ন শুনে সে কাঁদে।

তাকে উদ্যম করে শহরে আনি। একে তাকে ধরে থাকার ব্যবস্থা করি। জুটে যায়। বই জোগাড় করে দিই। বলি,'বাড়ির প্রতি নির্মম হও, নইলে তুমি দাঁড়াতে পারবে না। তুমি দাঁড়ালেই ভাইবোন মানুষ হবে।' তাকে একসেট জামা পায়জামা কিনে দেবো বলে দোকানে নিয়ে গিয়ে বলি, 'দেবদাস, তুমি কেমন দামের জামা পাজামা পরো? তার চেয়ে দামি জিনিস কিনবো না।' মনে আছে দেবদাস আমাকে সচকিত করে বলেছিলো, 'স্যার, আমি কোনোদিন নতুন জামাকাপড় পরিনি। স্টেশন বাজারে পুরোনো সেলাই করা জিনিস কিনে পরি।'

আমি দেবদাসের দিকে অপলক চেয়ে থাকি। বুঝতে পারি বড় কঠিন বাজি ধরে বসেছি। তবু জিততে তো আমাকে হবেই। এবারে আর অশিক্ষার সঙ্গে নয়, দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই।

সে লড়াইতে আমি আর দেবদাস জিতে যাই, তবে ব্যানার্জির মত রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড জিত সেটা নয়। কিন্তু মহত্তর। দেবদাস প্রি. ইউ পাশ করে একটু উচ্চাশা সম্পন্ন বিষয়ে অনার্স নেয়। ইংরাজি। নানা কারণে বিষয়টা ঠিক দেবদাসের মত মরা গরীবের পক্ষে ভোগ্য নয়। তবু সে লড়ে। সে লড়াই কঠিনতর। কারণ এবারে সে প্রথমে যে-বাড়িতে গার্জেন-টিউটর হয়ে ঢোকে নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করবার লোভে, অচিরে দেখা গেল সেখানে গৃহকর্তা সন্ধ্যে থেকে বসান জুয়ার আসর। রাত বারোটা পর্যন্ত চলে হৈ চৈ চেঁচামেচি। আর মাঝে মাঝেই গৃহকর্তা হাঁক পাবেন, 'মাস্টার, যাও কেটলি নিয়ে দোকান থেকে চার কাপ চা নিয়ে এসো।' তাহলে দেবদাস দিনান্তে সুস্থির হয়ে দু দণ্ড পড়বে কখন?

তাকে এই নরককুণ্ড থেকে উদ্ধার করেন প্রীতি দিদিমনি নামে এক শিক্ষিকা। তাঁর কন্যাকে দেবদাস পড়াতো। এবারে একটু যেন স্বস্তি এলো। কিন্তু সে আর কদিন? প্রীতি দিদিমণির বেকার স্বামী ছিলেন উগ্রচণ্ড রাগী আর মাতাল। সেটা দেবদাস প্রথমে ধরতে পারেনি কারণ তিনি মদ্যপান করতেন বাড়ির বাইরে। বাড়িতে নেশায় বুঁদ হয়ে গম্ভীর থাকতেন। একদিন ভদ্রলোক খুব গম্ভীরভাবে দেবদাসকে সহৃদয় কণ্ঠে বললেন, 'দেবু, আমার এক বন্ধুর কাপড়ের ব্যবসা। বিশটাকা জোড়ায় সামান্য ধুতি এক-

জোড়া কাপড় পাওয়া যাচ্ছে, কিনবে? তাহলে টাকা দাও।' টাকাটা নিয়ে তো ভদ্রলোক বিকেলে রওনা দিলেন, ফিরলেন রাতে। কোনো উচ্চবাচ্য নেই। বসে রইলেন বুঁদ হয়ে। দেবদাস অনেকক্ষণ পরে সাহসে ভর করে গিয়ে বললো, 'মেসোমশাই, কাপড় এনেছেন?' নেশাড়ে মানুষটা রক্তচক্ষু মেলে বললেন, 'কাপড় কিসের?' দেবদাস বললে, 'ঐ যে বিকেলে টাকা নিলেন আমার কাছে, কিনবেন বলে?'

'চোপ' গর্জে উঠলেন ভদ্রলোক। তারপরেই সপাটে এক চড়, 'গেট আউট ফ্রম মাই হাউস'। দেবদাস এতখানি বয়সে কখনও মার খায়নি। সে হতভম্ব হয়ে গেল।

ছুটে আসেন প্রীতি দিদিমণির রান্নাঘর থেকে। তিনি কিছুই জানতেন না। সব শুনে তিনি স্বামীকে বললেন, 'ছিছি, তুমি এতদূর নীচ হয়ে গেছ যে দেবুর মত গরীব ছেলের অত কষ্টের জমানো পয়সায় মদ খেয়ে এসেছো? ছেলেটাকে এত ধোঁকা দিলে? ছিঃ।'

'চোপ' বলে আবার গর্জে উঠে এবারে তিনি প্রচণ্ড কিল চড় লাথি চালাতে লাগলেন প্রীতি দিদিমণির ওপর। তারপর সারারাত কীভাবে যে দুঃস্বপ্নের মত কেটেছে।

ভোর হতেই দেবদাস সটান আমার বাড়ি। সব শুনে গম্ভীর হয়ে যাই। তারপরে একটা জলদি সিদ্ধান্ত নিই। দেবদাসের পড়া শেষ হতে তখনও ছ'বছর। কিন্তু তাকে রাখার ব্যবস্থা করি এক বোর্ডিঙে। কিছু আর্থিক দায় এসে যায়। তা আসুক।

শেষ পর্যন্ত সে কিন্তু সসম্মানে বি. এ পাশ করে। অর্থাৎ ইংরাজিতে অনার্স নিয়ে। নম্বরটা হয়ত ঠিক আমাদের দুজনের প্রত্যাশামত হয় না। তবু এ সাফল্যের দাম অনেক। বুদ্ধিমান বুঝমান দেবু এম এ পড়ার অমোঘ আকর্ষণ ত্যাগ করে গ্রামের স্কুলে মাস্টারি নেয়। বছর দশেকের মধ্যে সংসারের মধ্যে ছন্দ আনে। ভাইদের পড়ায়, বোনদের বিয়ে দেয়। বাবা অবশ্য বাঁচেন না। এরপর বিজ্ঞাপন দেখে আমাদের শহরের একটা নামী উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে দরখাস্ত করে ইন্টারভিউ দিয়ে সে সফল হয়। তার জীবন গঠন করেছে যে-শহর তার প্রতি একটা টান ছিল তার। সেখানেই সে স্থিতু হ'লো।

তারপর তো পনেরো বছর গত হয়েছে। দেবদাসের সঙ্গে যে প্রায়ই দেখা হয় তা নয়। তবে প্রায়ই দেখি একটা মোপেড চড়ে দেবদাস চলেছে।

পেছনে স্ত্রী, সামনে কন্যা। ভেতর ভেতর দেবুর মনে একটু সৌখীনতার স্বপ্ন ছিল বুঝতে পারি যখন দেখি সে সিল্কের সার্ট পরতে ভালবাসে। সৎ পরিশ্রমী ছাত্রদরদী শিক্ষক বলে শহরে দেবদাসের খুব নাম হয়েছে। টিউশ্যনীর কাজটাও সে ছাড়েনি। কেননা একটা বোনের বিয়ে বাকি আছে আর তাছাড়া

একদিন দেবদাস সসম্ভ্রমে সলজ্জে তার নিজের বাড়িতে নেমন্তন্ন ক'রে নিয়ে গেল। দেবদাসের নিজের বাড়ি? আমার ভেতরটা বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে আসছিলো। তিল তিল ক'রে জমানো কত কষ্টের টাকা আর কো-অপারেটিভের ঋণ দিয়ে তৈরি দেবদাসের নিজের বাড়ি। নিজের মত ক'রে সাজিয়েছে, সঙ্গে একটু বাগান। লক্ষ্মীমন্ত এক নম্র নীরব স্ত্রী আর ফুটফুটে একটা মেয়ে। আমার মনটা আশীর্বাদে শুভেচ্ছায় নম্র হয়ে আসে তাদের প্রণাম নিতে। দেবদাস আমাকে একটা ধুতি আর পাঞ্জাবির কাপড় দিয়ে প্রণাম করে। যে কোনোদিন নতুন-কেনা পরিধেয় পরতে পায়নি এককালে, আজ সে বস্ত্রদানে সমর্থ হয়েছে। আমি ভালবেসে তা বুকে চেপে ধরি।

তাই ব'লে খুব একটা যোগাযোগ রাখি না দেবদাসের সঙ্গে। দেখি দূর থেকে তাকে, শুনি তার যশ আর পড়ানোর খ্যাতি। ভাবি, বেড়ে উঠুক সেই লতাগুল্ম নিজেরই শেকড়ের জোরে। গ'ড়ে নিক নিজেরই আকাশ আর মাটি। মনে পড়ে, একদিন শুষ্কপ্রায় রৌদ্রক্লিষ্ট এক লতায় আমি ধরেছিলাম সামান্য একটু ছায়াছত্র। সেচন করেছিলাম একটু স্নেহসলিল।

শিক্ষকের স্নেহঋণ সে শিক্ষক হয়েই শোধ করেছে। শৌভিক ব্যানার্জি তার পিতার দর্পিত অর্থে শুধু শিক্ষকের অর্জিত বিদ্যা কিনেছে। এ বিশ্বে কারুর কাছে তার ঋণ নেই। সে তাই নিঃস্ব।

শিক্ষা আর অশিক্ষার প্রভাব যে কোনো কারুর জীবনের সামনে মেলা আছে, কে তার থেকে কতটুকু নিতে পারে বলা কঠিন। আমাদের এক সহপাঠী বরাবর স্কুল জীবনে পরীক্ষায় প্রথম চারজনের মধ্যে থাকতো। উচ্চ শিক্ষার জন্যে কলকাতার এক কলেজে ভর্তি হয়ে স্থান পেলো হস্টেলে। সেখানে এক বখাটে রুমমেটের প্রভাবে একেবারে তলিয়ে গেল জীবনে। এর উলটোটাও দেখেছি। আমাদের শহরের দেবাংশু সান্যাল নামকরা লোক, অভিজাত সজ্জন। তাঁর বড় মেয়ে মণিদীপা ছিল আমার অনার্সের ছাত্রী। সেই সুবাদে আমার ছিল সান্যাল বাড়ি যাতায়াত। সান্যাল মশাইয়ের

তিন কন্যা। তারমধ্যে মেজ আর ছোটদুটি পিঠোপিঠি। সুন্দর ফুটফুটে খরগোসের মত। আমি যখন তাদের দেখি তখন তাদের একজন পড়তো ফাইভে, একজন ফোরে। নামদুটোও তাদের চমৎকার অহনা আর লহনা।

কালে কালে তাদের দুষ্টুমির নানা গুণপণা প্রকাশ পেলো। তবে খুবই বিনীত, বাধ্য, মঞ্জুভাষিণী। কেবল লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী নয়। তাদের বিপত্নীক জ্যাঠামশাই রিটায়ার করে থাকতেন পণ্ডিচেরী। শ্রীঅরবিন্দের দর্শনে ব্রতী। একবার গরমের সময়ে বেড়াতে এসে ভাইকে যুক্তি দিলেন মেয়েদুটিকে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে দেবার। অনেক ভাবনা চিন্তা করে তা-ই ঠিক হলো। তখন শ্রীমা জীবিতা, তাঁর অনুমতি মিললো। একদিন কান্নাকাটি করে অহনা আর লহনা চলে গেল পণ্ডিচেরী।

দুজনের মধ্যে অহনা ছিল খুবই নরম ধরনের আর লাজুক। বাইরের লোকের সামনে কথাই বলতে পারতো না। তার ওপরে খাওয়া শোওয়া সব বিষয়ে পিটপিটে। খেলাধুলায় একেবারে আগ্রহ ছিল না। ঘরে বসে গল্পগুজব করতে ভালবাসতো। তাকে নিয়েই তাই চিন্তা হলো বেশি। কারণ পণ্ডিচেরীর শিক্ষাজীবন খুবই কঠোর। শারীর শিক্ষার খুবই কড়াকড়ি। সবাইকেই সেখানে জিমনাস্টিকস্, সাঁতার, ডাইভিং এবং দৌড়ে পটু হতে হয়।

বছর খানেকের মধ্যে তাদের বাবা-মা বারচারেক ঘুরে এলেন পণ্ডিচেরী। জানা গেল অমন তুলতুলে খরগোসের মত দুই বোন নাকি রোগা আর কালো হয়ে গেছে। তার মা বললেন, 'অবশ্য খুবই গরম জায়গা বলে বোধহয় অতটা কালো হয়ে গেছে। তবে ধকলও খুব। যা খাটায় আর লাফঝাঁপ করায়। তাই বলে ভাববেন না যে ওদের মন খারাপ। খাসা আছে। ফ্রেঞ্চ আর তামিল ভাষা খানিকটা শিখে ফেলেছে। বন্ধুবান্ধব জুটে গেছে। টিচাররা বললেন বিশেষ করে অহনার ফ্রেঞ্চ শেখবার স্বাভাবিক প্রবণতা আছে।'

সব শুনে বেশ ভালই লাগলো। শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশের গুণে প্রবণতা এইভাবেই বোধ হয় ধরা পড়ে। জানতে চাইলাম, 'কবে ফিরবে তারা?'

: দু বছরের আগে একবারও আসবে না। তারপর মাঝে মাঝে। কিন্তু চিন্তা সেজন্যে নয়। চিন্তা এই, যে পণ্ডিচেরীতে যে শিক্ষাব্যবস্থা তাতে কোনো ডিগ্রি ডিপ্লোমা নেই। ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই খুব ভাবিত আমরা। সাধারণত ওখানকার শিক্ষাশেষে ওখানেই থেকে যায় সবাই। আশ্রম তো। অনেকে বিয়ে করে না। তাছাড়া ওখানকার পরিবেশ থেকে এসে এখানে খাপ খাওয়াতেও পারে না। কি যে হবে মাস্টারমশাই।

দুবছর পরে অহনা-লহনা বাড়ি আসতে আমার ডাক পড়লো। আশ্চর্য পরিবর্তন সত্যি, বিশেষত অহনার। স্মার্ট, শক্তসমর্থ, পেটানো স্বাস্থ্য, তারুণ্যের সবল দীপ্তি, চোখেমুখে বুদ্ধির স্পষ্ট ছাপ। তাদের দিদি মণিদীপা একটা বাড়তি খবর দিয়ে বলে, 'জানেন মাস্টারমশাই, দুজনে যখন ঝগড়া করে সে একটা শোনবার মত জিনিস। তার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝবেন না।'

ঃ কেন?

ঃ ফরফর করে ফ্রেঞ্চ বলে। অহনা তো ফ্রেঞ্চে মাদারের সঙ্গে কথা বলে।

শুনে ভারি ভালো লাগলো, অবাকও হলাম। আমাদের শহরের একজন লাজুক সংকোচে জড়োসড়ো কোমল মেয়ে খোদ ফরাসী ভাষায় শ্রীমার সঙ্গে কথা বলছে ভাবা যায়? যথার্থ শিক্ষার কি ব্যাপক সম্ভাবনা। শিক্ষাপরিবেশ কতটাই পালটে দিতে পারে জীবনকে।

এরপরে অন্তত দশবছর অহনা-লহনার কথা জানতে পারিনি। চাকরিসূত্রে হয়ে গিয়েছিলাম প্রবাসী। কেবল মণিদীপার বিয়ের কার্ড একটা পেয়েছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, অহনা-লহনার কথা কিছুটা ভুলেই গিয়েছিলাম। অবশেষে একদিন ফিরলাম শহরে। কিছুটা নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সেদিন ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম পুরোনো আমার সেই শহরের প্রিয় সব অঞ্চল। ঘুরতে ঘুরতে শহরপ্রান্তে পৌঁছে গেছি কখন খেয়াল নেই। হঠাৎ চোখে পড়লো লতাপাদপ ঘেরা সান্যাল বাড়ি। আলো জ্বলছিলো। ঢুকে পড়লাম। বোঝা গেল পরিবারটির ওপর দিয়ে ভাগ্য বিপর্যয়ের ঝড় বয়ে গেছে। শ্রীমতী সান্যালের স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। তবু আন্তরিক সৌজন্যে অভ্যর্থনা করলেন।

দশ বছরের দীর্ঘ ব্যবধান মানুষকে খানিকটা নীরব করে রাখে অন্তত কিছুক্ষণ।

মণিদীপার কুশল বার্তা নিয়ে জানতে ইচ্ছে করলো অহনাদের খবর। লহনা এখনও পণ্ডিচেরীতেই রয়ে গেছে, তবে অহনা ফিরে এসেছে গতবছর। পরিবারটির ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেছে গতবছর। সেই খবর পেয়েই অহনা ফিরে আসে। শ্রীমতী সান্যাল বলেন, 'কি বোল্ড আর ফার্ম যদি দেখতেন। কি ইনার স্ট্রেঙ্গথ অব মাইণ্ড! ছেলে থাকলেও এমন পারতো না। সব কিছু একা সামলালো। তারপরে সোজা কলকাতায় আলিয়াস ফ্রাঁস-যে দেখা করলো, ডেপুটি হাইকমিশনার অব ফ্রান্সের সঙ্গে কথা বললো। কাজ জোগাড় করে নিলো।'

'তাই নাকি বাঃ'? আমি তারিফ করে বলি 'কি কাজ? কোথায়?'

: মধ্যপ্রদেশে একটা কোলাবরেটিভ প্রোজেক্ট হচ্ছে ভারত আর ফ্রান্সের মধ্যে। সেখানে ফ্রেঞ্চ একস্‌পার্টরা এসেছিল। তাদের ইন্টারপ্রেটারের কাজ। কী ভাগ্য বলুন?

ভারতে ভালো লাগে। ভাগ্য ঠিকই, কিন্তু অনেকটাই চারিত্রিক দৃঢ়তা আর আত্মশক্তি যা অহনা অর্জন করেছে একটা পরিকল্পিত শিক্ষার পরিবেশ থেকে। শিক্ষা এতটাই পারে। একজনকে একেবারে সমূলে তুলে ধরে। ভাষাশিক্ষাও যে এতটা কাজে লাগে এমনভাবে আগে ভাবিনি।

শ্রীমতী সান্যাল একটা অ্যালবাম বার করে বললেন, 'তিনমাস হলো মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে।'

: তাই নাকি? এটা তো আরও ভালো খবর। কোথায় হলো?

: ঐ ফ্রেঞ্চ এক্সপার্টদের একজনের সঙ্গে। জামাইয়ের ফটো দেখুন। নাম হলো ভেগা। খুব ভালো ছেলে।

সমুদ্রনীল চোখ মেলে অ্যালবাম থেকে ভেগা আমার দিকে চেয়ে থাকে। বিশ্বাস হয় না। খুসি খুসি চোখে চাই গর্বিতা জননীর দিকে। তাঁর গর্ব মেয়ে না জামাই কার জন্যে?

বললেন, 'জানেন মাস্টারমশাই, আমার মেয়ের জন্যে ভেগা একটা নতুন গাড়ি কিনেছে আর বাড়ির নাম রেখেছে 'অহনা'। এই দেখুন বাড়িটার ফটো।'

আনন্দে আবেগে আমার চোখ রুদ্ধ হয়ে আসে। আমার সামনে একটি ফরাসী-শৈলীর বাড়ি ভেসে ওঠে। তার সামনে হাস্যময়ী বিদেশিনীর মত মেয়েটি আমার কতই চেনা তবু কত অচেনা।

অহনার কথা মনে এলেই এখন আমার শিক্ষা-অশিক্ষার পরিবেশগত সুবিধে-অসুবিধের কথা ভাবনায় আসে। নিছক পরিবেশগত এরকম শিক্ষাধারা থাকতে পারে যা স্বতই গ'ড়ে তুলতে পারে শিক্ষার্থীকে। অহনার ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পণ্ডিচেরীর আন্তর্জাতিক শিক্ষা-পরিবেশ তাকে শুধু যে একটা ভিনদেশী ভাষায় দক্ষ করেছে তাই নয়, এনেছে চরিত্রের দৃঢ়তা, সহজ স্বচ্ছন্দ অন্তঃশক্তি। তার ভেতরটাকে বিকশিত ক'রে তুলেছে।

অথচ এই পরিবেশগত অক্ষমতার জন্যে কম শিক্ষার্থীকেই তেমন ক'রে গ'ড়ে ওঠা হলো না। খুব মনে পড়ে সেই সব গ্রাম্য স্কুল বা উদ্বাস্তু কলোনীর স্কুল-গুলোর কথা। একজন দুজন হয়তো ছটকে বেরিয়ে আসে, বাকি সব গড্ডলিকা স্রোতে প'ড়ে ম্লান বিবর্ণ অর্ধশিক্ষিত একটা সাধারণ ছাঁচে পরিণত হয়।

এছাড়া এমন শহুরে পরিবেশগত প্রতিবন্ধ আছে যা শিক্ষাবিরোধী। সেখানে দরকার শিক্ষার্থীর মধ্যে মোটিভেশন আনা। ভালো স্কুলে সন্তানকে ভর্তি করে তার জীবন গঠনের জন্য অভিভাবককে নিরন্তর লেগে থাকতে হয়। এমন এক লড়াই দেখি দীপন সেনের জীবনে।

দীপন আমার এক সম্পর্কিত ভাগনীর ছেলে। জন্মের সাতদিনের মধ্যে ভাগনী কমলার অনুরোধে আমি দীপনের নামকরণ করি। দীপন মানে উদ্দীপন আবার আলো-জ্বালা। নামটা যাকে বলে ইনস্পায়ারিং। এটা তো স্বাভাবিক যে যার নামকরণ করেছি তার জীবন বিকাশের ধারা সম্পর্কে একটা বাড়তি উৎসাহ থাকবে। তাই মাঝে মাঝে তাদের বাড়ি যাই। দীপনদের পৈতৃক সাবেক বাড়ি কুমোরটুলী অঞ্চলে একটু ঘিঞ্জির মধ্যে। গায়ে গায়ে বাড়ি। কিছুটা অস্বাস্থ্যকর। পাশেই বস্তি। খুব ছোটবেলা থেকে দীপনের ঐ বস্তির দিকে উৎসাহ কেননা এখানে তার কিছু বন্ধু আছে যারা তার খেলাধুলোর সঙ্গী। কমলা আর তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা ঐ সঙ্গ নিয়ে। উল্টোপাল্টা কথা বলে দীপন, একটু জেদী একরোখা। লেখাপড়ায় কিছুটা খেয়ালী। হঠাৎ হঠাৎ হাত চালায়, কাউকে না পেলে বাড়ির কাজের মেয়েটার ওপর। কমলাকে এটা বোঝানো যায় না একমাত্র সন্তানদের এ রকম হয়। তারা নিঃসঙ্গ বোধ করে। ভাই বা বোন থাকলে সে অনেক শান্ত স্বভাবের হতো।

দীপন যখন ক্লাশ ফাইভে উঠলো তখন কমলারা তার সম্পর্কে মতামত নিলো এক সাইকো-অ্যানালিস্টের। তিনি বললেন, দীপনকে সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত নানারকম কাজের মধ্যে বেঁধে ফেলতে হবে। মোটিভেট করতে হবে। লেখাপড়াতো তাহ'লে আরো ভালো করবে। সব শুনে আমি বললাম, 'তার মানে যার নাম দীপন, তার স্বভাবে আনতে হবে উদ্দীপনা।' সুরু হলো সেই লড়াই। প্রথমে কুমোরটুলির মাঠে ভোর বেলা ক্রিকেট কোচিং নেওয়া। বিকালে হেদোর জলে সাঁতার আর ডাইভিং।

খাটনিটা কমলারই তরফে বাড়লো। তা হোক সে হাসিমুখে তা মেনে নিলো সন্তানের ভবিষ্যৎ ভেবে। ক্রমে ক্রমে বছর চার পাঁচেক শ্রমে আর ধৈর্যে দীপন এখন প্রতিযোগিতামুখী কলকাতার জীবনে সামিল হয়েছে। হিন্দুস্কুল থেকে সে এবার মাধ্যমিক দেবে। গলাটায় বয়সে ধরেছে। একটু গোঁফের রেখা। এখন আর হেদো-কুমোরটুলীর সাঁতার বা খেলায় নিয়ে যেতে হয়না তাকে। বসে-আঁকো বা কুইজ প্রতিযোগিতার জন্য কমলাকে

এখন আর আঁকুপাঁকু করতে হয় না। রাতে বুক অব নলেজ চর্চা করতে হয় না। এখন তাদের বাড়ি গেলে দেখা যাবে পড়ার টেবিলে দীপন পড়ছে একমনে। অথবা অঙ্ক কষতে কষতে কানে ওয়াকম্যানে ক্যাসেট শুনছে জ্যাকসনের। তার পড়ার টেবিলের সামনের দেওয়াল ক্রিকেটারদের স্টিকারে ঘন সমাচ্ছন্ন। মাধ্যমিকে সে কটা লেটার পাবে তা নিয়ে কমলা এখন ভাবে।

অথচ এসব কোনো ভাবনাই তেমন ক'রে ভাবতে হয়নি আমার শ্যালিকা বিজলীকে। কেননা তার বিয়ে হয়েছে শান্তিনিকেতনে। তার অধ্যাপক স্বামী স্বভাব উদাসীন শান্ত এবং আত্মমগ্ন। কলকাতার উপকণ্ঠে বাড়ী, জীবিকা কলকাতাতেও ভালোই ছিলো। কিন্তু শান্তিনিকেতনের জীবন এই সত্তর আশির ছিন্ন পরিবেশেও ভালো লেগে গেল। আসলে আশ্রমিক জীবন সেখানে নেই নেই করেও অনেকটা এখনও আছে। যারা নিতে পারে তাদের জন্য খোলা আছে সত্র। ঠিকই যে শান্তিনিকেতনে এখন অনেক অশান্তি কিন্তু তার বাইরে আছে একটা শান্ত জগতের অলক্ষ্য ছন্দ। কথা হ'লো রবীন্দ্রনাথেরই কথায়, 'পারবি কি তুই যোগ দিতে সেই ছন্দেরে?' বিজলীরা পেরেছিলো।

তাদের সংসারে যখন একটি পুত্রসন্তান জন্মালো তখন তার নাম রাখা হ'লো উৎস। তখনও জানা ছিল না যে সেখানকার জীবন যাপনের সহজ উৎসে কতখানি প্রাণরস ছিল। ক্রমে আনন্দ পাঠশালার শিশুদিনগুলো যাপন ক'রে সে পাঠভবনে এলো। অজস্র আনন্দময় উৎসমুখের উৎসারিত আলো এবারে তার জীবনকে ঘিরে ধরলো। কেউ তাকে তেমন করে পাঠ দেয়নি তবু উৎস দিব্যি গান গায়। বাসন্তী রঙের পাঞ্জাবী আর সাদা পাজামা পরে শিশু শালতরুর মতো একহারা চেহারার উৎস ভোরে উঠে বৈতানিকের দলে গান গায়, 'এই তো ভালো লেগেছিলো আলোর নাচন পাতায় পাতায়'। দেখতে দেখতে তার গানের গলা খুলে গেল। বললে দুদশখানা গান পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই গেয়ে দিতে পারে। মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে স্কুল কিংবা খোয়াইয়ের পথে চলে যায়। পাঠভবনের সাহিত্য পাঠের আসরে সহজ গল্পে মনের কথা লিখে পড়ে। উৎস যেন আনন্দ আর সৃজনের উৎস হয়ে ওঠে। বাবা মা-র গর্ব গৌরবের সন্তান। অথচ বাবা মা তাকে তেমন ক'রে মেটিভেট করেন না। দেখাই যাক না কী হয়। উৎস রংতুলি নিয়ে মাঠে মাঠে বসে যায়। এটা ওটা নিয়ে মূর্তি গড়ে। লেখাপড়াতেও তার মনোযোগ সমান।

দেখতে দেখতে পাঠভবনের নবমশ্রেণীতে উঠে যায় উৎস সহজ স্বাচ্ছন্দ্যে। ইতিমধ্যে সেবার বসন্তোৎসবে পাঠভবনের ছাত্রছাত্রীরা গৌরপ্রাঙ্গণে সকলের সামনে 'তাসের দেশ' অভিনয় করলো। উৎস তাতে রাজপুত্রের ভূমিকায় চমৎকার নেচে ছিলো। খবরটা শুনে মনে হ'লো রবীন্দ্রনাথ এমনটাই তো চেয়েছিলেন তাঁর শিক্ষাচিন্তায়। ভেবেছিলেন প্রকৃতির বুকে যেমন সহজে ফুটে বেরোয় প্রাণের তাপ তার বর্ণগন্ধ নিয়ে, তেমনই শান্তিনিকেতনের আশ্রমের পরিবেশে ফুটে উঠবে শিক্ষার্থীর নানা সৃজনের প্রাণবেগ। 'উৎস'র বাবা মা কি ভেবেছিলেন যে তাদের সন্তান এত সহজে গেয়ে উঠবে গান, আবার নাচবেও? অবশ্য সেসব গান বা নাচের মান যে একেবারে অতি উচ্চাঙ্গের তা তো নয়। তবু বিশ্বভারতীর সাধারণ মান সারাদেশের গড়পড়তা মানের চেয়ে অনেক উঁচু অন্তত নাচ গান আর ছবি আঁকার ক্ষেত্রে।

এরপরে রবীন্দ্রজন্মের একশো পঁচিশ বছরে এসে গেল এক অভাবিত সুযোগ। লণ্ডনে আয়োজন হ'লো এক রবীন্দ্র উৎসবের। শান্তিনিকেতন থেকে একটা নাচ গানের দল গেল তাতে অংশ নিতে। সে দলের পঁচিশ জনের মধ্যে উৎসও হ'লো একজন। দুটো নৃত্যনাট্যে নাচবে, গানের দলে কোরাস গাইবে। বিজলী আনন্দে উচ্ছ্বাসে দিশাহারা। উৎসব থেকে ফিরলে দেখা করতে যাই। অ্যালবামে ফটো দেখি। সত্যি কার জীবনে উৎসমুখ যে কোন্ দিক থেকে খুলে যায় কে জানে? বিজলী খানিকটা কপট অনুযোগের সুরে বললো আমাকে, 'সত্যি আমার কিছু ভাবনা হচ্ছে এবার। ছেলেটা কি আমার নাচিয়ে হয়ে যাবে? লেখাপড়া শিখবে না নাকি?'

আমি বলি, 'লেখাপড়া তো ভালই শিখছে। তার সঙ্গে এমন সুযোগ আর কজন পায়? ভাবো তো, উৎস যদি কলকাতায় পড়াশুনো করতো তবে কি নাচ গানের দলে এমনভাবে বিলেত যেতে পারতো? আর তাছাড়া শান্তিনিকেতনে উৎস যদি ভবিষ্যতে সঙ্গীত ভবনের ছাত্র হয় তাতেই বা ক্ষতি কি?'

যাকে নিয়ে এত কথা সেই উৎস তখন নির্বিকারভাবে একটা মাটির পুতুল গড়ছিলো। তার ভেতরের স্থিতধী সত্তায় বিলেত ভ্রমণ কোনো উত্তেজনা আনে নি দেখলাম। শান্তিনিকেতনের এও হয়তো একটা শিক্ষা যা ভেতর-ভেতর গড়ে ওঠে। তাকে বললাম, 'নাচ গান তোর ভালো লাগে?'

: হ্যাঁ

: ভবিষ্যতে কি নাচ গানকে জীবিকা করবি ভাবছিস!

: না। আগে মাধ্যমিক পাশ করবো। তারপরে বিজ্ঞান পড়বো ইচ্ছে আছে। নাচ গান শেখবার কোনো অসুবিধেতো নেই এখানে। শিখে নেবো।

ভেবে দেখলাম উৎসব জন্য কোন সাইকো-অ্যানালিসিস লাগেনি। যাকে বলে সেল্‌ফ মোটিভেটেড।

কিন্তু এসবের বাইরেও কিছু ঘটনা থাকে, থেকে যায় এই দেশের এক বিশাল ছাত্রসমাজ। তাদের সবাই দীপনের মত সুপরামর্শ বা মোটিভেশন পায় না, কিংবা উৎসর মত পাযনা প্রাণবিকাশের পারিবেশিক ধারা। এদেরই একজনের নাম বিজন দাস। যার বাবা গরীব উদ্বাস্তু। উঠেছেন এসে এক গ্রাম্য কলোনিতে। স্বামী স্ত্রী আর তিনছেলে। গতর খেটে খাওয়া। বিজনের বাবা ট্রেনের ফল বিক্রেতা। বিজনের দাদা স্কুলের ড্রপ আউট। আপাতত তাদের গ্রামে ভ্যান রিক্সা চালায়। বিজন কিন্তু ছোটবেলা থেকে মেধাবী। বিদ্যায় তার বিপুল আগ্রহ। প্রাইমারী ক্লাস থেকে স্কুলে সে প্রথম হয় একেবারে নিজের চেষ্টায়। মাস্টার মশাইদের একটা আলাদা নজর আছে অবশ্য তার উপর। তাদের মত দরিদ্র খেটে খাওযা পরিবারে লেখাপড়া চালিযে যাওয়া একটা বড স্বপ্ন।

সেই স্বপ্নে একটা বড ধাক্কা লাগে যখন বিজন মাত্রই ক্লাশ ফাইভের ছাত্র। তাদের চালাঘরের পেছন দিকে কোনো সমাজবিরোধী দল রেখে গিয়েছিল একটা শক্তিশালী হাত বোমা খড়ের মধ্যে ঢেকে। হয়তো প্রয়োজনমত কোনো এ্যাকশানে সেটা চটজলদি কাজে লাগাবার মতলব ছিল তাদের। বিজনের ভাই সুজন তখন নিতান্ত বালক। বাড়ির আনাচে কানাচে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎই জিনিসটা দেখতে পেযে বিজনের কাছে এনে বলে, 'দাদা, এই ছাখ্‌ একখানা বল।' বিজন সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে কি যে হয়, প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে যায। তাতে উড়ে যায় বিজনের ডানহাতের অনেকটাই।

জেলা হাসপাতালে যতজন তার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তারমধ্যে বিজনের শিক্ষকরাই ছিলেন সংখ্যায় বেশি। তাঁদের মধ্যে বিজনের প্রিয় মাস্টারমশাই শুভজিৎ বাবু ছিলেন। সবাই সান্ত্বনা দিযে চলে যাবার পর বিজন স্যারকে ডেকে বলে, 'স্যার, আমাকে একটা খাতা পেন্সিল এনে দেবেন?'

শুভজিৎ অবাক হযে বলেন, 'এখন, এই অবস্থায খাতা পেন্সিল কি করবি?'

শান্তকণ্ঠে বিজন বলে, 'এখন তো অনেকদিন এখানে থাকতে হবে। ততদিনে বাঁ হাতে লেখা অভ্যাস করি। আমি তো আর ডানহাতে লিখতে পারবো না স্যার।'

শুভজিৎ আমায় বলেছিলেন, তিনি কোনরকমে চোখের জল লুকিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন হাসপাতাল থেকে। কিন্তু একটা কথা তাঁর বোঝা হয়ে গিয়েছিল। বুঝে ছিলেন, লেখাপড়া বিজন করবেই এবং তাঁর জীবন অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িয়ে গেল বিজনের সঙ্গে। এইবারে সুরু হলো সেই লড়াই। দৈহিক প্রতিবন্ধিতার সঙ্গে মনের তীব্র সঙ্কল্পের লড়াই।

এতো কোনো মুখরোচক খবর নয় যে সংবাদপত্রে বেরোবে। কিন্তু বিজন-শুভজিৎদের মত একরকম জেদের দাঁতে-দাঁত-চেপে লড়াই চলছেই সারাদেশে। শুভজিৎ কেবল যে বিজনের জন্যে বিদ্যাদানে তৎপর থেকেছেন তাই নয় তার মনকে চাঙ্গা রাখতে সবচেয়ে সতর্ক থেকেছেন। অবশ্য বিজনের স্কুলের সব শিক্ষকই তার প্রতি নজর রেখেছিলেন।

কিন্তু আসল কাজটা বিজনকে তো একাই করতে হয়েছে। তার ভেতরে নির্মাণ ক'রে নিতে হয়েছে আরেকটা বিজনকে। সে সঙ্কল্পবদ্ধ, দৃঢ়, অবিচল লক্ষ্য। সে অপরের সহানুভূতি কুড়িয়ে বাঁচবে না। তাকে তো কতজনই নিরস্ত করতে চেয়েছে। দারিদ্র্য আর দুর্ভাগ্য—এই দুটো বড় শত্রুর সঙ্গে কি একা লড়া চলে? প্রথম প্রথম সে কেঁদেছে নিজের অক্ষমতায়, অন্যদের টিটকারিতে। বামন হয়ে চাঁদে হাত। ঠুঁটো জগন্নাথ। এসব কথা তাকে হজম করতে হয়েছে। পাশাপাশি সহৃদয়জনের শুভেচ্ছাও ছিল বৈকি। তবে তার বাবা স্পষ্টই হতাশ হয়ে পড়েছিলেন, মা আড়ালে কাঁদতেন। দাদা উৎসাহ দিতো গোপনে চুপি চুপি, রাতে পাশে শুয়ে।

আসলে মানুষের স্বভাব পালটানো যেমন কঠিন, তেমনই কঠিন দৈহিক প্রবণতাকে পাল্টানো। বিজন তো কোনদিন ল্যাটা ছিল না, তাই বাঁ হাতে লেখা স্পষ্ট করে লেখা, বা সবচেয়ে যা জরুরী—দ্রুতবেগে লেখা, তা আয়ত্ত করতে তার বহুদিন লেগেছে। অবশেষে তার প্রথম পর্যায়ের জয় এসেছে। ক্লাস এইট নাইন থেকেই তার সম্পর্কে শিক্ষকরাই আশাবাদী হয়ে ওঠেন। গতবছর বিজন মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে আমাদের বাড়ি এসেছিলো সুভজিতের সঙ্গে। শুভজিৎ আমার ভাইয়ের মত। তাকে বলেছিলাম, বিজনকে আমি একদিন দেখতে চাই।

সামনাসামনি তাকে এই প্রথম দেখে মনে হলো একাগ্র সঙ্কল্পের স্বপ্নময় বিজনতা মাখানো তার দুই চোখে। বললাম, 'পাশ ক'রে কী পড়বে? আর্টস না সায়েন্স?' বিজন বললো, 'সায়েন্স'। আমি বললাম, 'কি ক'রে পড়বে

সায়েন্স? একখানা হাতে কি ল্যাবরেটরির কাজ করতে পারবে?' বিজন তার স্বপ্নস্বচ্ছ চোখ দুখানি মেলে বললো, 'ঠিক পারবো। কেন পারবো না।'

ঠিক পনোরো দিন পরে বিজন এলো তার একমাত্র সক্ষম হাতে এক প্যাকেট মিষ্টি নিয়ে। প্রণাম ক'রে বললো, 'স্যার পাঠিয়ে দিলেন। আমার রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ।'

উদ্বেগ উৎকণ্ঠা ছিলই মনে। বললাম, 'কেমন হ'লো?'

ঃ চারটে লেটার, স্টার।

বহুরকম সফলতার কারণে মিষ্টিমুখ করেছি জীবনে, এমন মিষ্টি কখনও লাগেনি।

অমা নিশীথিনীতে মাঝে মাঝে তিনতলার ছাদে উঠে তারকাপুঞ্জ দেখি। মনের মধ্যে কত রঙের ভাবনাস্রোত বয়ে যায়। সুদীর্ঘ শিক্ষকতার জীবনে দেখা জানা নানা সফলতা আর বিফলতার কথা মনে আসে। দেবদাস-অহনা-উৎস-দীপন সকলের কথা ভাবি। বিশেষ ক'রে বিজনের কথা মনে আসে। কিন্তু এত সব উজ্জ্বলতার আলো ম্লান হয়ে আসে যখন নিভৃতক্ষণে নিজের মেয়েটির কথা ভাবি। তার কথা, তার অক্ষমতার কথা তো ভুলে থাকতেই চাই। তবু তা হানা দেয় মাঝে মাঝে। যেন বইয়ের মধ্যে চেপে রাখা শুকনো ফুলের গন্ধের মত। তখন মনের মধ্যে একরকম ক্ষরণ সুরু হয়।

শিক্ষার কোনোরকম আলোই আমার মেয়ের চোখে বিচ্ছুরিত হয়নি, হয়না। কেননা সে জন্ম থেকেই জড়বুদ্ধি। তাই আমি যেন সেই বাতিওয়ালা যার ঘরেই আলো জ্বলেনা। তার দুটি চোখ বোধহীন, তার ওষ্ঠ কোনোদিন ভাষার তাপে কাঁপেনি। এত বড় একটা বিরাট বিচিত্র বিশ্বে তার কিছু বোঝবার নেই, বলবার নেই। আমাদের বেদনাবিহত গৃহকোণ ছাড়া তার থাকার জায়গাও কোথাও নেই। দুরারোগ্য সেরিব্রাল পল্‌সি ব্যাধি তার মস্তিষ্ক আর স্নায়ুকে অসাড় ক'রে দিয়েছে, কেবল প্রকৃতির অভ্রান্ত করুণ নিয়মে তার শরীরটা বেড়ে উঠেছে। সেই শরীরের ওপর অবশ্য তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। সে কেবল তার জড়তা নিয়ে বসে থাকে চোখ মেলে।

এদেশে তার মত জড়বুদ্ধির সংখ্যা আঠাশ লক্ষ, কিন্তু তাদের জন্য সরকারি বা বেসরকারি কোনো আবাস নেই। এ জাতীয় প্রতিবন্ধীর অস্তিত্ব কেবল তার পরিবারের প্রতিবন্ধিতা এনে দেয়। এদের নিরাময়ের কোনো ঔষধ নেই, নিষ্ক্রমণের কোনো পথও নেই। দয়াময় মৃত্যুই কেবল এদের ত্রাতা।

কতবার ভেবেছি কোনো একটা হোম পাওয়া যায় না, যে কোন দামে, যেখানে তাকে রাখতে পারি। আবার ভাবি আমার জীবনের দায় কেন অন্যে বইবে? যদিও বা বয়, তবে কি সেটা হবে না আমারই আত্মপ্রবঞ্চনা? 'তোমার হাতের বেদনার দান এড়ায়ে চাহিনা মুকতি' রবীন্দ্রগানের এই পংক্তি মাঝে মাঝে ভাবি। কিন্তু এক্ষেত্রে বেদনার দান যে বড় দুঃসহ দুর্বহ। বুঝতে পারি পৃথিবীর মধ্যে কঠিনতম শাস্তি হ'লো সন্তানের ব্যর্থতা বিফলতাকে বুঝে নেওয়া।

এসব দুঃসহ অস্তিত্বের মধ্যেও মাঝে মাঝে একঝলক বাতাসের মত খবর আসে। কোথাও একটা জড়বুদ্ধিদের জন্য নিকেতন খোলা হচ্ছে। পরে খোঁজ খবর নিয়ে হতাশ হ'তে হয়। কিন্তু সম্প্রতি মাস কয় আগে নিশ্চিত খবর আনলেন একজন, বেহালার সখের বাজারের ভেতরের দিকে এক বিদেশিনী একটি আবাস খুলেছেন। খবর নিতে অনেক খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে পৌঁছোলাম। প্রাথমিক সংবাদেই অবশ্য খানিকটা হতাশ হ'তে হ'লো। কেননা আবাসও সত্য, বিদেশিনীও সত্য, কিন্তু জড়বুদ্ধিদের নয়, সেখানে আছে দৈহিক প্রতিবন্ধীরা। ইন্টার ন্যাশনাল স্প্যাস্টিক সোসাইটির একটা শাখা। হতাশ হয়ে চলে আসছি কিন্তু বিদেশিনীর ডাকে বসতে হলো। জানতে চাইলেন সমস্যা কি। সব শুনে ভাঙা ভাঙা ইংরাজিতে বললেন, তাঁর নাম মিশেল। ফ্রান্সের সরবোন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করতেন। ছুটি নিয়ে পি এইচ ডি ক'রে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়ে ইংলণ্ডে স্পাস্টিক সোসাইটির কার্যকলাপ দেখে তার সদস্য হয়ে এদেশে এসেছেন সেবার কাজে। আর ফিরবেন না লেখাপড়ার জগতে। এই তো যথার্থ কাজ।

আমি সম্ভ্রম ভ'রে তরুণী বিদেশিনীকে দেখি। তিনি এবারে আমাকে জিজ্ঞেস করেন আমি কি করি, আমার স্ত্রীই বা কি করেন। আমি বলি, 'আমরা দুজনেই কলেজে পড়াই'।

'সেকি?' বিস্ময়ে মিশেল বলে, আর আমার কাছে এসেছো জড়বুদ্ধি সন্তানের সমাধানের জন্য? তোমরা তো উচ্চশিক্ষিত, তোমরা বোঝোনি, এই ব্যাধির সামাজিক অসহায়তা?'

ঃ তার মানে?

ঃ তারমানে, তোমরা এক্ষুনি চাকরি ছেড়ে দাও। বাড়িতে নিয়ে এসো এলাকায় জড়বুদ্ধিদের। সবাইকে নিয়ে একটা সেবাসত্র গড়ে তোলো।

ঃ আমি?

ঃ হ্যাঁ তুমি এবং তোমার স্ত্রী। কিসের শিক্ষা তবে তোমাদের? নিজের সমস্যাকে ভাবছো একার? না না। সবাইকে নিয়ে ভাবো। টাকার অভাব হবে না। আমি জোগাড় ক'রে দেবো। তোমাদের মত যারা আঘাত খেয়েছে তারাই তো সমাধান করবে। নইলে কিসের শিক্ষা? স্কুল কলেজে পড়াবার লোকের অভাব হবে না। তোমাদের মত দুঃখের অভিজ্ঞতা পাওয়া অথচ শিক্ষিত মানুষের অভাব। গো অ্যাণ্ড ডেডিকেট ইয়োরসেলফ।

আমি অধোবদনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নীরবে বার হয়ে এলাম। মনের গভীর তলদেশ পর্যন্ত খোঁজ ক'রে দেখলাম কন্যার ব্যাধি আমাকে সৌখিন দুঃখবিলাসী ক'রে দিয়েছে। আমি স্বার্থপরের মত তার হাত থেকে পরিত্রাণ চাই, তাদের মত ব্যাধিগ্রস্তদের সার্বিক ত্রাণ চাই না। আমার উচ্চশিক্ষা, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান আর যশোলিপ্সা আমাকে এ শিক্ষা দেয়নি যে আত্মদানই সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

নুনা সামাটের গল্প

অনিল ঘড়াই

বাবার হাত ধরে যখন চাঁইবাসা পৌঁছলাম তখন আদিবাসী শহরের মাথার উপর চক্কর কেটে উড়ছিল একটা চিল, তার সচল ছায়া দ্রুত সরে যাচ্ছিল দূরের জঙ্গলগুলোর দিকে। আমি অবাক চোখে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, স্পষ্টত এমন বিপজ্জনক চিল ওড়া আমি ইতিপূর্বে দেখিনি। আমাদের বাড়ির সামনে একটা বেলগাছ আছে, সেখানে দুপুরবেলায়, কখনো সন্ধের মুখে আমি একটা চিলকে প্রায়ই বসে থাকতে দেখেছি। আমার মা বলে, চিলের স্বভাব ভাল নয়। ওরা লোভী আর হিংস্র পাখি। অন্যের জিনিস ছোঁ মেরে কেড়ে খেতে এদের কোন তুলনা নেই।

আমি মাকে শকুনের কথা বলেছিলাম। মা প্রত্যুত্তরে বলেছিল, শকুন ভাগাড় খায়। মরা-পচা জীব-জন্তুর মাংস খায়। কিন্তু ওরা সাধারণত অন্যের জিনিস জবরদখল করে ভাগ বসায় না।

চাঁইবাসার পাথুরে মাটিতে পা দিয়ে আকাশমুখো তাকাতেই সর্বপ্রথম আমার মায়ের কথাই মনে পড়ল। মনে পড়ল, সেই বেলগাছটার কথা যেখানে দুপুরবেলায় ঐ বিশাল ডানার ধূসর চিলটা কোথা থেকে উড়ে এসে গলার কণ্ঠা নাড়িয়ে ধুঁকায়। মা বলে, চিলের চোখ বড় সাংঘাতিক! ওরা অনেক উপর-আকাশ থেকে ভোগের বস্তু দেখতে পায়। তখনই ছোঁ মেরে নেমে আসে মাটিতে। যা পায় সর্বস্ব নিয়ে পালায়।

মায়ের কথা বলার ধরনে এক ধরনের বিপন্নতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি—যা ক্রমান্বয়ে আমার মধ্যেও সঞ্চারিত। আমার গলা কাঠ হয়ে আসতেই আমি ভয়ে ভয়ে শুধোলাম, বাবা, বালিডিহি আর কত দূর?

বাবা সম্ভবত আমার প্রশ্নটা শুনতে পায়নি, কেননা সাইকেল নামানোর জন্য ব্যস্ত ভঙ্গিতে বাবা ধুতি গুটিয়ে বাসের ছাদের উপরে উঠে গিয়েছে। এত নিচ থেকে আমার কম্পিত প্রশ্ন বাবার কানে নির্ঘাৎ যায়নি। আমি আর দ্বিতীয়বার বাবাকে প্রশ্ন করার সাহস পেলাম না। বাবা যদি অন্যমনস্ক হয়ে বাসের ছাদ থেকে ঠিকরে পড়ে সেই ভয়ে সিঁটিয়ে থাকলাম। খুব-বাসে সফর করার অনেক ঝামেলা—এটা আমি অনেক আগে থেকেই জানতাম।

চক্রধরপুর থেকে বালিডিহি একবাসে যাওয়া যায় না, চাঁইবাসা-কুজু-ইচাপীড হয়ে যেতে হয়। মোবাম ফেলা পথে রিক্সা ভাড়া অনেক। বাবা পয়সা বাঁচাতে সাইকেল সঙ্গে এনেছে। মা বারংবার নিষেধ করেছিল। বাবা মায়ের নিষেধ শোনেনি। বরং রেগে-মেগে বলেছে, আয় তো কর না, টাকার মর্ম আর কি বুঝবে! টাকা যারা কামায় কেবল তারাই বোঝে টাকা কি জিনিস!

আমার বয়স এখন ষোল। আমি এ-বছরই মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসব। টাকা কি জিনিস তা আমি হাড়ে হাড়ে না চিনলেও—এর গুরুত্ব কিছুটা বুঝি। বাবার সাইকেল আনাটা আমারও পছন্দ হয়নি। সামান্য ক'টা টাকা বাঁচাতে গিয়ে বাবা সেই কৃপণ বৃদ্ধের গল্পটাকেও ম্লান করে দিল। ছাদের দিকে তাকাতেই আমার মনে হল, বেলগাছের সেই ধুঁকধুকানো চিলটা বাবার উপর ভর করেছে, কাচা, ইস্ত্রী করা জামা আর ধুতিটা কদাকার চিলের পাংশুবর্ণ পালকের চেয়েও নোংরা হয়ে উঠছে ক্রমশ। ফুলহাতা জামাটায় ওটা কিসের দাগ? বারবার করে আমার চোখ সেই দাগটার দিকে চলে যাচ্ছে।

সাইকেল নামাতে দেরি হচ্ছিল বাবার। বাসের খালাসী কেমন বিশ্রী ভাষায় ধমকে উঠল বাবাকে, দাদু সরুন। মুরোদ নেই যখন উঠেছেন কেন? নামুন—

কথাগুলো শেষ না করেই 'দড়াম্' করে ছাদ থেকে সাইকেলটা ফেলে দিল ছেলেটা।

বাবা কেমন কাচুমাচু মুখে অপরাধীর মতো সরে গেল। ছাদ থেকে নেমে এসে বাবা আমার দিকে মলিন চোখে তাকাল, ঢোক গিলে ফ্যাকাসে, অর্থহীন হেসে শুধাল, কিরে পরিমল, তোর কি ক্ষিদে লেগেছে—কিছু খাবি?—বাস স্ট্যাণ্ডে ভাল মিঠাই-প্যাড়া পাওয়া যায়। খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না তাই, বাবার দিকে 'না' সূচক দৃষ্টিতে তাকালাম। গাঁয়ের বাড়িতে আসব বলে ভোর-ভোর উঠে দু' তরকারি-ভাত বেঁধে দিয়েছে মা। সেই ভাত এখনো আমার পেটে ঠাসা,—মাত্র একঘণ্টার জার্নিতে ক্ষিদের কোন আভাসই আমার মুখে ফুটে ওঠেনি। আসার সময় মা কেমন বেদনাহত স্বরে বলেছিল, যে গ্রামে যাচ্ছিস—সেখানে আগে তোর ঠাকুরদা থাকত। ঐ ভাঙা বাড়িটায় তোদের দুই পুরুষের বাস। এখন সেখানে আর কেউ থাকে না। খাঁ-খাঁ শ্মশান! জন্মভূমি ছেড়ে সবাই পালিয়ে আসল—শহরে নাকি অনেক সুবিধা।

মা যখন এসব কথা বলে তখন দুঃখ পাওয়াটা শিকড় উপড়ান ছিন্নমূল

গাছের মত ছায়া ফেলে তার মুখমণ্ডলে। মা'র এত দুঃখ পাওয়া কি কারণে তা আমি বুঝি না। মানুষ তো গাছের মত এক জায়গায় স্থির থাকে না। তবু কেন মা এত ভেঙে পড়ে স্মৃতিচারণায়?

আমি এর আগে কোনদিন চাঁইবাসায় আসিনি, শুনেছি—বিহার বোর্ডের পরীক্ষার চাঁইবাসাতেই সেন্টার হবে। তখন ঘরভাড়া নিয়ে আমরা ক'জন বন্ধু মিলে থাকব। আমাদের সঙ্গে মা আসবে। মা আমাদের রান্না করে দেবে দু'বেলা।

সাইকেল ঠেলতে-ঠেলতে কিছুটা এগিয়ে এসে বাবা একটা অতলস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। ধুতির খুঁটে মুখ মুছে বলল, বড় চড়া রোদ। কি করে যাব বলতো, পরিমল?

আমি বাবার মুখের দিকে দরদ-সম্পৃক্ত চোখে তাকালাম। চাঁইবাসা থেকে কুজু মাত্র আট কিলোমিটার পথ। এই উগ্র, চড়া রোদে আট কিলোমিটার পথ যেন ষোল কিলোমিটারের অধিক। বাবা একটা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে বিড়ির ডিবা বের করল, তারপর—বিড়ির মুখে ফুঁ দিয়ে আগুন ধরাল যত্নে। বাবা বিড়ি টানলে চোয়ালটা সুচলো হয়ে বড় কদাকার দেখায়, মুখটা বাবাকে তখন বাহাত্তর বছরের খন্‌খনে বুড়োর চেয়েও খারাপ দেখায়। বিড়িটা নিঃশেষ করে ছায়ায় ঢাকা পথটার দিকে তাকিয়ে বাবা বলল, বস্। শক্ত করে ধরবি—দেখিস যেন পড়ে না যাস্।

একটু আগে যে তীব্র রোদ ছিল তা যেন হঠাৎ করে বশ্যতা স্বীকার করেছে শিশম্-অশথ্-শাল আর গামারের ছায়ায়। আমি ভাবতেই পারছিলাম না যে পৃথিবীটা সত্যিই কি ছায়ায় ঢাকা এমন মনোরম স্বর্গ। আমাদের বাড়ির সামনে বাসরাস্তা। রাস্তার দু'ধারে শাল-অর্জুনের গাছ থাকলেও সেখানে তো এমন ঘণীভূত আদর মাখানো নরম ছায়া নেই। এই গরমের সময় রাস্তার দু'পাশের গাছগুলো মরে গিয়ে ফন্‌ফনে বাতাসে ওড়ে। সেই খড়কুটোর সাথে উড়ে বেড়ায় রাশ রাশ ধুলো। ইস্কুল থেকে ফেরার সময় আমার পালিশ করা জুতোটা কেমন খারাপ হয়ে যায় ধুলোয়, আমি সেখানে নখের আঁচড় কেটে কতবার আমার নিজের নামটা লিখেছি।

বাবা বলে, ধুলোতে দাগ কাটলে কর্জ হয়।

মা বলে, ধুলোতে লিখলে বিদ্যা সব ধুলোয় মিশে যায়। মগজে আর কিছু থাকে না।

সাইকেল এত জোরে ছুটছিল যার দরুন সাই-সাই করে সরে যাচ্ছিল রাস্তার দু'ধারের জাড়াগাছ, শালচারা, ব্যয়ড়া আর হরিতকীর গাছগুলো। ঘন জঙ্গলের আড়ুরে ছায়ায় স্বপ্নের মাকড়সারা তখন আমার মনের ভেতরে হরেক রকমের জাল বুনতেই ব্যস্ত। আমি মনে করতে পারলাম না—এমন নিবিড় ঘন জঙ্গল এর আগে দেখেছি কিনা। মামারবাড়ি যাওয়ার পথে যে ছোট জঙ্গলটা পড়ে তার সাথে এর কোন তুলনাই চলে না। সাইকেল যত দুরন্ত গতিতে ছুটছিল ততই যেন উন্মনা হয়ে পড়ছিলাম আমি। সীটের বড় আঁকড়ে কোনমতে অস্থির চোখের তারায় চেয়েছিলাম বহু দূরের সেই গ্রাম-গুলোর দিকে যেখানে মাথায় কাঠের বোঝা নিয়ে সরু আল ধরে রুক্ষতাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছে সারিবদ্ধ-ছন্দোবদ্ধ আদিবাসী মেয়েরা—যাদের পরনের ডোরাকাটা শাড়ির রঙিন চমক বহু পুরনো কোন সুখদায়ক দৃশ্যের মত ঝলসে উঠছিল মাঝে মাঝে। বাবা বলল, ওরা এই আশে পাশের গাঁ গুলোতে থাকে। দিনভর সংসারে কোন কাজ নেই তাই, কাঠ কুড়োতে আসে বনে। বনরক্ষীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে এরা কেন্দু পাতা, শাল পাতা আর মহুয়া পেড়ে নিয়ে যায় ঝুড়ি ঝুড়ি। শহরে বেচে যা পায়—তাতেই এদের সংসার চলে কোনমতে।

আমি বললাম, বাবা, এরা তাহলে খুব গরিব, দিন আনে দিন খায় বুঝি?

আমার প্রশ্নে কঠিন চোখে তাকিয়ে বাবা ঢোক গিলল, চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, গরিব বলেই কি চুরি-চামারি করে খেতে হবে? পরের মেরে খেতে হবে?

আমি ধমক খেয়ে চুপ করে গেলাম। বাবা নিজেকে শোনানোর মত করে বলল, সে কি কারোর পৈতৃক সম্পত্তি—তাই যা খুশি তাই করবে? সরকারি জিনিসে কারোর তো কারোর থাবা মারার হক্ নেই।

আমাদের ইস্কুলের বাংলার 'স্যার' বলেন, আদিবাসী মানে এই পৃথিবীর আদি মানুষরা আদিম বাসিন্দা। এরা মূলত অরণ্যবাসী। আর্যসমাজ এদের ঘৃণা ভরে বরাবরই দূরে সরিয়ে রেখেছে। বনভূমি এদের জন্ম, শৈশব, কৈশোর, যৌবন আর বার্ধক্যের লীলাভূমি। অথচ, আশ্চর্যের বিষয় এই অরণ্যভূমি থেকে এদের আজ আইন করে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। সেই ব্রিটিশের যুগ থেকে এরা উপেক্ষিত—আজও সেই চরম উপেক্ষার শেষ হয়নি।

আমি বুঝতে পারিনা—কার কথা সত্যি, বাবা না মাস্টার মশায়ের। আদিবাসীদের হাব-ভাব-চাল-চলনে আমি যে দারিদ্র্য প্রত্যক্ষ করেছি—

তাতে আমার কষ্ট হয়। মানুষ এত গরিব হতে পারে, এদের না দেখলে তা যেন বিশ্বাস করাই কঠিন।

অনেকক্ষণ সাইকেলের ক্যারিয়ারে বসে থাকাতে আমার দাবনার কাছ থেকে চিন্‌চিনে একটা ব্যথা ক্রমাগত উথলে উঠে কোমরের আশেপাশের অঞ্চলকে অবশ করে দিয়েছিল, ঝুলিয়ে রাখা পা দুটো ক্রমশ অনুভূতিহীন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যহীন হয়ে পড়ছিল। আমি একরকম বাধ্য হয়েই বাবাকে বললাম, বাবা সাইকেলটা একটু থামাও। আমার পা' দুটো কেমন ঝিন্‌ঝিন্ করছে।

বাবা শুধু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সাইকেলটা থামিয়ে দিল মাঝারি মাপের গাছের ছায়ায়। এতদূর থেকে আমি সেই দলবদ্ধ আদিবাসী রমণীদের ক্লান্তিময়, রৌদ্র-ঝলসান পথ চলা দেখতে পেলাম। গ্রীষ্মের দাবদাহকে অগ্রাহ্য করে সংকীর্ণ আলপথ মাড়িয়ে দাউ দাউ অগ্নিপ্রবাহিত বাতাসের ঝাঁঝকে উপেক্ষা করে তার সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল অবহেলিত দেবদূতের মত। বাতাসে ধুলোর ঘূর্ণি। খাটো শাড়িতে লাল পাথুরে মাটির আক্রোশ। দোলযাত্রার হুল্লোড় নয়, যেন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার সকরুণ চিহ্ন।

যে গাছের ছায়ায় আমরা দাঁড়িয়েছিলাম সেখানে সূর্যের খণ্ডিত মুখাবয়ব হাজার সার্সির প্রতিফলিত মুখ হয়ে প্রলম্বিত হয়েছে ভূমিতে। বাবা সাইকেলটায় স্ট্যাণ্ড দিয়ে কেমন এক বিচিত্র ভঙ্গিতে মুখ দিয়ে শ্বাস নিচ্ছিল। বড় কদাকার দেখাচ্ছিল বাবার চোঙাকৃতি, রুগ্ন, চিমড়ে চোয়াল ওঠা মুখটা।

আশেপাশের প্রাকৃতিক রুক্ষতার মধ্যেও পাথরের তলে-তলে তিরতিরে শীলপ্রবাহ-এর মত নম্র-কোমল স্নিগ্ধ এক সৌন্দর্য ছিল যার আকর্ষণে বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলাম, আমার দু চোখে তখন বাঙামাটির পাথুরে চাটাংয়ের দুনিয়া খেয়ে ফেলার ক্ষুধা। বিমোহিত চোখে ছায়াপ্রদানকারী গাছটার দিকে তাকিয়ে বাবাকে শুধালাম, বাবা, এটা কী গাছ? বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, কুসুম গাছ। এর আগে বুঝি দেখিস্‌নি?

'না সূচক ঘাড় নাড়লাম আমি।

বাবা 'বাবলা স্যারের' মত ধীর-গম্ভীর গলায় বলল, কুসুমফুল দেখতে ভারি সুন্দর! থোকা-থোকা সাদা-সাদা ফুল হয় গাছ ভর্তি। তখন জংগল মিঠে সুবাসে ভরে থাকে। কুসুম বীচে তেল হয়। সেই তেল মানুষে খায়।

কারা খায়?

আমার প্রশ্নে চোখ-মুখ কঠিন করে বাবা সেই দূরের পোড়া হতশ্রী গ্রামটার দিকে তাকাল। আমি স্পষ্টত তার চোখে-মুখে রাগের ফুল্‌কি আর অসন্তোষের

নিকষ কালো ছায়া দেখলাম। বারলা স্যার বলেন, কুসুম মহুয়া শাল করঞ্জ আর নিম বীজ হল তৈলবীজ। আদিবাসী গ্রামের অধিকাংশ মানুষই এইসব তৈলবীজ ব্যবহারে অভ্যস্ত। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এইসব বনজ বীজের উপর আদিবাসীদের আর কোন অধিকার নেই। বন বিভাগ এইসব তৈলবীজ লিজ দিয়ে দেয় ঠিকাদারের কাছে। ঠিকাদারের লোকরা নির্দিষ্ট সময়ে গাছকে শ্রীহীন করে রস্তা ভরে লরি লরি তৈলবীজ শহরে চালান করে দেয় অরণ্য বিতাড়িত কমজোরি মানুষগুলোর চোখের সামনে দিয়ে। বারলা স্যার এ-ও বলেন, এটা একধরনের অত্যাচার—তোমরা দেখো এর একদিন প্রতিবাদ হবেই। শোষণের শিকড় বেশিদূর প্রোথিত হতে পারে না।

বাংলার ক্লাসে আমি বহুবার বারলা স্যারের মুখে প্রবাদপুরুষ বীরসা মুণ্ডার কাহিনী শুনেছি, একবার চক্রধরপুরে 'বীরসা মেলা' হয়েছিল—সেখানে আমি স্থানীয় এক আদিবাসী যুবকের মুখে বীরসার বীরত্বের কথা শুনেছি। আমার মনে হয়েছে বীরসা মানুষ নয়, দেবতা। আমার মা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে।

আমাদের বাড়িতে যে আদিবাসী বুড়িটা রোজ কাজ করতে আসে, তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত সবখানেই অভাবের চিহ্ন। মা তাকে বাসি-রুটি, পান্তা ভাত দিলে সে কত খুশি হয়ে নিয়ে যায়। আবার অব্যবহৃত জামা-প্যান্টগুলো বুড়ি দিদির নাতিটা পরে, নাহলে প্রায় সময় আমি তাকে খালি গায়ে এদিক-সেদিক ঘুরতে দেখি। বুড়িদিদির নাতিটা আমারই বয়েসি অথচ ওর কৃশ, প্যাংলা শরীরটা যেন একটা মরাটে লংকা গাছ। আমি প্রায়ই মায়ের কাছে বুড়িদিদির নাতির হাঁড়িয়া খাওয়ার গল্প করি, কেননা স্কুল যাওয়া-আসার পথে আমি তাকে অনেকবার রাস্তার ধারে শিশম গাছের ছায়ায় হাঁড়িয়া বাটিতে চুমুক দিতে দেখেছি। মা বলে, হাঁড়িয়াই ওদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই প্রচণ্ড গরমে আমপোড়া বা বেলের সরবত ওরা পাবে কোথায়? টকদই, ভূষি বা লেবুর সরবত সবই তো ওদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে।

বাবা বলে, বুড়িদিদির নাতিটা নাকি চোর। দোকান থেকে পাউরুটি তুলে নিয়ে পালায়। মা কিন্তু বাবার সাথে একমত নয়। মা বলে আমাদের দুর্ব্যবহার, ঘৃণা আর অবহেলাই ওদের এমন বিশৃঙ্খল করেছে।

মা'র কথা বাবা একদম সহ্য করতে পারেনা, তেলে-বেগুনে জ্বলে না উঠলেও গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে থাকে ছোট ছোট ঝুপড়িঘরগুলোর দিকে। আমি ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখেছি বাবার কপালে তখন দুশ্চিন্তার ভাঁজ

পড়ে, নির্বিকার চোখের তারায় আনাহূত ভয়ের রেণুগুলো গুড়ো গুড়ো হয়ে মিশে যায়।

লোটাপাহাড়ে আমার ছোটকাকার বিড়ির পাতার ব্যবসা। অফ্-সিজিনে কাকা আদিবাসীদের কাছ থেকে কেন্দুপাতা নামমাত্র টাকায় কিনে রাখে। সেই পাতা সিজিন পার করে বেচলে লাভের অঙ্ক তিনগুণ। পাতা বিক্রির টাকায় কাকার এখন দোতলা পাকা বাড়ি, মোটর সাইকেলে চেপে কাকা শহরে আসে মহাজনের কাছে।

আমার ছোটকাকা বরাবরই নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ, আমি তার কাছে আদিবাসীদের নিয়ে অনেক দুঃখজনক অমানবিক গল্প শুনেছি। কাকার একটা গল্প আমার চোখে ছবি হয়ে আটকে আছে, সেদিন থেকে কাকাকে আমি চেরাবেড়া পাহাড়ের চেয়েও নিষ্ঠুর ভাবি। এখনও আমার চোখে ভাসে কেন্দুপাতা বেচতে আসা এক আদিবাসী মায়ের মুখ। তার মাথায় ছিল কেন্দুপাতার বোঝা, বাঁ-কোমরের কাছে লাল গামছার বেড়ে বাধা ছিল সাতদিনের শিশু। এক ফোঁটা দুধের জন্য বাচ্চাটা এলাকা চঞ্চল করে কাঁদছিল অথচ, কাকার খাটালে তখন সাত-সাতটা দুধেলা মহিষ বাঁধা। কাকা তাকে এক ফোঁটাও দুধ দেয়নি, বিনিময়ে জলের দামে পাতাগুলো কিনে নিয়ে আঙুল উচিয়ে সামনের চায়ের দোকানটা দেখিয়ে দিয়েছিল অবলীলায়। মেয়েটার বুকে দুধ ছিল না এবং প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে চায়ের দোকানটাও ছিল দুধ শূন্য। অগত্যা, বাধ্য হয়ে গরম চা ঠাণ্ডা করে আঙুলে ফোঁটা ফোঁটা করে খাইয়েছিল মেয়েটা।

এমন একটা নক্কারজনক ঘটনার নায়ক হিসাবে কাকার বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। বরং এক ধরনের সামন্ততান্ত্রিক হামবড়াই ভাব ফুটে উঠছিল কথা বলার সময়। কাকা বেশ গর্বের সাথে বুকের ছাতি ফুলিয়ে বলেছিল, ওদের কিভাবে ঠকিয়ে নিতে হয় আমি তা জানি। ওরা যত মূর্খ থাকবে আমার বিজনেস ততো ভাল চলবে। তারপর কাকা হা-হা করে গলা ফাটিয়ে এসে উঠেছিল।

বাবা কাকার কবিৎকর্মা বুদ্ধিকে সমর্থন করে ছিল পাতলা ফিনফিনে সংক্রামিত এক হাসি ছুঁড়ে দিয়ে। ধিক্কারে কঠিন হয়ে উঠেছিল মায়ের ঠোঁট লজ্জা আরক্ত মুখ তুলে মা বলেছিল, কাউকে ঠকিয়ে নিলে নিজেকেই ঠকতে হয়, ঠাকুরপো। মনে রেখো, ভগবানের মার দুনিয়ার বার। তার কাছে সব কড়ায়-গণ্ডায় লেখা থাকছে। সময় আসলে সুদে আসলে সব ফিরিয়ে দেবে।

ইচাপীড আসতে ঘণ্টা খানিক সময় লেগে যায় আমাদের। এখান থেকে আর মাত্র মাইল খানিক ভেতরে ঢুকলেই আমাদের সেই পুরণো বাড়ি, যেখানে এখন আর কেউ থাকে না। আমার দাদু শহরে চাকরি পেয়ে চলে এসেছে তা প্রায় পঞ্চাশ বছর হ'ল। বাবা বলে, দাদু ভাল সংস্কৃত জানতেন। খুব নাম ডাক ছিল দাদুর শিক্ষকতার। সিংদেও রাজা প্রায় পঞ্চাশ বিঘার কাছাকাছি জমি দান করেছিলেন দাদুকে।

ব্রাহ্মণ এবং শিক্ষক হিসাবে দাদু সবার কাছেই ছিলেন শ্রদ্ধার পাত্র। তবু, কিসের লোভে তিনি শহরে এলেন, তা এখনও আমার অজানা। মাকে বহুবার এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেছি। মা কোন উত্তর দেয়নি, কেবল ছলছলে চোখে আমার দিকে তাকিয়েছে। এক সময় ফুঁপিয়ে উঠে বলেছে, বড় হও, বুঝবে।

মা বড় হওয়া বলতে কী মনে করে আমি তা জানিনা, তবে আমার মনে হয় আমি বড় হয়ে গিয়েছি। নাহলে বাবা কেন আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে এল গ্রামে। আমি তো আসতে চাইনি, একরকম জোর করেই তো বাবা আমাকে নিয়ে এল। মা অবশ্য মৃদু প্রতিবাদের গলায় বলেছিল, ও না হয় পরে একদিন যাবে। শুনেছি, চাঁইবাসায় আজ মিটিং আছে। বাসে ভিড় হতে পারে—

মিটিং শব্দটায় বাবা ফুঁসে উঠেছিল, জলে ওঠা বারুদ গলায় বলেছিল, মিটিংয়ের কথা বাদ দাও। মিটিং তো এখন সিংভূমের মাদুলি। মিটিং আছে বলেই কি হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকতে হবে? তোমার যেমন মেয়েলী বুদ্ধি—

মা হা করে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল বাবার দিকে, উপহাসটা কাহিল করে দিয়েছিল তাকে।

বাবা কেমন দুঃখ-দুঃখ গলায় বলেছিল, আমার অলরেডি একবার স্ট্রোক হয়ে গিয়েছে। জমি-জমা নিয়ে যা টেনশন্ ক'দিনই বা বাঁচব। এখন থেকে ওর সম্পত্তি ওকে বুঝে নিতে দাও। ওর তো বড়দা নেই যে পাশে এসে দাঁড়াবে।

সামনের উল্‌ঝাল, অভাবী গ্রামটাতে আমাদের পাশাপাশি পঞ্চাশ বিঘে জমি। বাবা আগে প্রতিমাসে এখানে একবার করে আসত। এখন বয়স বেশি হওয়ার দরুন কেবল বছরে একবার আসে ফসলের ভাগ নিতে। প্রতি

বছর দুর্গো পুজোটা পেরিয়ে গেলেই বাবার আর ঘরে মন ধরে না, নিদ্রাহীন চোখে বাবা তখন ফসলের স্বপ্ন দেখে—আর হা-হুতোশের যন্ত্রণাময় অভিব্যক্তি-গুলো মায়ের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চায়। দাদু মারা যাওয়ার পর থেকেই বাবার এই অন্তর্গত উৎপীড়ন ক্রমান্বয়ে বেড়েছে। মা বোঝালেও বাবা মায়ের কথায় কর্ণপাত করে না, মা যেন তার শত্রু—এমন নির্লিপ্ত, সন্দেহঘন চোখে তাকায়। সেল্‌ফ থেকে পোষ্টকার্ড পেড়ে এনে খ্যাস্ ঘ্যাস্ করে লেখে, TO : NUNA SAMAT, চৌঠা অগ্রহায়ণ যাচ্ছি। তোমরা তৈরি থেকো। ধানের ভাগ ঐদিন আমার চাই-ই। নাহলে কিন্তু অশান্তি হবে।

বাবার প্রতিটি চিঠিতে পরোক্ষভাবে রুক্ষ এবং শাসন করার একটা মেজাজ আমি ভালভাবে লক্ষ্য করেছি যা আদৌ আমি মন থেকে মেনে নিতে পারি না। নুনা সামাট্ নামের সেই আদিবাসী বুড়োটার উপর বাবার কথায় কথায় রাগ। প্রতিনিয়তই তার কথায় মুখর থাকে আমাদের শহর বাড়ির চার দেওয়ালের বাতাস। হয়ত এই কারণেই বুড়োটার সাথে আমার অনেকদিনের চেনা-জানা, আত্মীয়তা। অথচ, বাবা তাকে কোনদিনও নিকটজন ভাবে না। উল্টে গালি-গালাজ করে আমার সামনে। বলে, বুড়োভামটা চোর, পাক্কা শয়তান। আমাকে ঠকিয়ে খাচ্ছে। খেয়ে-খেয়ে ভুঁড়ি বাগাচ্ছে। আর এদিকে আমাকে সাড়ে পাঁচ টাকা দরে চাল কিনে খেতে হচ্ছে।

মা একদিন থাকতে না পেরে বলেছিল, ও জমির উপর তোমার তো কোন হক্ নেই। যা দিচ্ছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকো। মানুষের বেশি লোভ ভাল নয়।

মায়ের কথায় নীল হয়ে গিয়েছিল বাবার মুখ। ধুক্‌ধুকানো সেই চিলের মত গলা কাঁপিয়ে বাবা বলেছিল, তুমি একথা বলছো? বলতে পারলে? ঘরশত্রু বিভীষণ না হলে এমন কথা কেউ কি বলতে পারে? ছিঃ ছিঃ, এ আমি কাকে নিয়ে ঘর করছি!

মা এর পরে আর কোন কথা বলার সাহস পায়নি। তার দু'চোখে তখন মিছরি দানার মত চিকচিকান জল। আমার দিকে তাকিয়ে সে আর চোখের জল আটকাতে পারেনি।

মা যে ঘরশত্রু বিভীষণ নয়, ঘরের লক্ষ্মী একথা চাঁদ-সূর্যের মত সত্যি। গ্রামে আমাদের যে পঞ্চাশ বিঘে জমি আছে তার দাবিদার এখন আমার

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

বাবা নয়,—সরকার। ইচা-খরখাইয়ের ড্যাম্পের জন্য সরকার নায্যমূল্যে আমাদের জমিগুলো অধিগ্রহণ করেছে। বাবা স্বেচ্ছায় দাদুর দত্তক পাওয়া জমিগুলো বিক্রি করে দিয়েছে সরকারের কাছে। আইনত ঐ নির্দিষ্ট জমিগুলোতে বাবার আর কোন অধিকার নেই। যেহেতু ড্যাম্পের কাজে জমিগুলো এখনো ব্যবহৃত হয়নি, এই এক সুযোগে বাবা এখনো ছুটে আসে ফসলের ভাগ নিতে। তার হম্বি-তম্বি কত যে অর্থহীন—এই বোধশক্তি বাবা হারিয়ে ফেলেছে দিনকে দিন। নুনা সামাট্ আইনের এসব ঘোরাল মার-প্যাঁচ জানে না, তাই অনুগত চিত্তে সে এখনো ফসলের ভাগ দেয়।

মাকে আমার দুঃখী দেখতে ভাল লাগে না, আমি জানি আমার মা যে কোন মহাকাব্যের আদর্শ স্ত্রী চরিত্রের অনেক ঊর্ধ্বে। মন ভাল থাকলে মা প্রায়ই আমাকে একটা গল্প শোনায়। আমার দাদু কাজ করতেন রেল-কোম্পানীতে। মায়ের জন্মের সময় দিদিমা মারা যান রেল-হাসপাতালে। মাকে তখন দেখা-শোনার কেউ নেই। দাদু গার্ড। তাকে প্রায়ই বাইরে যেতে হয় ডিউটিতে। তার ডিউটির কোন রাত-দিন নেই। এদিকে মাকে নিয়ে দাদুর দুশ্চিন্তারও শেষ নেই। শেষে সব দুশ্চিন্তা দূর করলেন আদিবাসী এক বউ। তিনি রেল-কোয়ার্টারেই থাকতেন। তার স্বামী ছিলেন টোকেন-পোর্টার। সেই আদিবাসী বউয়ের দুধ খেয়ে মা মানুষ। তার কথা মা এখনো ভোলেনি।

মোরাম ফেলা রাস্তার ধুলো উড়ছিল টায়ারে জড়িয়ে। বাবা বেশ দক্ষ হাতে সাইকেলটা টেনে নিয়ে যাচ্ছিল সামনে। আমার সাদা ফুল-প্যান্টটার হাঁটু অব্দি লাল ধুলোয় ভর্তি। হঠাৎ একটা সুগন্ধ এসে আমাকে বড় উন্মনা করে দিল। আমরা একটা আমগাছের নিচ দিয়ে চলেছি। মুকুল মধু হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আমার মাথায় এসে পড়ল। কেমন চ্যাট্‌চেটে একটা স্পর্শানুভূতি—যা আমার জীবনে এই প্রথম। কিছুটা গিয়ে দেখি একটা আদিবাসী ছেলে প্রায় উদোম শরীরে ঢাউস একটা লগা নিয়ে কচি নিমের পাতা পাড়ছে। সে কেমন ভ্যাবাচেকা খাওয়া চোখে আমাদের দিকে তাকাল।

এই সময় নিমগাছে কুঁড়ি আসে, সেই কুঁড়ি ফুল হয়ে গ্রামের বাতাস ভরিয়ে রাখে। বাবা বলল, নিমের হাওয়া আর নিমের ছায়া দুটোই শরীরের পক্ষে ভাল।

আমি শুধোলাম, তাহলে ছেলেটা এত রোগা কেন?

বাবা কেমন দম ধরে দাঁড়িয়ে পরে আমার দিকে তাকাল, তার চোখে-মুখে আরোপিত বিরক্তির প্রলেপ। ধমকের স্বরে বলল, বেশ তো পাকা পাকা কথা শেখেছিস—তুইও কি তোর মায়ের মত হবি ?

অবশেষে সাইকেল গিয়ে থামল নুনা সামাটের ঘরের সামনে। সাইকেলের বেল বাজানোর আগেই ছুটে এল চনমনে ঘাস-ফড়িং রঙের একটা মেয়ে। তার বয়স আমারই মত। গায়ে রঙ চটা একটা বেগুনি রঙের ব্লাউজ, পরণে ছিল লুঙির মতো জড়ানো একটা লম্বা চাদর। সে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জায় আলতো রাঙ্গা হয়ে সহসা কোডক লাগা মুরগির মত ঘাড়টা নামিয়ে নিল মাটির দিকে। আমি লক্ষ্য করলাম, মেয়েটার কলা বেগোর চেয়েও মসৃণ গলায় চাঁদগলন্ত রূপোর বিছে হার। দুপুরের রোদ পড়ে উজ্জ্বল চূর্ণ পারদের বিচ্ছুরণ সেখানে, সেই দৃপ্তিময় মহিমান্বিত আভায় মেয়েটির শ্যামাশ্রী মুখশ্রীতে কচি নিমপাতার সজীবতা। রঙ-বেরঙের কাচের চুড়ি তার দু'হাতে ভর্তি। সে যখন লজ্জা ভাঙতে তিতির পাখির মত নড়ে উঠল তখন পাকা ঝুমকা ফলের রিন্‌রিন্ বাজনা শুনলাম আমি। মেয়েটা একবার বাবার দিকে, একবার আমার দিকে সলাজ চোখে তাকিয়ে পিছনের খোলা চুল নাচাতে-নাচাতে চলে গেল ঘরের ভেতর।

হুস্ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল বাবা। তারপর, আমার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, দেখলি, কেমন ঠাট-বাট। রূপোর গহনা গড়িয়েছে। সব আমার ধান বেচার টাকায়। এবার মনে হয়, খালি হাতেই ফিরতে হবে, পরিমল।

বাবার এই সংকীর্ণ কথা-বার্তা আমার আদৌ ভাল লাগছিল না, অভিমান জনিত সংকোচ বাক-রুদ্ধ করে দিল আমাকে।

আমাকে নিশ্চুপ দেখে বাবা বলল, তোর কি তেষ্টা পেয়েছে ?

আমি ডানদিকে ঘাড় ঝুকালাম।

বাবা শুকনো গলায় বলল, এরা আদিবাসী, ছোট জাত। এদের হাতে তো জল খাওয়া যায় না। তুই এক কাজ কর। সঙ্গে লেবু লজেন্স আছে, একটা মুখে ফেলে দে।

দরকার নেই। ঠোঁট কামড়ে বাবার প্রতি অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম আমি। বাবা যে এমন কুসংস্কার আর অন্ধ গোঁড়ামির বালিটিপি তা আমার চোখে স্পষ্ট ধরা পড়ে যেতেই আমি আর বাবার দিকে তাকাতে পারছিলাম না। বাবা পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত কাকের চোখে নির্নিমেষ আমাকে

দেখছিল। আমার ফর্সা চামড়া রোদের কামাতুর খেলায় পিঙ্গল, তামাটে।

বাবা বলল, ঐ করণ গাছটার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়া। আমি দেখি সামাট বুড়ো আছে কিনা। তারপর নিজেকে শোনার মত করে বলল, না থাকারই কথা। চিঠি দিয়ে আসলে এই এক ঝামেলা। ওরা কাজের ছুঁতোয় টাটা-চাঁইবাসা চলে যায়। অথচ, তোর মা বলে, এরা সরল-হাবা-গোবা, ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না।

বাবার কথা শেষ না হতেই ব্যস্ত পায়ে লাঠিতে ভর দিয়ে ধাপান মাজা নিয়ে এগিয়ে এল একজন বুড়ো। বাবাকে সে এমনভাবে প্রণাম করল যেন বাবা তার মাথাটা আগে থেকেই কিনে রেখেছে। বাবা এক পা-ও সরল না, বরং খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে প্রণাম নিল বুড়োটার। আমি যতদূর জানি, বয়সে ছোটরাই বড়দের প্রণাম করে। এক্ষেত্রে উল্টো প্রথা দেখে আমি বেশ অবাক হলাম।

বুড়োটা হন্তদন্ত হয়ে কোথা থেকে একটা খাটিয়া এনে পেতে দিল করণ গাছের ছায়ায়। বাবা গিয়ে দাম্ভিক গুরুদেবের মত গম্ভীর মুখে খাটিয়ায় গিয়ে বসল। বুড়োটা কিভাবে আদর-আপ্যায়ণ করবে ঠিক বুঝতে পারছিল ঘাবড়ে গিয়ে গলগল করে ঘামছিল। একসময় কিঞ্চিত ধাতস্থ হয়ে সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকল, এ সোমবারি, সোমবারিরে-এ-এ, গুটে (একটা) পাংখা আনতো।

সোমবারী সেই সবুজমনা কিশোরীটি যে একটু আগে আমার চোখে চোখ রেখে পলাশ লাজে ছুটে গিয়েছিল ঘরে। কিছুক্ষণ পরে দেখি সেই মেয়েটাই হাতে একটা বেতের পাখা নিয়ে আমাদের সামনে পাথর খোদাই পুতুলের মত দাঁড়াল।

নুনা সামাট তাকে আদেশ করার গলায় বলল, দিকু (বাইরের লোক) মেহমানদের বাসাৎ কর। বাবুরা সেই কুন্‌ঠি (কোথা) থিকে আসচে। মুই যাচ্চি পানি আনতে কুয়ায়। তোর মাকে ক' বেল পাড়ি দিতে গাছ থিকে—বাবুরা সরবত খাবে।

বকতে বকতে বুড়োটা চলে গেল জোয়ান মেজাজে। সোমবারী রইল পাখা করার জন্য। মাঝে মাঝে হাত এলে গেলে সে কেমন আশ্চর্য চোখ তুলে আমার দিকে ডরপুঁক নজরে তাকাল। ওর চোখ দুটো এত টানা টানা, এত উজ্জ্বল—আমার মনে হল ও যেন সব সময় গরম কাজল পরতে ভালবাসে।

ছোটবেলায় মা আমাকে পরিয়ে দিত। আমার বেশ মনে আছে, কাজল পরলে আমি আমার চোখ দুটোকে চিনতে পারতাম না। মা বলত, কাজল হল চোখের সহেলী। কাজল পরলে চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়ে। তখন 'দৃষ্টি-শক্তি' শব্দটার প্রকৃত অর্থ বুঝতাম না। আজ যেন মায়ের সেই বহু ব্যবহৃত শব্দটার অর্থ বুঝে আমার বড় লজ্জা পেল। 'কাজল টানা চোখ' আর 'কাজল চোখ'—এই দুয়ের ফারাক বুঝতে পেরে আমি সেই চোখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম অপলক।

বাবাও তাকিয়েছিল কট্‌কটে চোখে, তবে সোমবারীর দিকে নয়—নিকোনো তক্‌তকে উঠোনের সেই প্রকাণ্ড খড়গাদাগুলোর দিকে। খড় দেখে ধানের পরিমাণ অনুমান করতে পারে এমন একটা সগর্ব উচ্চারণ আমি এবং মা বহুবার বাবার মুখে শুনেছি। বাবা মনে মনে কি যেন হিসেব নিকেষ করছিল, আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি,—বাবা তার প্রাপ্য ধানের নিসেব-নিকেষই করছিল। মাঝে মাঝে এক অপ্রতিরোধ্য উত্তেজনায় শক্ত হয়ে উঠছিল তার ঠোঁট, পায়ের নখ দিয়ে খুঁড়ে স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করেছিল সে।

নুনা সামাট কুয়ো থেকে দু'বালতি জল বয়ে আনতেই বাবা আর আমি চোখ-মুখ, হাত-পা ধুয়ে বাবু হয়ে খাটিয়ার উপরে বসলাম। নুনা সামাটের নতুন গামছাটায় পা মুছে বাবা নামিয়ে রাখল চৌপায়ার নিচে। অনাদর আর ধুলোয় মাখামাখি হয়ে গামছাটা পড়ে থাকল একপাশে। নুনা সামাট করুণ চোখে এসবই দেখছিল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, শেষে সে জড়তাপূর্ণ গলায় বলল, মালিক, সরবত দিই,—মোর গাছের বেল—মধুর মতো মিঠা। বাবা সঙ্গে সঙ্গে শরীর ঝুঁকিয়ে, 'না-না' করল। মিথ্যে কথায় মুখ ভরিয়ে বলল, আজ আমার নির্জলা উপোষ। আমি কিছু দাঁতে কাটব না।

ছোট মালিক। সামাট বুড়ো আমার দিকে তাকাল, গুটে গিলাস সরবত খাও বাবু, মোর গাছের বেল

আমি 'হ্যাঁ' 'না' কিছু না বলে বাবার মুখের দিকে তাকালাম। বাবাও কিছু না বলে আমার নিকে তাকাল। খুব রেগে গেলে কিংবা অপমানিত হলে বাবার চোখ-মুখ অমন আঁচ গনগনে লাল হয়ে ওঠে। আমি বুঝতে পারছিলাম, বাবা এখন ভিস্ম্যাভিযাস। নুনা সামাট কেমন অসহায় চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে। বেচারার অত বড় সদাহাস্য মুখটা ছোট হয়ে গিয়েছে সংকোচে। কাচের গেলাসটা নামিয়ে রেখে সে একটা চট পেতে বাবার

মুখোমুখি বসল। তারপর দেশ-গাঁ, খরা-শুকা, ধানপোকা আর নানাদি পরব নিয়ে গল্প শুরু করল স্বচ্ছন্দে।

আমার চোখ সোমবারীকে খুঁজছিল, হঠাৎ দেখি সে কোথা থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর দেশলাই নিয়ে কাঁসার-রেকাবিটা নামিয়ে রাখল বাবার সামনে। সামাট বুড়োর ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। সে রেকাবিটা ঠেলে দিয়ে বলল, লিন মালিক, ধুঁয়া ছাড়ুন। তারপর, সব কথা হবে—

সিগ্রেট ধরিয়ে বাবা বেশ চড়া মেজাজে বলল, আর দেরি করা ঠিক হবে না। এবার তুমি আমার ধানের হিসাব বুঝিয়ে দাও। রোদ পড়ে গেলে ঘর ফিরতে হবে আমাকে। পথ তো এক পোয়া নয়, অনেকটা।

বাবার কথা বলার ধরনটা আগেকার দিনের সিনেমার সেই জমিদারের মত। বাবা যেন সদ্য সিংহাসন চ্যুত রাজা। সামাট্ বুড়ো বাবার হাবভাব দেখে নড়ে-চড়ে বসল, পোড়া বিড়িটা মাটিতে ঠুসে ধরে বলল, ঠিক আচে বাবু, আপনার ধান আমি সব দিয়া দিব, কিন্তুক ইবার ফসল ভাল হয় নাই, সব চিটা-চিটা। গাছে থোড় আসার মুখে পানি হলোনি, বড়পুজা অব্দি টানা খরাণী। সব শুকায় গেল বাবু, পাথর জমিন সব ফাটি ফাটি 'হা' হিলা।

বাবা ফুঁসে ওঠা গলায় বলল, ফি-বছর তোমার এককথা। এসব বাহানা ছাড়, ধান আনো

মাটিতে দাগ কাটতে কাটতে বুড়োটা হাপুস চোখে তাকিয়ে থাকল বাবার দিকে। তার হাবভাব দেখলে মানুষ মাত্রই দয়া হবে।

বাবাও কিছুটা নরম হল। বলল, এ বছর কত দেবে ঠিক করেছ?

সামাট বুড়ো চারবার দু'হাতের দশ আঙুল উঁচিয়ে দেখাল। বাবা রাগে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ-মুখ লাল করে বলল, চল্লিশ মণ! হবেনা। বিঘা পিছু একমণও নয়-একি মগের মুলুক নাকি? না পারলে ছেড়ে দাও— আমি অন্য চাষিকে দেব। আমি গরিব ব্রাহ্মণ। আমাকে ফাঁকি দিলে কি তোমার ভাল হবে?

শেষের বাক্যটায় কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল সামাট্‌বুড়ো, সে ভ্যালভেলিয়ে পর্যায়ক্রমে আমার আর বাবার মুখের দিকে তাকাল। শেষে হার মানা স্বরে বলল, হিসাব মত আর দশ মন ধান হয় আপনার ভাগে কিন্তু বাবু, অভাবে পড়ি মুই সেই ধান খাইলিচি। বাবুগো, বড় আকাল সময় এখুন। পেট পালি পারিনি। যা দণ্ড হয় দিন, মাথা পাতি লিবা—

বাবা ফুঁসে উঠে শুধাল, তুমি কি রাক্ষস?

মাথা ঝুকাল সামাট্ বুড়ো।

বাবা বলল, তোমার মতো লোভী মানুষ এই গোটা সিংভূমে আমি আর দেখিনি। পরের জিনিস না বলে খাও, তোমার অমন শরীরে যে কুষ্ঠ-কুঁড়ি ধরবে।

এবারও চুপ করে থাকল সামাট্ বুড়ো, মাটির দিকে চোখ।

বাবা বলল, চোরের মত আছো কেন, জবাব দাও। তুমি কি ভেবেছো চুপ করে থাকলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব।

এবার জবাব দিল সামাট বুড়ো। কাশতে কাশতে বলল, বাবু, মুই চোর নই, ডাকু নই, লুটেরা নই—মুই হলি মানুষ।

—মানুষ তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তবে তুমি হলে গিয়ে বনমানুষ!

—বন আগে থিলা বাবু, অখন নেই। সব কাড়ি লিচে—

—থাম, আর নেতাগিরি ফলিও না, পেটে ভাত নেই—তার আবার বড় বড় কথা।—সম্ভবত ধুঁয়োটা আটকে গিয়েছিল বাবার গলায়, খক্ খক্ করে কাশতে গিয়ে চোখ থেকে ছিটকে এল জল। চোখের জল মুছে শেষ পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশ মণে রাজি হল বাবা। সামাট্ বুড়ো একটা খেজুর পাতার মাদুর বিছিয়ে দিয়েছে করণ গাছের ছায়ায়। বড় একটা দাড়ি-পাল্লা টাঙ্গানো হয়েছে তে-ঠেকা বাঁশে। ধামা ধামা ধান গোবর-মাটি লেপা গোলার ভেতর থেকে বয়ে আনছিল সামাট বুড়ো আর তার বউ। প্রতিবার ধান ঢেলে দেওয়ার সময় আমি লক্ষ্য করেছিলাম ওদের চোখে আগুনের ফুল্‌কি, কলজে উপড়ে ফেলা দাহময় যন্ত্রণা। সোমবারী বিমর্ষ অসহায় চোখে তাকিয়েছিল জড়ো করা সেই ধানগুলোর দিকে। আমার মনে হচ্ছিল ওর চোখ ফেটে যেন অশ্রু বিপর্যয় ঘটবে অসময়ে। দম ধরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে এক ছুটে ঘরের পিছনের দিকটায় পালিয়ে গেল সোমবারী। আমিও বাবার চোখ এড়িয়ে ভীতু পায়ে এগিয়ে গেলাম সেইদিকে। গিয়ে দেখি,—ছাই গাদার পাশের সজনে গাছটায় ও উঠে গিয়েছে অবলীলায়। নরম ছাইয়ের উপর ওর পায়ের ছাপ—আমি মুগ্ধ বিমোহিত চোখে তাকিয়ে থাকি সেইদিকে। কোজাগরী পূর্ণিমায় মা এমনই পদচিহ্ন এঁকে আলপনা দেয় ঘরময়। হঠাৎ জলতরঙ্গের শব্দের মত ভেসে আসে হাসি, ঘাড় তুলে দেখি পুঁইডগার চেয়েও নরম আঙ্গুলগুলো দিয়ে টুক্‌টুক্ করে সজনে ডাঁটা পাড়ছে সোমবারী। চোখে চোখ পড়তেই ফিক করে হেসে ও মন খারাপের চোখে তাকাল। আমি দেখলাম, ওর পায়ের রূপোর তোড়াটা ফুলের মালা হয়ে ঝুলছে। আর

পায়েব তলাটা কি ফর্সা, অবিকল আমাদের শ্বেত-পাথবের সেই কৃষ্ণ ঠাকুরটার মত!

আমাকে বোকার মত তাকিয়ে থাকতে দেখে সোমবারী একটু সাহসী হ'ল। হাতের চেটোতে কপালেব ঘামগুলো মুছে নিযে বলল, ছোট মালিক, মুঙ্গাগুঁটি (সজনে ডাঁটা) গুলান কুডায লাও। ঘব লিযে যাবে। তুমার মা খাবে—

একটা দুটো করে সজনে ডাঁটা কুডিযে একত্রিত করছিলাম আমি, কোন ফাঁকে গাছ থেকে টুক্ করে নেমে এল সোমবারী। ভাপানো নিঃশ্বাস ফেলে সে আমার পাশে শিব-দুর্গার মত দাঁডাল। আমার পাতলা গোঁফে তখন মাছের ডিমের মত ঘাম, কেন—জানি না ভযে অনবরত পা কাঁপছিল আমার।

ধান মাপাব তোডজোব তখন বাতাসে, রোদের হল্কা কিছুটা কমে গিয়ে গ্রামটার উপর ছায়া পডেছে আকাশেব। আমার ছাযায় দাঁডিযে সোমবারী গজ-মুক্তা দাঁত দেখিযে হাসল। বলল, চলো ছোটবাবু, আমাদেব গাঁ-খানা তুমাকে দেখিযে লিযে আসি। হা, জান বাবু—ইখানে একটা চন্দ্রহাবেব মত নদী আচে, নদীটায় কি সোবোত। আব কি হাতিফাটা গর্জন। যাবা তো চলো, তুমারে সব দেখিয়ে লিযে আসি।

ইচা-খরখাই ড্যাম্পের জন্য সবকার যে আমাদেব জমি গুলো কিনেছে, সেই পাথুরে জমিতে সিঁথি দাগ হয়ে নদী চলে গিযেছে বহুদূর। অবণ্যভূমির ছাযায নদী যে এত গর্বিতা হয, ক্রুদ্ধ, গর্জিতা সর্পিণী হয়, তা দু'চোখ ভরে না দেখলে চোখ ও মনেব কোন খিদে মবে না। এত সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্য আমি কি এর আগে কখনো দেখেছি? বাউল বাতাসে হঠাৎ হঠাৎ ভেসে আসছিল নিম-মহুযাব সুবাস। কি ভেবে আমার বুকটা হঠাৎ মুচডে উঠল বেদনায়। এই স্বর্গভূমি ছেডে আমরা এখন অধোগামী নরকে আছি? মাযেব কথা বর্ণে বর্ণে মিলে যেতে অভিমানে আমার চোখেব কোণটা ভিজে গেল। হা-হুতোশ করে উঠল মনটা। অর্থের লোভে বাবা এখন অর্থকীট। জমি বিক্রিব মোটা টাকা শহরের ব্যাঙ্কে সুদের ফুল ফুটিযে দিচ্ছে প্রতিমাসে, সেই অঙ্কও বাবার মাস মাইনের চারগুণ। তবু তৃপ্ত নয মানুষটা, নাহলে কেউ কি ছুঁডে দেওয়া ঢিলের পেছনে পাগলেব মত ছুটে যায়। নুনা সামাট সরকারী জমিতে চাষ করে বছর বছর ফসলের ভাগ দেয বাবাকে, সাব-জল-লাঙ্গল সব তাব। বাবা শুধু খবরদারির লাগামটা শক্ত হাতে ধবে বছর বছর শুষে নেয একটা মানুষকে।

ইচা—খরখাই বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আমি আর সোমবারী ফাঁকা জমিল গুলোর দিকে তাকালাম। আমাকে এখানে আনতে পেরে আমবারীর আর খুশি ধরছিল না, বয়ে যাওয়া নদীটার মত সে-ও যেন উছলা নদী। দু'হাত প্রসারিত করে বুকে বাতাস ভরে নিয়ে সে বলল, হা, ছোটবাবু, দেখ—কত্তো জমিন। সব তুমাদের। তুমরা কত্তো বড়লোক! ক-অ-অ-ত্তো-ত্ত-ত্ত বড়লোক!

ফেরার সময় একটা গাছের তলায় দাঁড় করিয়ে সোমবারী আমাকে বোকা বানানোর জন্য বলল, আচ্ছা ছোটবাবু, কও তো ইটা কি গাছ?

আমি হা করে তাকালাম, আকাশ দেখলাম। এখানকার আকাশ কত নীল, নির্মল!

সোমবারী দাঁত বের করে হাসল, পারলে না তো বাবু,—আমি জানি তুমি পারবেনি। তুমি যে শহুরে থাকো—

এটা কি গাছ? আত্মসমর্পণে সহজ হ'ল সোমবারী। ঝিলিক দেওয়া দাঁতে একটা শুকনো পাতা চিবাতে চিবাতে বলল, ইটা হলো গিয়ে মহুয়া গাছ।

হা, দেখ চোনি কি সোন্দর ফুল, কি মিঠা সুবাস! এই পর্যন্ত বলেই আবার গম্ভীর হয়ে গেল সে, ভারিক্কি গলায় বলল, খরাকালে মোর মেগে মহুয়া সিজিয়ে খাই। বাবু গো, মহুয়া খেলে বড় নিশা হয়।

সোমবারী যখন তার ছোট ছোট পদ্মডাঁটি হাত উঁচিয়ে আমাকে এসব বোঝাচ্ছিল, তখন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম আমার সামনে-পিছনে গণ্ডা কয়েক আমার বয়সী ছেলে-মেয়ে। তারা বেশ অবাক চোখে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। তাদের হলুদাভ, ঈষৎ গোলাপী চোখে সম্ভ্রম জনিত ভয়। আমার পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তর্জনী নাচিয়ে তারা যেন কিসব বলা-বলি করছিল নিজেদের ভাষায়। তাদের হাব-ভাব এমন আমি যেন অন্য গ্রহ থেকে বিতাড়িত কোন জন্তু। আমার হাব ভাব, চাল চলন, কথা-বার্তা সবকিছু যেন ওদের থেকে আলাদা। এ উপেক্ষা অসহনীয়। ঐ অতগুলো চোখের লোলুপ দৃষ্টি থেকে রেহাই পাবার জন্য বন্ধুত্বটাই আমার কাছে সুখের মনে হল। আমি তাদের হাতের ইশারায় কাছে ডাকলাম। এক পা, দু'পা করে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে।

কম্‌বু কম্‌বু! --বলে ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ওরা। কিছুটা ছুটে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ওরা আবার ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকাল। লজ্জা

সংকোচে ঝড়ে নুয়ান বিধ্বস্ত গাছের মত গতিহীন হলাম আমি। ঘটনার আকস্মিকতায় বিহ্বল স্বরে ডাকলাম, ও ভাই, শোন – শোন।

ওরা আমার কথা শুনল না, নিরাপদ দূরত্বের জন্য পড়ি মড়ি করে ছুটে গেল লাল ধুলো উড়িয়ে। আমার চোখ ফেটে তখন জল আসার উপক্রম, তিন অক্ষরের ঐ বিষাক্ত শব্দটা জ্বালা ধরিয়ে দিল বুকে।

সোমবারী আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিল, কেমন ফ্যাকাসে গলায় সে বলল, বাবু চলো।

আমি বললাম, হ্যাঁরে, সোমবারী 'কম্‌বু' মানে কি?

প্রথমে ইতস্তত করছিল সোমবারী, আমি ওর হাতটা ধরে কাতর স্বরে বললাম, কিরে, বলবি না তো, ঠিক আছে যা! আমি আর কোনদিনও তোদের গ্রামে আসব না।

আমার কথায় কি ছিল, সোমবারী বুনো হাঁসের মত চোখ তুলে টুপটুপিয়ে কাঁদল। শেষে আমার হাতটা ধরে বলল, বাবু, 'কম্‌বু' মানে লুটেরা – যার মেনে লুটপাট করি পালায়, ধান-গোম-জোন্‌হার-মোকাই—সব।

তখনও বাতাসে ভেসে আসছিল নুনা সামাটের গলা, ওজন দাঁড়ির হিসাব। বিশে এবং—বিশে দুই,—বিশে তিন—। কম্‌বু—কম্‌বু—কম্‌বু—উ-উ উ।

ভিনদেশী

নন্দদুলাল আচার্য

পাড়া-পড়শীরা বলে ছিল ওর কেউ নেই
ঘরও ভেসে গেছে গতবছরের বন্যায়
ইচ্ছে জাগলে নিয়ে যেতে পারো ওকে
কপালখাকি ও কন্যায়

তোমার তো আছে লালঘোড়া আর
মেঘ ধবলিমা আকাশও
ভিনদেশী যুবা নিয়ে যাও ওকে
পাহাড়তলির সকাশে

ওকে দিও ঘর
তুমি হয়ো ওর বর
জল ঝর্ণায় স্নান করে ওর দেহ হোক সুন্দর

কচি কলাপাতে ভাত বেড়ে দেবে মেয়েটি
স্বেদ মুছে দেবে আঁচলে
বলবে আনত মৃত্যুই ছিল শ্রেয়
হে স্বামী না এসে বাঁচালে

পূর্বী গাইছে রতির ঋতুর বধুরা
চোখের বিভায় এনেছে কি মায়াবাত
নয়নে পুণ্য ঘনায় কৃত্তিকার
ও কুমার দেখে দুজনের সাক্ষাৎ।

প্লেটোর বঁধুয়া

অনন্য রায়

আমাকে বিবাহ কেন করবে না বলো তো।—তুমি বুঝি
মার্কিউস পড়ো নি?
'ব্রহ্ম' মানে নিঃসঙ্গতা, ওঁয়াতে, উপনিষদে, তা-ই লেখা আছে।

আমাকে চিক্কণ করো মাটি-মানুষের শস্যে, বজ্রের অশ্বিনী।
বাসনা ও বাস্তবতা পুড়েছে দূরত্বমুগ্ধ পাহাড়শিখায়, দীর্ঘ একাকিনী আঁচে

যখন বৃষ্টির শব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি সূর্যের পাঞ্জাবি-পরা স্তঠাম
যুবক, নীল নৈঃশব্দ্যের নম্র বার্চ গাছে
কেবলি বৃষ্টির ফোঁটা, স্তব্ধতার স্রোত তার গিলে করা জলের
আস্তিনে মোছে বর্ণালির ভাসমান সিঁড়ি
(বজ্র ও বিবাহ চায়, আগুন ও জল চায় চুমু খেতে নীল ওষ্ঠে
দিগন্তের, আর অস্তসূর্য তারই হ্রেষাধ্বনি!)
যদি—না বিবাহ করো : অন্য অপরাহ্নে, লাল মেঘে-মেঘে
রক্তের ছটায়, আমি কাম্যুর প্রবন্ধ পড়ে করবো হাবাকিবি!

এইসব বুধের ব্যাধি, বানানো ব্যসন ছিঁড়ে, বাস্তবতা বেঁচে থাকে
স্মোল্‌নির বিদ্রোহে কিম্বা বুদ্ধের বেদনা হয়ে গাছের মসৃণ
ছায়া অঙ্কুরিত ঘাসে;
(হাওয়ার পেরেকে-গাঁথা চাঁদের কঙ্কাল কেন ক্রাচে-ভর-দেওয়া কোনো
ভাঙা মেঘ নিয়ে আসে বসন্ত-সন্ত্রাসে!)

কোনো অশ্বিনীর সঙ্গে আমার বিবাহ : সে-তো গল্পকথা নয়!—সত্য
নিয়মিত দিনযাপনে, উষার ট্রামপেটে কী যে আশ্চর্য শরীরী!

আমরা এখন

নীরদ রায়

মেপে রাখি মধ্যস্থতা গোপনে গোপনে
তুলে রাখি নদীশোক রক্তমুখী চাহনি দেয়ালের কাঁধে
এখন আমরা শুধু চিনেরাখি আমাদের প্রিয়রাস্তাগুলি,
আমাদের সুখ ও আনন্দের বসতবাটি জ্যোৎস্নার পাশফেরা,
আমাদের দুঃখগুলিই এখন আয়তনে সব চেয়ে বড়
আমাদের না হওয়া ঘরবাড়ি, টবে সাজানো ফুল
বিদেশ ভ্রমণের পুর পশ্চিম—সহজের ফর্সা মুখচ্ছবি
এখন আমাদের ব্যথা বেদনার সমস্ত শরীর জুড়ে,

অথচ মাইল মাইল দুর্যোগে যেদিকে ভেঙে গেল সব
জোড়া লাগবেনা যেসব কান্না আর কোনোদিন
নীরবের সন্ত্রাসে কোলাহল গ্রাম ছাড়া
আমাদের নজর আর ভুলও হাঁটেনা সেদিকে একবারো
আমাদের ভিতর বাহির ব্যস্ততার আদাজল
এখন, শুধু আমাদের নিয়েই।

গায়ক

মল্লিকা সেনগুপ্ত

সব আলো নিভে গেলে চিলেকোঠা ঘরে
গায়ক বসেন তার যন্ত্রমধ্যে, হারমোনিয়মে

ঠিক সুরে গলা কারো লাগেনা কখনো
লাগলে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি নেমে আসে

নাভি না কপাল থেকে সুর উঠে এলো!
আলো নাকি অন্ধকারে সুর উঠে এলো!

যে মুহূর্তে কণ্ঠ এসে শিখরবিন্দুকে স্পর্শ করে,
কালো পর্দা নেমে আসে গায়কের চোখে।

অলীক কুহক কিংবা নয়

প্রতিমা রায়

যেন কুহক
পিঠ লুকিয়ে হামাগুড়ি দেয়
পা ছোঁড়ে,
অথবা অনন্ত স্রোতের মুঠি

কি চায়
ঐ নীরন্ধ্র গর্ভ হতে উঠে আসতে!

মানুষের অমোঘ অনুভূতিতে
দু হাতের ফাঁকে গলে গিয়ে
অলীক কুহক কল্পনায় জন্ম নেবে বলে

বার বার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়
সমুদ্র আর গুঁড়ো সূর্যের স্রোতে।

ভূমিকম্প

জয়দেব বসু

উনিশশো উননব্বইয়ের কোনো সন্ধ্যার কথা দিয়ে শুরু করি।
আমার কিছুতেই মনে পড়ছিল না সেই মেয়েটির মুখ, যদিও
তখন পৌষ, সংক্রান্ত জানুয়ারি এবং সাকিন এই বাঙালি
শহর অর্থাৎ লাইল্যাক কোটার কোনো কথাই ছিলনা, তবু
ফুটেছিল। শুধু ফুটেছিল নয়, ত্রস্ত আঙুলে সেই লাইল্যাক
ফুল শিয়রের পার্শ্বদেশে অলক গুছিয়ে নিয়ে হেসেছিল।
অবশ্য এখন যদি প্রশ্ন করেন আমি আদতে নয়নতারা কিনা,
তাহলে ভ্রান্তি আর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যাবে, কেন না সেদিন
সেই সন্ধ্যায় তার মুখ কিছুতেই মনে পড়ছিল না

তো, একে কি ছন্দ বলবেন কবিরা? একে কি ভালোবাসা
বলবেন? যখন অনুতাপ হয় বহু ভুল হয়ে গেল ভেবে,
যে সময়ে নিঃসঙ্গতা হেরে যাচ্ছে মনে হয়, চীনে লণ্ঠন
জ্বলে উঠছে হানাবাড়িতে, বাচ্চারা ওড়াচ্ছে ফানুস এবং
গ্রাহাম বেল কথা বলছেন এনগেজ্‌ড্‌ টোনকে ছাপিয়ে
একে কি তেমন কাল বলা যাবে?

সেদিন তেইশে, শীত, তরল ঘড়ির স্রোত একপল থেমে গিয়েছিল

রাত্রিজল ছুঁয়ে

বিপুল চক্রবর্তী

রাত্রিজল ছুঁয়ে জেগে আছি
নক্ষত্রমালার দেশ আরো
দূর থেকে ক্রমাগত দূরে

রাত্রিজল, বেহুলা ভাসান

বহে যায় বাঙলা কবিতা
বাঙলার শব ও শালুক

ভাষা

রাহুল পুরকায়স্থ

অনেক কথাই বলার ছিল, শোনোনি
কুযোতলায়
আগুন এসে ভিজিয়েছিল গলা

সাত শহরের লোক জেনেছে
কার্যত লৌকিক
দোযাত উলটে ঝরেছে নাব্যতা

কৌপীন ওড়ে গ্রামে ও শহরে
বাত্রিগুহার আলোয়
ঠিকরে পড়েছে রীতিনীতি, ব্যাসকূট

কথা হবে, বলে চলে গিয়েছিল
শোনোনি, বাখোনি কথা
কাল বাত্তিরে বাতাসে ভেসেছো 'নাগবিক' সন্দেহে

ঝোরা

অনীক রুদ্র

তাহলে ঝোরার কাছে চলে গেছে পর্যটক যুবা
গলায় ক্যামেরা নিয়ে
সঙ্গিনীর হাতে চকোলেট
ওখানে শপথ হল
আরো কি কি কথা ও আশ্লেষ
সেইসব জেনেছিল সেতারের দীর্ঘতম ছায়া
এখন শীতের ঋতু
হিমানী পাহাড়ে তার বিকেল নেমেছে
তুমি তো এখানে ছিলে, মনে পড়ে—
কুয়াশা ছাপিয়ে যেত কতদিন শূন্য পাকশালা
অথবা বিধুর জলে
দ্রাবিড় সোন্যাটা ছিল মিশে

একটি প্রবাদমুক্ত

অনুরাধা মহাপাত্র

রাত্রির তাম্রাভ ল্যাম্পপোস্টে জ্বলে মৃত ও জীবিতের আত্মজীবনী
'অনাহার থেকে তীব্রঘামে মৃত্যু তবু ভালো', তাই দাসদের
ফকিরের যন্ত্রণার মতো কাটে সহস্র বছর নদীতীরে
রুখা প্রান্তরে পশুতাড়নায় গরলামৃতের মতো বেঁচে—
তবু মানুষ স্বাধীনতা চেয়ে নিজেরই বিরুদ্ধে যায়,
দেশ-দেশান্তরে নিজেরই রক্তের লোহা জ্বলে মৃত্তিকায়।
আগুন তাদের কাছে আহারের মতো প্রায়—স্বাহার
শরীরের অগ্নিসাগরে ডুবে যাওয়া সারসেরা
সার সার জ্বলা আকাশের যন্ত্রণায় আমাদের স্বপ্নের
ভিতরে পাখা ঝাপটায়, পথে পথে পাথরের ফলা
পথবিবাহের—গভীর গমশীষের মতো রমণীরা
টগর ফুলের মতো শিশুদের স্মৃতি এ'দেশের পথগৃহে
বটমূলে আর গঙ্গাগোধূলিভরা পরিচয়হীন সব বাইলেন,

গলির ভিতরে বিসর্জিত অপরাজিতার মতো আজ ফোটে,
তাই প্রতিদিন অব্যক্তের ক্রুশ, তাই প্রতিদিন প্রশ্নের সকাল—
প্রতিটি তীরের ফলা, খালাসীর কালিমুখ, অফিসের সর্পযন্ত্রণা
সাবান ও সাবানের কারখানার বিবাহের প্রথা
ভেদ ক'রে এই দিন একবার স্বাহা হয়ে স্নাত হতে চায়।

দাঁড়ি, কমা, যতিহীন কোনো আঁধারের পথে
অতিথির মতো দিক্‌হীন লঞ্চ ওঠে ভেসে
আর চারদিকে প্রশ্নের হাহাকার, 'মাঝি হো, হো মাঝি'—এই
আহ্বয়ের মাঝে কোনো ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি নেই, অগ্নিদগ্ধ প্লেন
দেখে কোনো বিস্ময় নেই, শুধু নিস্তব্ধ গ্রাম
শহরান্তর জুড়ে পাখার প্রসার জলে প্রশ্নহীন—
তাই, হে ধর্মবক, তুমিও কি শুদ্ধ জলের কাছে ব্যক্ত একবার?
তুমিও অব্যক্তের রুধিরের মতো যাও জলের সন্ধানে?

ভাসছে পাল-তুলে

সুব্রত রুদ্র

পাল তুলে ভেসে যাচ্ছে।
আমাদের পরিবারটি বাড়তে বাড়তে বড়ো হচ্ছে মাটির কেন্দ্রো পর্যন্ত

পিঁপড়েদের আত্মীয় আমাদের পরিবার
তারা সম্পর্কে মশার আবার কী রকম
পাতায় পাতায়, জড়ানো হুটোপুটি
সকাল দুপুর সন্ধ্যা

দূর থেকে আমাদের দেখবে নবদূর্বাদলশ্যাম।

ছিন্নপাতার শব সারারাত নাচে

রেণুকা পাত্র

উদভ্রান্ত হাওয়ায়
ছিন্নপাতার শব সারারাত নাচে।

শব্দের ফিসফাস, নিমগ্ন আঁধারে
কার এই ছিন্নবাস
সাগরের কূলে ?

ইঁট, কাঠ, পাথর উজিয়ে
ছত্রাক মাথা তুলে ডাকে—
আয় ফিরে সর্বনাশ
তমসার নিসর্গ বিতানে।

মধ্যবয়সে

অনন্ত দাশ

উর্ধ্বমুখ শুয়ে আছি
অজস্র চিন্তার কুঁড়ি ফুটে উঠছে কড়ি বরগায় ছাদে
দেওয়ালে চন্দ্রমল্লিকার মত দুটো স্তন নিয়ে যামিনী রায়ের ছবি
জয়কো ইলেকট্রনিক
সময়কে ভেঙে ভেঙে মহা শূন্যে মিলিয়ে দিচ্ছে
এমন সুস্থির জীবন কখনো ছিল না—

আজন্মলালিত অভিলাষ
কিছু ভাঙা পংক্তি নিয়ে দরজায় টোকা দিচ্ছে
প্রিয়জনের দূরে চলে যাওয়ার মত একটা দুঃখ
বারবার মোচড় দিয়ে উঠছে বুকে
একটা অর্থহীন, ক্লান্ত জীবনের জন্য এত মায়া—

মধ্যবয়সে
সায়াহ্নের কাছাকাছি বসে

আমি অসহায়ের মত দেখি
বহুদূরে আকাশের কোন দিয়ে
আবহমান কালের স্মৃতি দুঃখ যন্ত্রণা নিয়ে
দীর্ঘশ্বাসের মত উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন—

ভ্রূণ

অশোক দত্তচৌধুরী

চড়া ভাদ্র-দুপুর। সুরপুরের গঙ্গা চলেছে রূপনারায়ণে
আর কাঁচা রূপো ঢেউ তুলছে ঐ ভাগীরথী।
পাকুড়ের নিচে জাল হাতে দাঁড়িয়ে কী ভাবছে নিবন্ধন?
কাঁচা রূপো আস্তরণ জল ঝিলিক দিয়ে উঠলো গুমোট দুপুর।
মাঝে-মাঝে ঝলক হাওয়া। প্রবাহিত চৈতন্যের চর।
অবিশ্রান্ত ঘুঘু গোসাপ মাছরাঙা গিরগিটি শ্বেত দ্রোণ
আকাশমণির সবুজ থেকে ভাদ্র-দুপুর।
ক্ষুৎকাতর কাদা-মাখা উদোম ন্যাংটো ছেলের দল
জেটির নিচে স্থির দাঁড়ানো। একই আকাশের নিচে
একই রূপো আস্তরণ জল থেকে চর। বটের লাল ফল
দীর্ণ করে বীজ। বারবার সম্পূর্ণ হতে চায় ভ্রূণ।
আর মানুষ—দয়ালু মানুষ ক্ষুধার্ত মানুষ কল্পনাপ্রাণ মানুষ
ন্যায়নিষ্ঠ মানুষ প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ যৌনদীর্ণ মানুষ
বসতি তুলেছে এইখানে একাগ্র প্রবাহিত চৈতন্য সময়
দুপুর ভাদ্র-দুপুর। সমায়তন খুঁজে চলেছে সম্পূর্ণতা।

ঘর

চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

উড়ে যায় ভেজা পর্দা, আসবাবপত্র ভাসমান
ঢেউয়ের মাথায় দুলছে ছায়াগুলি,
চারিদিকে অবিশ্বাস্য রাগ লেগে আছে।
এ-ঘর নির্জন, শুধু

কবন্ধ পুত্রের চোখ ভোররাতে জলে ভরে ওঠে,
মেঝের কুহকে তার নাভিকুণ্ড পোঁতা হয়েছিল।
আজ, এতোকাল পর কেন যে রক্তের মৃদু কষা গন্ধ বাতাসে ভাসলো—
ভাঙা পুতুলের গলা কে যেন মুচড়ে দিলো জোরে!
লোকে কানাকানি করে,
তারপর খুব কৌতূহলে কপাট একটু খুলে
ভেতরে তাকায় যেই, অন্ধকারে চোখ পুড়ে যায়।

প্রথম কবিতা

সুব্রত সরকার

বাংলা কবিতা থেকে পালিয়ে যেখানে এসেছি
পৃথিবীর কোন দেশ নয়,
অর্ধেক কার্বন, বালি, জন-মানবহীন প্রান্তরে
পশুর ভুক্তাবশেষ কিছু অক্ষরের হাড়গোড় পড়ে আছে
বাকি অর্ধেকে চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে
আহার সংগ্রহ করতে হয়!
দেহধারণের লীলা যেন শেষ হয়েও শেষ হতে চায় না
যত উঠি তত কারচুপি, জলের শব্দ, ছলনার দিকচক্রবাল
গায়ের রঙ তামাটে হয়ে যাচ্ছে দেখে লোকেরা বলে
পাপ পরবেশ হয়ে কোথাও আটকে গেছে আত্মা
ছাড়া পেতে বেশ সময় লাগবে।
এখন ভুলের গর্তে জীবন প্রাণীর মত শ্বাস ফেলে
তার রোগা ছায়া মা-মরা ছেলের মত উদাস
টের পাই ভাষা ছিল আসলে বিষাক্ত গাছ
ক্ষত থেকে আঠা সংগ্রহ করে
প্রস্তুত করা হতো রণজয়ী আয়ুধ।
যশহীন, তুচ্ছ কবিকেও এখন মনে হচ্ছে তেপান্তরের তারা
অসুরের শক্তি নিয়ে অপেক্ষা করছেন—

এই সভ্যতার কতটুকু অবশেষ রাখবেন তাঁর ইচ্ছা
মানুষের রচনাশক্তি ও কল্পনা এইমাত্র যেখানে পৌঁছালো
মহাশূন্যে লীন হয়ে গেলে
আর একবার লেখা হবে প্রথম কবিতা।

চেনা

শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়

জলন্ত রাতের গল্প শোনো যদি বলি
সে এক বাঘের থাবা দিনগুলো সয়ে
এই যে এলাম পথে, মরুময় ফাঁকা
সাধের হীরককণা গেছে কবে ক্ষয়ে।

এখন যেটুকু আছি, এ বাঁচার মানে
একা ঘরে বসে ভোঁ—ভোঁ, কানামাছি খেলা
দেহে, মনে ঘুণপোকা, চোখে ঘোর, ধাঁ—ধাঁ—
নিবে এলো এ-রাতের অবসর বেলা
নিজেকে ধরবো মেলে—সে সাহস গেছে
আছে প্রাণে প্রাণময় ক্ষীণ আলো জেলে
পরাণ মাঝির গান শেষ হলে পরে
তীরে এসে চিনে নেবে আঁধারের মুখ॥

অগ্নিমীলে পুরোহিতম

জয়া মিত্র

আমাকে স্পর্শ করো।
তোমার সর্বঘ্ন আঙুল
দীর্ঘস্পর্শ ছুঁয়ে যাক যন্ত্রণার শব।
স্পর্শ করো তাকে
সেই বেঁচে থাকা মৃত্যুরও অধিক

প্রতি পল অনুপল
তীক্ষ্ণ নখে ফালি ফালি
বিবর্ণ দিনরাত্রি সব মুছে যাক
আমাকে নতুন করো
এবং নতুন।
তোমার দুহাত ভরা বিলুপ্তির বর্ণময় শিখা
আমাকে নিক।

চিরস্মরণীয় রামমোহন

ক্ষিতীশ রায়

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মসাল ১৭৭২ অব্দ বলে স্বীকৃত। তিনি পরলোক গমন করেছিলেন ১৮৩৩ অব্দে। মৃত্যুর পর প্রায় দেড়শত বৎসর কাল রামমোহন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা বা আলোচনা সীমাবদ্ধ ছিল ব্রাহ্মসমাজ ও মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অতি ভক্তিবশত যতটা তিনি বড়ো নন তার চেয়েও তাকে বড়ো করে দেখাতে চেয়েছেন। কেউ কেউ আবার বিদ্বেষবশত তাঁকে ছোটো প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এই শেষোক্তদের প্রতি লক্ষ্য রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মর্ত্যজীবনের শেষ মাঘোৎসবে (জানুয়ারী ১৯৪১) আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "তাঁর সম্বন্ধে বিরোধের উত্তাপ আজও প্রশমিত হয়নি।" সেই সময়ে রচিত একটি কবিতায় লিখেছিলেন :

মৃত্যুঞ্জয় যাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে
দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব করো যদি
খর্বতার অপমানে
বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।

আজ যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন, হয়তো দেখে খুশি হতেন রামমোহনের উপর থেকে বিরূপতার মেঘ বহুলাংশে অপসৃত হয়ে গেছে। রামমোহনের মৃত্যুর সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত এই সংকলন গ্রন্থ তার অন্যতম প্রমাণ।

রামমোহন প্রতিভার বহুমাত্রিক বিকাশের একটি প্রকৃত মূল্যায়ন যে একক প্রচেষ্টায় সম্ভবপর হতে পারে না—একথা বুঝতে পারা গিয়েছিল রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকীর সময় (১৯৩৩-৩৪) থেকে। সে সময় দেশে

বিদেশে যে-সব সভা ও আলোচনাচক্রের অধিবেশন হয়—সেগুলির প্রতিবেদন এবং সে-সময়ে রচিত বাংলা ও ইংরেজি প্রবন্ধাদি একত্রিত করে আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তীর সম্পাদনায় The Father of Modern India নাম দিয়ে একটি Commemoration Volume প্রকাশিত হয়। বর্তমান সংকলনের সম্পাদকমণ্ডলীর মতে "সম্পাদন নৈপুণ্যে ও বিষয় গুরুত্বে এই সংকলনটি তুলনাবিহীন।" তাঁরা আরও বলেছেন, "বর্তমান গ্রন্থখানি সেই আদর্শেই পরিকল্পিত।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ধারণা 'যুগপুরুষ' রূপে রামমোহন তাঁর নিজের দেশে প্রথম স্বচ্ছন্দ স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন ১৯৭২ অব্দে—তাঁর জন্মের দুই শতাব্দী পূর্ণ হবার পর আধুনিক জীবনে রামমোহনের প্রাসঙ্গিকতা এখন সর্বজনসম্মত। এই আধুনিকতার মূলে রয়েছে রামমোহনের জীবনদর্শন যার মধ্যে তিনি মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির সঙ্গে ইহলৌকিক কল্যাণকে তুল্যমূল্যে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আধুনিকতা যে ক্ষুণ্ণ হবার নয় তার একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায় বর্তমান সংকলনের লেখকমণ্ডলী ও তাঁদের লিখিত নিবন্ধাবলীর সূচীর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে।

বিষয়সূচীতে রামমোহনের নামের সঙ্গে যে-সব বিশেষণ প্রযুক্ত হয়েছে তা থেকে অনুমান করা যায় কীভাবে ও কতো ভাবে রামমোহনের কৃতি ও ব্যক্তিত্ব বিশেষত মনীষীদের চিত্ত আকৃষ্ট করেছে। যে-সব বিশেষণে রামমোহনকে বিশিষ্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে : ভারত পথিক / মহাত্মা / যুগপ্রবর্তক / দেশাভিমানী / জাতীয় আন্দোলনের অগ্রদূত / মহাজাতীয়তার দিশারী / বিশ্বমানব / নবচেতনার অগ্রপথিক—ইত্যাদি।

তাঁকে কেন্দ্র করে যে-সব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য : ভারতীয় অর্থনীতি / খৃস্ট ও খৃস্টধর্ম / শ্রমজীবী সমাজ / আন্তর্জাতিকতাবাদ / শিক্ষাচিন্তা / রাজনীতি / দেশাত্মবোধ / নারী মুক্তি / হিন্দু নারীর অধিকার / বেদান্ত ভাষ্য / হিন্দী ভাষা / বঙ্গসাহিত্য / বাংলার নবজাগরণ / আধুনিক যুগ / সংবাদপত্র / ব্যাকরণ / রামমোহনের ধর্মচিন্তা ইত্যাদি।

লেখক তালিকায় যেমন আছেন রবীন্দ্রনাথ / শিবনাথ শাস্ত্রী / ব্রজেন্দ্রলাল শীল / বিপিনচন্দ্র পাল / অজিতকুমার চক্রবর্তী / কাজী আবদুল ওদুদ / অতুল চন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ মনীষীবৃন্দ, তেমনি আছেন হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় / ভবতোষ দত্ত / ফাদার ফালোঁ / চিন্মোহন সেহানবীশ / নির্মাল্য বাগচী / নির্মল সেন / সোমেন্দ্রনাথ বসু / দেবীপদ ভট্টাচার্য / নিমাইসাধন বসু / দিলীপ

কুমার বিশ্বাসের মতো এমন সব নিবন্ধকার, যাঁরা সার্থকভাবে প্রাচীন যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের সংযোগ স্থাপনে সুপটু।

পরিশিষ্ট অংশে যুক্ত হয়েছে সাতটি রচনা এ-যুগে পাঠকদের কাছে রামমোহনের পরিচয় বিশদ করার জন্য। এই সব লেখার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় তুহফাৎ-উল-মওয়াহিদ্দীন (একেশ্বরবাদীদের উদ্দেশে নিবেদন) রচনার সুনীলবরণ রায় কৃত নূতন বঙ্গানুবাদ ও তার যুক্ত নির্মল মুখোপাধ্যায়ের দীর্ঘ ভূমিকার। এতদ্ব্যতীত আছে গৌতম নিয়োগী সংকলিত রামমোহনের গ্রন্থসূচী এবং রামমোহন সম্পর্কে বাংলা গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদির সূচী।

গ্রন্থের পরিশিষ্ট অন্তর্ভূক্তির জন্য সূচনায় নির্দিষ্ট ছিল রামমোহন রচিত ভারতীয় রাজস্ব পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ, ভারতীয় রাজস্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তরে রামমোহনের সাক্ষ্য, রায়তদের অধিকার ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রামমোহনের মতামত। এই তিনটি ইংরেজি রচনার সুষ্ঠু ভাষান্তর করে দিয়েছিলেন Socio-Economic Research Institute এর Director, দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তা ছাড়া মঞ্জুলা বসু রামমোহনের অর্থনৈতিক চিন্তার বিষয়ে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

রামমোহন স্মৃতিরক্ষা সমিতির অনুরোধে মূল সংকলন গ্রন্থের প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় এইসব লেখা একত্র সমাহৃত করে পৃথকভাবে "রামমোহন ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ" নাম দিয়ে একটি সুমুদ্রিত পুস্তিকা প্রকাশ করেন হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক তাপসকুমার দত্ত। এই পুস্তিকার সম্পাদনা করেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ ভবতোষ দত্ত। তাঁর মতে এ পুস্তিকা "বাংলা ভাষায় অর্থনীতি সম্বন্ধীয় প্রকাশনাতে একটি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন।"

মূল সংকলন গ্রন্থ সম্বন্ধে সম্পাদকদ্বয়ের সঙ্গে একমত হয়ে স্বচ্ছন্দেই বলা চলে "উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত ভারতবর্ষে আধুনিকতা মন্ত্রের উদ্গাতার প্রতি গ্রন্থখানি বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে অর্পিত শ্রদ্ধার্ঘ্য।" প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর স্বল্পায়তন ভূমিকায় যথার্থই বলেছেন, "গ্রন্থটিতে বঙ্গ দেশীয় পণ্ডিত সমাজের যে সমন্বয় ঘটেছে তা গ্রন্থ সংকলনের ইতিহাসে দুর্লভ বলা চলে। এঁরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিদ্যার ক্ষেত্রে আপন জ্যোতিতে ভাস্বর। রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভা ও কর্মের পরিক্রমা এইরূপ বহুবিধ বিদ্যাবত্তার দ্বারাই সম্ভব। গ্রন্থটি রামমোহনের প্রকৃত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে একটি সার্থক পদক্ষেপ।"

পরিশেষে একটি ব্যক্তিগত কথা: রামমোহন স্মরণ গ্রন্থটি আমার পক্ষে

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, চিন্মোহন সেহানবীশ ও সোমেন্দ্রনাথ বসুরও স্মারণিক। প্রয়াতদের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলি, রামমোহন নিদিধ্যাসনের ক্ষেত্রে তাঁদের উত্তরাধিকার যেন আগামী দিনের গবেষকবর্গকে প্রেরণা দিতে পারে।

আশাতীত সুলভ মূল্য ধার্য করা হয়েছে বলে আশা করা যায় পুস্তকদুটির প্রচুর চাহিদা হবে।

এক। রামমোহন স্মরণ : মৃত্যু—সার্ধশতবর্ষপূর্তি সংকলন।

সম্পাদকমণ্ডলী : পুলিনবিহারী সেন, সোমেন্দ্রনাথ বসু, প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত, দিলীপকুমার বিশ্বাস। প্রকাশন সমিতি : করুণাকেতন সেন, এস. এ. মাসুদ, কমলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপসকুমার দত্ত, কিরণচন্দ্র সেনগুপ্ত, জগদিন্দ্র ভৌমিক ও আশিসকুমার পাইন (আহ্বায়ক)। প্রকাশক : রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি। ৬৩ রাজা বসন্ত রায়রোড। কলিকাতা-৭০০০২৯। পরিবেশক : প্যাপিরাস। ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন। কলিকাতা। প্রকাশ : মার্চ ১৯৮৯। পৃঃ ১৩+৩৯০+পরিশিষ্ট পৃঃ ৭৯। চিত্রসূচী : ১। প্রচ্ছদ—গিবসন্-কৃত আবক্ষ মূর্তি, ২। প্রবেশক : ব্রিগস্-অঙ্কিত পূর্ণাবয়ব তৈল চিত্র, ৩। কর্ণেল ব্রেরেটন্-এর বিচারসভায় দর্শকরূপে উপস্থিত রামমোহন। ব্রিস্টল আর্ট গ্যালেরিতে রক্ষিত তৈলচিত্র, ৪। অটোগ্রাফ খাতায় রামমোহন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য। পাণ্ডুলিপি চিত্র। প্রচ্ছদ : সুবিমল লাহিড়ী। মূল্য : চল্লিশ টাকা।

দুই। রামমোহন ও অর্থনীতি প্রসঙ্গ। প্রকাশক : তাপসকুমার দত্ত। হরিনাভি ব্রাহ্মসমাজ, ৫৮ ক্রীক রো, কলিকাতা-৭০০০১৪। ভূমিকা : ভবতোষ দত্ত। প্রচ্ছদ : খালেদ চৌধুরী। পৃঃ ৪৪। প্রকাশ : মে ১৯৮৬। মূল্য : আট টাকা।

রবীন্দ্ররচনার দর্শনভূমি

গুণময় মান্না

১.

রবীন্দ্রনাথ নিজেই একাধিক উপলক্ষে নিজের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি ছাড়া, অজিতকুমার চক্রবর্তী—রাধাকৃষ্ণণ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত বেশ কয়েকজনের রচনায় একই বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথসহ এঁদের সব রচনার মূল্য যথাযথভাবে স্বীকার করেও বলা যায়, রবীন্দ্রদর্শনের আদ্যন্ত-ব্যাপ্ত পূর্ণাঙ্গ বিকাশের মূলসূত্র এপর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি। তার কারণ হয়তো এই যে, রবীন্দ্রনাথের মনোলোক বহুধা-প্রসারিত, জটিল, স্ব বিরোধ-কণ্টকিত এবং অনেক ক্ষেত্রে পলাতক, ইলিউসিভ। তাঁকে সঠিক-ভাবে দেখতে গেলে যে কালের ব্যবধান প্রয়োজন ছিল, কবি নিজে এবং উক্ত গ্রন্থকারেরা তা পাননি। অনেক সময়ই সাময়িকতার প্রণোদনা এবং পূর্বনির্দিষ্ট ধারণার দ্বারাই তাঁরা পরিচালিত হয়েছেন। কিন্তু খোলা মন নিয়ে, রবীন্দ্র-রচনারই তন্নিষ্ঠ পাঠ ও বিশ্লেষণ, রবীন্দ্র-মনোবিকাশের স্তরে স্তরে উদ্ভিন্ন বহুশাখায়িত বৈচিত্র্যের অনুসরণ করে একটা আশ্চর্যজনক ফললাভ করা সম্ভব, একটি সূত্র হাতে পাওয়া যায়—সেটিকে নাম-রূপ দিয়ে বলা যায়, রবীন্দ্রদর্শন মূলত অস্তিত্ব-চেতনার দর্শন।

একটু হিসেব নিচ্ছি। অজিতকুমার চক্রবর্তী 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে প্রথম জীবনদেবতা তত্ত্বের ভাষ্য রচনা করলেন। মূলত, সোনার তরী-চিত্রা-র যুগ অবলম্বন করে তা নিষ্পন্ন হয়েছে। কিন্তু তারও আগে রবীন্দ্রনাথের আরো তাৎপর্যপূর্ণ রচনা ছিল—এবং একেবারে বনফুল-কবিকাহিনী-ভিত্তিক গোড়া থেকেই রবীন্দ্ররচনা সুস্পষ্ট তাত্ত্বিকতা লাভ করেছিল—সে সবকে তাহলে অবাস্তব বলে ভাবতে হয়। এবং একথাও সত্য যে জীবনদেবতা তত্ত্ব দিয়ে কবির পরিণতি-পর্যায়ের রচনার উপযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। অজিত-কুমারের সঙ্গে তুলনায় রাধাকৃষ্ণন আরো আংশিক : তাঁর উপাদান ছিল মূলত ইংরেজি Gitanjali, Sadhana এবং Personality, শুধু তাই নয়, রাধাকৃষ্ণন উক্ত গুটি কয়েক রচনার তন্নিষ্ঠ বিশ্লেষণও করেন নি, উপরন্তু তাঁরই স্ব-সেবিত ভারতীয়তা এবং উপনিষদ ফ্রেমের মধ্যেই উক্ত গ্রন্থগুলির ব্যাখ্যার

দায় সেরেছেন। সেদিক থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বোধ হয় তাঁর ভালো ব্যাখ্যাতা। কিন্তু আত্মপরিচয়-এ তিনি ব্যাখ্যা করেন জীবনদেবতার, Sadhana এবং Personality-তে উপস্থিত হয়, যাকে আরো পরে তিনি মহামানব নামে অভিহিত করেছিলেন, আর মানুষের ধর্ম (Religion of Man)-এ কেবল man-এর কথাই বলেন, যে সৃজনশীল আত্মিকতায় কেবলই বিশ্বমুখিন হচ্ছে। এ সবের কোনোটাই ভুল নয়, কেবল রবীন্দ্র-মনোবিকাশের বিভিন্ন তরঙ্গশীর্ষে সে সবের অবস্থান-তাৎপর্য। তাই প্রয়োজন এমন একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ নির্বাচনের, একটি মৌলিক প্রবর্তনা-প্রেরণার উৎস-অনুসন্ধানের—একই লতার প্রাণরস থেকে যেমন সবুজ পাতা গজায়, লাল ফুল ফোটে, ফোটে শাদাও—যা সমস্ত বিরোধ ও বিভিন্নতাকে ধারণ করতে সমর্থ।

রবীন্দ্রনাথের মনোবিকাশের স্তরে স্তরে বিভিন্নতা কম নয়। তাঁর রচনার প্রথম পর্যায়ে ঈশ্বর নেই, কেবলই মানবজগৎ, মধ্য পর্যায়ে ঈশ্বর, শেষের দিকে ঈশ্বর প্রায় অনুপস্থিত. তার স্থান অধিকার করেছে মহামানব। অস্তিত্ববাদী চেতনায় তিনি যে মানবজগৎকে সূচনাপর্বে সৃষ্টি করেছেন, কালেকালে সেই মানুষের রূপ বদলেছে তাঁর রচনায়, শেষ পর্বে যে মানুষ তাঁর চেতনায় ভিড় করেছে, তারা অন্ত্যজ মন্ত্রবর্জিত এবং তারা 'কাজ করে'। পোশাকে যেমন এক রঙের বহির্বাসের আড়ালে অন্য রঙের অন্তর্বাস জানানি দেয়, তেমনি রবীন্দ্রমানসের পরিণতিক্রমে হিতবাদ ধ্রুববাদ (এ দুটি রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে সাধারণত আনা হয়নি) ভক্তিবাদ মরমিয়া তত্ত্ব গতিবাদ মানবধর্ম এমন কি মার্কসীয়-প্রতিম দ্বান্দ্বিকতা তাঁর দর্শনচেতনাকে সমৃদ্ধ করেছে। তথাপি একথাও সত্য যে এইসব পরিবর্তনশীল স্তর বৈচিত্র্য ওই একটিমাত্র মৌল প্রবর্তনা তাঁর অস্তিত্ব-চেতনার থেকে উৎসারিত এবং তাতেই বিধৃত হয়েছে।

ঐতিহ্যাগত এবং সমকালিন দেশিক ও বৈদেশিক জীবনদর্শন বিপুল ক্ষুধায় যেমন তিনি অঙ্গীকৃত করেছেন, তেমনি তাঁর স্ববিরোধও কম নয়; আধুনিকতার তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রবক্তা কিন্তু আবার তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও প্রতিষ্ঠা করেছেন, স্কুল পালিয়েছেন কিন্তু নিজেই আবার স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন, তিনি গতির কথা বলেন কিন্তু স্থিতির ধ্রুববিন্দুর প্রতি ও তাঁর সমান আকর্ষণ, জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ তিনি আবার সেই জাতীয় আন্দোলনের তিনিই তীব্র সমালোচক, গান্ধীকে তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করেছেন আবার গান্ধীর নির্মম সমালোচনাও এসেছে তাঁর কাছ থেকে, তিনি কৃতী জমিদার কিন্তু ততোধিক কৃতী প্রজাকল্যাণসাধক, আলস্যের সহস্র সঞ্চয় তাঁর

কাম্য কিন্তু বোধ হয় সেযুগের কর্মিষ্ঠতম মানুষ তিনি ; বলশেভিক-শাসিত রাশিয়ায় না এলে তাঁর মনে হয়েছিল তাঁর তীর্থদর্শন অসম্পূর্ণ থাকত অথচ বিপ্লবোত্তর রাশিয়া সম্বন্ধে মন্তব্য করেন যে সেটা একই দানবের পার্শ্বপরিবর্তন, সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে উচ্ছ্বাস কিন্তু একথাও ভুলবার নয় যে ক্ষণকালিন হলেও মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ তাঁর মনকে ছুঁয়েছিল—এগুলো রবীন্দ্রনাথের স্ববিরোধের সামান্য কিছু উদাহরণ।

কী সেই মূলগত প্রবর্তনা যার অন্তর্নিহিত গতি-তাড়নায় এবং পরিবর্তনশীল বিশ্বজগতের সংস্পর্শে রবীন্দ্রদর্শনচিন্তা আদ্যন্ত-ব্যাপ্ত জৈবনিক রূপলাভ করেছে? সর্ব বিভিন্নতা এবং এই সব বিরোধকে ধারণ করতে সমর্থ হয়েছে? মনে হয়, অস্তিত্ব চৈতন্যের আলোকেই এই জটিল সমস্যাটির নিশ্চিত সমাধান হতে পারে।

২

রবীন্দ্রনাথকে অস্তিত্ববাদী দার্শনিক বলে গ্রহণ করলে কতগুলি প্রশ্নের সম্মুখিন হতে হয়। অস্তিত্ববাদ ইউরোপীয় দর্শন এবং আধুনিক কালের জীবনদর্শন। এ দর্শনের শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা রূপে যদিও জাঁ পল সার্ত্রের নাম উল্লেখ করা হয়, কিন্তু তাঁর আগে হাইডেগার, কিয়ের্কেগোর, ইয়েসপার্স, মার্সেল প্রমুখ মণীষীরা এ দর্শনের ধারক বিভিন্ন স্তম্ভ নির্মাণ করেছেন। দার্শনিকেরা অবশ্য অস্তিত্ববাদের মূলানুসন্ধান করতে গিয়ে আরো পিছনে গিয়েছেন, এতোটাই যে তাঁরা সক্রেটিসকেও ছুঁয়েছেন। প্রাগুক্ত দার্শনিকদের মধ্যে কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী, আবার সার্ত্রএর মতো কেউ বা পরবর্তী। এখন, রবীন্দ্রনাথ কি এই সব ইউরোপীয় দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন? এর সুস্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, না। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব প্রেরণাতেই তাঁর মনোলোককে বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। আধুনিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতা উভয় ক্ষেত্রেই অস্তিত্ববাদের (অস্তিত্ববাদ ব্যক্তিচেতনারই দর্শন) উদ্দীপন শক্তিরূপে কাজ করেছে। স্মর্তব্য যে ইউরোপীয় সভ্যতার সংঘাতে ভারতীয় জীবনে যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল, রবীন্দ্রনাথের পরিবারে দেখা দিয়েছিল সেই সভ্যতার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ধারকতার পূর্ণ প্রকাশ: বস্তুত ঠাকুর পরিবার ছিল এ সভ্যতার অন্যতম অগ্রণী।

লক্ষণীয় যে, সদ্য-উক্ত ইউরোপীয় দার্শনিকদের 'অস্তিত্ববাদী' আখ্যা দিলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য অতি দুস্তর, আবার তাঁদের থেকে রবীন্দ্র-

নাথেরও পার্থক্য। তবে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ এঁদের চিন্তাধারায় কমবেশি ফিরে ফিরে এসেছে, সেগুলিকেই এই দর্শনের সাধারণ গুণনীয়ক রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন, অস্তিত্ব চেতনা এঁদের মূল প্রস্থান-ভূমি, তারপর তারই সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে মৃত্যু-উৎকণ্ঠা, নির্বাচন-স্বাধীনতা ও দায়বদ্ধতা, মুক্তি-পিপাসা, অস্তিত্ব ও সারতার সম্বন্ধ-বিচার প্রভৃতি।

এখন, রবীন্দ্রনাথকে সোজাসুজি অস্তিত্ববাদী বলে চিহ্নিত করতে অনেকেই হয়তো দ্বিধা করবেন, কবি নিজেই কোনো অভিধার দ্বারা নিঃশেষে সীমিত হতে আপত্তি করতেন, নিজেকে ব্রাহ্ম বলে নির্দেশিত করতে তাঁর অস্বস্তি ছিল, অপরপক্ষে নিজেকে হিন্দু মনে করতে উৎসাহিত হতেন, আবার সেটাকে অতিক্রম করে মানুষ বলে অভিহিত হতেই ভালবাসতেন। সেক্ষেত্রে যদি অস্তিত্ববাদী বলে তাঁর একটা আঁটোসাটো মাপ আমরা তৈরি করতে নাও চাই, তবু একথা স্বীকার করতে হবে যে, অস্তিত্ববাদের প্রাগুক্ত লক্ষণগুলি তাঁর রচনা ও জীবনচর্যার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতরূপে প্রকাশ পেয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন আত্মপরিচয় গ্রন্থে নিজের কথা বারবার বলেছেন, কেমন করে তাঁর সত্তার বীজ প্রথম অঙ্কুরিত ও বিকশিত হয়েছিল, সেকথা বলতে গিয়ে ঠিক তেমনি অক্লান্তভাবে তাঁর নিজের পরিবারের কথাও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই পরিবার-পটভূমি এখানে স্মরণে রাখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষেরা যশোর-খুলনা থেকে নগর-কেন্দ্র কলকাতায় ছিটকে এসেছিলেন দুটি কারণে, প্রথমত পিকৃলি-অপবাদে সমাজবিচ্যুত হয়ে, দ্বিতীয়ত ইংরেজ বণিকের যোগানদার হয়ে আর্থিক ভাগ্যান্বেষণে। দুটিই ব্যক্তিক অস্তিত্ব অঙ্কুরণের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ।

মূল হিন্দু-সমাজধারা থেকে বিচ্ছিন্নতার কালো ছায়া ঠাকুর-পরিবার থেকে কখনো মুছে যায়নি - এটা তাঁদের পরবর্তী কালের প্রচুর বিত্তবিভব সত্ত্বেও। বিবাহাদি সামাজিক ব্যাপারে তাঁদের একরকম একঘরে হয়ে থাকতে হত, অতি সীমিতসংখ্যক পরিবারের সঙ্গে তাঁদের বৈবাহিক আদান-প্রদান চলত। এতে একদিকে তাঁরা যেমন আন্তরিত (insulated) হয়ে ছিলেন, অন্যদিকে বিরাট ঠাকুর-পরিবারের ব্যক্তিরা ছিলেন পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন—এমন কি বিলাত প্রবাসকালে অবাঞ্ছিত আচারের জন্য স্বয়ং দ্বারকানাথ অন্তঃপুর থেকে এক রকম স্বনির্বাসিত জীবন যাপন করতেন। আবার প্রত্যেকে যেমন আন্তরিত, তেমনি তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তিরও (energy) অদ্ভুত স্ফুরণ ঘটেছিল। এ পরিবারের লোকেরা সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক,

বাণিজ্যিক এবং সর্বোপরি চিত্রকলা সঙ্গীত শিল্প কাব্য নাটক প্রভৃতির ক্ষেত্রে যে শক্তিস্ফুরণ ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তা ছিল সত্যই অনন্য।

ঐতিহাসিক সমাজ-পরিবর্তন পরম্পরায় শ্রেণী বিশেষের সংস্থিতি এক এক রকম হয়ে থাকে, যদিও সর্বস্তরেই বলতে থাকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার যুগ্মতা। আঠারো-উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শ ও সহযোগে এদেশে যে নতুন বুর্জোআ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল, তা ছিল ঐতিহাসিক অনিবার্যতা। প্রাচীন যূথজীবনের ধ্বংস-স্তূপের ওপরই মাথা তুলেছিল বুর্জোআ শ্রেণী, কিন্তু সেকালে সামাজিক অগ্রগতির পতাকা বহন করেছিল এরাই। শ্রেণী-চারিত্র্যে ঠাকুর-বংশীয়েরা বুর্জোআ ছিলেন নিঃসন্দেহে, রবীন্দ্রনাথও। সুতরাং বুর্জোআর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, অস্তিত্বের সুতীব্র চেতনা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ-গুলি তাঁর দর্শন-চেতনার প্রাথমিক শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা নতুন যুগ এবং নতুন মানুষের জীবনসত্যকে যে অখণ্ড-ভাবে ধরতে পেরেছে, সেটাই তাঁর কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ যে কালে উদীয়মান, সেকালের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বহু উপলক্ষেই রবীন্দ্রনাথকে সাগ্রহ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ তো বটেই, আমরা মনে রাখব, রমেশচন্দ্রের কন্যার বিবাহ সভায় তিনি সন্ধ্যাসংগীত-এর তরুণ কবির গলায় মালা পরিয়েছিলেন। সন্ধ্যাসংগীত অস্তিত্বের বিচ্ছিন্নতা ও যন্ত্রণার কাব্য, যুগসত্যের এই অমোঘ প্রকাশ মনীষী বঙ্কিমের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। বাল্মীকিপ্রতিভা অভিনয়ের বৈপ্লবিক তাৎপর্যও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন।

৩

রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্বচেতনার ব্যাপারটি একটু খতিয়ে দেখতে চাই। দেখছি যে রবীন্দ্রনাথের জীবনের উন্মেষক্ষণ থেকে একেবারে পরিণতির কাল পর্যন্ত সর্বস্তরেই অস্তিত্বচেতনা মূলসূত্ররূপে ধারকতার কাজ করেছে। বিভিন্ন পর্ব থেকে যদৃচ্ছ দু'একটি উদাহরণ নিচ্ছি—'অন্তর বাহির যাবে যাবে দেশকাল— / 'আছি' মাত্র রবে শুধু আর কিছু নয়' (প্রকৃতির প্রতিশোধ), 'এই আমি যাকে আমি বলছি এর আর কোনো দ্বিতীয় নেই' (শান্তিনিকেতন) 'আমার নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে' (গীতাঞ্জলি), 'আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে' (শ্যামলী), 'দিনের প্রথম সূর্য প্রশ্ন করেছিল সত্তার নূতন আবির্ভাবে' (শেষ লেখা), এই সব।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে অস্তিত্ব-চেতনার প্রয়োজনেই রবীন্দ্রনাথ বারবার মানুষ, সমাজ, ঈশ্বর, স্বদেশ ও বিশ্বলোকের দ্বারে এসে পৌঁছেছেন—যদিও তা মোটেই চরমত সেসবের জন্য নয়, আত্মকামতারই পূর্ণ বিকাশের প্রয়োজনে। ন বা আর পুত্রস্য কামায পুত্র প্রিযো ভবতি আত্মনস্ত কামায পুত্র প্রিযো ভবতি—তাই বলে পুত্র-প্রেম মিথ্যা হয়ে যায় না, বড জোর বলা যেতে পারে, আত্মকাম মুখ্য প্রবর্তনা, পুত্রকাম বা বিশ্বকাম তারই গৌণ ফল। শ্রীচৈতন্যের প্রেমলীলায় অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ বিভাগের মতো।

আর রবীন্দ্রনাথ? তাঁর কাছে আত্মকাম অস্তিত্ব এবং বিশ্বকাম লোকমুখিনতা একই জীবনচর্যার অনিবার্য ফলশ্রুতি, সেটি ঐতিহাসিক অনিবার্যতান্ত—আর আমরা ধরে নিয়েইছি, দর্শন মাত্রেই প্রত্যক্ষ জীবনচর্যার সঙ্গে যুক্ত, তা সে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে কোনো দিকেই হোক না কেন। রবীন্দ্রনাথ মূলত ব্যক্তিত্ববাদী—তার দুই মুখ, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া—আর তিনি জীবনের প্রতি স্তরে নিজেকে অতিক্রম করেছেন, নিজেরই সত্য রক্ষা করার জন্য। অচলাযতন নাটক থেকে একটা মাত্র উদাহরণ নিচ্ছি। যে বিদ্যাযতন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন গুরু, তা হয়ে উঠল অচলাযতন, তখন গুরুকেই মূল সত্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য যোদ্ধৃবেশে তার প্রাচীর ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। কথাটার তাৎপর্য, ব্যক্তিকেন্দ্রিক সভ্যতাকে প্রতিক্রিয়ার হাত থেকে উদ্ধার করে তাকে বিশ্বমুখিনতা দান করা, আর সেই ভাবেই তার মৌলতা রক্ষা করা, এই তো? শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় একটি বিশেষ ভাবের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু চলার পথে অবস্থা এবং অন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংঘাত-সংস্পর্শে প্রতি স্তরেই তার পথচ্যুতির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল—কতবার যে রবীন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালযের রীতি-পদ্ধতিকে ভাঙতে-গড়তে হয়েছিল, তার ইযত্তা নেই। সে কেবল তার মূল আদর্শকে নতুন পরিস্থিতিতেও বজায রাখার জন্য। সেই প্রযোজনেই তিনি শান্তিনিকেতন বিদ্যালযকে পরিণতি দিলেন বিশ্বভারতী-তে, এবং তারও পরে তার সঙ্গে যুক্ত করলেন শ্রীনিকেতন, পূর্বোক্ত দুই প্রতিষ্ঠানের পরিপূরক রূপে। অবশ্য আমরা মনে রাখব, এসব কাজের যতই আত্ম-অতিক্রমী প্রবর্তনা থাক, তার পিছনেই রয়েছে আরো এক অমোঘ প্রবর্তনারূপে অস্তিত্ববাদীর স্বাধীন নির্বাচন, তাঁরই চেতনার রঙে রঞ্জিত বিচিত্রমুখিন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান (যথাস্থানে এসবের বিশদ আলোচনা থাকছে), এবং অস্তিত্ববাদীর কর্মানুষ্ঠানে অদ্ভুত শক্তির (energy) প্রকাশ।

সুতরাং সিদ্ধান্ত করতেই হয়, রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্ববাদী হলেও আত্ম-কণ্ডুয়নের গহ্বরে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেন নি, ক্রমাগতই সামাজিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে মুক্তির পথে এগিয়েছেন, তিনি অস্তিত্ববাদী হলেও অন্য অস্তিত্ববাদীদের মতো নন (আর সেটাই অস্তিত্ববাদের চারিত্র্য), এমন কি নন নিজের কোনো এক পূর্বগামী অতীতের মতো, পুরাতনের খোলস ছেড়ে এসে পড়েছেন নতুন ভূমির ওপর, সেটা কেবল ভবিষ্যতের মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে তাৎক্ষণিক সৃজ্যমানতায় নিজেকে নিয়োজিত করার জন্য। দ্বিধা অন্তর্দ্বন্দ্ব সর্বদাই তাঁর মনকে উদ্বেজিত করেছে, কিন্তু সর্বদাই তিনি এগিয়েছেন, বিকৃতি ও প্রতিক্রিয়াকে অতিক্রম করে।

একটি প্রশ্ন এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে আসে। রবীন্দ্রনাথের অস্তিত্ববাদী চেতনার উন্মেষে পাশ্চাত্য অস্তিত্ববাদীদের প্রভাব যদি পড়েনি, সমকালিন বাঙলাদেশের চিন্তাজগতের কোনো সমর্থন ছিল কি? মনে হয়, ছিল। যেমন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার সূত্রপাত করেছিলেন জনক প্রমুখ ক্ষত্রিয়েরা, তেমনি একালে বাঙলার নবজাগ্রত বুর্জোআরাই বেদান্তের পুনরুজ্জীবনে সক্রিয় হয়েছিলেন—তার এক শাখা রূপ লাভ করেছিল ব্রাহ্ম আন্দোলনে, এবং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিশিষ্ট অভিজাত ব্রাহ্ম-পরিবারের সন্তান, অন্য শাখা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে ভিত্তি করেছিল। দক্ষিণেশ্বর-জোড়াসাঁকো একটা পর্যায়ে খুবই কাছাকাছি ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র কোনো সম্প্রদায় গঠন না করেও বেদান্তের (গীতা) ওপর তাঁর ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এঁরা সকলেই একটি প্রশ্নের দ্বারা পীড়িত হয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে সত্তার (being) সমস্যা। 'এ জীবন লইয়া কী করিব—এই জিজ্ঞাসা বঙ্কিমচন্দ্রকে অঙ্কুশাহত করেছিল, করেছিল বিবেকানন্দকেও। এ যুগটাই ছিল তাই। অস্তিত্বের মূলানুসন্ধান ও তার পরিণাম সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই অব্যবহিত পরিবেশ থেকে যে স্বীয় চৈতন্যের পোষকতা টেনে নেবেন তাতে আর আশ্চর্য কী। বেদান্তের জীব-ব্রহ্ম সম্পর্ক-নির্ণয় এ যুগের বৈদ্যুতীতে নতুন তাৎপর্য পরিগ্রহ করেছিল।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখা যায়, পিতৃনির্দেশে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক না হওয়া পর্যন্ত সচেতনভাবে তিনি তাঁর রচনায় বেদান্তের উপাদান আহরণ করেন নি, যদিও তাঁর চারপাশে বেদান্তের আবহমণ্ডল বিদ্যমান ছিল। উদ্দমশীল তরুণ কবি বরঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা এক অনন্য সৃষ্টি, একথা অনেকেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু ওটির পিছনে যে দার্শনিক চেতনা প্রচ্ছন্ন তার নাম-রূপ

দিতে কেউই মনোযোগী হননি। বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদী ও ধ্রুববাদী বলেই আলোচিত, কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে কপালকুণ্ডলা-য় তিনিই প্রথম অস্তিত্ববাদের সূচনা করেন: বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, মরণোৎকণ্ঠা এবং নির্বাচন-স্বাধীনতা ও তার দায়িত্বগ্রহণ কপালকুণ্ডলা-য় এবং অংশত বিষবৃক্ষ-এর কুন্দনন্দিনীতে এবং অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের বনফুল ও কবিকাহিনী-তে সমভাবে প্রকাশিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরিতা বহু আলোচিত নয়, দর্শনচিন্তার ক্ষেত্রে একেবারেই নয়। কিন্তু তরুণ রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা ও বিষবৃক্ষ-এর কুন্দনন্দিনীতে যে ভাববীজ পেয়েছিলেন, তাকে তৎক্ষণাৎ তুলে নিয়ে পল্লবিত করতে একটুও পিছিয়ে থাকেন নি। শুধু তাই নয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম হিতবাদ এবং পরে ধ্রুববাদে আকৃষ্ট হয়েছিলেন, এবং তারপর এ দুইয়ের ওপর ভিত্তি করে তাঁর নিজস্ব মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের সেশ্বর অনুশীলন তত্ত্ব গড়ে তুলেছিলেন। যদিও এ পর্যন্ত কেউই বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার নিকট সাদৃশ্যের ওপর আলোকপাত করেন নি, তবু আশ্চর্য এই যে অস্তিত্ববাদী রবীন্দ্রনাথ অস্তিত্বচেতনার প্রয়োজনেই যে শ্রেয়-সাধনের অভিমুখ হয়েছিলেন, তাতে তিনি হিতবাদ, ধ্রুববাদ, এমনকি তাঁর সমাজ-ভাবনা ও সমাজ-কর্মে ('স্বদেশী-সমাজ' পরিকল্পনা ও পরে জমিদারিতে তার প্রয়োগ) মানুষের সর্বাঙ্গীণ বিকাশতত্ত্বই অবলম্বন করেছিলেন। বর্তমান আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে এ সবই বিশদীকৃত হবে, এখানে বলার কথা এই যে, গীতাঞ্জলি-পর্বের কিছু আগে থেকে (সাংকেতিক নাটকগুলির সূচনা থেকে) রবীন্দ্রনাথ যে দ্বন্দ্বমূলক (dialectical) গতিবাদের অভিমুখ হয়েছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তিনি তুলনীয় তার আগে পর্যন্ত। বেশ ভালোভাবেই। বলাবাহুল্য যে বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি হুবহু গ্রহণ করেননি, সেটা কট্টর অস্তিত্ব-বাদীর পক্ষে সম্ভবই নয়, এমনকি বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যও প্রবল—যেমন, বঙ্কিমচন্দ্র কেবল তাত্ত্বিক, রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে তাত্ত্বিক এবং কর্মী, theory এবং practice-এর অপূর্ব সমন্বয় তাঁর জীবনচর্যায় দেখা যায়—তবুও একথা সত্য যে, তাঁর জীবনের প্রতি স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহ্যকে আত্মীকৃত করেই এগিয়েছেন।

৪

অস্তিত্ববাদী রবীন্দ্রনাথের বিশ্বমুখিনতার প্রসঙ্গটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, অন্যদিক থেকে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। অস্তিত্ববাদ মূলত বুর্জোয়া জীবনদর্শন

এবং রবীন্দ্রনাথের দর্শনও মূলত বুর্জোআর দর্শন—একথার মধ্যে কোনো ভুল নেই। কিন্তু যখন মার্কসিস্টরা বলেন অস্তিত্ববাদ মুমূর্ষু বুর্জোয়ার শেষ ঘাঁটি অতএব তাৎপর্যে প্রতিক্রিয়াশীল, তখন কারো কারো ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হলেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা মোটেই তথ্যসম্মত নয়। কেননা অস্তিত্ববাদী দর্শনকে শেষ অবধি ধরে থাকলেও—এবং ব্যক্তিত্ববাদী কবির পক্ষে তা না করলে স্বধর্মচ্যুতি হত—তারই ওপর তিনি সর্বমানবতাবাদী জীবনদর্শনের ফুল ফুটিয়েছেন।

বুর্জোআ অভিধাটি বহু প্রচলনে নিন্দাসূচক। কিন্তু কোনো জিনিসই স্বতই ভালো কিংবা মন্দ নয়, ইতিহাসের গতি-পরিণতির পথে তার বিশেষ ভূমিকার নিরিখেই সেসব নির্ণীত হতে পারে। রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যখন বুর্জোআ শ্রেণী সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীর বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল, মানবমুক্তির নিরিখে তখন তার ভূমিকা ছিল বিপ্লবাত্মক, মানবতার জয়গানে মুখর। কিন্তু তার প্রকৃতির মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল বৈপরীত্যের বীজ, রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে কেবল তাকেই ভেঙেছিল তাই নয়, তার চলার অনিবার্য শর্ত হয়ে দাঁড়াল নিজের ভিত্তিভূমিকেই ভেঙে ফেলা: the bourgeoisie lives by constantly revolutionizing its base—প্রতি মুহূর্তে তাকে আর-এক নতুন স্তরের দিকে যাত্রা করতে হয়। এই যাত্রাটি ঘড়ির কাঁটার মতো ডাইনে ঘোরে, আবার তার উল্টো দিকে বামেও। একদিকে আত্মকামের তাড়নায় নিজেরই বিঘোষিত আদর্শকে সে ভেঙে ফেলে—মুক্ত বাণিজ্যনীতি পরিণতি লাভ করে মনপলিতে, মানুষকে ভালোবাসা রূপ পায় সংকীর্ণ স্বজাতিকে ভালোবাসায়, স্বজাতিপ্রেমের পরবর্তী বিকৃতি দেখা দেয় সাম্রাজ্যবাদে। বুর্জোআর এ ভূমিকা নিন্দনীয়। কিন্তু অন্যদিকে বুর্জোআরই আর এক গতিমুখ আছে, সে নিজঘোষিত আদর্শের বিকৃতিমানে না, নিজেকে অতিক্রম করে সর্বমানবের স্বাধীনতা ও তৎসংপৃক্ত সমাজভিত্তিক যূথ-জীবনের দিকে অগ্রসর হয়। শিল্প-সাহিত্য-দর্শনেও এর প্রতিরূপতা আছে। প্রেরণাটি বুর্জোআর, রূপ দ্বান্দ্বিকতার, কিন্তু তার একদিকে ফলে হেগেলীয় ভাববাদ, অন্যদিকে তারই প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দ্বান্দ্বিকতার ওপর ভিত্তি করেই মার্কসীয় বস্তুবাদ। এ্যাবসলিউটের এক ভাবপ্রতিরূপ দেখা দেয় ক্যাসিবাদে, অপরটি সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদে। যে সব মনীষী দার্শনিক, জননায়ক এইসব তত্ত্ব ও তন্নির্ভর কর্মপ্রয়াসের উদ্গাতা—তা সে বামাবর্ত বা দক্ষিণাবর্ত যাই হোক না কেন—তাঁরা সকলেই কিন্তু বুর্জোআ শ্রেণীসংস্থিত, কেউ কেউ বা

স্বশ্রেণীকে অতিক্রম করে গেছেন। মূল্যবোধের নিরিখে তখনই তাঁদের প্রগতিশীল বলি, এবং উচিত কথাই বলি—নইলে মার্কস, এঙ্গেল্‌স, লেনিন, মাও, এঁরা হেগেল বা নীট্‌শের মতোই বুর্জোআ।

প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসে এটাই দেখা গেছে, বিকৃতি থেকে মানুষকে উদ্ধার করার জন্য বারবার জননেতাকে তাঁর নিজের শ্রেণীর গণ্ডি অতিক্রম করতে হয়েছে—বুদ্ধ চৈতন্য নানক কবির এর উদাহরণ, মার্কস বা লেনিনের কথা তো উল্লেখ করাই হয়েছে।

সেকথা যাক। আত্মঅতিক্রামী বিশ্বমুখ প্রবর্তনা রবীন্দ্ররচনার একেবারে প্রথম থেকেই শেষ পর্যন্ত নানারূপে বিলসিত হয়েছে। প্রভাতসংগীত-এ তিনি উপলব্ধি করেন, 'আপন জগতে আপনি আছিস একটি রোগের মতো', সুতরাং 'আজিকে বারেক ভ্রমরের মতো বাহির হইয়া আয়', তারপর হৃদয় খুলে গেলে 'জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি'। আরো পরে সংকল্প করছেন, 'এই সব মূঢ় মূক ম্লান মুখে দিতে হবে ভাষা', দেবতার কথা বলতে গিয়েও উপলব্ধি করেন, 'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ', এবং পরিণত বয়সে দাঁড়াতে চেয়েছেন তাদেরই পাশে, যারা অন্ত্যজ, যারা 'কাজ করে', যাদের শ্রমের ওপর ভিত্তি করে 'চলিতেছে সমস্ত সংসার'। রবীন্দ্রনাথের জনমুখিনতা কেবল রোমান্টিক কবি (তিনি মূলত রোমান্টিক কবিই) ও অলস দার্শনিকের ভাববিলাস নয়, তিনি তাকে নিরলস কর্মচর্যায় রূপ দানও করেন: তত্ত্ব ও প্রযুক্তির এমন সুষ্ঠু সমন্বয় খুব কম ব্যক্তিত্বের মধ্যেই দেখা যায়। জনসংযোগের সঠিক তত্ত্বের কথা তিনিই প্রথম এদেশে উপলব্ধি করেন, পরে গান্ধী আসেন, আসেন সাম্যবাদীরা। আবার মনে হয়, মানে বর্তমান লেখকের মনে হয়, সঠিক প্রযুক্তিও রবীন্দ্রনাথের ছিল—এবং গান্ধী বা সাম্যবাদী আন্দোলনের (এ পর্যন্ত প্রযুক্তি দেখে বলা যায়) প্রযুক্তি সঠিক হয়নি। পরে এ প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

যেকথা বলছিলাম। জনসংযোগ এবং জনকল্যাণের জন্য যেমন চাই কর্মের প্রয়াস, তেমনি তার পিছনে চাই সঠিক তত্ত্ব। এ পর্যন্ত সমাজদর্শনের অনেক রীতিপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে, সেসবের মধ্যে মার্কসবাদকেই সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞান-নিষ্ঠ বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ মার্কসবাদ-অসম্পৃক্তভাবেই বৈজ্ঞানিক গতিবাদ (এ-পর্যন্ত রবীন্দ্র-গতিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় উপনিষদ ও বের্গসঁকে টানা হয়েছে; উপনিষদ অপর্যাপ্ত এবং রবীন্দ্রনাথ বের্গসঁকে নিজেই অস্বীকার করেছেন), ব্যক্তি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক (dialectical) অগ্রগতি, থিসিস-এ্যান্টিথিসিস-

সিন্থেসিস এই প্রত্যয়গুলি ব্যবহার না করেও (এবং সম্ভবত সচেতন না হয়েও) পাওয়া-হারানো-পাওয়ার ('তোমায় নতুন করে পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে) উত্তরণের কথা বারবার বলেন। এ উত্তরণ আবার স্থির প্রাপ্তি নয়, ক্ষমতা লাভ করার বিপ্লবের পর যেমন প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (চীন), কেননা বিপ্লব হচ্ছে একটা continuous process—রাজাকে জটিল জালের আবরণ থেকে মুক্ত করে এবং ভূমিতে দলিত রঞ্জনের কাছ থেকে নীলকণ্ঠ পাখির পালক তুলে নিয়ে নন্দিনী বলে, ও আবার আসবে ওর জন্যে প্রতীক্ষা করব। রবীন্দ্রনাথের দ্বান্দ্বিকতা (সেটা তাঁর রচনার উন্মেষ পর্ব থেকেই ছিল, ক্রম-পরিণত হয়েছে) রবীন্দ্রনাথেরই, কিন্তু তা হেগেলীয় ও মার্কসীয় দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের সঙ্গে সুন্দরভাবে তুলনীয়।

এ গেল তত্ত্বের কথা। অমন মোহমুক্ত মন নিয়ে কাজ করতেও আর কাউকে দেখা যায়নি। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তখনই তিনি বুঝেছিলেন, দেশের সত্য মূর্তি রয়েছে দেশের মানুষের মধ্যেই। কী করতে হবে তৎক্ষণাৎ সেটা তিনিই বুঝেছিলেন, স্বদেশী আন্দোলনের অন্য নেতারা বুঝতে পারেন নি। এই সময়ই তিনি 'স্বদেশী সমাজ'-এর পরিকল্পনা করেন: আত্মশক্তির উদ্বোধন (অস্তিত্ববাদীর কাম্য কর্মপ্রয়াস, energy, commitment, তু. সার্ত্র, হিডেগার), তার প্রেরণা, তার লক্ষ যৌথ জীবন গড়া, তুলনা দিয়ে বলা যায়, সাম্যবাদী সমাজে কমিউন গড়ার মতো। দেশকর্মীরা তাঁর কথায় কান দেননি, এইখানেই তাঁর সঙ্গে তাঁদের পক্ষান্তর হল। কিন্তু তিনি নিজেই তাঁর জমিদারিতে কয়েকটি গ্রামকে কেন্দ্র করে এই সমাজকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন। যে কোনো সামাজিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সঠিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম: রবীন্দ্রনাথ সেরূপ সংগঠনও করেছিলেন, প্রথম গ্রামসমাজে সমবায় আন্দোলন প্রবর্তন করে (ধনতান্ত্রিক কেন্দ্রীভবন মনপলির বিরুদ্ধে নিম্নবিত্তের সমবায়কে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তিনি), তারপর শ্রীনিকেতনে কৃষিবিদ্যা, কারুজীবিতা প্রভৃতি কার্যক্রম চালু করে।

এ সম্বন্ধে আরো কথা এই যে তিনি অনাসক্ত ভাবুক নন। তিনি জানতেন সত্য রক্ষা করতে হলে মিথ্যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেই হবে, আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এই জীবন। বুর্জোআর সত্য আদর্শ (প্রথম-বিঘোষিত মানবতার আদর্শ) রক্ষার জন্যই তিনি বারবার বুর্জোআ-বিকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন। বুর্জোআ-বিকৃতিতে যুদ্ধ ঘটায়, তিনি বুর্জোআ আদর্শের

নিরিখেই শান্তির পুরোধা। চীনের ওপর জাপানি হামলায় তিনি ক্ষুব্ধ। জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস জিঘাংসার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। কেবল তাই নয়, দেশি বুর্জোআর বিকৃতির বিরুদ্ধেও তিনি দাঁড়াতে পারেন। গান্ধীকে কেন্দ্র করে যে জনজাগরণ ঘটেছিল তাকে তিনি বারবার স্বাগত জানান, কিন্তু যখন সে জাগরণকে ভ্রান্তপথে চালিত করার চেষ্টা করা হয়, তখন তার নির্মম সমালোচনা করতে তাঁর কুণ্ঠা নেই ('ঘরে বাইরে', 'চার অধ্যায়')। সত্যের অতন্দ্র প্রহরী, The Great Sentinel, এবং যে কাজ মোহমুক্ত সঠিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে কখনো স্বীকার করে নেন নি। সব অনুরোধ-উপরোধ, চাপ সৃষ্টি করা, সুতীব্র নিন্দা সত্ত্বেও তিনি চরকা কাটতে রাজি হন নি। আমরা এখানে মনে রাখব, রবীন্দ্রনাথ বুর্জোআ ঠিকই, কিন্তু বুর্জোআ বিকৃতি নয়, তার অমলিন আদর্শের শ্রেষ্ঠ ধারক।

এ সব কথা বর্তমান আলোচনার যথাস্থানে বিশদ করা হবে, এখানে লক্ষ করতে চাই যে, যে প্রয়াসে তিনি অস্তিত্বকেন্দ্রিক সেই একই প্রয়াসে তিনি তারই প্রয়োজনে এবং পরিপূরক রূপে লোকমুখিন॥ (ধারাবাহিক)

নানা রঙের দিন

কিছু কিছু মানুষ থাকেন প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও যাঁরা পৌঁছাতে পারেন না জনপ্রিয়তার শীর্ষে, নানা প্রতিকূলতার জন্য। তবু কালজয়ী হয়ে থাকে তাঁদের সৃষ্টি। তেমনই একজন হলেন সদ্য প্রয়াতা সরলা বসু। 'কত দিনের কত ব্যথা' উপন্যাসটি তাঁর অসাধারণ লেখনী ক্ষমতার এক অনুপম স্বাক্ষর। উপন্যাসটি লিখতে তাঁর সময় লেগেছিল এক বছর দুদিন। তিনি এটি লেখা শুরু করেন ১৯৭২ সালের ১মে এবং শেষ করেন ১৯৭৩ সালের ৩ মে। 'কত দিনের কত ব্যথা' লেখিকার দীর্ঘতম রচনা।

উপন্যাসটির তিনটি ভাগ—জলপদ্ম, স্থলপদ্ম এবং সুর ও বাতাস—তিনটিই আবার একসূত্রে গাঁথা। লেখিকা কৈশোর পরিক্রমা 'গাছুর সংসার' লিখতে গিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি হয়ে উঠল এক অনবদ্য প্রেমোপাখ্যান। লেখিকা তাঁর মনের সমস্ত মাধুরী ঢেলে দিলেন এর দেহে। উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি একটি কথা বলেছেন—"এই বইখানি আমার জীবনের এক আশ্চর্য লিখন, কোন লিখন-দেবী যেন জোর করে লিখিয়ে নিয়েছেন।" কথাটা খুবই সত্য, এটি পড়তে পড়তে মন কখন যেন পাড়ি দেয় 'সেই হাসি কান্না, প্রেম-বিরহ, পাওয়া না পাওয়ার বেদনামাধুরীতে বিজড়িত অতীতের দিনগুলিতে। যে বেদনা বিধুর বিষণ্ণতা এ উপন্যাসের সম্পদ, তার স্পর্শে পাঠকের মন স্পন্দিত হয়ে ওঠে প্রতি মুহূর্তে। আর যে ভাষায় এ উপন্যাসের কাহিনী গ্রথিত সে ভাষার মাধুর্যরসে অবগাহন পাঠকের পক্ষে আর একটি অভিনব অভিজ্ঞতা লাভ।

নায়ক হীরেন্দ্রনারায়ণের ডায়েরি এবং নায়িকা চণ্ডীর মুখের গল্পে রচিত হয়েছে তাদের প্রেমের অপূর্ব উপাখ্যান এবং এই অভিনব প্রথা উপন্যাসের গঠনকেও করে তুলেছে বিশিষ্ট। বস্তুত, হীরেন্দ্রনারায়ণ ও চণ্ডীর প্রেমের এই

কাহিনীকে প্রেমের কাব্য বললেও বুঝি ভুল হয় না। ভাষার লালিত্যে, আবেগ বিধুরতায় এ যেন লাভ করেছে কাব্যের সৌন্দর্য। চণ্ডীর সেই বেদনাক্লিষ্ট জীবন আর হীরেন্দ্রনারায়ণের অপূর্ব প্রেমের যন্ত্রণায় তিলে তিলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়া যে কোন পাঠককেই আপ্লুত করবে গভীরভাবে। বড়ো করুণ চণ্ডীর জীবন আলেখ্য। সে সাধারণ দরিদ্রকন্যা হয়েও ভাগ্যের বিচিত্র খেলায়—হল রায়বাড়ির দেবী চণ্ডী। রায়বাড়ির বংশকে বিনাশের হাত থেকে রক্ষার জন্য শিশুকন্যা চণ্ডীকে আনা হয়েছিল তার দরিদ্র মা-বাবাকে প্রচুর অর্থ যৌতুক দিয়ে। তারপর অতিযত্নে ধীরে ধীরে বড়ো হয়—চণ্ডী। সে রায়বাড়ির স্নেহ, যত্ন সবই পেল—পেল না শুধু মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি। রায়বাড়ির কাছে সে হয়ে গেল পাষাণী প্রতিমা। শুধুমাত্র হীরেন্দ্রনারায়ণ তাকে মর্যাদা দিয়েছিলেন মানবী হিসাবে, ভালবেসেছিলেন তাকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে। কিন্তু সে ভালবাসা সার্থক হল না। যেহেতু চণ্ডী নাপিতের কন্যা, সেহেতু তাকে সরিয়ে রাখা হল হীরেন্দ্রনারায়ণের কাছ থেকে। তাঁর বিয়ে দেওয়া হল কমলারাণী নামে এক অপূর্ব সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে। তাঁদের কন্যাসন্তানও হলো। কিন্তু জীবনে তিনি শান্তি পেলেন না, পেলেন না প্রিয়তমাকে একান্তভাবে আপন করে পাবার আনন্দ। আর চণ্ডীও পেল না হীরেন্দ্রনারায়ণকে নিজের করে। শান্তির ঠিকানা তারও কাছে অজানা থেকে গেল। রায়বাড়ির বিশাল ঐশ্বর্য-সম্পদ, আড়ম্বর, নানা পূজা-পার্বণের ঘটা, নানা কর্মকাণ্ডের বিশাল ইতিবৃত্তের মধ্যে এই দুটি অতৃপ্ত নর-নারীর ব্যথিত হৃদয়ে শোকসংগীত অশ্রু-বিন্দুর মত ঝরে পড়েছে। অকালেই সংসারের মায়া ত্যাগ করে চলে গেলেন হীরেন্দ্রনারায়ণ। ক্রমে একে একে বিদায় নিতে লাগল রায়পরিবারের এক একটি মানুষ। থাকল শুধু ঐশ্বর্য-সম্পত্তি, থাকল না মানুষগুলি—কালের শিকার হয়ে তারা চলে গেল, আর তার সাক্ষী হয়ে থাকল চণ্ডী নিজে। একাকীত্বের বেদনা নিয়ে তার দীর্ঘ পথচলা।

এ উপন্যাসে বহু চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে কিছু আবার মনুষ্যেত্তর পর্যায়ের। যেমন গাছু, লুকু, নস্থ, বুজু, ব্যাচা, তরাসী, গরামী প্রভৃতি। এছাড়াও আছে সমাজের একেবারে সাধারণ স্তরের মানুষেরা। মনুষ্যেতর প্রাণীদের উপস্থিতি এবং মানুষের সঙ্গে তাদের একসঙ্গে জীবনযাত্রা উপন্যাসটিকে বিশেষিত করেছে। গাছুকে তো লেখিকা 'উপনায়ক' বলেছেন। সে গেছো ইঁদুর বটে, কিন্তু চণ্ডীর সঙ্গে তার পরম আত্মীয়তা। সেও মানুষের মতো জীবনযুদ্ধে অংশ নেয় ভালবাসে, বিয়ে কোরে সংসার পাতে, সমস্ত

প্রতিকূলতাকে তুচ্ছ করে নতুনভাবে বাঁচতে চায়। এ উপন্যাসে বোধহয় এটাই দেখার বিষয় যে চণ্ডী মানুষ হয়েও পরিণত হল দেবীতে আর গাছু ইতরপ্রাণী হয়েও জীবনযুদ্ধের মধ্য দিয়ে হয়ে ওঠে মানুষের সমস্থানীয়।

লেখিকা যদিও এ উপন্যাসকে বিশেষিত করেছেন প্রেমের উপন্যাস হিসাবে, তবুও তার মধ্যেই আছে কিছু সামাজিক সমস্যার আভাস। আসলে একজন সচেতন শিল্পী কখনই সমাজ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না। এ উপন্যাসে তাই এসেছে পঞ্চাশের মন্বন্তরের কথা। সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলিতে গাছুর মত ইতরপ্রাণীকেও খাদ্যের জন্য পালিয়ে যেতে হয়েছিল শহরে। সেই দুর্ভিক্ষের কিছুটা পরিচয়—আমরা পাই। তাছাড়া এতে আছে হাঁড়িদের কথা—যারা জীবনধারণ করে জন্তুর মত। আছে, নিষ্ঠুর কৌলীন্যপ্রথার কথা।

উপন্যাসটির একটি বড়ো সম্পদ হল এর ভাষা এবং গঠনশৈলী। উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে প্রথমেই যেটি নজরে পড়ে তা হল এর ভাষার স্বচ্ছন্দ গতি এবং মাধুর্য। বহুজায়গায় ভাষা অসাধারণ গীতিময়তা লাভ করেছে। হীরেন্দ্রনারায়ণের ডায়েরীর শেষাংশ থেকে সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে—"এই তোতাপুর গ্রাম · এর উন্মুক্ত প্রান্তরের সঙ্গে কতদিন একাত্ম হয়ে গেছি। কত বর্ষণ-শ্রান্ত শ্রাবণের গভীর রাত্রে বেহালায় যুগসঙ্গীতের সুর তুলেছি বর্ষাস্নাত 'নারিকেল-কুঞ্জের' শর শর ঘর ঘর হাওয়ায়—যেন কত পূর্বকালের সংবাদ পেয়েছি। আমার তোতাপুরের কোয়ার্টারে বসে তুমি যেদিন আমার ভালোবাসার এই লেখা পড়বে হয়তো সেদিন থাকবে হেমন্তের শিশির-ভেজা সু-ধান্যের মধু, সৌরভে সিক্ত রাত "

—এখানে ভাষা যেন গদ্যের সীমানা পেরিয়ে পৌঁছে গেছে কবিতার জগতে। এভাবেই সমগ্র উপন্যাসটিতে ছড়িয়ে আছে লেখিকার কবি-মনের স্পর্শ। আবার গাছুর দৈনন্দিন জীবনের প্রসঙ্গ যখন এসেছে তখন ভাষা হয়ে উঠেছে আটপৌরে। কিন্তু গাছু ও তরামীর প্রেম-ঘন মুহূর্তে লেখিকা সৃষ্টি করেছেন ভাষার মধ্য দিয়ে সংগীতের মূর্চ্ছনা।

উপন্যাসটির আর একটি বিশেষত্ব এর গঠনরীতি। উপন্যাসটির সূচনায় আছে যেন রূপকথার আভাস। তারপর কখন যেন কাহিনী রূপকথার মায়ারাজ্য ত্যাগ করে পৌঁছে যায়—আনন্দ-বেদনায় ঘেরা বাস্তব জীবনের গভীরে—রচিত হয় এক অসামান্য প্রেম-কাহিনী। সে কাহিনীর প্রকাশভঙ্গীও অভিনব। নায়কের ডায়েরির পাতা এবং নায়িকার মুখের গল্প রচনা করে সেই কাহিনীকে।

সব মিলিয়ে 'কত দিনের কত ব্যথা' বিশেষ মাধুর্য বয়ে আনে পাঠকের মনে। বাংলা উপন্যাসের জগতে এ যেন এক বিশেষ মাত্রার সংযোজন। উপন্যাসটি সম্পর্কে লেখিকা বলেছেন—"আমার সুখী জীবনে আনন্দিত মনে এই মধুরস কাগজের পৃষ্ঠায় ছড়াতে লাগলাম—আমার সব ভালটুকু নিংড়ে দিলাম এর ভেতর। এত ভালবেসে এত আনন্দে জীবনে কোনদিনও লিখিনি।" এটাই এ উপন্যাস সম্পর্কে সব থেকে বড়ো কথা।

ইন্দ্রাণী ঘোষাল

কত দিনের কত ব্যথা। সরলা বসু। বিশ্ববীক্ষা প্রকাশনী, কলকাতা-৯। কুড়ি টাকা

পরিচয় দপ্তরে ননী ভৌমিক

উপলক্ষ্য যদি 'ধুলোমাটি' উপন্যাসের জন্য এ-বছরের বঙ্কিম-পুরস্কার, তবুও বেশ কিছুদিন সস্ত্রীক কলকাতায় কাটিয়ে গেলেন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক এবং পরিচয় পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক ননী ভৌমিক।

চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে লেখক, সাংবাদিক, কমিউনিষ্ট কর্মী এবং পরিচয়-এর কর্মী ও সম্পাদক ননী ভৌমিক ছিলেন আমাদের সংস্কৃতি জগতের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। গত ৪ঠা নভেম্বর তাঁকে পরিচয় দপ্তরে কয়েক ঘণ্টা বেশ অন্তরঙ্গভাবে পাওয়া গিয়েছিল। এই পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেছিলেন ১৯৫১-৫৬ সময়কাল। এর এক দশক আগে থেকেই তাঁর লেখার নতুনত্ব তাঁর সমকালীন, বিশেষ করে অনুজ লেখকদের নানাভাবে প্রভাবিত করছিল। ১৯৫৭-র গোড়ায় তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে চলে যান। মাঝে মাঝে দেশে এলেও সে-অর্থে তিনি আজ পর্যন্ত প্রবাসীই রয়ে গেলেন। সোভিয়েতে গিয়ে আর একটিমাত্র গল্প লিখেছিলেন তিনি, যা পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে পরিচয়-এ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর সাড়া-জাগানো তিনটি বই—'ধুলোমাটি', 'ধানকানা' ও 'পূর্বক্ষণ'-এর স্মৃতি ক্রমশই ধূসর হয়ে আসছিল। অরুণা প্রকাশনীর বিকাশ বাগচীকে ধন্যবাদ, দীর্ঘ চার দশক পর তিনি প্রথমোক্ত বই দুটি আবার ছাপলেন। এর ফলেই তাঁর বঙ্কিম পুরস্কার লাভ এবং তার চাইতেও বড় কথা, নতুন প্রজন্মের পাঠকদের হাতে বই দুটির যোগান। ননী ভৌমিক দীর্ঘ তিন দশকের ওপর আর লেখেন না কেন, এই প্রশ্ন করাটাও কিন্তু ইতিমধ্যে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক হয়ে এসেছিল।

পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে তাঁকে নিয়ে সেদিন ঘণ্টা তিনেকের তুমুল আড্ডা হয়। পত্রিকার একমুঠো ঘরটি উপচে বাইরের বারান্দাতেও তাঁর অনেক অনুরাগী ভীড় করেছিলেন। সেই সুবাদে সেদিন পুরনো এবং সাম্প্রতিক পর্বের পরিচয়-এর অন্ততঃ পাঁচজন সম্পাদককে এক জায়গায় পাওয়া গিয়েছিল —এঁরা হলেন, গোলাম কুদ্দুস, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, বর্তমান

সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং ননী ভৌমিক তো বটেই। তাছাড়া সেদিন চিত্তরঞ্জন ঘোষ, কার্তিক লাহিড়ী, অমলেন্দু চক্রবর্তী, পূর্ণেন্দু পত্রী, মিহির সেন, বাসব সরকার, অভিনেতা নির্মল ঘোষ, প্রসূন বসু, ধনঞ্জয় দাশ, পত্রিকার বর্তমান কর্মাধ্যক্ষ্য রঞ্জন ধর থেকে শুরু করে সাধন চট্টোপাধ্যায়, কেশব দাশ, আফসার আহমেদ, শুভ বসু, সুদর্শন সেনশর্মা, অপূর্ব কর, গোবিন্দ ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক তরুণ কবি-লেখকই উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন ননী ভৌমিকের গুণগ্রাহী চারজন প্রকাশকও।

এই অন্তরঙ্গ আড্ডায় স্বাভাবিকভাবেই স্মৃতিচারণের মেজাজ এসে যায়। ফুল আর ভালবাসা ছাড়াও ননী ভৌমিককে বেশকিছু বই ও পত্র-পত্রিকা পরিচয় ও লেখকদের তরফ থেকে সেদিন দেওয়া হয়েছিল। পোষাকি অনুষ্ঠান বলতে ছিল আলাপ-চারিতার ফাঁকে ফাঁকে একটি গান এবং 'ধানকানা' থেকে ননী ভৌমিকের একটি গল্প পাঠ। সবারই সেদিন এই আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠেছিল, এরকম সন্ধ্যা অবিরল হোক।

অনুরাধা রায়

'লা পাসিওনারা'

তিরিশের দশকে স্পেনের আস্টুরিযাব খনি শ্রমিকবাই প্রথমে তাঁকে আদর কবে নাম দেন 'লা পাসিওনারা'—দেশপ্রেমেব যন্ত্রণাব ফুল। খনি-শ্রমিকের মেযে দোলোরেস গোমেজ ইবাকবি জন্মেছিলেন, বেড়ে উঠেছিলেন জঙ্গী শ্রমিক-আন্দোলনের মধ্যে, একসময তাব নেতৃত্বও দিযেছিলেন।

উনিশশো ছত্রিশেব ১৮ জুলাই ফ্র্যাঙ্কো, মোলা, ও অন্যান্য ফ্যাসিস্ট সেনাপতিবা স্পেনের প্রজাতন্ত্রেব বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেদিনই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ বেতার কেন্দ্র থেকে অগ্নিকন্যা ইবারুরিব গলায প্রতিবোধের দৃপ্ত আহ্বান ছড়িযে পড়ে স্পেনময, 'হাঁটু গেড়ে বেঁচে থাকার চেযে নিজের পাযে দাঁড়িযে মৃত্যুও বরণীয।' ছড়িযে পড়ে তাঁর ইস্পাত কঠিন ঘোষণা, 'নো-পাসারান।' দস্যুদেব কিছুতেই বিজযী হতে দেব না।

১৮৯৫-এ খনি অঞ্চলে তাঁর জন্ম। একুশ-বছবে তিনি সমাজতন্ত্রের আদর্শে দীক্ষা নেন, ১৯২০-তে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 'তৃষ্ণার্ত যেভাবে ঝর্ণার কাছে আসে, আমি তেমনভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কাছে এসেছি'—বিশ্বরেণ্য শিল্পী পিকাসোর এই উক্তি 'লা পাসিওনাবা' সম্পর্কেও হুবহু খেটে যায। ১৯৩৪-এর দক্ষিণপন্থী স্বৈরাচারেব বিরুদ্ধে স্পেনেব সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থানের তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেত্রী। ছিলেন ফ্যাসিস্ট-বিবোধী সংগ্রামেব ও গৃহযুদ্ধেব বক্তস্নাত বছরগুলিতে (১৯৩৬-৩৯) প্রতিরোধ সংগ্রামের উজ্জ্বলতম প্রতিনিধি।

সাম্রাজ্যবাদেব মদতপুষ্ট ফ্র্যাঙ্কো ও তাব গুণ্ডাবাহিনীর সাময়িক জয়ে যখন গোটা স্পেন আর্ত, তখন বিদেশে গঠিত স্পেনেব কমিউনিস্ট পার্টির সর্ব-সম্মত নেত্রী হিসেবে তিনি দীর্ঘকাল আপসহীন লড়াই-এব পুরোভাগে ছিলেন। ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসান ঘটাব সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেশে ফিরে

আসেন। স্মরণীয় যে, দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে স্তালিনগ্রাদের গৌরবময় প্রতিরোধ সংগ্রামে অংশ নিয়ে তাঁর একমাত্র তরুণ পুত্র শহীদ হন।

দেশে ফিরে আসার পর পঁচাশি বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ছিলেন স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। তারপর ১২ নভেম্বর তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত ছিলেন পার্টির সম্মানিত সভানেত্রী।

তাঁর মৃত্যুতে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে, 'বিশ-শতকের এই শ্রেষ্ঠ ফুলটি স্পেনের হাজার হাজার জনগণের প্রতিদিনের তৎপরতার মধ্যেই বেঁচে আছে, বেঁচে আছে সারা দুনিয়ার সংগ্রামী মানবতার সবরকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্যোগের মাঝখানে।

তাঁর বিখ্যাত আত্মজীবনী 'অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি' থেকে একটি অংশ আমরা প্রকাশ করছি, যেখানে তিনি লিখেছেন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে ও স্পেনের প্রজাতন্ত্রের সপক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথা।

" 'লক্ষ কণ্ঠে শোনা গেল: এগুলো সোভিয়েত বিমান! এগুলো আমাদের আমাদের!' এই এক অবিস্মরণীয় মুহূর্তে বড় দূরের সমাজতন্ত্রী দেশ আমাদের গণফৌজ ও সমস্ত নরনারীর হৃদয়ের এত কাছাকাছি এসে গেল যে আর কোনদিনই কোনো সীমান্ত, কোনো সমুদ্র, কোনো পর্বতমালা বা কোনো বন্দীশালা বা কোনো সন্ত্রাসই স্পেনের জনগণ ও সোভিয়েতের জনগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে না। চিরকালের জন্য তাঁরা অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা—সংগ্রামে, বীরত্বে, আত্মদানে।

মাদ্রিদ তার শক্তিকে যেন আবার ফিরে পেয়েছে। সে এখন দুর্জয়। মাদ্রিদ রক্ষার লড়াইয়ে ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের এক সম্মানিত স্থান রয়েছে। অবরোধের শাণিত ছুরি যখন মাদ্রিদের প্রায় কণ্ঠনালীতে ঠেকছিল, তখন আমাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। তাদের দেখে মাদ্রিদের জনগণের প্রতিরোধের ক্ষমতা শত গুণ বেড়ে গেল এবং তাদের উভয়ের সম্মিলিত শক্তি রুখে দিয়েছিল ফ্যাসিস্টদের জয়যাত্রা।

মাদ্রিদ রক্ষায় এই সংগ্রামেই জন্মেছিল থেলম্যানের গান। জার্মান সহযোদ্ধারা লড়তে লড়তে এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই গান গাইতেন। জার্মানির জনগণ আজও সগর্বে এই গান গেয়ে চলেন, অভিবাদন জানান স্পেনের মৃত্যুহীন সংগ্রামকে—

স্পেনের তারাগুলি ঝলমল
করছে।

নিচে, অনেক নিচে পরিখায় বসে
আমরা—
ভোর হয়ে আসছে
ডাক আসছে যুদ্ধের।

বহুদূরে ফেলে এসেছি আমাদের
মাতৃভূমি,
তবু, এখানেই প্রতিরোধে আমরা
অটল।
তোমাদের আমাদের সংগ্রামের
একই লক্ষ্য—
স্বাধীনতা।

অমিতাভ দাশগুপ্ত

ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল

ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল বর্ণাঢ্য জীবনের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন কবি, গীতিকার, শিক্ষাবিদ, গবেষক, টি ভি-বেতার প্রভৃতি জনমাধ্যমের বিদগ্ধ অনুষ্ঠানের ব্যক্তিত্বময় উপস্থাপক, বাংলাদেশের বাংলা আকাদেমির দক্ষ মহাপরিচালক।

সম্প্রতি (গত ২৩ সেপ্টেম্বর) ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে তিপ্পান্ন বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসান হয়েছে।

গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষা জীবন। ছাত্রাবস্থাতেই ১৯৫৪ সালে মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর সহযোগে বের করেছিলেন, 'পূর্ব বাংলার কবিতা' নামে সমকালীন কবিতার একটি সংকলন। কবিতা, চর্চা গান গাওয়ার পাশাপাশি গান লেখা, গীতিকার হিসেবে আবির্ভাবেই সাফল্য ফেরদৌসী বেগমের (পরে রহমান) কণ্ঠে গীত 'আমি সাগরের নীল' এবং 'ভ্রমরের পাখনা যত দূরে থাক না' দুটি গানের অসাধারণ জনপ্রিয়তায়। আমৃত্যু তাঁর সফল গীতিকারের পরিচয় অক্ষুণ্ণ ছিল। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দি বেঙ্গলী প্রেস এণ্ড লিটারেরি রাইটিং' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের জন্য পি এইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

কর্মজীবনে একুশ বছরের বেশি সময় বাংলার অধ্যাপনা, ১৯৮৪ সাল থেকে

ঢাকা শিল্পকলা আকাদেমির মহাপরিচালক পরে ১৯৮৬ থেকে আমৃত্যু ঢাকা বাংলা আকাদেমিতে একই পদে তিনি আসীন ছিলেন।

শিল্প, সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় সমান উৎসাহী ছিলেন বলেই হয়তো সম্ভব হয় নি অজস্র লেখালেখিকে দু মলাটের মধ্যে এনে খুব বেশী উপস্থিত করা। কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা তিন,—'আপন যৌবন বৈরী', 'যেহেতু জন্মান্ধ', 'আক্রান্ত গজল'। অন্য গ্রন্থের মধ্যে 'শিল্পীর রূপান্তর' এবং 'কথা ও কবিতা'। প্রথমটি সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন ও দ্বিতীয়টি সাহিত্য সমালোচনা বিষয়ক রচনা-সংকলনের সম্ভার।

সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশের জাতীয় পুরস্কার 'একুশে পদক' লাভ করেন। এ ছাড়া কবিতার জন্য সুহৃদ সাহিত্য গোষ্ঠীর স্বর্ণপদক ও 'আপন যৌবন বৈরী' গ্রন্থের জন্য আলাওল পুরস্কারেও সম্মানিত হয়েছিলেন।

মনে-প্রাণে শিল্পী, সাহিত্য প্রাণ ও চির অনুসন্ধিৎসু, রুচিশীল, ব্যক্তিত্বময় ডঃ আবু হেনার উজ্জ্বল উপস্থিতি বাংলাদেশের শিল্প-সাহিত্য অঙ্গনে বহুধা ব্যাপ্তিতে অনুভূত। বর্ষীয়ান কবি থেকে প্রতিশ্রুতিময় তরুন লেখক, শিল্পী পর্যন্ত নিয়ত সঞ্চরণশীলতা তাঁর চরিত্রের আরো এক উল্লেখনীয় দিক। পশ্চিমবঙ্গের কবি-লেখক-শিল্পীমহল তাঁর কাছে সতত স্বাগত ও আপ্যায়িত হয়েছেন।

প্রয়াত আবু হেনা মোস্তফা কামালকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি।

অপূর্ব কর

সরলা বসু

কবি অরুণাচল বসুর জননী, সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'মা' শ্রীযুক্তা সরলা বসুর জন্ম ১৩১০ বঙ্গাব্দে। স্বাভাবিক এক সাহিত্য ক্ষমতার অধিকারিণী সরলা বসু ৫০টি গল্প, একটি উপন্যাস ছোটদের জন্য কিছু রচনা এবং অরুণাচল বসুর সঙ্গে একত্রে 'সুকান্ত স্মৃতি' লিখেছেন।

১৩৩৭ সনে 'সাম্যবাদী' পত্রিকায় তাঁর গল্প প্রথম প্রকাশিত হয়, নাম 'সীতার পাতাল প্রবেশ'।

১৩৫০ সনে 'অরণি' তে তাঁর 'বারো ডজন দেশলাই' প্রকাশিত হয়। তাঁর তিনটি গ্রন্থের নাম ঃ ঝিলমিল বাজার দেশ' (কার্তিক ১৩৬৯), 'জল-বনের

কাব্য', (আষাঢ় ১৩৭২), 'কবিকিশোর সুকান্ত'। সংকলিত গ্রন্থ 'সুকান্ত মূল্যায়ণ' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৭৬)। সুকান্তর চিঠিপত্রে সরলা বসুর সাহিত্য সাধনা বিষয়ে উল্লেখ আছে। সরলা বসু ১৯৭২ সালের ১ মে 'কত দিনে কত ব্যথা' নামে একটি দীর্ঘ উপন্যাস লিখতে শুরু করেন। শেষ করেন '৭৩ সালের ৩ মে।

সত্য ও কল্পনায় মেশা গ্রাম বাংলার পটভূমিতে রচিত একটি অসাধারণ উপন্যাস—'কত দিনের কত ব্যথা।'

এই সরলা বসু সম্প্রতি অতি নীরবে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। একদিকে উদাসীনতা অন্যদিকে অভিমান—কোথাও কি কিছু রয়ে গেল ?

অনিরুদ্ধ সেন

হীরাবাই বরোদেকার

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সুপ্রভা সরকার

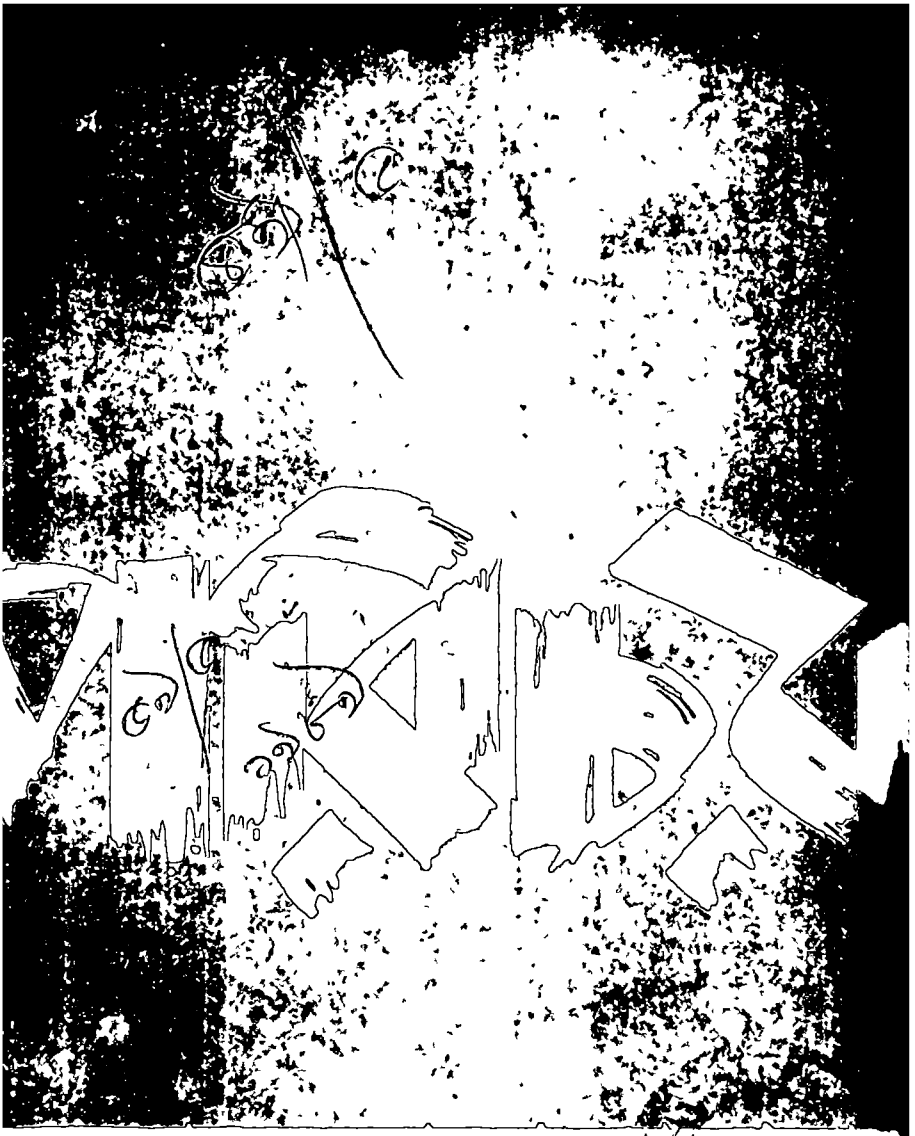

সেকালের চোখে ক্ষুদিরাম প্রফুল্ল চাকী

আনন্দধারার বই

কলিকাতা তারিখ অভিধান ॥ দিব্যেন্দু সিংহ ॥ ৫০·০০ টা

তিনশ বছরের কল্লোলিনী কলকাতা। তার সমাজ-শিক্ষা-শিল্প-সংস্কৃতি আমাদের পরম গর্বের। একদিনে নয়, কালে কালে তিলে তিলে বহু জন্ম-মৃত্যুতে, প্রাণপাত-পরিশ্রমে, সংস্কার-আন্দোলনে গড়ে ওঠা এই তিলোত্তমা নগরীর প্রতিটি দিনে কোন কোন সালে কী ঘটেছিল, তাই নিয়েই গড়ে উঠেছে এই মূল্যবান সংকলন-গ্রন্থ।

'কলকাতা নিয়ে যাঁরা চর্চা করেছেন বিভিন্ন দিক থেকে তাঁদের বইগুলোর মধ্যে শ্রীদিব্যেন্দু সিংহের বইটি নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করবে নিজস্ব অধিকারের দাবীতে।'

—নিশীথরঞ্জন রায় (ভূমিকা)

"বইটি একদিকে যেমন কলকাতার সমযানুক্রমিক ধারাবাহিকতাকে একটি সূত্রে বাঁধার প্রয়াস, তেমনি অগণিত অজ্ঞাত তথ্যের আকর-গ্রন্থ।...নির্দেশিকা অংশে 'কলকাতার প্রথম', 'পত্র-পত্রিকা' 'প্রতিষ্ঠান' 'ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন / উদ্বোধন এবং কলকাতার ব্যক্তিত্ব'—শুধু নির্দেশ-পঞ্জী নয়, উল্লেখ্য সংযোজন।"

—সন্তোষকুমার অধিকারী

"অসামান্য, অবিশ্বাস্য তোমার বই—'কলিকাতা তারিখ অভিধান'। আমি অবাক বিস্ময়ে অভিভূত হয়েছি। এ তোমার বিদ্যার পরিচয় শুধু নয়, এ তোমার পরিশ্রমের বাহবা নয়, এ তোমার সাধনার বিরাট প্রকাশ।"

—বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আনন্দধারা ॥ ৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯

সম্পাদকীয়

এবার অমর শহীদ ক্ষুদিরাম-এর জন্ম-শতবর্ষ। এই উপলক্ষে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী-কে কেন্দ্র করে একটি গবেষণাধর্মী রচনা প্রকাশ করা হল।

বিশ্ববিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়েরও জন্ম-শতবর্ষ চলছে। ইতিপূর্বে আমরা তাঁর ওপর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম। পরবর্তী সংখ্যায় তাঁর ওপর একটি রচনা প্রকাশ করা হবে।

গুণময় মান্না-র রবীন্দ্র-বিষয়ক যে প্রবন্ধটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হচ্ছিল, লেখা দেরিতে পাওয়ায় বর্তমান সংখ্যায় এটি ছাপা গেল না। এর জন্য আমরা লজ্জিত।

পরিচয়

৫৯ বর্ষ ৫ সংখ্যা ডিসেম্বর ১৯৮৯ পৌষ ১৩৯৬

প্রবন্ধ

ক্ষুদিরাম-কানাইলাল : সেদিনের চোখে সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ১
লোকসংস্কৃতির মার্কসীয় চর্চা এবং পি সি. যোশি মানিক সরকার ১২
ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও অ-শাস্ত্রীয় আধুনিক স্বরমণ্ডল
সৌমেন গুহ ২০

আলোচনা

কেন উপজাতি ? সুনির্মল দত্তচৌধুরী ৬৯

আফ্রিকার কবিতা অনুবাদ তুষার চৌধুরী

গল্প

সারবস্তু মানিক চক্রবর্তী ৪৬
ধুনারীর বন্দুক তন্ময় মজুমদার ৬২

দীর্ঘ কবিতা দেবদাস আচার্য

পুস্তক পরিচয়

আধুনিক শিক্ষার হালচাল পার্বতী সেন ৭৯
নাট্যাচার্য শিশিরকুমার জগন্নাথ ঘোষ ৮৩
ছোট গল্পে নতুন মানুষ পবিত্র মুখোপাধ্যায় ৮৪

নাট্য প্রসঙ্গ

পিটার ব্রুকের মহাভারত অমর গঙ্গোপাধ্যায় ৮৮

প্রচ্ছদ

সুবোধ দাশগুপ্ত

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

সম্পাদকমণ্ডলী

গৌতম চট্টোপাধ্যায় সিদ্ধেশ্বর সেন দেবেশ রায় রণজিৎ দাশগুপ্ত
অমর ভাদুড়ী অরুণ সেন

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

উপদেশকমণ্ডলী

গোপাল হালদার হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলিকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস, ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

ক্ষুদিরাম-কানাইলাল ঃ সেদিনের চোখে

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বাঙলার বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাটি আজও আমাদের কাছে শ্রদ্ধা সম্ভ্রম আর রোমাঞ্চ-ভালবাসায় মেশা এক অবিস্মরণীয় বীরত্ব গাথা হয়ে আছে। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্ল-সত্যেন-কানাইলাল বাঙালী-মানসে মুদ্রিত হয়ে আছেন শৌর্য, সাহস আর ত্যাগের প্রতীক হিসাবে।

ক্ষুদিরামকে নিয়ে লেখা 'একবার বিদায় দে মা' গানটির কথা আমরা সকলেই জানি এবং গানটি এক অন্ধ ভিখারির রচনা বলে কথিত আছে। ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লর স্মরণে এ-রকম আরও অনেক গানের সন্ধান পাওয়া যায়—যেমন,

'ক্ষুদিরাম তুমি দিয়েছিলে প্রাণ/বাঙলারে ভালবাসি/হাসিতে হাসিতে মরণ মঞ্চে গলায় পরিলে ফাঁসি ...'

'ক্ষুদি তোমার পায়ে নমস্কার / তোমার কাণ্ড দেখে ভণ্ডরা সব / করছে হাহাকার.... .'

'তোদের ঘুমের নেশা ভাঙিয়ে দিলে / ক্ষুদিরামের একটি বম্।'

'আজিও তোমাকে ভুলতে পারিনি বীর প্রফুল্ল চাকী / নিজ হাতে দিলে পরাণ আহুতি বন্ধনলাজ ঢাকি.. '

'না হইতে বোধন মাগো ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গলঘট '

'ক্ষুদি তুই প্রাণ পেলি / যে পথ দেখায়ে গেলি / সে পথ বিনে বাঙ্গালী পাবে না আরাম।

এই-সব গান সেদিন কাপড়ের পাড়ে বুনে দেওয়া হয়েছিল বলেও জানা যায়। গানগুলি পড়লেই বোঝা যাবে, এগুলি লিখেছিলেন দেশের সাধারণ মানুষ, কোন কোন ক্ষেত্রে লোক-কবিরা। গানগুলিতে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁদের কাজের প্রতি সমর্থন যেমন আছে, তেমনি তাদের কীর্তিকে দেখানো হয়েছে দেশের মানুষের বাসনাপূরণের একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে। বিদেশী শাসকের হাতে দেশবাসীর নিয়ত লাঞ্ছনা তাদের অবমানিত আত্মাভিমানকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, যেখানে তারা যেন চাইছিলেন বোমা ছোঁড়া বা গুপ্তহত্যার মতো কিছু একটা ঘটুক। আর তাই ক্ষুদিরাম-কানাইলাল

বা সত্যেন-প্রফুল্লর কীর্তিকে তাঁরা দেখতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষের সম্মিলিত বাসনারই একটা প্রকাশ হিসাবে। 'একবার বিদায় দে মা' গানের একটি অপ্রচলিত পাঠে আছে: 'হাতে যদি থাকত ছোরা / তোর ক্ষুদে কি পড়ত ধরা / রক্তগঙ্গা বয়ে যেত / দেখত বিশ্ববাসী'।[২] বেশ বোঝা যায়, জনসাধারণের কবি তাঁর নিজের আকাঙ্ক্ষারই আপতন ঘটিয়েছেন গানের মধ্যে।

সমসাময়িকদের সাক্ষ্যে জানা যায়, মজঃফরপুরে বোমা পড়ার (৩০ এপ্রিল, ১৯০৮) আকস্মিকতায় সাধারণ মানুষ প্রথমে কিছুটা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেও অচিরেই তাঁদের এই মনোভাব বদলাতে থাকে। গ্রে স্ট্রীটের 'নবশক্তি' প্রেস থেকে অরবিন্দকে যখন গ্রেপ্তার করা হচ্ছিল (২মে, ১৯০৮), সাধারণ মানুষ অরবিন্দের হাতে হাতকড়া পরানোর বিরুদ্ধে সরবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। তাঁদের নেতৃত্বে ছিলেন কংগ্রেস নেতা ভূপেন্দ্রনাথ বসু।[৩] ক্ষুদিরামের মৃতদেহ যখন শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে মজঃফরপুরের মানুষ রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে শহিদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন: 'অনেকে শবের উপর ফুল দিয়ে গেল। শ্মশানেও অনেক ফুল আসিতে লাগিল।'[৪] কানাইলালের শেষযাত্রাও ছিল কলকাতার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে: 'বেলা ৭টার সময় জেল কর্তৃপক্ষ কানাইর মৃতদেহ ছাড়িয়া ছিলেন। সমবেত জনতা তুমুলরবে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতে লাগিল। দর্শকদের মধ্যে অনেকেই ফুল ও ফুলের মালা আনিয়াছিল। সেই ফুলে কানাইকে সাজানো হইল। কানাইর শবদেহ কাঁধে করিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল।'[৫] আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখছেন—'কালীঘাটের রাস্তায় আগাগোড়া শোকাভিভূত দর্শকের অসম্ভব ভীড়। রাস্তার পাশে দুই দিকের বাড়ী হইতে শবাধারে পুষ্প ও লাজ (খৈ) বৃষ্টি এবং মুহুর্মুহু শঙ্খধ্বনি এক অপরূপ দৃশ্যের সৃষ্টি করিয়াছিল।'[৬] আরও জানা যায়, শ্মশানঘাটের রাস্তায় সেদিন এত ভীড় হয়েছিল যে, কালীঘাটের মন্দিরে পূজো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ঠাকুরের ফুল-বেলপাতা লোকে কানাইলালের পায়ে ছুঁইয়েছিল আর চিতাভস্ম সংগ্রহের জন্য রীতিমতো কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছিল। নারীরা ডিবে ভর্তি করে চিতাভস্ম নিয়ে গিয়েছিলেন।[৭]

কলকাতার মানুষের মধ্যে সেদিন কী অস্বাভাবিক উত্তেজনা ছিল তার আরও পরিচয় পাওয়া যায় উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্যের রচনায়। লেখক নিজের উদ্যোগে কানাইলালের মৃতদেহের ফোটোগ্রাফ তোলার ব্যবস্থা করেছিলেন

এবং একদিনে তিন হাজার ছবি বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত পুলিস হকারদের কাছ থেকে ছবি কেড়ে নেয়।[৮] এই জন-আলোড়ন সেদিন নিঃসন্দেহে সরকারের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল, কারণ এর কয়েকদিন পরে সত্যেনের ফাঁসির পর তাঁর মৃতদেহ নিয়ে কোন শোকমিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

শহিদের আত্মদানে সাধারণ মানুষের এই প্রতিক্রিয়ার পাশাপাশি যদি আমরা সেই-সময়কার পত্র-পত্রিকার রচনাগুলিকে বিচার করি, এক অদ্ভুত বৈপরীত্য আমাদের বিস্মিত করে দেবে। সমকালীন বুদ্ধিজীবীরা শুধু যে গুপ্তহত্যার রাজনীতির তীব্র নিন্দা করেছিলেন, তাই নয়, এমন মন্তব্যও করেছিলেন যে, এইসব কাজ দেশকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা মানতে রাজী আছি, গুপ্তহত্যার রাজনীতি বা তথাকথিত সন্ত্রাসবাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে, এবং খুব সঙ্গত কারণেই একজনের কাছে তা গ্রহণীয় না-ও হতে পারে। কিন্তু সেদিনের বুদ্ধিজীবীদের প্রতিক্রিয়া ছিল তার থেকে আলাদা ধরনের। রাজনৈতিক সমালোচনা যতটা না ছিল, তার চাইতে বেশি ছিল আতঙ্ক, ত্রাস। বিপ্লবী নলিনীকিশোর গুহ যেমন বলেছেন, 'নেতারা বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়েছেন, কিন্তু সত্যই যে বাঙ্গলার যুবকগণ তাঁহাদের হাতছাড়া হইয়া ক্রমে এক নতুন পথের পথিক হইয়া পড়িতেছে তাহার ইঙ্গিত পাইয়া তাঁহারা কতকটা শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।'[৯] এই শঙ্কা নিছক উদ্বেগজাত ছিল না, কারণ রচনাগুলিতে অনেক সময়ই এটা প্রমাণের চেষ্টা ছিল যে, লেখক অন্তত এই কাজের সঙ্গে যুক্ত নন। বিপ্লবী রাজনীতির সমালোচনার নামে নিজেদের ঘর সামলানোর ব্যাকুলতা এই সময় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল দেখা যায় এবং পারস্পরিক দোষারোপও একেবারে অনুপস্থিত ছিল না।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা বুদ্ধিজীবী-মানসের এই স্ব-বিরোধিতার দিকটিই বোঝার চেষ্টা করব। এ-আলোচনার প্রয়োজন আছে মনে হয়, কারণ ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে বিপ্লবী আন্দোলনের ধারাটিকে অনেক সময়ই এমন-ভাবে দেখানো হয় যে, মনে হতে পারে, বিপ্লবীরা যেন প্রথম থেকেই সমাদৃত হয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, আজ ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লর জন্মশতবর্ষে এ-রচনার একটা বিশেষ প্রাসঙ্গিকতাও থাকতে পারে।

॥ ২ ॥

'গুপ্তহত্যা কখনও ধর্মসঙ্গত বা বীরধর্মসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না'—'প্রবাসী'-র এই মন্তব্যে[১০] একটি বিশেষ রাজনৈতিক পন্থার সমালোচনা আছে, কিন্তু এরপর যখন লেখা হয়, 'মানুষ তাহাকে সুপথে চালিত করিতে পারিল না, ভগবান করিবেন। নিরপরাধ ইংরাজ স্ত্রীলোকদুটির আত্মা তাহার আত্মাকে ক্ষমা করিবে।'[১১]—তখন নতুন গড়ে ওঠা বিপ্লববাদী ধারাটার প্রতিই যেন একটা কটাক্ষ এসে যায়। এই মনোভাব আরও নগ্নভাবে প্রকাশ পায় 'ভারতী' তে। বিপ্লবীদের সম্পর্কে ভারতীর মূল্যায়ন: 'অবোধ বালকগণ হত্যারূপ পাপকার্য দ্বারা নিজের এবং দেশের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।' এবং 'ভারতী' বিশেষ উদ্বিগ্ন, কারণ 'আজ যদি ইংরেজ চলিয়া যান আমরা কত বিপদে পড়িব কে বলিতে পারে।'[১২] ক্ষুদিরামের 'অটল বীরভাবে'র প্রতি ভারতী-র মুগ্ধতা থাকলেও 'ন্যায়করুণাসঙ্গত' ইংরেজ আইনের প্রতি তার শ্রদ্ধা যেন আরও বেশি।[১৩] তাই ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম হলেও 'ভারতী'র মনে হয়, কনডার্ফের 'নিরপেক্ষ' বিচারে 'সকলেই তাকে ধন্য ধন্য' করছে। কানাইলালের ফাঁসির পরও ভারতী-সম্পাদকের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিল, 'এঁরা দেশের কল্যাণকামনায় দেশের সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'[১৪] অন্যদিকে ক্ষুদিরামের প্রতি 'প্রবাসী' শ্রদ্ধা জানিয়েছিল এই বলে যে, 'তাহার জীবন যেমনই হউক সে মরিয়াছে বীরের মতো', কিন্তু সেই সঙ্গে প্রবাসী-র এই বিশ্বাসটাও ছিল যে, 'যে-সকল হত্যা বা হত্যার চেষ্টার কথা হইতেছে তাহা প্রাণরক্ষার জন্য নয়, এবং দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যে নয় তাহা পাগল ভিন্ন কাহাকে বুঝাইতে হইবে না।'[১৫] প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, স্বাধীনতার জন্য যদি না হয়, তাহলে কিসের জন্য এই হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল। 'ভারতী'র উত্তর: 'কল্পনার মাদকতা সেবনে উন্মত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা প্রকৃত কার্যের পথ ছাড়িয়া বিপথে ছুটিল।'[১৬] 'প্রকৃত কার্যের' পথ তাহলে কি? প্রবাসীর দ্ব্যর্থহীন মত: 'যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে ইহা কেহ মনে করে কিনা জানি না, আমরা মনে করি না।' আর 'ভারতী'-র আবেদন, যথেচ্ছাচার নীতির সংশোধন, যাতে 'রাজায় প্রজায় পুনরায় বিশ্বাসের সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে।'[১৭]

'বঙ্গদর্শন' (শ্রাবণ ১৩১৫) গোটা ব্যাপারটিকে 'আকস্মিক চিত্তবিকার' বলে উড়িয়ে না দিলেও স্বীকার করে নিয়েছিল এই কাজের নিন্দা সর্ববাদীসম্মত'।

॥ ৩ ॥

বিপ্লবী আন্দোলনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের বিষয়টি আজও কিছুটা বিতর্কিত হয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যে-তিনটি রচনা বিশেষ গুরুত্ব পেয়ে থাকে, সেই তিনটিরই উপলক্ষ হল মজঃফরপুরের ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়া। ক্ষুদিরামের বোমা ছোঁড়ার ২৫ দিন পরে কলকাতার চৈতন্য লাইব্রেরিতে ২৫মে রবীন্দ্রনাথ যে-বক্তৃতাটি দেন, সেটিই পরে 'পথ ও পাথেয়' নামে 'বঙ্গদর্শন' এবং 'ভারতী'-তে প্রকাশিত হয়। এরপর তিনি লেখেন আরও দুটি প্রবন্ধ—'সদুপায়' (ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৫) আর 'সমস্যা' (বঙ্গদর্শন', আষাঢ়, ১৩১৫)।

এই তিনটি রচনায় রবীন্দ্রনাথের যে-মত প্রকাশ পেয়েছিল, তা কোন-কোন দিক থেকে পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত অন্যান্য রচনার থেকে আলাদা। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঘটনাগুলিকে কেবল 'দুই পাঁচজন ছেলেমানুষের চিত্তবিকারের পরিচয়' বলে মানতে পারেন নি, এবং স্বীকার করেছিলেন, 'আসলে দেশের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া আছে।' দ্বিতীয়ত, 'আমি ইহার মধ্যে নাই, এ কেবল অমুকদলের কীর্ত্তি' বলে দায়িত্ব এড়ানোর চেষ্টা তাঁর মনে হয়েছিল 'লজ্জার বিষয়'।[১৮] অভিযুক্তদের সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল, 'আর কিছু বিচার না করিয়া কেবলমাত্র বিপদ ঘটাইয়াছে বলিয়াই তাহাদের প্রতি তীব্রতা প্রকাশ করাও কাপুরুষতা।'[১৯]

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এইখানেই থেমে থাকেন নি। বিপ্লবী রাজনীতির প্রতি তাঁর অনাস্থা প্রকাশের ভাষা যথেষ্ট তীব্রই হয়েছিল : "অন্যায়ের দ্বারা অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই অথচ তাহাতে সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়।'[২০] এই 'অবিশ্বাসী রাষ্ট্রনীতি', রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, য়ুরোপ থেকে ধার করা এবং তা 'পৃথিবীর সর্বত্রই ধর্ম্মবুদ্ধিকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই চাঞ্চল্যের সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাই জোর দিলেন ভারতীয় জাতি গঠনের ওপর, 'অবিচালিত ও নির্বিকার সত্যের' এবং 'তপস্যার দ্বারা মঙ্গলের সৃষ্টির' ওপর।[২১]

রবীন্দ্রনাথের এইসব কথা স্বভাবতই রবীন্দ্র-সমালোচকদের অস্বস্তির কারণ হয়। প্রভাতকুমার স্বীকার করেন, 'বিপ্লবপন্থীদের পথকে কবি চিরদিনই নিন্দার্হ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।' নেপাল মজুমদার লেখেন, রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'সচেতনভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আরোপ করিতে চাহিয়াছিলেন।' এবং অন্যান্য রচনার প্রসঙ্গ এনে চিন্মোহন

সেহানবীশ সিদ্ধান্ত টানেন, মতপার্থক্য থাকলেও বিপ্লবীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের ছিল 'অন্তরের গভীর টান।'[২২] যদিও এত করেও সামাল দেওয়া যায় না, আর জীবনের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ যে 'অতিশয় পন্থার' বিরোধিতাই করেছেন, কয়েক বছর পরের একটি রচনায় তা তিনি নিজেই ঘোষণা করেন এবং বিপ্লবী-দের পথকে 'চোরের পথ' বলতেও কুণ্ঠিত হন না।[২৩]

পরবর্তী কালে, তিরিশের দশকে, আন্দামানে দ্বীপান্তরিত বন্দীদের মুক্তির দাবিতে এবং হিজলি বন্দীনিবাসে গুলিচালনার প্রতিবাদে তাঁর ভূমিকা নিঃসন্দেহে বদলে যায়। কিন্তু এই পর্বে তাঁরই গানের মন্ত্রে প্রাণিত তরুণদের আত্মত্যাগকে তিনি যে যথাযোগ্য মর্যাদা দেন নি, এটা ঘটনা। আর এর জন্যে তাঁকে রীতিমতো কঠোর সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছিল। 'নব্যভারত' পত্রিকার একটি রচনায় লেখা হয়েছিল, 'আমরা চিরপদানত থাকিব, অন্যে আমাদের উপর প্রভুত্ব করিবে, আমরা কিছুতেই ঠেকাইতে পারিব না ইহাই কি মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বৃদ্ধবয়সের প্রবীণ মত?' 'অর্চ্চনা' পত্রিকায় জনৈক লেখক অকুণ্ঠিতভাবেই বলতে পেরেছিলেন, 'আজ কবি দেশব্যাপী উত্তেজনাকে মত্ততা আখ্যা দিয়া দেশের উদ্যমের মুখে হুল' ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছেন।'[২৪]

আমরা অনুমান করে নিতে পারি, স্বদেশী আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব এই সময় রবীন্দ্রনাথকে বিশেষভাবে পীড়িত করেছিল, আর তাই বিপ্লবীদের পথকে তিনি অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি। কিন্তু তিরিশের দশকে আমরা অন্য রবীন্দ্রনাথকে পাই।

॥ ৪ ॥

যাই হোক সমালোচনার ধারা কোনদিকে বইছে, ওপরের আলোচনা তার কিছুটা আভাস দেবে। এটা আরও স্পষ্ট হবে যদি রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যগুলিকে এর পাশে রেখে বিচার করা যায়।

মজঃফরপুরের ঘটনার আগেই সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরম-চরম ভাগ হয়ে গেছে। নরমপন্থীদের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক কালে বিপ্লবী সমিতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও আত্মজীবনীতে তিনি যে ওই ঘটনাকে 'নিষ্ফল উদ্দেশ্যহীন এবং ভয়ঙ্কর' বলে বর্ণনা করেছেন,[২৫] তা-তে হয়ত অবাক হবার কিছু নেই। কিন্তু চরমপন্থীরাও এই সময় বিপ্লব পন্থার সমালোচনায় সরব ছিলেন। বিপিনচন্দ্র পালের অগ্নিবর্ষী রচনা থেকে বিপ্লবী তরুণরা প্রেরণা পেতেন,

কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের' প্রবক্তা, বিপ্লবী সমিতির কাজকর্মকে তিনি 'হুজুগে' বলেই মনে করতেন এবং অরবিন্দের গ্রেপ্তারের পর 'বন্দে মাতরম'-এর সম্পাদনাভার হাতে নিয়েই তিনি লিখতে পেরেছিলেন, Bombs and assasinations had absolutely no place in our propaganda. Both our instinct and our wisdom equally rebel against these outlandish methods of political warfare[২৬]

বিপিনচন্দ্রের এই বক্তব্য সর্বাংশে সত্য নয়, কারণ তিনি নিজে বিশ্বাস না করলেও অরবিন্দের সম্পাদনায় 'বন্দে মাতরম' বিপ্লবের ডাকই তরুণদের শুনিয়েছিল। ক্ষুদিরামের বোমা ছোঁড়ার মাত্র একদিন আগে অরবিন্দ 'বন্দে মাতরম'-এ লিখেছিলেন, The fair hopes of an orderly and peaceful evolution of self government which the first energies of the movement fostered are gone for ever. Revolution, bare and grim, is preparing her battle field.'[২৭]

এই তেজোদীপ্ত আহ্বান যে-পত্রিকা ঘোষণা করেছে এবং সেই আহ্বান কানে নিয়ে যারা জীবন তুচ্ছ করে এগিয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়াটা নিশ্চয়ই নৈতিকতার বিচারেও সমর্থনীয় হতে পারে না।

দুঃখের বিষয়, ঠিক একই কাজ করেছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ-ও। মুরারিপুকুর মামলায় তার সওয়াল ঐতিহাসিক হয়ে আছে, কিন্তু অরবিন্দকে তিনি যেভাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য—দেশপ্রেমের মন্ত্রদাতা, মানবতাবাদের পূজারী—the poet of patriotism the prophet of nationalism and the lover of humanity—এক দার্শনিক ব্যক্তিত্ব হিসাবে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন—[২৮] তা কিন্তু মোটেই বাস্তব ঘটনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। অরবিন্দ অবশ্যই বিপ্লবের আহ্বান তরুণদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন, 'বন্দে মাতরম' ছাড়া, 'যুগান্তর' পত্রিকারও তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত 'বিপ্লবতত্ত্ব' নামের রচনাটি তাঁরই লেখা বলে মনে করা হয়।[২৯] মুরারিপুকুর গোপন সমিতির যে-সভায় কিংসফোর্ড হত্যার পরিকল্পনা নেওয়া হয়, অরবিন্দ সে-সভাতেও উপস্থিত ছিলেন বলে জানা যায়,[৩০] কিন্তু পরে অরবিন্দ 'এই হত্যাকাণ্ডের সহিত সকল সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার' করেন[৩১] এবং চিত্তরঞ্জনও সওয়ালের সময় অরবিন্দের সেই পরিচয়টিই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন।

একটা অপ্রীতিকর প্রসঙ্গ এখানে অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বাঙলার বুদ্ধিজীবী এবং কংগ্রেস নেতারা এই সময় প্রায় সকলেই অরবিন্দর গ্রেপ্তারের ঘটনাটিকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেন এবং একই সুরে ধিক্কার দেন ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লর ভূমিকাকে। অমৃতবাজার পত্রিকার যে-সম্পাদকীয়তে অরবিন্দর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়, সেই রচনাই আবার বিপ্লবীদের নিন্দিত করে 'some brainless young lads' বলে। ওই পত্রিকার আর-একটি রচনায় বিপ্লবীদের কাজকর্মকে 'কাপুরুষোচিত হিংসা'—dastardly violence—বলেও আখ্যা দেওয়া হয়।[৩২] অরবিন্দর হাতে হাতকড়া পরানো হয়েছে বলে ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রতিবাদ করেছিলেন; কিন্তু অরবিন্দর সঙ্গেই যাঁরা গ্রেপ্তার হন সেই শৈলেন বসু আর অবিনাশ ভট্টাচার্যের কোমরে দড়ি আর হাতকড়া পরানোর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেছিলেন বলে জানা যায় না। এই অদ্ভুত বৈপরীত্যের সমন্বয় যে তারা ঘটাতে পেরেছিলেন, তার একটি কারণ যেমন অরবিন্দর অসামান্য ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের সশ্রদ্ধ মনোভাব, অন্যটি তেমনি সশস্ত্র-সহিংস রাজনীতি সম্পর্কে তাঁদের দ্বিধা, অনাস্থা এবং আতঙ্ক।

ওই রাজনীতির প্রতি তাঁদের অনীহা থাকতেই পারে। বস্তুত ক্ষুদিরামের সমর্থনে যে রচনার জন্য ('দি কানট্রিস মিসফরচুন, কেশরী, ১২ মে ১৯০৮) তিলক দণ্ডিত হন, সেই রচনাতেও কিন্তু তিনি ঠিক বোমার রাজনীতি সমর্থন করেন নি। তাঁর যুক্তি ছিল, এরকম একটি ঘটনা যে ঘটতে পারল তার মূলে আছে সরকারী নিপীড়ন: The bombs exploded owing to the official class having tried the patience of the Bengalees to such a degree that the heads of the Bengalee youths became turned[৩৩] আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থনের সময়ও তিলক যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তাঁর রচনায় বোমার সমর্থনে কিছু বলা হয় নি—সমালোচনা করা হয়েছে সরকারী দমননীতির: ' in condemnint bomb throwing we were sorry we could not help condemning the repressive measures of the government.'[৩৪] তিলকের এই বক্তব্য ছিল খুবই সংগতিপূর্ণ। কিন্তু মনে মনে বিপ্লবীদের সাহস আর আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েও বাঙলার বুদ্ধিজীবীরা সেদিন যেভাবে এই রাজনীতির নিন্দায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন, তার মধ্যে বুদ্ধিজীবী-সমাজের স্ববিরোধিতাই যেন প্রকট হয়ে ওঠে। যে 'প্রবাসী' বিপ্লবী রাজনীতির সমালোচনায় এত সরব ছিল, সেই

প্রবাসী-র সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কেই দেখা গিয়েছিল কানাইলালের শবযাত্রার পুরোভাগে।[৩৫] নরেন গোঁসাই-হত্যার ঘটনায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও উল্লসিত হয়েছিলেন বলে জানা যায়।[৩৬] কানাইলালের প্রতি শিবনাথ শাস্ত্রীর শ্রদ্ধা যে কত প্রগাঢ় হয়েছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায় একটি অবিস্মরণীয় উক্তিতে। শিবনাথ শাস্ত্রী জেলের মধ্যে গিয়ে সত্যেন বসুকে আশীর্বাদ করে এসেছিলেন, কিন্তু কানাইলালকে তিনি আশীর্বাদ করেন নি কারণ, 'বহু যুগ তপস্যা করলে তবে যদি কেউ তাকে আশীর্বাদ করার যোগ্যতা লাভ করতে পারে।' আপীলের কথা শুনে কানাইলাল চীৎকার করে বলেছিলেন, There shall be no appeal. শুনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মন্তব্য করেন, 'shall আর will এর ব্যবহার করতে কেউ আর ভুল করবে না।'[৩৭]

॥ ৫ ॥

শহিদ-বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীরা যে বিপ্লবীদের কাজকে 'পাপকার্য', সর্বনাশের পথ ইত্যাদি বলে ধিক্কৃত করতে পেরেছিলেন, তার কারণ বোধহয় নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ছেড়ে রাজনীতি অন্য দিকে বাঁক নিতে থাকা এবং সশস্ত্র হয়ে ওঠার সম্ভাবনায় এঁদের আতঙ্ক আর উদ্বেগ। তাই দেখা যায়, রচনাগুলিতে বিপ্লবীদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের সমালোচনা যতটা না আছে, তার চাইতে বেশি করে আছে সর্বনাশের আশঙ্কায় সন্ত্রস্ত হাহাকার। উত্তপ্ত জ্বালাময়ী কথা অনেকেই বলেছিলেন, কিন্তু তা যে সত্যি সত্যিই কাজে পরিণত হবে, সেটা যেন কেউ ভাবতে পারেন নি। মতিলাল রায় যেমন বলেছেন, ক্ষুদিরাম-প্রফুল্লর কীর্তি 'পরিপাক করাই দেশের পক্ষে তখন দুঃসাধ্য ছিল। এমন প্রচণ্ড কর্ম ভেতো বাঙালীর হাড়ে যে কখনও সম্ভব হইতে পারে এরূপ ধারণা করা যাইত না।'[৩৮]

এই পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষ যে বিপ্লবীদের একটা শ্রদ্ধা-সম্মান জানাতে পেরেছিলেন, তার কারণ তাঁদের মনে হয়েছিল, বহুকালের জড়তার অচলায়তনের ঘা দিতে পেরেছে এই অশান্ত-নবীন ছেলেরাই। আমরা জানি, বাঙলায় বিপ্লববাদ গড়ে ওঠার পিছনে একটা কারণ ছিল বাঙালীর 'ভীরু' বদনাম খণ্ডানোর চেষ্টা এবং সেদিক থেকে বোমার রাজনীতি 'বাঙালীর মানসিক ক্রমবিকাশের ফল।'[৩৯] আধমরাদের ঘা মেরে বাঁচানোর তাগিদ তাঁরা অন্তর থেকে অনুভব করেছিলেন। ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে

আগুন জ্বালানোর আহ্বান তাদেব বক্তেব মধ্যে বেজে উঠেছিল, আব সেই বজ্রানলে আপন বুকেব পাঁজব জ্বালিযে নিয়ে তাঁরা এগিযে গিযেছিলেন আত্ম-দানের উৎসধাবাব দিকে। বুদ্ধিজীবী আর জাতীয নেতাদেব সমর্থন তাঁবা পান নি, সমর্থন পাননি তাঁদের প্রিয কবিব কাছ থেকে, এমনকি শেষ পর্যন্ত দ্বিধাবিভক্ত হযে পডেছিলেন তাঁদের সহযোদ্ধাবাও। অববিন্দব বাজনীতি থেকে বিদায, বাবীন্দ্র ও অন্যান্যদেব স্বীকাবোক্তি—এই সব মিলে বাঙলাব এই আগ্নেয অধ্যাযটিব পবিণতি হযেছিল কতকটা বেদনাদাযক, কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামেব প্রকৃত সৈনিকেব মর্যাদা তাঁবা পেযেছিলেন দেশবাসীব কাছ থেকে। অজ্ঞাতনামা কবি লিখেছিলেন, 'বাজাব জাতি বুটেব লাথি / পডছে মাথায দিবাবাতি / তুমি ভাঙলে সে ভুল জীবন দিযে / দেশেব লোকের সবাকাব।'[৪০]

তথ্যসূত্র ॥

১। গানগুলি নেওযা হযেছে কালীচবণ ঘোষেব 'জাগবণ ও বিস্ফোবণ' ২য খণ্ড (পৃ ২৯৮-৩০০) বমেশচন্দ্র মজুমদাবেব বাংলাদেশেব ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড (পৃ ১২৫-২৬) এবং নগেন্দ্রকুমাব গুহ বাযেব 'শহীদ যুগল' (পৃ ২২১) থেকে

২। শহীদ ক্ষুদিবাম / ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র, পৃ ১৯৪-৯৫

৩। আমাব এলোমেলো জীবনেব কযেকটি অধ্যায / উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ ১২৩ [লেখক অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্যেব ভাই]

৪। ক্ষুদিরাম-উপেন্দ্রনাথ সেন (সাক্ষবতা প্রকাশন, ১৯৭৯) / পৃ ২২

৫। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—প্রাগুক্ত / পৃ ১৪৫-৪৭

৬। বমেশচন্দ্র মজুমদার—প্রাগুক্ত / পৃ ১৩৭

৭। ভাবতেব বিপ্লব কাহিনী / হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৮১-৮৩

৮। উপেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য—প্রাগুক্ত / পৃ ১৪৭

৯। বাঙ্গলায বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ (১ম সং) / পৃ ২১

১০। প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫ [বিবিধ প্রসঙ্গ']

১১। প্রবাসী, ভাদ্র ১৩১৫ ['তাহাকে' বলতে ক্ষুদিবাম আব 'নিবপবাধ ইংবাজ স্ত্রীলোক দুটি' বলতে বোমাব আঘাতে নিহত শ্রীমতী কেনেডি ও তাঁব কন্যাকে বোঝানো হযেছে।]

১২। 'বন্দেমাতবম' / ভাবতী, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫

১৩। 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' / ভারতী, শ্রাবণ ১৩১৫
১৪। 'কর্তব্য কোন পথে'—স্বর্ণকুমারী দেবী / ভারতী ১৩১৫ পৌষ
১৫। প্রবাসী / অগ্রহায়ণ ১৩১৫
১৬। 'আমাদের কর্তব্য'—স্বর্ণকুমারী দেবী / ভারতী ভাদ্র. ১৩১৫
১৭। প্রবাসী / অগ্রহায়ণ ১৩১৫ , ভারতী / জ্যৈষ্ঠ ১৩১৫
১৮। 'পথ ও পাথেয়' / ভারতী, আষাঢ় ১৩১৫
১৯। প্রাগুক্ত
২০। সদুপায় / ভারতী / শ্রাবণ ১৩১৫
২১। 'পথ ও পাথেয়'
২২। রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক (২য় খণ্ড) প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় / পৃ ১৭১ , 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ—নেপাল মজুমদার / পৃ ২৯৪ , রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবীসমাজ—চিন্মোহন সেহানবীশ / পৃ. ২২
২৩। 'ছোটো ও বড়ো'—কালান্তর / পৃ. ১০০, ১০৩
২৪। শশধর দাস—নব্যভারত / আষাঢ় ১৩১৫ , অমরেন্দ্রনাথ রায়—অর্চনা / ভাদ্র-আশ্বিন ১৩১৫
২৫। জাতি যেদিন গঠন পথে—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ : ভূপেন্দ্রনাথ দাশ / পৃ ৩৯৯
২৬। Bepinchandra Pal and India's struggle for Swaraj—Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee / p 107
২৭। Bande Mataram and Indian Nationalism—Haridas Mukherjee and Uma Mukherjee / p 29
২৮। উদ্ধৃত হয়েছে—দেশবন্ধু স্মৃতি / হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত / পৃ ৮৫
২৯। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুগান্তর পত্রিকার দান—উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় / পৃ ২০
৩০। বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি—যদুগোপাল মুখোপাধ্যায় / পৃ ২৮৪
৩১। কারাকাহিনী—শ্রীঅরবিন্দ (শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম) / পৃ ৬
৩২। অমৃতবাজার পত্রিকা ৪ মে এবং ৯ নভেম্বর, ১৯০৮
৩৩। ভারতের বিপ্লব কাহিনী—হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত / পৃ ৬৮
৩৪। The Trial of Mr. B. G. Tilak / Ganesh and Co., Madras, p. 154
৩৫। রমেশচন্দ্র মজুমদার – প্রাগুক্ত / পৃ ১৩৭
৩৬। বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল—মতিলাল রায় / পৃ ৫
৩৭। যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়—প্রাগুক্ত / পৃ, ২৭৮-৭৯
৩৮। মতিলাল রায়—প্রাগুক্ত / পৃ ১৯
৩৯। ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম— ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত / পৃ ১০-১১
৪০। কালীচরণ ঘোষ—প্রাগুক্ত / পৃ ২৯৯

লোকসংস্কৃতির মার্কসীয় চর্চা এবং পি. সি. যোশি

মানিক সরকার

"অতীতের দিকে যখন ফিরে তাকাই তখন মনে হয় আমাদের প্রগতিশীল সংস্কৃতি আন্দোলন গড়ে তোলার পিছনে পি সি যোশির অবদান অসামান্য। পার্টির সেক্রেটারি হয়ে তিনি সাংস্কৃতিক সমাবেশ গড়ার দিকে নজর দিলেন। আর যে কাজটা তিনি যোগ্যতার সঙ্গে এবং সুন্দরভাবে করেছিলেন। পার্টিতে এ রকম সেক্রেটারি আর কখনও আসেন নি। তিনি যোগাযোগ করলেন উদয়শঙ্কর, শান্তি বর্ধন, রবিশঙ্করের সঙ্গে। বোম্বের আঁধারিতে বাগানবাড়ি ভাড়া করলেন। পার্টি সার্কুলার দিয়ে আর্টিষ্ট জোগাড় করলেন।

"কাদের তিনি একত্রিত করলেন? একদিকে রবিশঙ্করের মত শিল্পী, প্রীতির মত গায়িকা, যাঁর ছিল golden voice, আবার দশরথলালের মত ট্রাম শ্রমিক।

"আমি বোম্বে হেড কোয়ার্টার্সে গেছি ১৯৪৬ সালে। তখন ওখানে ছিলেন নিরঞ্জন সেন, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, শম্ভু মিত্র, সুনীল জানা প্রমুখ। আমি গেছি শুনে যোশি ডেকে পাঠালেন। বললেন—'কি গান গাও একটা গেয়ে শোনাও।"

['গণ সংস্কৃতি আন্দোলনঃ অতীত ও বর্তমান'-হেমাঙ্গ বিশ্বাস, 'পরিচয়' জানুয়ারি ১৯৮৮, পৃষ্ঠা—১৬ ১৭]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন সাধারন সম্পাদক কমরেড পি সি যোশির অবদান ভারতের প্রগতিশীল গণসংস্কৃতি আন্দোলনে এখন যতদিন যাচ্ছে, ততোধিক স্বীকৃতি লাভ করছে। জীবিতকালে বিশেষ করে পঞ্চাশের দশকের পর থেকে এই স্বীকৃতি তিনি পেলে কতই না আনন্দের হত।

ভারতের লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রেও পি সি যোশির অবদান আছে। লোকসংস্কৃতি চর্চার গবেষকেরা হয়তো অনেকেই এ সংবাদ রাখেন না। গণসংস্কৃতির আন্দোলন এবং লোকসংস্কৃতির চর্চার মধ্যে একটি যোগসূত্র ছিল। অনেক লোককবি, লোকশিল্পী, লোকবাদ্যকার, প্রমূখ গণসংস্কৃতির যেন বর্ণাঢ্য উদ্যানের পুষ্পস্তবকে সমবেত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে কবিয়াল রমেশ শীল, শেখ গোমানী, বিষ্ণু রাভা, মঘাই ওঝা, টগর অধিকারী, গুরুদাস

ধাড়া, আন্নাভাই সাঠে, ওমর শেখ, নিবারণ পণ্ডিত, কুল পণ্ডিত অন্যতম। অন্যান্য প্রদেশে আরও অনেকে ছিলেন। আমি তাঁদের সকলের নাম জানি না। কিন্তু এটা উল্লেখ করতে চাই, এই সমস্ত লোকশিল্পী এবং লোক কবিরাই ভারতের এবং বিভিন্ন প্রদেশের গণসংস্কৃতির প্রথম আন্দোলনকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত এবং সমৃদ্ধশালী করেছিলেন। গণসংস্কৃতির আন্দোলনে লোকশিল্পীদের এই অবদান স্বীকার করা প্রয়োজন। আবার সেদিনের গণসংস্কৃতির আন্দোলন, অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবহেলিত সমাজে নানাভাবে বঞ্চিত কৃষিনির্ভর লোকশিল্পীদের বৃহত্তর সমাজ এবং দেশের সামনে তুলে ধরেছিল, লোকশিল্পের গৌরব তাতে বেড়েছিল। এর পেছনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মহৎ অবদান ছিল। এর জন্যে আজ কমিউনিস্টরা গর্ব করতে পারেন। ভুলভ্রান্তি বিচ্যুতি সেদিন যাই-ই থাক, গণসংস্কৃতির আন্দোলন, গণশিল্পীদের জাগরণ এবং লোকশিল্পীদের সম্মান প্রদর্শন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম অবদান। এই অবদানের পেছনে পার্টির সাধারণ সম্পাদক পি সি যোশির নিরলস ও ঐকান্তিক কর্মধারা প্রসন্ন চিত্তে স্বীকার্য। অতীতের যথার্থ স্বীকৃতিতে বর্তমানই গৌরবান্বিত হয়, ভবিষ্যত হয় আলোকিত।

লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ভারতে অন্যান্য রাজ্যের সংবাদের আদান-প্রদানের কোন সুসংগঠিত মাধ্যম নেই, অন্ততঃ আমার জানা নেই। কিন্তু গত ২৫ বৎসর এই কাজে বিশেষ করে গত ১৯ বৎসর এই কাজের সঙ্গে এই রাজ্যে আন্তরিক ভাবে যুক্ত থাকাতে, পশ্চিমবাংলার মাঠে-ঘাটে কাজ, দশসহস্রাধিক লোকশিল্পীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন, তৃণমূলের পঞ্চায়েতে এই কাজ নিয়ে যাবার মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করাতে, অন্যান্য রাজ্যে এই কাজের সূত্রে গতায়াতে, বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকশিল্পীদের বড় বড় সমাবেশে যোগ দেওয়াতে, শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা এবং মতের আদান প্রদানে আমার এই ধারনা হয়েছে লোকশিল্পীদের নিয়ে লোকসংস্কৃতির গণতান্ত্রিক আন্দোলন বর্তমান ভারতে গড়ে তোলা সম্ভব এবং তা গড়ে তোলা প্রয়োজন। সমাজ জীবনে বিশেষ করে কৃষকসমাজে, বিভিন্ন বর্গের শ্রমজীবীসমাজে এই আন্দোলনের উর্বর ভূমি রয়েছে। তৃণমূলের কৃষক সমাজকে, এবং শ্রমজীবী নরনারীকে নিয়ে লোকশিল্পীদের নেতৃত্বে এই আন্দোলনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া এখন প্রয়োজন। ভারতের শাসকশ্রেণী, শোষকশ্রেণী এর প্রতি ইতোমধ্যে তাঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন। 'আপনা উৎসব', সাতটি 'আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন' এর অন্যতম দৃষ্টান্ত। আনন্দের কথা, পুনর্গঠিত 'ভারতীয় গণনাট্য

সংঘ' তাঁদের গৃহীত সাম্প্রতিক কর্মসূচীতে লোকসংস্কৃতি চর্চার গুরুত্বের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। ফলে লোকসংস্কৃতি চর্চা-বিষয়ক বিভিন্ন সংস্থা গড়ে উঠছে।

লোকসংস্কৃতির চর্চায় ভারতের কমিউনিস্টদের অবদান আছে, এখন থেকে নয়, অনেকদিন আগে থেকেই তাঁরা এর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন। আমাদের দেশের বুর্জোয়া-প্রভাবিত প্রচার-মাধ্যমে তার স্থান দেওয়া হয় নি বলে এবিষয়ে অনেকেই অবহিত নন। পি. সি যোশি এর প্রতি দৃষ্টি দিয়েছিলেন ১৯৫৪ সনে। সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার শারদীয় 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ১৯৬০ সনে 'লোককথা (ফোকলোর) অধ্যয়নে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 'পরিচয়', 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় এ বিষয়ক অন্যান্য লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। এ বিষয়ে প্রয়াত অরুণ রায়ের কিছু লেখা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বই আমাদের সামনে রয়েছে, রয়েছে 'মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি' শীর্ষক সদ্য প্রকাশিত প্রয়াত মজুমদারের মূল্যবান একখানি পুস্তক ('মনীষা', ১৯৮৬)। শ্রীরামশঙ্কর চৌধুরী মহাশয়ের প্রকাশিত গ্রন্থ আছে। শ্রীসুধী প্রধান এখন লোকসংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ লিখছেন।

ভারতের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ শীর্ষক পি সি. যোশির একখানি দীর্ঘ চিঠি আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি। চিঠিখানি লোককবি নিবারণ পণ্ডিতের নিকট ১৯৫৪ সনের ২২ ফেব্রুয়ারি লিখিত। প্রয়াত পণ্ডিতের পুত্র শ্রীমান সন্তোষ পণ্ডিতের নিকট থেকে চিঠিখানি পাওয়া যায়। আমাকে দেওয়া চিঠিতে তিনি লিখছেন, "P C Joshi সাহেবের চিঠিটি বাবা '৭৮ সনে নার্সিং হোমে থাকার সময় শান্তিবাবুদের (শান্তিময় গুহদের) দিয়েছিলেন, চিঠিটি ব্যক্তিগত ছিল, মূল চিঠিটির অনুলিপি আপনার কাছে পাঠালাম।" এই চিঠির তারিখ ২০ ১২ ৮১।

পি সি যোশি লোকসঙ্গীত সংগ্রহকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছিলেন এই চিঠির মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। শুধু সংগ্রহ নয়, তিনি লোকগীতের ঐতিহাসিক এবং বর্তমান ভূমিকার সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী অর্থাৎ মার্কসীয় মূল্যায়নের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। লোকসংস্কৃতির মার্কসীয় চর্চায় এর মূল্যবান ভূমিকা আছে। লোকসংস্কৃতি ও সাহিত্য নিয়ে এই প্রজন্মের নবীন গবেষক, তরুন সংগঠক এবং অনুরাগীরা এর মধ্যে নতুন পথের সন্ধান পাবেন, ভারতের কমিউনিস্টদের ভূমিকারও কিছু পরিচয় পাবেন। লোকসঙ্গীত সংগ্রহের একটি নতুন পদ্ধতির মূল্যবান ইংগিত এর মধ্যে রয়েছে। কমরেড যোশি এই চিঠিতে উল্লেখ করেছেন, "আমাদের আদর্শগত সংগ্রামকে

শক্তিশালী করে তোলার জন্যই লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন এবং লোকপ্রিয় করা আবশ্যিক কর্তব্য। দেশের সংস্কৃতি-সম্পন্ন সম্প্রদায়কে যত বেশি লোক-সংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত করা যাবে, ততই প্রকৃত গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। তারা স্বদেশের স্বজনদের চিনতে ও জানতে পারবেন। চিঠিখানি দীর্ঘ, ইংরেজিতে লিখিত। তা' ভাষান্তরিত করেছেন শ্রীমঞ্জু সরকার।

লোকসংস্কৃতির আধুনিক চর্চায় চিঠিখানি একটি দলিল, পথচলার একটি রূপ রেখা। চিঠিখানি পড়া যাক ঃ

সি. পি. আই অফিস,
নং ৫, হাসান বিল্ডিং,
আমিনাবাদ,
লাক্ষ্ণৌ
২২.২ ১৯৫৪

লোককবি নিরাবণ পণ্ডিতের নিকট
কমরেড পি সি. যোশির চিঠির
অনুবাদ

"ভারতের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ

বম্বের পিপলস্ পাবলিশিং হাউস-এর জন্য আমি ভারতের লোকসঙ্গীত সংগ্রহ, সম্পাদনা ও তারপর ইংরাজীতে তর্জমা করে একখানি বই প্রকাশ করতে চাই। এ কাজে আমার অনুপ্রেরণার কারণসমূহ নিচে বর্ণিত হ'ল ঃ—

(১) (ক) আমাদের আদর্শগত সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তোলার জন্য লোকসংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত ও লোকপ্রিয় করে তোলা এখন আবশ্যিক কর্তব্য। দেশের সংস্কৃতিসম্পন্ন সম্প্রদায় যত বেশি লোকসংস্কৃতির প্রতি অনুরক্ত হবেন, ততই তাঁদের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি পাবে। তাঁরা তাঁদের দেশের স্বজনদের চিনতে ও বুঝতে শিখবেন। এইভাবে জাতীয়সংস্কৃতিবিরোধী ও ধর্মসর্বস্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ সম্ভব হবে।

(খ) ভারতের এক ভাষার লোককে অপর ভাষার লোকসঙ্গীত ও কবিতার রসকে গ্রহণ করতে সাহায্য করলে ক্রমে ভাষাগত আঞ্চলিক উগ্র-দাম্ভিকতা হ্রাস পাবে। কারণ অন্য ভাষার সম্ভার তাঁদের মনে সম্ভ্রম সৃষ্টি করতে সাহায্য করবে, অপরাপর ভাষা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রতি তাঁরা

আকৃষ্ট হবেন এবং ভাবের আদান-প্রদান একে অপরকে মানসিক সমৃদ্ধি এনে দেবে। এটাই আমাদের লাভ।

(গ) লোকসঙ্গীত (এবং লোকনৃত্য) বিদেশীদের বেশী আকর্ষণ করে। বিশেষতঃ পশ্চিমী দুনিয়ার প্রগতিশীল জনসাধারণ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের নিকট লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্য অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

(ঘ) ভারতের প্রতি উন্নততর পৃথিবীর আগ্রহ যখন ক্রমশ বৃদ্ধি পাবে, তখন সুসম্পাদিত একটি ভারতীয় লোকসঙ্গীত সংকলন অবশ্যই সমাদৃত হবে।

আমি আন্তরিকভাবে আশা করি আপনি আমার সঙ্গে এই ব্যাপারে একমত হয়ে উক্ত সংকলন প্রকাশে সাহায্য করবেন। কারণ, আপনি তো জানেন যে একক প্রচেষ্টায় এই কাজ সফল হতে পারে না। তাই আপনাদের মত সহমর্মী বন্ধু ও সাথীদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা আমি অবশ্যই পাব – এই ভরসাতেই এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি।

লভ্য পুরাণো সংবাদপত্র-পত্রিকা ও সঙ্গীত-তালিকা থেকে হিন্দি ও ইংরাজীর নির্বাচিত লোকসঙ্গীত প্রতিটি ভাষামণ্ডলীর যোগ্য প্রতিনিধিদের সাগ্রহ সহযোগিতায় আমি সংগ্রহ করেছি।

(২) ঐতিহ্যগত ও আধুনিক

আমি ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক লোকসঙ্গীতও সংগ্রহ করছি। অবশ্য স্বাভাবিক কারণেই আধুনিক লোকসঙ্গীত অপেক্ষা পরম্পরাগত লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা বেশি প্রয়োজন। কেউ কেউ একমাত্র ঐতিহ্যবাহী লোকসঙ্গীত ও লোককবিতা নির্বাচনে আগ্রহী। আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। কেউ যদি লোকায়ত জীবনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান ধ্যান-ধারণাকে লোকাঙ্গিকে ও লোক-বাগধারায় প্রকাশ করেন, আমি তা গ্রহণ করব। অনেক প্রগতিশীল ব্যক্তি এই মতই পোষণ করেন এবং তাঁরা অনুরূপ সৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন। যদি তাঁদের রচিত বা সংগৃহীত সঙ্গীত ও কাব্য খাঁটি লোক-বাগ্‌ধারা ও লোক-আঙ্গিকের অন্তর্ভুক্ত হয়, তা গ্রহণে বাধা থাকবে না। যদিও জানি, এমন সংখ্যা খুবই কম এবং আমার অনুমান তার অধিকাংশ রচনাই রাজনৈতিক শ্লোগানধর্মী হতে পারে।

(৩) বিষয়

প্রতি ভাষামণ্ডলী থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর অন্ততঃ একটা (এবং তা শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয়) এবং সম্ভব হলে একাধিক লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

(ক) কেবলমাত্র লোকসংস্কৃতি ভিত্তিক :—উদাহরণ স্বরূপ আমি দু-একটি উৎকৃষ্ট সংগ্রহের কথা উল্লেখ করছি। যেমন - ঢোল। (ড্রাম) ঢোল মানুষকে অধিক আকৃষ্ট করে এবং এর বাদ্য বাদ্যম। তেমনি অসমীয়াদের অতিপ্রিয় 'বিহুগীত', বা অযোধ্যার 'বীরহা' (viraha) ইত্যাদি।

(খ) দেশ ও প্রকৃতি :—লোকসঙ্গীত, যা দেশের প্রকৃতিপ্রেমের রসে সিঞ্চিত এবং যা জাতীয় গঠনবিন্যাসকে প্রতিফলিত করে। শেষোক্ত সঙ্গীত দুই চরিত্রের - একটা দেশাত্মক সঙ্গীতের আবির্ভাবের পূর্বে এবং অপরটি জাতীয় ভাবপ্রবণতা জাগরিত হবার পর।

প্রাকৃতিক সঙ্গীতগুলি প্রকৃতির প্রতি প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করে এবং অঞ্চল বিশেষের নরনারীদের জীবনকে প্রকৃতি কি ভাবে প্রভাবিত করে, তাকেই ব্যক্ত করে।

(গ) মানুষ ও সামাজিক নীতি :—

এইরূপ লোকসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁদের দুঃখ, কষ্ট ও জীবনের নানা যন্ত্রণা ও আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন, সমাজের নৈতিক সমস্যাবলী সর্বসমক্ষে তুলে ধরেন এবং তার পরিবর্তনের জন্য আর্জি করেন। বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের নিজস্ব গান, সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক, পারিবারিক জীবনের নানা বিষয়, বিবাহ ও জন্ম অর্থাৎ তাঁদের সামগ্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি তাঁদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

(ঘ) প্রেম ও সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত :—

(ঙ) শ্রম :—শ্রমজীবীদের শ্রমলাঘবের জন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁদের কণ্ঠে নিঃসৃত হয় শ্রমগীতি। নানারূপ কায়িক শ্রম—যেমন, লাঙল চষা, শস্য রোপা ও সংগ্রহকালে এবং কাঠ কাটার সময় তাঁদের সমবেত সংগীত।

রাখাল ও মেষপালকদের গান।

* কুলি ও ধাবমান মালবাহকদের গান।
  (যেমন পাল্কি বাহকের গান অনুবাদক)
* মাঝিদের গান।

গানের বিষয় নিবন্ধ থাকবে যথাসম্ভব শ্রম ও শ্রমপ্রক্রিয়া, মেহনতি মানুষের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও জীবানাকাঙ্ক্ষার বর্ণনার ভিত্তিতে।

(চ) দেশাত্মবোধক সঙ্গীত : - ক্রমবর্ধমান জাতীয় চেতনা ও অনুভূতির লোকসংগীত :—

* ১৯২০ সালের আন্দোলনের পূর্ববর্তী অতি জনপ্রিয় ব্রিটিশবিরোধী

লোকসঙ্গীত। ১৯২০ ও ৩০ সালের আন্দোলনের পরবর্তী বহু প্রচলিত লোকসঙ্গীত।

* পুলিশী জুলুম, রাজস্ব বিভাগের অধিকর্তাদের অত্যাচার ইত্যাদি আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত উদাহরণ সম্বলিত লোকসঙ্গীত।

* ১৫ই আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসবিরোধী লোকসঙ্গীত।

(ছ) আন্তর্জাতিক সঙ্গীত :—

পৃথিবীতে যুদ্ধ বাধানোর ক্রমবর্ধমান চেষ্টা এবং সৈন্যসরঞ্জামের অপচেষ্টা, অপরদিকে রাশিয়া, চীন এবং কোরিয়া সংহতির পক্ষে ও ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামাশ্রিত সঙ্গীত।

(৪) অনুবাদ ও পাদটীকা

মূল সঙ্গীত সহ যথাসম্ভব হিন্দি ও ইংরাজীতে ভাষান্তরিত সঙ্গীত আমার প্রয়োজনে লাগবে। পরে আমি তা ইংরাজীতে কাব্যিক গদ্যে প্রয়োগ করব।

অনুগ্রহ করে আপনার প্রেরিত সঙ্গীতের সঙ্গে পাদটীকা ও স্থানীয় প্রচলিত নাম এবং প্রথা উল্লেখ করলে সুবিধা হবে।

প্রতিটি সঙ্গীতের সঙ্গে নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশন করবেন। যথা—

(ক) ঐতিহ্যবাহী অথবা আধুনিক।

(খ) সঙ্গীতরচয়িতা পরিচিত, না অজ্ঞাত।

(গ) লোকসঙ্গীতটির নাম এবং কোন্ লোকরীতি অনুসারে তা রচিত হয়েছে?

(ঘ) লোকসঙ্গীতটি কতটা জনপ্রিয়। কোন সামাজিক পটভূমিকা তাতে প্রতিফলিত হয়েছে?

(ঙ) সেই সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি।

(৫) ব্যবধান-পূরণ

দেখা গেছে প্রকাশিত লোককাব্য অধিকাংশতঃ প্রকৃতি ও প্রেমের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। খুব কম সংখ্যক লোককাব্য বা কবিতাই শ্রমজীবী মানুষের জীবনসংগ্রাম অবলম্বনে রচিত। রাজনীতিকে ইঙ্গিতবহ কাব্য বা কবিতা ও কম এবং রচনার দিক দিয়ে তা দুর্বল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনার কাছে আমার অনুরোধ, আপনি শ্রম, সমাজ ও রাজনীতিবিষয়ক লোককাব্য বা কবিতা সংগ্রহে বেশী সচেষ্ট হন। অবশ্য অন্যান্য সব বিষয়কে বাদ দিয়ে নয়।

(৬) কিস্তি অনুযায়ী পাঠান এবং শীঘ্র পাঠান।

আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ এই যে, সমস্ত লোকসঙ্গীত ও কাব্যসংগ্রহ একত্রে পাঠাতে যদি দেরি হয় (এবং তা স্বাভাবিক), তবে যখনই যা আপনার সংগ্রহে আসে, তাই পাঠাতে আরম্ভ করুন। এতে আমার অনেক উপকার হবে।

মে মাসের গোড়ার দিকে আমাকে উল্লিখিত রচনাদির পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের নিকট দাখিল করতে হবে। সুতরাং আপনি মার্চের মধ্যেই আপনার সংগ্রহ পাঠান। তারও আগে যদি পাঠাতে পারেন, তবে খুবই ভাল হয়।"

[অনুবাদ : মঞ্জু সরকার ২৭ ৮ ৮৯]

পি সি যোশি কোন রাজ্যের বা অঞ্চলের নয়, সকল রাজ্য এবং অঞ্চল নিয়ে মহান ও চিত্তাকর্ষক যে-ভারত, তার লোকসঙ্গীতের সংগ্রহ এবং সংকলনের দেশপ্রেমিক ও সমাজতাত্ত্বিক এবং বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ এখন থেকে ৩৫ বৎসর পূর্বে ১৯৫৪ সনে গ্রহণ করেছিলেন। ভারতবোধ বিশ্ববোধ থেকে এই কাজ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তিনি আরম্ভ করেছিলেন।

"জাতীয় সংস্কৃতি বিরোধী এবং ধর্ম সর্বস্ববাদী শক্তির বিরুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ", "ভাষাগত আঞ্চলিক দাম্ভিকতা হ্রাস", "পশ্চিমী দুনিয়ার প্রগতিশীল জনসাধারণ ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের নিকট" ভারতকে চিত্তাকর্ষক করার জন্য তিনি এই কাজে নেমেছিলেন। এখনও আমাদের কাছে তিনি এই কাজের পথপ্রদর্শক হয়ে আছেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তিনি অন্যতম নেতা, গণসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাদাতা, নতুন আবেদনে পদ্ধতিতে লোকসংস্কৃতি চর্চার পথ প্রদর্শক। তাঁকে আজ ভক্তিভরে, বিনম্র চিত্তে শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও অ-শাস্ত্রীয় আধুনিক স্বরমণ্ডল

সৌমেন গুহ

কয়েকশ' বছর আগেও, দক্ষিণ ভারতকে বাদ দিলে, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চার আশ্রয়স্থল ছিলো উত্তর ভারতের মুসলিম দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা। আমরা স্পষ্ট জানি না, গোঁড়া হিন্দু সঙ্গীত কেমন করে পরিবেশন করা হতো তখন। এটা ঠিক সাম্প্রদায়িক অনুভূতির কথা নয়। প্রশ্নটা হলো, মুঘল আমলে হিন্দু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চাটি নিঃসন্দেহে বহু জল ঘোলা করে 'হিন্দুস্থানী সঙ্গীত' হয়ে উঠেছিলো। চিরায়ত সংস্কৃত শ্লোক নির্ভর সঙ্গীততত্ত্ব আরবীয় সঙ্গীতের মিশ্রণে খারিজ করেছিলো প্রাচীন ভারতীয় অবয়ব বা চরিত্রটিকেই।

আধুনিক কিছু সঙ্গীততাত্ত্বিক অবশ্য এ পরিবর্তনটাকে অতিসরলীকরণ করে থাকেন। তাঁদের মতে মধ্যযুগীয় ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছিলো মুঘল আমলে। আর এই নতুন ধারা, তাঁদের মতে, সমৃদ্ধ করেছে সারেকী ঐতিহ্যকেই।[১]

এ বিতর্কটা খুব জোরালো হয়ে ওঠার কারণ আমি দেখি না। দরবারী সংস্কৃতি নিঃসন্দেহে কাঠামোগতভাবে বিরাট পরিবর্তন এনেছিলেন ভারতীয় সঙ্গীতে। এখানে আমরা তা' নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি না। সুনির্দিষ্টভাবে স্কেল সিস্টেম বা স্বরমণ্ডলই এখানে আলোচ্য শুধু।

আধুনিক পরম্পরা

আমাদের কাছে 'পরম্পরা' শব্দটি প্রায় 'ঘরানা'-র সমার্থক! 'ঘরানা' যে বিশেষ গায়ন ও বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে বোঝায়—'পরম্পরা' মোটেই তা' নয়।[২] শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে 'পরম্পরা' বলতে অন্ততপক্ষে তিনটি কাঠামোগত বিষয়ের ধারাবাহিকতাকে বোঝানো উচিত মনে করি—প্রথমত: স্কেল সিস্টেম বা স্বরমণ্ডল (প্রাচীন ভারতে যাকে 'গ্রাম' বলা হতো),[৩]

দ্বিতীয়ত: রাগ বা বিশেষ স্বর-সজ্জা;

তৃতীয়ত: গায়ন বা পরিবেশন পদ্ধতি।

আধুনিক সঙ্গীত আলোচকরা খুব স্পষ্ট আমাদের জানাচ্ছেন না, এই তিনটি বিষয়ে প্রাচীন থেকে মধ্য আর মধ্য থেকে আধুনিক যুগে কিভাবে

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে পরিবর্তনগুলি এসেছে। এঁদের আলোচনায় তৃতীয় বিষয়টি নিয়ে যতোখানি মাথাব্যথা, দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে তারও কম—আর প্রথম বিষয়টি নিয়ে শুধু নৈঃশব্দ্য। একটা উদাহরণ দেয়া যাক—রাগ হিসেবে 'মালবকৈশিক', চলিত কথায় 'মালকোশ' নিঃসন্দেহে অতি উপযুক্ত হবে। শমোল্লেখের দিক থেকে অতি প্রাচীন রাগ এটি। এবং অবশ্যই মিশ্রণে জন্ম। এ রাগটিকে আমাদের 'পরম্পরা' বিষয়ে আলোচনায় আনতে ওপরে তিনটি পদক্ষেপ ব্যবহার করছি। আর অভ্যস্ত পাঠকের সুবিধের জন্যে তৃতীয় বিষয়টি থেকে শুরু করছি।

প্রথমত: শাস্ত্রীয় ঢঙে বা 'খেয়াল' হিসেবে বর্তমান 'মালবকৈশিক' কি চিরায়ত গায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করে? ধরুন—আলাপ বা বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত লয়ের ফর্মুলায় পরিবেশনের বাইরে এখন আর কিছু ভাবতে পারি? এ কথা অবশ্য সব রাগেই প্রযোজ্য। এখন কথাটা হলো—এই ফর্মুলা পরিবেশনের 'পরম্পরা' নিঃসন্দেহে আধুনিক ঘটনা। অতীতে রাগসঙ্গীত তিন রকম 'যতি'-সম্পন্ন ছিলো—সমা, স্রোতোগতা ও গোপুচ্ছা।[৪] বিলম্বিত-মধ্য-দ্রুত লয়ের গায়কী একটি যতি মাত্র। একই লয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত গাইলে, বর্তমানে অবাক লাগবে হিন্দুস্থানী ঘরাণায়। আর, দ্রুত লয় থেকে শুরু করে বিলম্বিতে শেষ করলে তো, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের গোঁড়া মঞ্চে খুনখারাপি হয়ে যাবে!

কেন?

বিলম্বিত-মধ্য-দ্রুত এই যতির বাইরে, গত কয়েক শতকে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে আর কোনো পরম্পরা নেই বলে, অর্থাৎ একটি রাগ, ধরা যাক 'মালবকৈশিক', একটি মাত্র ঘটাইলেই, অর্থাৎ একটি মাত্র যতিতেই আমরা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। এই আধুনিক পরম্পরার উৎস সম্ভবত সুলতানী বা মুঘল আমলে।

দ্বিতীয়ত: স্বরসজ্জা দিক থেকে অতীতের 'মালবকৈশিক' সম্পূর্ণ জাতির রাগ।[৫] অর্থাৎ সাতটি স্বরই ব্যবহার হতো। প্রায় বিতর্কাতীতভাবে—সা, রে, গা, মা, পা, ধা, নি এই সপ্তস্বরভিত্তিক এই রাগে, কোনো বিকৃত স্বর ছিলো না, একমাত্র কাকলি-নিষাদ ছাড়া। তাই, পঞ্চস্বরের বর্তমান 'মালবকৈশিক' সম্পূর্ণ সরে গেছে অতীতের অবয়ব বা কাঠামো থেকে। স্পষ্ট বলা যায় - পঞ্চস্বরের 'মালবকৈশিক' অন্য রাগ, একটি আধুনিক পরম্পরা মাত্র। কবে শুরু হয়েছে আমরা জানি না।

তৃতীয়ত : যদি বর্তমানেও 'মালবকৈশিক' রাগের স্বর-সজ্জা ঠিক আগের মতোই থাকতো, তা হলেও অন্য রকম শোনাতো। কারণ, প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সপ্তস্বর এখনকার সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি থেকে আলাদা ছিলো! এতোবড়ো যে পরিবর্তনটা ঘটলো, বেশীর ভাগ আলোচকই খেয়াল করেন না।

যা দাঁড়ালো—'মালবকৈশিক' এখন যেভাবেই পরিবেশন করা হোক না কেন, এটা প্রাচীন ও মধ্যযুগের 'মালবকৈশিক' মোটেই নয়। শুধু নামে মিল আছে।

তাই আধুনিক পরম্পরার কথা বলছিলাম। কোনও একটা সময়, পুরো স্বরমণ্ডল বা সপ্তস্বর বা স্কেল সিস্টেম ভেঙে উত্তর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত একটা ধারা তৈরী করেছিলো। যা আজও চলছে।

বর্তমান স্বরমণ্ডল

পাশ্চাত্য পিয়ানোর যে কোনো 'ডায়াটোনিক মেজর স্কেল, বাজালেই মনে হবে, সা-রে-গা-মা বাজানো হচ্ছে। এ মিল কি আকস্মিক? মোটেই নয়। আসলে এখন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে সপ্তস্বর যা ব্যবহার হয়, তা হুবহু পাশ্চাত্য ডায়াটোনিক স্কেল। এবং সরল করে বললে, মেজর মোড়ে (Diatonic scale in Major mode)।

প্রধানত বৃটিশ আমলে এই পাশ্চাত্য স্কেল বা স্বরমণ্ডল গ্রহণের কাজটি সম্পূর্ণ হয়, আর নির্দিষ্ট ব্যবহারিক রূপ পায়। উইলিয়াম হোন্সের মতো সাহেবরা ছাড়াও, অনেক ভারতীয় সঙ্গীততাত্ত্বিকও এই স্বরমণ্ডলকে মেনে নেয়। গত শতকে সরাসরি পাশ্চাত্য স্বরলিপি পদ্ধতি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়।[৬] তাঁর দেওয়া তুলনামূলক পাশ্চাত্য ও ভারতীয় স্বরমণ্ডল, আজও একেবারে একই আছে। যেমন—

পাশ্চাত্য	C	D	E	F	G	A	B
ভারতীয়	ষড়্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ

আর এই সাযুজ্যই বর্তমান ভারতীয় স্বরমণ্ডলকে একেবারে 'অ-ভারতীয়' করে তুলেছে। অর্থাৎ, আর কোনো উপায় নেই, ভারতীয় শাস্ত্রীয় রাগগুলি এই স্বরমণ্ডলে গাওয়ার বা পরিবেশন করার, চিরায়ত পদ্ধতিতে। খুব স্বাভাবিকভাবেই পিয়ানো থেকে হার্মোনিয়াম জাতীয় পাশ্চাত্য টেম্পার্ড যন্ত্রগুলি সহযোগী হিসেবে উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। পিয়ানো ব্যয়বহুল আর

বাজানো কঠিন। হার্মোনিয়ামের তাই একাধিপত্য। দামে সস্তা, সবল ও বহনযোগ্য।

এই স্বরমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য হলো, পাশ্চাত্য স্কেলের মতো, ষড্‌জ-ঋষভ, ঋষভ-গান্ধার, মধ্যম-পঞ্চম, পঞ্চম-ধৈবত, ধৈবত নিষাদ এই পাঁচটি পূর্ণ স্তরের (tone) ব্যবধান। এবং গান্ধার-মধ্যম ও নিষাদ-ষড্‌জ এই দু'টি অর্ধ স্তরের (semi-tone) ব্যবধান। এই ব্যবধান দিয়েই আমরা আধুনিক স্বরমণ্ডলে প্রাচীন রাগ পরিবেশনের অনুপযুক্ততা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্বরমণ্ডল

নির্দিষ্ট করে সময়কালটা বলা না গেলেও, আনুমানিক দু'হাজার বছর আগে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্বরমণ্ডল নিঃসন্দেহে ভরতের 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থের অনুগত ছিলো। সুবৃহৎ এই গ্রন্থ, মনে হয়েছে, পূর্বোক্ত বিভিন্ন সঙ্গীতশাস্ত্রকে এক জায়গায় সংকলিত করেছে। এর প্রায় বারো-তেরো শত বছর পর, দ্বিতীয় অতিবিখ্যাত গ্রন্থ শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীতরত্নাকর'। এর রচনাকাল ধরা হয় খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতক, অর্থাৎ উত্তর ভারতে সুলতানী আমলে, যখন দক্ষিণ ভারতে শিল্প-সংস্কৃতি অধিকতর স্বাধীনতায় বিকশিত হচ্ছিলো।

এই দু'টি গ্রন্থকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রতিনিধিত্বমূলক আকর বলে ধরে নেওয়ার সুবিধে অনেক। এদের মধ্যবর্তী ও সামান্য পরবর্তী অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সঙ্গীতের মূল তাত্ত্বিক প্রতিপাদ্যে যদি সামান্য ইতরবিশেষ হয়েও থাকে—স্বরমণ্ডলের ব্যবহার কিন্তু 'নাট্যশাস্ত্র' থেকে 'সঙ্গীতরত্নাকর' পর্যন্ত একই ছিলো।

এই স্বরমণ্ডলের প্রধান ভিত্তিই ছিলো 'শ্রুতি' বা সূক্ষ্ম স্বর (microtone)। সাতটি স্বরের একটি সপ্তকে ছিলো বাইশটি শ্রুতি। সাতটি স্বরের অবস্থান ভেদে খুব অতীতে, নাট্যশাস্ত্রের আগে, তিনটি স্কেল বা স্বরমণ্ডল ব্যবহার হতো—ষড্‌জ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম।

ভরতের নাট্যশাস্ত্রের সময়ই গান্ধার গ্রাম অপ্রচলিত হয়ে গেছে। মধ্যযুগে আমরা অনুমান করতে পারি, মধ্যম গ্রামও অপ্রচলিত হয়ে গেছে।

মধ্যম গ্রাম অবশ্য এখানে বিবেচনায় এনে লাভ নেই। কারণ, বর্তমান ডায়াটোনিক মেজর স্কেল তাতেও ন্যায্যতা পায় না। যাই হোক, ষড্‌জ গ্রামে স্বর সাতটির অবস্থান ছিলো এ রকম[৭]

	ষড্জ	ঋষভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিষাদ	ষড্জ
শ্রুতিব্যবধান		৩	২	৪	৪	৩	২	৪

যদিও শ্রুতির মান সম্পর্কে বিতর্কে আমি ৪ শ্রুতিকে পূর্ণ স্বর ব্যবধান ধরার সমর্থক, তবুও এখানে সে প্রসঙ্গ বা আনলেও চলে। কারণ স্বর সাতটির পরস্পরের মধ্যে তুলনামূলক ব্যবধানই এখানে বিবেচ্য।

লক্ষ্যণীয়—

গান্ধার—মধ্যম মধ্যম – পঞ্চম নিষাদ – ষড্জ	এই তিনটি স্বরব্যবধান সবচেয়ে বেশী ; ধরা যাক ১ ভাগ করে।
ষড্জ – ঋষভ পঞ্চম—ধৈবত	দু'টির স্বরব্যবধান আগের তিনটির $\frac{৩}{৪}$ ভাগ,
ঋষভ—গান্ধার ধৈবত—নিষাদ	এ দু'টি স্বরব্যবধান প্রথম তিনটির $\frac{১}{২}$ ভাগ।

এই হলো প্রাচীন ও মধ্য যুগে ভারতের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্বরমণ্ডলের চরিত্র।

বর্তমান স্বরমণ্ডলের তুলনা

বর্তমান স্বরমণ্ডলের সাথে প্রাচীনের সব থেকে বড়ো অমিল হলো—ডায়াটোনিক মেজর স্কেলে কখনোই তিন রকম স্বরব্যবধান হতে পারে না। হয় মাত্র দু'রকম—পূর্ণ স্বর আর অর্ধ-স্বর। বর্তমান স্বরমণ্ডলে $\frac{৩}{৪}$ ভাগ স্বরব্যবধানের অস্তিত্বই নেই।

দ্বিতীয়তঃ সাতটি স্বরে অবস্থান অবশ্যই প্রাচীন ও বর্তমান স্বরমণ্ডলে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন :—

প্রাচীন বর্তমান

সা—সা

½ স্বরব্যবধান { বে / গা —বে

মা —গা / মা } ½ স্বরব্যবধান

পা—পা

½ স্বরব্যবধান { ধা / ধা —নি

মা —নি / সা } ½ স্বরব্যবধান

দু'টি স্বরমণ্ডলের ষড্‌জ (সা) বা টৌনিক (tonic) একই ধরে নিলে মধ্যম (মা) দু'টির মিল থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু পঞ্চম (পা) দুটির মিল কিন্তু অতোটা স্বাভাবিক নয়। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কিছু হিসেবের গরমিল হয়—৪ শ্রুতিকে পূর্ণস্বর ও ২ শ্রুতিকে অর্ধ-স্বর ব্যবধান ধরলে। কারণ, তখন বর্তমান স্কেল বা স্বরমণ্ডলের শ্রুতি-সংখ্যা দাঁড়ায় ২৪টি। যাই হোক্, বর্তমানের ষড্‌জ, মধ্যম ও পঞ্চম যদি রা প্রাচীন বা চিরায়ত ভারতীয় শাস্ত্রীয় স্বরমণ্ডলের সাথে আপাতভাবে এক হয় – আদ্য কোনো স্বরের ক্ষেত্রে তা বলা যাবে না।

তা' হলে আমাদের পূর্বোক্ত উদাহরণ, 'মালবকৈশিক' রাগটির শুদ্ধ স্বরগুলি ছিলো বর্তমান থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অতীতের প্রতিবাদ

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যে বর্তমানের স্বরমণ্ডল বা ডায়াটোনিক মেজর স্কেলে সম্ভব নয়, এ সম্বন্ধে বেশ কয়েকজন সঙ্গীততাত্ত্বিক এ শতকের গোড়া থেকে সচেতন হতে থাকেন।

এ সচেতনার উল্লেখ্য পূর্ব-পদক্ষেপ হলো– গত শতকে ১৮৮৬ সাল নাগাদ পাথুরিয়াঘাটার শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 'শ্রুতি-বীণা' পরীক্ষা।[৮] এ পরীক্ষাটির বৈজ্ঞানিক মাপজোখের দায়িত্বে ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী এ জে এলিস। এই বিজ্ঞানীর হাতে শ্রুতি-বীণা পরীক্ষার খুঁটিনাটি

নথিভুক্ত হয়। কিন্তু শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর বর্তমানের ডায়াটোনিক স্কেলের ঠিক সমালোচনা করার জন্যে এ পরীক্ষার ব্যবস্থা করেননি। তাঁর উদ্দেশ্যটা মূলত ছিলো, প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রে 'শ্রুতি' যেমনভাবে বলা হয়েছে, তার ব্যবহারিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তবে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো তিনি শ্রুতি বস্তুটিকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দেননি।

বর্তমান ডায়াটোনিক মেজর স্কেলের শক্তপোক্ত প্রতিবাদী ছিলেন ই ক্লিমেণ্ট্স্। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের কর্মী ক্লিমেণ্ট্স ছিলেন অ-সাধারণ সঙ্গীততাত্ত্বিক। তাঁর তাত্ত্বিক গ্রন্থটি প্রকাশ পায় এ শতকের গোড়ার দিকে।[৯] প্রাচীন ভারতীয় শ্রুতিভিত্তিক সপ্তস্বরকে ক্লিমেণ্ট্স পুনর্গঠিত পাশ্চাত্য স্বরলিপিতে প্রকাশ করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তিনি টেম্পার্ড হার্মোনিয়ামকে সমালোচনা করেন।

ই ক্লিমেণ্টসের সমসাময়িক আর এক প্রতিবাদী কে বি দেবল। দেবলের গবেষণা অবশ্য ক্লিমেণ্ট্সের গ্রন্থের আগেই প্রকাশিত।[১০] দেবল নতুন এক হার্মোনিয়াম তৈরী করার পথিকৃৎ—যাকে চলতি কথায় বলা যায় 'শ্রুতি-হার্মোনিয়াম'। এই যন্ত্রে ভারতীয় বাইশ শ্রুতি ব্যবহার করা যেতো। যন্ত্রটি লণ্ডনের মুর এ্যাণ্ড মুর কোম্পানী তৈরী করতো, আর ভারতে এজেণ্ট ছিলো বোম্বের এস রোজ কোম্পানী।

ক্লিমেণ্টস্ ও দেবল সংগঠিত করেছিলেন পুনার 'ফিলহার্মোনিক সোসাইটি অফ্ ওয়েস্টার্ণ ইণ্ডিয়া'। এই একটি সংগঠনের মাধ্যমে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই, ভারতীয় স্বরমণ্ডলের বিশুদ্ধতা বা ভারতীয়ত্ব রক্ষার চেষ্টা চলতো অতি আধুনিক পদ্ধতিতে।[১১] মহারাষ্ট্রে এমনই সময়ে বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডের উত্থান। ভাতখণ্ডের সঙ্গীততত্ত্ব তখন অনেকে সমালোচনা করতেন।

ভারতীয় সঙ্গীতের স্বরমণ্ডলের ব্যাপারে তখন ভাতখণ্ডের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যেই ক্লিমেণ্টস্, দেবল ইত্যাদিরা নেমেছেন। হিন্দুস্তানী সঙ্গীতকে ডায়াটোনিক মেজর স্কেলে খাপখাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা ভাতখণ্ডের হাতে সম্পূর্ণ হয়, প্রতিবাদ সত্ত্বেও।[১২]

একটু পিছিয়ে গিয়ে, বাংলার অন্যতম সঙ্গীততাত্ত্বিক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। বিগত ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত 'সঙ্গীতসার' গ্রন্থে তিনি বর্তমান ডায়াটোনিক মেজর স্কেলের বিরুদ্ধে লিখেছেন। কিন্তু, দুঃখজনক হলো—প্রাচীন স্বরমণ্ডলকে শুদ্ধ জেনেও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী অবশেষে বর্তমানেরটাই গ্রহণ করেছেন।

ফলশ্রুতি

বর্তমানের ডায়াটোনিক মেজর স্কেল এখন আর নিছক ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের স্বরমণ্ডল নয়—এর ব্যাপ্তি প্রায় অভিজাত সঙ্গীতেরই আনাচে-কানাচে। খুব ভেতরের দিকের লোকগীতির সহযোগী স্বরমণ্ডল এখনও এর থাবার বাইরে টিকে আছে হয়তো। বাকী সমস্ত কিছুর ওপর দিয়ে পাশ্চাত্যের রোলার চলে গেছে।

এ ক্ষতিটা করেছে ভারতে ব্রিটিশ শাসন। দরবারী সঙ্গীত থেকে শিক্ষিত বাবুয়ানায় এর বিবর্তন। এখন বাংলা কীর্তনের সাথে হার্মোনিয়াম! রেডিও-টিভির 'লোকগীতি' এখন হার্মোনিয়াম ছাড়া চলে না। হার্মোনিয়াম এখানে নিমিত্ত মাত্র। আসল কথা হলো পাশ্চাত্য স্বরমণ্ডলের একাধিপত্য। প্রশ্ন হলো সত্যিই কি এটা একটা ক্ষতি?

বিষয়টাকে ঘুরিয়ে দেখা যাক। সত্যি কি 'মালবকৈশিক' বা অন্য কোনো উত্তর ভারতীয় রাগসঙ্গীত আমরা যা শুনি—তা' ভারতীয়? কেন ভারতীয়? ভারতের আধুনিক পরম্পরাগতভাবে এটা পেয়েছি বলে? না কি অভিজাত সম্প্রদায় এটাকে 'ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত' নামকরণ করেছে বলে?

আধুনিক স্বরমণ্ডল ব্যবহার করে, আধুনিক গায়ন পদ্ধতিতে যে অভিজাত সঙ্গীত বা 'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত' পরিবেশন করা হয়—তা হতেই পারে ভারতীয়। ভারতীয় মাটিতে তার লালন পালন, শ্রীবৃদ্ধি ও পুষ্টি।

কিন্তু অবশ্যই তা' ভারতীয় 'শাস্ত্রীয়' সঙ্গীত নয়। কারণ গত একশ' বছর ধরে আধুনিক কিছু পণ্ডিতের সঙ্গীততত্ত্ব নিশ্চয় শাস্ত্র নয়।

সব থেকে লজ্জার বিষয় হলো—বিদেশের দরবারে এই সম্পূর্ণ অ-শাস্ত্রীয় বস্তু পরিবেশিত হচ্ছে ভারতের চিরায়ত সাঙ্গীতিক ধারার নাম করে। যে ধ্যানগম্ভীর রাগচিত্রমালা আমরা কল্পনা করি—সে রাগরাগিণী আমরা কিন্তু শুনি না, শোনাতে পারি না। নতুন করে সবটুকু না ভাবলে—এ আক্ষেপটা চিরকাল থাকবে।

টীকা ও নির্দেশিকা

১ উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজ্যেশ্বর মিত্রের উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত (ওরিয়েন্ট লংম্যান, নয়াদিল্লী, ১৯৭০) গ্রন্থটির আলোচনা। সুলতানী আমলে দক্ষিণ ভারতে শার্ঙ্গদেবের 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের

রচনাকালটুকুই লেখক লক্ষ্য করেছেন—কাঠামোগত দ্বন্দ্বকে নয়। যেমন—'সঙ্গীতের দিক থেকে সুলতানী আমলের একটি বিশেষত্ব আছে, কেননা এই যুগেই এমন একটি সঙ্গীতের ঐতিহ্য স্থাপিত হয়েছিল যেটি—মুঘলযুগে একটি স্থায়ী রূপ প্রদান করতে সক্ষম হয়।' (পৃ ৪৬)

২ 'পরম্পরা' একটি সংস্কৃত শব্দ, যার একটি অর্থ হলো ধারাবাহিকতা। এবং তা' ছাড়া পদ্ধতিও বোঝায়। 'ঘরানা' শব্দটির ব্যবহারিক অর্থ পরিবার বা গোষ্ঠী, এবং এটি সংস্কৃত শব্দও নয়।' বাংলায় তো 'ঘরানা' শব্দের অভিধানিক অর্থ করা হয়েছে উচ্চবংশীয় ইত্যাদি।

৩ বর্তমানের স-র-গ-ম ইত্যাদির প্রতিটি একককে প্রাচীনকালে 'স্বর' বলা হতো। স্বরগুলি তুলনামূলক অবস্থানকে বলা হতো 'গ্রাম'। দ্রষ্টব্য : নাট্যশাস্ত্র' ১৮ ২১ ইত্যাদি।

৪ নাট্যশাস্ত্র, ৩১ ৩৭১।

৫. দ্রষ্টব্য : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, রাগ ও রূপ, পূর্বভাগ, রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩৫।

৬ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতসূত্রসার, প্রথম ভাগ, এ. মুখার্জী, কলিকাতা, ১৯৭৫ (পুনর্মুদ্রণ)।

৭ নাট্যশাস্ত্র, ১৮ ২৫-২৬ এবং সঙ্গীত রত্নাকর, ১ ৩. ১৩-১৬।

৮ এই পরীক্ষাটির পূর্ণ টেকনিক্যাল বিবরণ দ্রষ্টব্য : সি. আর দে, দ্য মিউজিক এ্যাণ্ড মিউজিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টস্ অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ডেকান, প্রথম প্রকাশ ১৮৯১, বি আর পাব্লিশিং, দিল্লী, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৬২-১৭৩।

৯ ই ক্লিমেণ্টস্, ইনট্রোডাক্শান টু দ্য স্টাডি অফ্ ইণ্ডিয়ান মিউজিক, গৌরব পাব্লিকেশন, নয়াদিল্লী, ১৯৮১ (পুনর্মুদ্রন)। এ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন আনন্দ কুমারস্বামী, গ্রন্থকারকে সমর্থন করে।

১০ কে বি দেবল, দ্য হিন্দু মিউজিক্যাল স্কেল এ্যাণ্ড দ্য টোয়েন্টি-টু শ্রুতিজ, পুনা, ১৯১০।

১১ রাগস্ অফ্ হিন্দুস্থান, ফিল্হার্মোনিক সোসাইটি অফ্ ওয়েস্টার্ন ইণ্ডিয়া, পুনা। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ১৯১৮, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯২১ এবং তৃতীয় খণ্ড ১৯২৩ সালে প্রকাশিত। এই সংগঠনটিতে চেয়ারম্যান ক্লিমেণ্টস্ এবং দেবল অনারারী সেক্রেটারী ছিলেন।

১২ পূর্বোক্ত গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫-৩৮।

আফ্রিকার কবিতা

[১৯৪৭-এ মাদাগাস্কারে শুরু ঔপনিবেশিক-বিরোধী যুদ্ধ, যা এখনো দক্ষিণ আফ্রিকাতে চলছে, নাইজিরিয়া ও অ্যাঙ্গোলার গৃহযুদ্ধ, অনেক নৃশংস একনায়কতন্ত্রের উত্থান,—যার কিছু আজো জাঁকিয়ে বসছে, দেশপ্রেমী নেতা ও লেখকদের জেলে আটক করা, এই সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত হচ্ছে আজকের আফ্রিকার কবিতা। এক বিশাল ক্ষয়ক্ষতির মধ্যে আশা আকাঙ্ক্ষা ভালোবাসা ক্রোধ ও আবিষ্কারের তাগিদে লিখে চলেছেন আফ্রিকার কবিরা। স্মরণাতীত কালের আফ্রিকার ঐতিহ্যকে মেনেও সাহিত্যকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে, নতুন যৌবনের উদ্দীপনায় নতুন নতুন দিগন্ত-উন্মোচনের কাজে ওরা নেমে পড়েছেন।

বিশালায়তন মহাদেশের অগাধ ও সতত জায়মান কাব্যরত্নভাণ্ডার থেকে বিংশশতাব্দীজাত কয়েকজন মাত্র কবির কবিতা এই স্বল্পপরিসর বিধৃত হচ্ছে।

কোফি আউনরের ইউয়ে স্রোত্র, ওকোত প্‌বিতকের লুও সংগীত এগুলো পরে কবিদের হাতে ইংরেজি কণ্ঠস্বর পেয়েছে। সেনেগাল বেনিন ও ক্যামেরুনের কবিরা ফরাসি ভাষা পরিত্যাগ করার তাগিদ অনুভব করেনি।

অ্যাঙ্গোলার প্রতিরোধ সংগ্রামে যোদ্ধা, যোদ্ধা কবি, কবিতা, কাব্যসংগীত সমস্ত মিশে গিয়ে নিরক্ষরতার বাঁধ ভেঙে জনজোয়ারে মিশে গিয়েছিল। সেঙ্ঘরের মহাদেশীয় ব্যবধান অতিক্রমী কবিতা, ওকারার সমসময়ের সাহিত্যের কলাকৈবল্য ও ইংরেজি ভাষা বিষয়ে সচেতন কবিতা, নেটোর ঋজু সবল কবিতা, দিপোকো ও চেনে-কোকারের আবেগদীপ্ত কবিতা, জোফ্রে রোশার সহযোদ্ধাদের জন্য কষ্ট ও শত্রুর জন্যে ক্রোধের কবিতা এইরকম নানা বিষয়ের টানাপোড়েন নিয়ে উপস্থাপিত হল এই কবিতাগুচ্ছ, যা আজকের আফ্রিকার, এবং যা আজকের পৃথিবীর যে কোনো ভাষার মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে পারে।—অনুবাদক]

লিওপোল্ড সেডার সেঙ্ঘর

জন্ম ১৯০৬ / সেনেগাল

মুখোশের প্রতি প্রার্থনা

কালো মুখোশ, লাল মুখোশ, তোমরা কালো আর শাদা মুখোশ,
চৌকো মুখোশ যার মধ্য দিয়ে আত্মা শ্বাস নেয়,
তোমাদের আমি নীরবে অভিবাদন করি।
আর তোমাকেও, নৃসিংহ আদিপিতা আমার।
তুমি এ জায়গাটা পাহারা দাও, যেখানে মেয়েলি অট্টহাসির,
মরণশীল মুচকি হাসির প্রবেশ নিষেধ।
তুমি অনন্তের বায়ুকে শোধন করো, এখানে যেখানটায় আমি
পিতৃপুরুষের বায়ুতে শ্বাস নিই।
অনাবিল মুখের মুখোশ, নিটোল নিভাঁজ,
তুমি তৈরি করেছ এই রূপ, এই মুখশ্রী আমার যা ঝুঁকে পড়ে
শাদা কাগজের বেদীর ওপর।
তোমার রূপের দোহাই, আমার কথা শোনো!
এখন যখন স্বৈরাচারের আফ্রিকা মুমূর্ষু—এ হচ্ছে এক দুঃখী
রাজকন্যের যন্ত্রণা
ইউরোপের রাজকন্যের মত, যার সাথে তার নাড়ীর যোগ—
অপলক চোখ রাখো তোমার সন্তানদের ওপর যাদের ডাক পড়েছে
যারা জীবন উৎসর্গ করে যেমন দরিদ্র তার শেষ কাপড়টা
যাতে এখন থেকে আমরা চেচাতে পারি 'এখানে' পৃথিবীর পুনর্জন্মে
শাদা ময়দা মাখার জন্যে জরুরী খমির হয়ে।
কেননা কেইবা আর যন্ত্রপাতি আর কামানের হাতে খুন
এই দুনিয়াটাকে ছন্দ শেখাবে?
কেননা কেইবা উচ্ছ্রিত করবে উল্লাসধ্বনি, যা মৃত আর
প্রাজ্ঞদের জাগিয়ে তুলবে এক নতুন ভোরে?
বলো কেইবা এই ভগ্নহৃদয় মানুষগুলোকে ফিরিয়ে দিতে পারবে
জীবনের স্মৃতি?
ওরা আমাদের বলে তুলোটমাথা, কফিমানুষ, তেলতেলে মানুষ,
ওরা আমাদের বলে মৃত্যুর লোকজন।
কিন্তু আমরা হচ্ছি নাচের লোক যাদের পা শক্তিশালী হয়
যখন ওগুলো শক্ত মাটিতে আঘাত করে।

গ্যাব্রিয়েল ওকারা

জন্ম ১৯২১ / নাইজিরিয়া

আধিয়াম্বো

আমি অনেকগুলো গলার স্বর শুনি
যেমন লোকে বলে একটা পাগল শোনে,
আমি গাছেদের কথা বলতে শুনি
যেমন লোকে বলে একজন কবিরাজ শোনে।

হতে পারে আমি একটা বদ্ধপাগল,
আমি একজন কবিরাজ।

হতে পারে আমি পাগল,
কেননা গলার স্বরগুলো আমাকে লোভ দেখাচ্ছে,
নিশুতরাতের চাঁদ আর
ডেস্কের স্তব্ধতা থেকে আমাকে ওস্কাচ্ছে
ঢেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় হেঁটে সমুদ্র পেরোতে।

হতে পারে আমি একজন কবিরাজ
যে উদ্ভিদরসের বাক্যালাপ শুনছে,
গাছের আড়াল থেকে দেখছে,
কিন্তু হারিয়েছে তার
আবাহনী শক্তি।

কিন্তু কণ্ঠস্বর আর গাছেরা
এখন নাম বলছে আর
স্তব্ধতা খোদাই একটি শরীর
হেঁটে পেরোচ্ছে চাঁদমুখ,
দেশে দেশে সাত সাগরে পা ফেলে ফেলে।

আমি আমার হাত তুলে ধরলাম—
আমার কাঁপুনিধরা হাত রুমালের মত
মুঠোয় চেপে ধরল আমার হৃৎপিণ্ডটা
আর নাড়তে লাগল নাড়তে লাগল—নাড়তে লাগল—
কিন্তু মেয়েটি তার চোখ সরিয়ে নিল।

অগাষ্টিনো নেটো

জন্ম ১৯২২ / অ্যাঙ্গোলা

আফ্রিকার কবিতা

দিগন্তে
আগুন
উত্তোলিত হাতের
ইবনদেইরো গাছের কালো কালো ছায়াশরীর
বাতাসে পোড়া তালগাছের হরিৎ ঘ্রাণ

রাস্তায়
ময়দার বস্তার নিচে গোঙানো
বাইলুন্দো কুলিদের সারি

ঘরে
মিষ্টিমদির চোখের বর্ণসঙ্করা
মুখে রুজ আর চালের গুঁড়োর প্রলেপ দিচ্ছে
একগাদা জামাকাপড় প'রে মেয়েটি নিতম্ব দোলাচ্ছে
বিছানায়
বিনিদ্র পুরুষটি ভাবছে
টেবিলে ব'সে খাবার জন্য ছুরি কাঁটাচামচ কেনার কথা

আকাশে প্রতিফলিত
আগুন
এবং মাদলবাজিয়ে কালো মানুষদের ছায়ামূর্তি
তাদের হাত উত্তোলিত
হাওয়ার মাবিস্বার উষ্ণ সুর

রাস্তায় কুলিরা
ঘরে বর্ণসঙ্করা রমণী
বিছানায় বিনিদ্র পুরুষ

জ্বলন্ত কয়লা গিলছে
আগুন দিয়ে গিলছে
দশদিগন্তের উষ্ণ দেশ

ওকোত প্‌বিতেক

জন্ম ১৯৩১ / উগাণ্ডা

'বন্দীর গান' থেকে

আজ কি আমার বাবার
শ্রাদ্ধবার্ষিকী ?

আমার স্বজাতির নারীপুরুষ
জড়ো হচ্ছে আমাদের গাঁয়ে,
গোল হয়ে বসেছে
শস্যগোলার ছায়ায়,
কিন্তু কে
স্বাগতভাষণ দেবে ?

পুরুষেরা খাচ্ছে দিশি মদ
মেয়েরা রাঁধছে পাঁঠার মাংস
আর বানাচ্ছে বজরার রুটি,
কিন্তু গুরুজনদের
পাত পাততে
আমি গরহাজির !
পুরুতরা ছুঁড়ছে
টুকরো টুকরো মুরগির মাংস,
পাঁঠার রক্তের ফোয়ারা ছোটাচ্ছে
ঢালছে কারণ
মৃতদের
সম্মিলিত প্রেতাত্মাদের উদ্দেশে,
কিন্তু কি করে আমি
এখান থেকে আমার পিতৃপুরুষের প্রেতদের
সম্বোধন করতে পারি ?
ওরাই বা কি ক'রে আমার বুকে পিঠে ছুঁড়বে
ওদের ওগডানো খাবার ?
কি করেই বা ঠাকুরমা আমাকে
আশীর্বাদের থু ছিটোবে ?

আমার সমবয়সীরা পরেছে
উটপাখির শাদা পালক,
ওরা যুদ্ধের গান গাইছে,
আমি ওদের সাথে
বনবাদাড়ে যেতে চাই
আমাদের গাঁ থেকে
মৃত্যুকে তাড়িয়ে দিতে চাই,
হাজার মাইল দূরে
পাহাড়পর্বত ছাড়িয়ে
পশ্চিমে,
ওকে ডুবতে দাও
অস্তসূর্যের সাথে
কখনো আর উঠতে দিও না।

আমি যোগ দিতে চাই
শবযাত্রার নাচিয়েদের দলে,
প্রতিহিংসা বুকে নিয়ে
পৃথিবীময় দাপিয়ে বেড়াতে চাই
কবরে আমার বাবার হাড়ে
নাড়া দিতে চাই!

এডুয়ার মোনিক

জন্ম ১৯৩১ / মরিশাস

দেখা হ'লে বেশ হয়

আচানক দেখা হলে বেশ হয় আমার তোমার সাথে অজানা শহরে
যেখানে প্রতিটি ঝগড়া যাবতীয় সোরগোল ঘড়ি
আমার নাড়ীর মধ্যে স্পন্দমান তোমার দেহের সাথে প্রতারণা করে
তোমাকে বন্ধনহীন করতে চাই অচেনা শয্যায়
যখন গাছের রূপ ধরে রাত তার নিজ নগ্নতার জোরে

আমাদের সাদৃশ্যের ভেতরে যা বিচ্ছেদ ঘটায় আমাদের
তাই ভালোবাসি আমি

উষার সীমানাগুলো দেখতে ঠিক আমাদের মুখশ্রীর মত
জীবনের তথ্যপ্রমাণাদি মেলে অন্যকোনোখানে
দূর থেকে যখন তোমার সাথে কথা বলি কখনো বোলো না তুমি না…

সাইফো সেপামলা

জন্ম ১৯৩২ / দক্ষিণ আফ্রিকা

বিচারের দিনে

কালো মানুষেরা জন্মগায়ক
কালো মানুষেরা জন্মদৌড়বীর
কালো মানুষেরা শান্তিকামী
এই কিম্বদন্তীগুলো আমাদের সাধাসিধেপনার কথা বলে

আমাদের শ্যাম্পেনের বোতলের সাথে চুমুক দেয়া হয়েছে
আমরা জেনেছি শ্বাসরোধকারী ধুলোবালি
আমরা অপমানের যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠেছি

গায়ক
দৌড়বীর
শান্তিপ্রেমী

আমাদের মধ্যে যে ঝড় ফুঁসছে আসলে তা কেউ দেখে না
কেউ জানতেও চায় না যে আমরা নিজেদের তলায় এসে ঠেকেছি

হাসাটাও যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠেছে

গায়ক
দৌড়বীর
শান্তিপ্রেমী
নিকুচি করেছে

আমার ভয় হয় আমরা বাতপাহাড়ায় গান গাইব
আর যেমন ব্যাপারস্যাপার দেখছি আমরা অজ্ঞাতবাসে যাব
যেটা আমি জানি না সেটা হচ্ছে কোন শান্তিটা আর কাম্য থাকবে

লেনরি পিটার্স

জন্ম ১৯৩২ / জাম্বিয়া

ইসাতু মারা গেল

ইসাতু যায় মারা
যখন ওর বয়েস মাত্র পাঁচ
এবং সগর্বেই
এই কথাটি জানার ঠিক আগে
কি সামান্য ক্ষতি
ঠেকেছিল এটি এমন কয়েকজনের কাছে।
তার মা কেঁদেছিল
অর্ধকৃতজ্ঞতায়
এত জলদি হাত পা ঝাড়া হ'য়ে।
দেখেনি সেই হাসি
স্নিগ্ধ যেন
উঠতি গাছের শেকড়
যা তার চোখ বুজিয়ে দিয়েছিল।
পাড়াপড়শি কাঁদল, তারা
কাঁদার জন্যে পয়সা পেয়েছিল
ভাবল মেয়ের বিয়েতেও
কি ভোজই না হোত!
পাথরচোখের ভেতর দিয়ে বাবা
মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে:
'কে চলকালো ভোরের শিশির
মেশা আতরখানা?'

CALCUTTA

জোনাথন কারিয়ারা

জন্ম ১৯৩৫ / কেনিয়া

একটা মু গাছে একটা চিতাবাঘ থাকে

একটা মু গাছে একটা চিতাবাঘ থাকে
নজরটা আমার বাড়িব ওপব
আমাব ভেড়াগুলো গায়ে ফুটকি দাগ নিযে জন্মায়
আমার বৌযেবা ওদেব জামা আঁটো করে পবায়
আব মুখ ফিরিযে নেয—
ভয পায পাছে চিত্রবিচিত্র বাচ্চা হয।
ওরা স্নান করে যখন মাথাব ওপর চাঁদ
নরম উর্বব
পাহাড়ী ঝর্ণার জল ছেটায চুচুকে
চামড়াব ঘাগরা খুলে ফেলে বেলেল্লাপনা জুড়ে দেয।
আমি অতিষ্ঠ
আমাকে মু গাছটা কেটে ফেলতে হবে
আমি উত্ত্যক্ত
আমি শক্ত হযে পাযচারি করি
মাজা চাপড়াই।
আমার ভিটেব বাইবে একটা চিতাবাঘ থাকে
আমাব মেযেমানুষদেব নজর কবে
আমি তাকে দাদা বলেছি, মাযেব পেটেব ভাই
সে চেরা চোখে আমাব দিকে তাকায
মাথা উঁচিযে
খাপেব ভেতর আমাব তলোযারে মবচে ধবে গেছে।
আমার বৌয়েবা ঠোঁট কোঁচকায
যখন কামার্ত প্যাঁচারা ডাকে
আমি অতিষ্ঠ হ'যে পড়ি
ওবা ঠাণ্ডা ঝর্ণাব জল নিয়ে আসে
আখ মাড়িয়ে বস কবে
কিন্তু আমাব শিঙেব তৈরী পান পাত্র ছুঁতে চায না।

আমার বেড়া ভেঙে গেছে
আমার ওষুধের ঝোলা ছিঁড়ে গেছে
আমার মাজার লোম ঝলসে গেছে
দোবের খাড়াই ঘুঁটিটা প'ড়ে গেছে
আমার মেয়েমানুষগুলো ফড়ফড়াচ্ছে
চিতাবাঘটা উদয় হয়েছে আবার
আমার ভিটেয় মুখ বাড়িয়েছে।
আমার ভেড়াগুলোকে খাচ্ছে।

কোফি আউনর

জন্ম ১৯৩৫ / ঘানা

যুদ্ধের গান

নিদ্রা যাব সফেদ চাদরে
যুদ্ধ আজ মানবপুত্রের সম্মুখীন
আর আমি নিদ্রা যাব সফেদ চাদরে,
ছেলেরা এগিয়ে যাক
কৃপ্পি আর তার লোকলস্কর এগোক,
দাদাদের বন্দুক গর্জাক,
আমরা সব এগিয়ে চলেছি,
নিদ্রা যাব সফেদ চাদরে।

আমরা যেই শুরু করব কেঁপে উঠবে মাটি,
যুদ্ধ আমাদের ঘরে ঘরে,
ভীতুরা পিছিয়ে পড়বে
মেয়েমানুষের সঙ্গে থেকে যাবে ঘরে;
আমাদের বউদের কাছে ঘেঁষবে যারা
যখন লড়াইয়ে আমরা দূরদেশে আছি
আমরা ফিরে এলে ওরা লাউখোলা হারাবে।

কে কোথায় শুনেছে একথা
মায়ের চোখের সামনে
শিশুকে কেটেছে কালসাপ;

যুদ্ধ আমাদের দোরগোড়ায়
যুদ্ধ আমাদের ঘরে ঘরে
মানবপুত্ররা মিলে লড়বে এ লড়াই
শাদাদের বন্দুক গর্জাক
ধোঁয়ায় ঢাকুক আমাদের
সাদাদের সঙ্গে লড়াই আমৃত্যু লড়াই।

আমরা রণক্ষেত্রে মারা যাব
আর কোথাও মরতে সাধ নেই,
মরবে আমাদের বন্দুকগুলিও
আমাদের তীক্ষ্ণ ছুরিগুলো নষ্ট হবে
আমরা রণক্ষেত্রে মারা যাব।

ভ্যালেন্তে মালাঙ্গাতানা

জন্ম ১৯৩৬ / মোজাম্বিক

নারী

নদীর হিম জলে
আমরা পাব প্রকাণ্ড সব মাছ
হয়তো তারা এই পৃথিবীর বিনাশ
জানাবে সঙ্কেতে
কারণ তারা রাখবে না আর নারী
নারী তো সেই সাজায় যে খেতখামার
নারী মানে পুরুষজাতের ফল

উড়ুক্কু মাছ ইতি টানে খোঁজায়
কারণ নারী পুরুষজাতের সোনা
যখন সে গায় দেখায় তাকে যেন
লোকগাইয়ের মধুর খঞ্জনী
মরবে সে যেই কাটব তার চুল
নিজেকে পাপ থেকে রেহাই দিতে।

নারীর চুল হবে আমার কফিনে পশমিনা

যখন আরেক শিল্পী ডাকে আমায়
ইন্দ্রলোকে আঁকতে আমার ছবি
নারীর স্তন হবে আমার বালিশ
নারী চোখ খুলে দেবে আমায় স্বর্গদ্বার
নারীর পেট জন্ম দেবে আমায় সেইখানে
নারীর চোখ থাকবে আমার ওপর
যখন আমি করব স্বর্গারোহণ।

ম্বেল্লা সন্নে দিপোকো

জন্ম ১৯৩৬ / ক্যামেরুন

নির্বাসন

চুপিসাড়ে
অতিবোঝাই শালতিগুলো আমাদের তীর ছেড়ে চলে যায়।

কিন্তু কারা এই ছদ্মবেশী সৈন্য,
বিদেশবিভুঁয়ে বৃষ্টি ঝরাতে চলেছে, এই মেঘগুলো ?

রাত্রি তার ধনবত্ন হারাচ্ছে
আগামী তার অলস হাতে
তাঁতে বোনা পুরাণকথা।

কিন্তু হয়তো সবকিছুই আমাদের পক্ষে খানিকটাও ভালো নয় এমন নয়,
যেমন এক হাজার মাইল দূরের এক কুড়েঘরের দরজা থেকে
একটি শিশুর হাড্ডিসার হাত খুশিতে আঁকড়ে ধরছে
বৃষ্টির লম্বা লম্বা চর্মসার আঙুল।

চার্লস নোকান

জন্ম ১৯৩৭ / আইভরি কোষ্ট

আমার মাথা বিশাল

আমার মাথা বিশাল
আমার দুচোখ ব্যাঙের
আমার ঘাড়ের ওপর একটা শিঙ
কিন্তু একটা যাদুকরী সংগীত
আমার থেকে বেরোয়।
কোন গাছের নিঃশ্বাসে এমন
বিরল সৌরভ?
কালো সৌন্দর্য, ব্যাঙের পাঁককাদার আস্তানা থেকে
কি করে তুমি উত্থিত হও?
যে-তুমি আমাকে লক্ষ্য করো, তুমি ভাবো
যে আমার বাদ্যযন্ত্রের কণ্ঠস্বর
আমার স্বাধীনতাকে খরিদ করে, যে আমি তরলতা, চিন্তা
যা ওড়ে।
না, আমার মধ্যে কিছু নেই
দুঃখের একটা ডোবা ছাড়া।

জাঁ বাপ্তিস্ত তাতি-লুতার

জন্ম ১৯৩৯ / কঙ্গো প্রজাতন্ত্র

ছেলেমানুষিতে দ্বিপ্রহর

বারোটি ঘুষি দিয়ে ঘড়ি সময়ের স্পন্দনের সাথে বেইমানি করে,
আর দিনের পয়দা-করা সূর্য
এখন ফুলকির ঝলকানির মধ্যে পড়ে পিছু হঠতে শুরু করছে।
জাতপাতের, ব্যাঙের, আশ্রমের দেয়ালগুলো
আমাকে অন্ধ করে, আমি দেখছি, অনেক দূরে
ভাগ্যের দেয়ালে একটা ফাঁক তৈরি হচ্ছে
দূরে বহু দূরে, এ যে মৃত্যুর বিশাল মোহানা
আমার মাথা বিশাল

যেখানে আমার যত দৈনন্দিন স্বপ্ন এসে জোটে।
যেই আমাব ছেলেমানুষিব কবিতাগুলো জ্বলে উঠবে
আমি ওদের মৃত্যুর ছাই বেখে দেব আমার মুখের ওপর
নতুন অঙ্কুবোদ্গম না হওয়া অব্দি।
বিদ্যুতের আয়নায আমাব নিজেকে একলা আব ঢ্যাঙা মনে হয়।

যে গাছটি আমাব বন্ধু উল্টে গ্যায তার পলতে
যা কিনা আমাব ছাযাতৃষ্ণার দেখভাল কবত,
আমি বোদ্দুরে এগিযে যাই
এবং শূন্য-ঝোলা কাঁধে দৈবজ্ঞ, আমি কষ্টে
কেন্দ্রেব আগুনের ভেতব দিযে হাঁটতে থাকি।

জোক্রে রোশা

জন্ম ১৯৪১ / অ্যাঙ্গোলা

ফেরার কবিতা

নির্বাসন ও স্তব্ধতার দেশ থেকে যখন আমি ফিরি
ফুল এনো না আমাব জন্যে।

বরং আমাব জন্যে এনো সব শিশিব,
নাটকগুলোব সাক্ষী সে-সব ভোবের অশ্রু।
আমাব জন্যে এনো প্রবল প্রণয়ক্ষুধা
আব তারাভবা বাতে স্ফীত গোপনাঙ্গের ফবিয়াদ।
আমাব জন্যে এনো নিদ্রাহীনতাব দীর্ঘ বাত
যখন মাযেরা কাঁদছে, সন্তানহারা।

নির্বাসন ও স্তব্ধতাব দেশ থেকে যখন আমি ফিবি
না, ফুল এনো না আমাব জন্যে

আমাব জন্যে এনো শুধু এই
ভোবে নিহত-বীবদের অন্তিম-ইচ্ছে
সঙ্গে হাতে করে একটা ডানাহীন পাথর
আব ওদেব চোখ থেকে ফণা তোলা ক্রোধেব স্থতো একখানা।

সিল চেনে-কোকার

জন্ম ১৯৪৫ / সিয়েরা লিয়োন

সিয়েরা লিয়োনের একজন কবি হয়ে

আমার নিজের দেশে একলা এক কবি
আমি খুঁজছি জীবনের আপাত সত্যের নানারূপ
রূপকের অগ্নিশিখা কবিতার বিষ
স্বদেশ আমার তুমি আমার হৃদয়, টিকে আছো যেন বিধ্বস্ত নিসর্গ
সর্বদাই যাদু আত্মগোপনের, সত্য গোপনের
এবং তোমার অতিপ্রাকৃতিক রূপ ঝরাবার
স্বদেশ তোমার কবি হয়ে মরতে চাই
আমি যে তোমাকে এত ভর্ৎসনা করেছি আর বিকিয়ে দিয়েছি
তোমাকে বেসেছি এত ভালো আর ঘৃণাও করেছি
আমার কষ্টের কথা ভাবো, তুমি হবার কবিতা
মহাকায় যে-তোমার গলায় পরালো ফাঁস ভ্রাতৃঘাতী পরগাছাগুলো
নীরক্ত কবিতা লিখে আমি কি তোমাকে ঠকিয়েছি
অতিরিক্ত 'মেধাজীবী' হবার বিচ্ছেদব্যথা পাই
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককুল সিল চেনে-কোকারের কবিতা বিষয়ে
বলাবলি করে আর নিন্দে করে ছাত্রদের
ইংরেজি অনার্স ক্লাসে আমার রচনা পড়ে যারা
এসব দরকার নেই স্বদেশ আমার।
শুধুই পুস্তকবন্দী হতে চাই না আমি
অ্যালবাট্রস হতে চাই তোমার চাঞ্চল্য অনুকারী
মাঠে মাঠে লাঙল চরাতে চাই শুধু
পড়ুয়া কিষাণদের প্রাতরাশ হতে চাই
ও তোমার জীবনের জাতীয় প্রতীক হতে চাই হে স্বদেশ
কেননা হৃদয় আজ ভারাক্রান্ত, নির্বাসন ডাকে
বিস্মৃতির যন্ত্রণার ঝাপ্টা মেরে আমার ভুরুতে
সাধারণ মানুষের মতো আমি আরো একবার
চাই ভালোবাসতে একটি রমণীকে প্রেমে মৃত্যুবরণ না করে
রেখে যেতে একটি ছেলে কিংবা মেয়ে যে স্মরণে রাখবে ঠিক আমার সমাধি

স্বদেশ আমার ব্যথা, আমার ফিনিক্স, দর্পী সর্বনাশা মযাল আমার
যার পেটে আমার তাবৎ ক্রোধ মরে
আমি সুখী হতে যাচ্ছি ফলে এই বুকের ভেতরে একটা গ্রেনেডের মত
ব্যথা বইতে হবে না আমার। আমি সাধাসিধে হয়ে উঠতে চাই
এবং সম্ভব হলে তোমার সাথেই থাকতে চাই, তারপর একদিন
মরে যেতে চাই পিছে ফেলে রেখে নিজ কাব্য—জীবনের অপূর্ব রূপক।

ক্লিষ্ট মানুষের খিদ

দুই আঙুলের ফাঁকে ঘামছে চাষী
বুকে ঘামছে সঙ্গীতজ্ঞ
ফুসফুসে ঘামছে খনিমজুর
বিবমিষায় ঘামছে অস্তিত্ববাদী মানুষ
উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ঘামছে প্যালেস্তিনীয়
যাকে তাড়িয়েছে আউশহ্বিৎস্‌বিস্মৃত ইহুদি
ইহুদিপাড়ায় ঘামছে কালোমানুষ
কচ্ছপের খোলে ঘামছে জন্তুমানুষ
পালাতে পালাতে ঘামছে নিরীহ মানুষ
গ্রহণীতে ঘামছে শিশুরা
আবর্জনার গাদায় লড়ছে শূয়োরছানা
ঘামছে নারী যার জরুরী কাম
আমার সংক্ষিপ্ত ফুর্তি যোগাচ্ছে
ঘামছে গরীব মানুষ যার সংসার দুই উরুর ফাঁকে উপোসী
ঘামছে মরামানুষ, প্রান্তিক মানুষ
যে চায় তার হাড়গুলো হোক সোনার ঝাল দেয়া
ঘামছে গরীব যে মরেছে অতিধনীর হাতে
ঘামছে ব্রোঞ্জের মানুষ যে এসবই সয়
ঘামছি আমি যে এদের নিয়ে গান করি।

সারবস্তু

মানিক চক্রবর্তী

জীবন মানে কোনো নীতি নয়, অন্তত জীবনের সবটুকুই প্লাস্টার অব প্যারিসের মতো কোনো ছাঁচে তুলে নিলে, সেটাকে আস্ত একটা নীতির টাইটেল দিয়ে কখনোই কোনো প্রদর্শনীর ঘরে, সুদৃশ্য দেয়ালে, উজ্জ্বল টিউব-আলোর তলায় ঝুলিয়ে রাখা যাবে না। জীবনের কোনো-কোনো খণ্ডাংশ নিয়ে হয়তো একটা নীতির রূপরেখা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে থাকে, কিন্তু তাও এত জেলির মতো পাতলা, থলথলে, তাকে কোনো আঠাতে তুলে নিয়ে সংরক্ষণ করাও হয়তো সবসময় বেশ মুস্কিলের। তবু আর পাঁচটা মানুষ সেটুকুই খোঁজে। সমুদ্র, সমুদ্র, পুরীর সমুদ্র, কোভালম বীচের কাছে সমুদ্র, গোয়ার সমুদ্র, কিংবা দীঘা কি নিদেনপক্ষে বকখালি, সেখানে শুধু সমুদ্র নেই। বরং সমুদ্রসৌন্দর্যের পরিপন্থি আরো অনেক কিছু আছে। অনেক নোংরামি, ক্লেদ, ঘুনধরা, ঘাম-রক্ত, অনেক বাসি, পচা ব্যাপার। কিন্তু তার সঙ্গে সমুদ্রও আছে। সমুদ্রের বিশাল বিশাল ঢেউ, গর্জন, কল্লোল, সমুদ্রের দিগন্তবিস্তৃত নীল জল, অনেক দূরে আকাশ গিয়ে মিশেছে, যেন আকাশের পেট থেকেই নীল রাশি রাশি স্রাবের মতো গলগল করে সমুদ্রের জল চারদিক থেকে ধেয়ে আসছে, বহুদূর থেকে। এই তো ব্যাপার। তা বলে আস্তটাই কি সমুদ্র কি সমুদ্রসৌন্দর্য অথবা সমুদ্রের ভয়ংকরতা হয়ে গেল? বাদবাকি জাগতিক পিছুটানগুলো ঐ সমুদ্রের খুব কাছেই, মানুষ কেমন করে সেই সব কিছু ঝেড়ে ফেলে শুধু সমুদ্রের ছাঁচটুকুই তুলে আনতে পারবে? একেবারে আস্ত পারবে না। অথচ মানুষ সমুদ্রকে পেলে সেখানে হয়তো আর সব কিছু তুচ্ছ মনে করে। সেখানেই তার শ্রেষ্ঠত্ব। অথবা ফ্রেমে সে শুধু ততটুকুই ধরবে, যে উদ্দেশ্যে সে অপার্থিবকে ধরতে গেছে সেখানে, অনুভব করতে গেছে। একদিন ঐ বাদবাকি সব কিছুই হয়তো ভুলে মেরে দিতে পারে। অনায়াসে বর্জন করতে পারে, ফেলে দিতে পারে। কিন্তু সমুদ্রকে ফেলে দেয় না।

বাথরুম থেকে এসে, বিকেল তিনটে সাড়ে-তিনটে নাগাদ, সুজিত দেখল সিমেন্টের পারমিটদুটো ফ্যানের হাওয়ায় টেবিল থেকে উড়ে গিয়ে মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে। কেউ কেউ মাড়িয়েও গেছে হয়তো ইতিমধ্যে। ধুলোয়

ময়লা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। ভাগ্যিস তার নিজের ষ্টীল আলমারিটার তলায় গিয়ে ঢুকে যায় নি। ঢুকে যেতে পারত, কারণ অফিসে সুজিত যে সীটে বসে তার ঠিক মাথার ওপরেই ফ্যান। বোঁ-বোঁ করে চব্বিশ ঘণ্টা ঘুরছে!

সুজিত রুমাল দিয়ে হাতদুটো ও মুখ মুছতে-মুছতে ঐ পারমিটের কাগজটা তুলে টেবিলে মেলে দেখে নিয়েও ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারে নি। কি করে পড়ে গেল? অমন ইম্পর্টেন্ট কাগজ? সে বার বার টেবিলের ওপর হাত দিয়ে দোমড়ানো কাগজদুটোকে অত্যন্ত ত্রস্ত ও সতর্কভাবে সমান করতে-করতে ভাবল, তাহলে তো অনেক কিছুই ঘটতে পারে? ঐ পারমিট দুটো, অরিজিনাল এবং ডুপ্লিকেট, কতই না তোলপাড় হয়েছে অফিসে, ফার্ষ্ট আওয়ার থেকে! নানা কাজে সুজিত হয়তো বারবারই অন্যমনস্ক, ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল, ঠিক কথা। এখনো তার টেবিলের ওপর অন্তত দশ-বারোটা ফাইলের স্তূপ। মার্চ মাস। সরকারি অফিসের মার্চ মাস যে কি বস্তু, কে আর না জানে? দুজন ঠিকেদারকে একেবারে বিকেল সাড়ে চারটার পরে আসতে বলেছে, তখন কাজকর্মের চাপ একটু হাল্কা হলে, ধীরে সুস্থে বসে বিল্ করে দেবে। ওরা আসবেও ঠিক, সাড়ে চারটার আগেই আসবে, পয়সাকড়িও নেয়া হয়ে গেছে সেই সকালবেলা, ফার্ষ্ট আওয়ারেই, সুজিতের ডান পকেট এবং বাঁ পকেট একটু সামান্য উঁচু, টোপলামতো ফুলে আছে সামান্য, সব পঞ্চাশ টাকার নোট। দুজনেরই।

সেটা কথা না, সিমেন্টের এই দুটো পারমিট সুজিতের টেবিল থেকে হারিয়ে কোথাও চলে গেলে, কিম্বা একটু ছিঁড়ে গেলে, ডেষ্টোর হয়ে গেলে, সুজিতকে অনেক ঝামেলায় পড়তে হত। এমনকি চার্জশীট, শো-কজ হওয়াও বিচিত্র নয়। কারণ দস্তুরমতো হেড-এ্যাসিষ্টেন্টের কাছ থেকে সকালবেলাতেই সই করে, ওটা নিজের টেবিলে নিয়ে এসেছে সুজিত। প্রায় দেড় হাজার টন সিমেন্ট। শ্রীরামপুরের কনষ্ট্রাকসানটার জন্যে। ওটাকে এই মার্চ মাসের মধ্যেই অন্তত অর্ধেক খরচ দেখাতেই হবে, এপ্রিলের থার্ড উইকে কোনো এক সময় সি এম ওটার একটা সেকসান উদ্বোধন করবেন, যদিও ডেট্ এখনো কনফার্মড হয় নি।

কিন্তু সময়ের পরিধিটা পাকা হয়ে আছে। আশ্চর্য তো? কি করে উড়ে, টেবিলের তলায় গিয়ে পড়ল? তোর টেবিলের ওপর এত পেপারওয়েট, তাছাড়া বড় বড় দুটো ষ্ট্যাম্প প্যাড, ঢাউস স্কেল, দুটো প্লাস্টিকের ট্রে,

তাছাড়াও টেবিলের ওপরে বিশাল, ভাবি কাচ, কাচের তলাতে বেখে দিলেও তো ঝামেলা চুকে যায় ?

সুজিত এসব নিযে কোথা থেকে কেমন করে যে সময কাটায়, নিজেও মাঝে মাঝে বুঝতে পারে না। আজও বুঝছিল না। তবু যেন কেমন কবে সময় কেটে যাচ্ছিল।

এ-হেন সুজিত কি ক'রে বোঝা যায় না, মনোজ চক্রবর্তীব সঙ্গে একটা মানসিক সাযুজ্য অনুভব করে। কেননা ইতিমধ্যেই ওপরের কর্মপদ্ধতির ব্যাপাবগুলোও এর পরে অনুমান করা যায! অর্থাৎ বিকেল সাড়ে চাবটাব পবে, মহাকরণ এখন অনেকটা ফাঁকা হযে গেলে, সেই দুজন ঠিকেদাব নিশ্চযই এসে পডবে। একেবাবে চন্দ্র-সূর্য ওঠার মত সত্য আব পরিস্কার জলের মত তবল! সুজিতেব যা টাকা নেবার নেয়া হযে গেছে, আগেই বলা হলো। দুটো পকেট সামান্য একটু টোপলামতো হয়ে আছে—এবং ইতিমধ্যে সে বাথরুমে বা নিচেব ক্যান্টিন বা যে কোনো একটা করিডবে গিযে টাকাগুলো সাইজ কবতে পাবে নি, বোঝাই যাচ্ছে, সে এত ব্যস্ত এখন।

সুজিতেব দেযা মনোজ চক্রবর্তীর বিববণ, অনেকটা হয়তো এবকম দাঁডাবে : তাবিখটা ১৮ ৩ ১৯৮৯। ওযেলিংটন স্কোযাবেব মোডে দাঁডিযেছিল সুজিত। বিকেল অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। এমনকি সন্ধ্যেও যাব-যাব ভাব। সুজিতের দেখাটা আকস্মিক না, কেননা প্রাযই সুজিত কারণে-অকাবণে যেন মনোজ চক্রবর্তীকে দেখতে পায। সেই দেখাটা হিংস্র বা বাগত দেখা না। একটা জিনিস তো ঠিকই, মনোজ চক্রবর্তী আব সুজিতেব গাযের মধ্যে একই বক্ত বইছে। সুজিতের যে চেতনা, মনোজের চেতনার সঙ্গে তেমন একটা কোনো ফাবাক নেই! শুধু সুজিত মাঝপথে বসে গিযেছিল। মনোজের মত ধারাবাহিকতা রাখতে পাবে নি—জট পাকিয়ে ফেলেছে। তবে একটা বাঁচোযা, খেলাটা সুজিত ছেডে দেয় নি। ববং সুজিতেব যে আবেগ এবং অনেকটা যেন আবেগেই ভেসে যাওযা তাব ইডিওলজি অথবা সত্তা, সেই বস্তুটাকে সুজিত প্রাণপণে ধবে রাখতে চেয়েছিল, পাবে নি। কোথা থেকে কি গোলমাল হযে গেল সে নিজেও বলতে পাববে না! কিন্তু ধীবে ধীরে যেন অনেকখানি ফাবাক হযে পডল বা কোথা দিয়ে যেন পিছিযে পডল সুজিত—একেবারে ইঁদুব আব বাঁদবেব মতো হযে বইল ব্যবধানটা!

কর্মচারী আন্দোলনেব এই ব্যাপারটা অনেকটা যেন নেশাব মতোই। এখানে একটা সময গিযে আর ইডিওলজি, লক্ষ্য, 'লাইন অব অ্যাকশান' এ

সমস্ত যেন কাজ করে না। ভেতরে মস্তিষ্ক দ্বারাও বোধহয় কিছু কিছু পরিচালিত। তাল রাখতে-রাখতে যে আবার ট্র্যাকে ফিরে আসতে পারল, ঠিকই আছে। সে বরং অনেকখানি এগিয়েই রইল। ধারাবাহিকতার সঙ্গে তার ঐ ছিটকে যাওয়া অংশটুকুও যোগ হয়ে বেশ বড়োসড়ো একটা মূলধন গড়ে তুলল। এবং যেহেতু রাস্তাটা কি, কোন্‌দিকে যাবে, কতদূর যাবে, কেউ জানে না--ফলে, ঐ ছিটকে যাওয়া অংশটুকুই ধরা হলো, যেন আরেকটা স্ট্রাটেজির অঙ্গ। যদিও সুজিত ঠিকই জানে, আসলে মনোজই একসময় অনেকখানি সরে গিয়েছিল, অনেক প্রমাণ দিতে পারবে মনোজের ব্যাপারে সুজিত। কিন্তু চিৎকার করে গলা ফাটালেও কেউ আর সেটা এক বিন্দু মেনে নেবে না।

কেননা, মনোজ তাদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এখন গোটা পশ্চিম-বাংলার আর সুজিত পেছোতে পেছোতে একটা ইউনিটের সম্পাদক পর্যন্তও নয়। সম্পাদক কি, সেক্রেটারিয়েট কি এক্সিকিউটিভ মেম্বারও নয়। স্রেফ চাঁদা দেয়া সদস্য একজন।

মনোজ জ্যোতি সিনেমার দিকটা থেকে আসছিল। হেলতে-দুলতে। কাঁধে সাদা ব্যাগ। আর যেভাবে মনোজ হাঁটে, অন্তত পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি মনোজ হবেই—কাঁচা-পাকা, খাড়া খাড়া চুল। চোখ দুটো অসম্ভব গভীর। প্রায় জ্বলছে। মাথা হেঁট করে সামান্য বাঁদিকে ঝুঁকে হাটে। তেমনই আসছিল। সুজিত দূর থেকে দেখতে পায়। বাইর্টাস থেকে বেরিয়ে সুজিত অনেকের কথা আর মনে রাখে নি। পকেট দুটো এখন আর ফোলা নয়, সব গুছিয়ে এটাচির মধ্যে নিয়ে নিয়েছে। এইমাত্র একটা ডাবল্ ক্যাসেটও কিনল, কিশোরকুমারের। তা থেকে প্রায় পঞ্চাশ টাকা বেরিয়েও গেছে। আসলে এলোমেলো খানিকটা হেঁটে, কিছুটা পুরনো বইয়ের দোকানগুলোর দিকে চোখ বুলিয়ে, সুজিত একসময় বালিগঞ্জের একটা ট্রামেই হয়ত চেপে বসত। ফাঁড়ির কাছে নেমে, রঙেল রোড ধরত। এমন সময়েই ঐ বিপত্তি!

মনোজ দূর থেকে আসছিল প্রায় স্পিডবোটের মত, কেটে-কেটে।

দূর থেকেই মনোজকে পুঙ্খানুপুঙ্খ হেঁটে যেতে দেখে তাকে হঠাৎ ম্যাজেস্টিক মনে হয় সুজিতের। সত্যি-সত্যি একটা ব্যক্তিত্ব। পারসনালিটি। মনোজ বেশ ধীরভাবেই হেঁটে চলে গেল বাঁদিকের ফুটপাতটা ধরে। রাস্তা পেরোল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের মুখে। তারপর আবার ধীরে ধীরে হেঁটে

মৌলালির দিকে চলে গেল। নিশ্চয়ই এন আর. এস, মানে নীলরতন সরকার মেডিকাল কলেজে যাবে। ওখানেই কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর।

অথচ সুজিত জানেই মনোজ কৃষ্ণনগরের ছেলে। বোধকরি ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক বাঁক সে পার হয় নি, অধিকাংশই পার হয় নি—অন্তত সুজিত যা দাবী করতে পারে। চাকরির প্রথম দিকে সে তো মফঃস্বলে বেশ খানিক জায়গায় ছিল, মফঃস্বল সম্পর্কে ধারণাটাও সুজিত মোটে স্বচ্ছ করে ফেলতে পারে নি আজো। তার কাছে মফঃস্বল মানে মফঃস্বলই। সেখানে সত্যি-সত্যিই তো আর গোবরে পদ্মফুল ফোটে না!

যেমন মনোজ নিশ্চয়ই জীবনে কখনো ললিতা সরকারের মতো মেয়ের ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারে নি! কাছে আসা দূরে থাক্। ঘনিষ্ঠ হওয়া, ক্রমাগত যৌনসম্পর্ক, এসব তো আরো দূরে।

অথচ এক ললিতা সরকারকে নেড়েচেড়েই সুজিত আরো অন্তত চল্লিশটা বছর নিশ্চয়ই পার করে দিতে পারে। এদিকে পঁয়তাল্লিশ তো পেরোলই। যতই না সুজিত অনিমার মতো মেয়েকে বিয়ে করুক—ওদের ডাগর-সাগর মেয়ে মহুয়া গতবার তো সেকেণ্ডারি দিলই। তবু সুজিত বলবে—। কারণ এতে আর বয়সের ব্যাপার নয়। যৌন-যৌবনের ব্যাপার নয়। এ স্রেফ নাড়াচাড়া করার ব্যাপার। এদিকের মাল ওদিকে নিয়ে যাও, আবার ওদিকের মাল এদিকে নিয়ে এসো।

তবু মনোজ, সে অসামান্য বক্তৃতা করে। প্রায় বৃষ্টির মতো অনর্গল যা বক্তব্য রেখে গেল, এই তো সেদিন, নিউ সেক্রেটারিয়েটের ক্যান্টিন হলে, গোটা সভা, কর্মচারী সমাজ একেবারে কেঁপে গিয়েছিল মনে হয়। অথচ এমন কিছু ইস্যু না। বামফ্রন্ট সরকার কায়েম হয়েছে অনেকদিন। কোথাও তেমন কোনো মেঘ-টেঘ কিছুই নেই। এমনকি কর্মচারীদের সুড়সুড়ি দেবার মতোও সামনে তেমন কিছু বোনাসের ব্যাপার বা খুব বড় একটা প্রতারণা করার বিষয়-টিষয় কিছুই নেই! স্রেফ কর্মচারীর দায়িত্ব, চেতনা, এই ব্যাপার নিয়ে এত গভীরে চলে গিয়েছিল মনোজ সেদিন তার বক্তব্যে, একসময় সুজিতও দূরে দাঁড়িয়ে শুনতে-শুনতে বাহ্যজ্ঞান কেমন যেন হারিয়ে ফেলছিল! অথচ সুজিত নিশ্চিত জানে, আজ একটা সামান্য অংশও ধারাবাহিকতা রাখতে পারলে, ঠিক এমন জায়গায়, বাইরে বিকেল, আর ক্যান্টিন হলঘরের মধ্যে একটা জাগ্রত চেতনাকে আরো জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে সুজিতও এই মনোজের ভূমিকায় কিছু কম যেত না। সে তথ্য নির্ভর না হলেও তার বক্তব্যের মধ্যে নিজস্ব

একটা দুর্লভ নিয়ন্ত্রণ আছে। সেই নিয়ন্ত্রণ তাকে অনেকদূর অবধি স্থির, ঋজুভাবে নিয়ে যেতে পারে, কিছুমাত্র ভূমিকা বা কায়দা না করে, ভেতর থেকেই।

যেমন ললিতা সরকারের ব্যাপার, হাজরা রোডের সেই রোয়াক আর উদ্ধত ললিতার আঁচল পেছন থেকে লাফ দিয়ে টেনে, চাপদাড়ি আর ভেতরের দিকে খানিক ঢুকে হলদেটে হয়ে থাকা চোখের সুজিত, যার কণ্ঠস্বর অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় তখনই—ললিতাকে এভাবে বলতে পারে না, 'আপনি যেখানে যাচ্ছেন যান—কিন্তু জবাবটা দিয়ে যান। আমি অন্তত আপনার দেখা আর পাঁচটা কুকুর ছাগলের মত নই। আমি চিতার বাচ্চা।'

ললিতা আঁচল সুজিতের হাত থেকে ঝটকা মেরে সরিয়ে নিয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে পড়ে বলেছিল—'তার মানে? আপনি এখুনি তার প্রমাণ দিতে পারবেন? আমি যাদের নিয়ে হ্যাণ্ডেল করি, আপনার মতো ঐ চিতার বাচ্চা না কি বললেন—তা নাও হতে পারে হয়ত, কিন্তু হায়েনা, নেকড়ের জাত—আপনাকে দল বেঁধে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলতে পারে, দেখবেন?'

বাইশ-চব্বিশ বছর আগের কলকাতা। তখন চোত-বৈশেখ মাসে প্রচণ্ড প্যাঁচপ্যাঁচানি গরমের পরে, বিকেল চারটে সাড়ে চারটায় কলের জলে চান করে নিলে আর পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়িয়ে একটু রাস্তায় বেরুলেই গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া, আমেজ, সব এসে নিবিড়ভাবে স্পর্শ করত। তখন সব জিনিসের একটা বাধ্যবাধকতা ছিল। মানুষ অমন লাফিয়ে-লাফিয়ে উল্লুকের মত হাঁটত না। ধীরে ধীরে পা ফেলত!

এহেন ললিতা সরকার, যাকে সুজিত আর সুজিতের বন্ধু অসীম দুজনে মিলে পরবর্তী কয়েক মাস কি এক দেড় বছরের মধ্যে একেবারে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে নিয়েছিল বলতে গেলে, নড়তে-চড়তে দেয় নি, আর এখন তো ললিতা সরকার যতোই তার দু-বছরের ছোট সি পি এমের পাণ্ডা কালুকে বিয়ে করুক, তাদের ছেলে হারুটা এখন পাড়ায়-পাড়ায় বেশ ভালো ম্যাজিক-শো দেখিয়ে বেড়ায়, মাঝে মাঝে বড় বড় হলেও অনুষ্ঠান করে—এখন ললিতার স্বামী কালুর চুল বোধহয় সুজিতের চেয়ে ঢের বেশী পেকে গেছে। শরীর বেঁকেও গেছে অনেক! তবুও সুজিত, ঐ যাকে বলে একটা এমন সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক গেঁথে দিয়েছিল ললিতা সরকারের মনে, বোধ করি আবার নাড়াচাড়া করে সে ফের কলি অনেকখানি ফেরাতে পারে। অত্যন্ত অদ্ভুত এবং ব্যালান্সিং ক্ষমতার ব্যাপার।

যাই হোক, মনোজ। হ্যাঁ মনোজ—, মনোজই আসলে সুজিতের মধ্যে এমন একটা ধাক্কা আনে। অবশ্যই অন্য ধরণের ধাক্কা। তবু মনোজ, এটা তো অস্বীকার করলে চলবে না—সুজিতের চেয়ে অন্তত পাঁচ বছর পরে সরকারী অফিসে ঢুকেছে, কাছাকাছিও খুব বেশীদিন হয় নি। সত্তর দশকের গোড়ায় সুজিত তখন বাঁকুড়ায়, নিরবিচ্ছিন্নভাবে কর্মচারীদের সংগঠিত করছে কংগ্রেসী গুণ্ডাদের মার থেকে নিজেকে সামলাচ্ছে, এমন কি ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাও তার দেওয়া হয় নি, কারণ এটার বিরোধিতা করছিল তখন সুজিতরা সবাই। সারাক্ষণ চোলাই খেয়ে প্রায় বেহুঁস হয়ে থাকা এক বর্ধমানের কুখ্যাত মস্তানকে চাকরি দিয়ে পাঠানো হয়েছিল বাঁকুড়ায় একটা সরকারী দপ্তরে, সুজিতদের শায়েস্তা করার জন্যে। তাকে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছিল সুজিতকে, অজিতদাকে, সুভাষদাকে, যাতে করে সর্বক্ষণ তাদের ব্যতিব্যস্ত আর সন্ত্রস্ত করে রাখা হয়। সুজিত তখন নিজস্ব একটা রিভলবার সবসময় পকেটে রাখত। নিজের মনে ভেবে নিয়েছিল, যা হবার হবে, একদিন অন্ধকার জায়গা-টায়গা দেখলে শালা ঐ কংগ্রেসী ভাড়া করা গুণ্ডাকে শেষ করে দেব, নিঃশব্দে। তখন অনিমাকে নিয়েই আছে বাঁকুড়া মেথরপট্টির পাশে এক মাষ্টারমশাইর বাড়িতে। মহুয়া তখন এইটুকখানি। কেজি-তে পড়ে।

তো যাকগে, মনোজের তখন নাম পর্যন্ত শোনেনি সুজিতরা। রমণীদা ছিলেন, তিনি সারা পশ্চিমবাংলার উঠে আসা ভালো ভালো কর্মীদের খোঁজখবর রাখতেন, সপ্তাহে দুবার কলকাতা যেতেন, রমণীদা তখনই রাজ্য কমিটির প্রেসিডেণ্ট। রমণীদার কাছে ইতস্তত দু-চারবার শুনেছিল মনে পড়ে, সমিতি-অফিসে বসে, কাজ করতে-করতে আর বিড়ি খেতে-খেতে, তারপর ভুলেও মেরে দিয়েছিল।

অনিমা অবশ্যই এসবের কোনো ধার ধারত না। যতো তুচ্ছই হোক, অনিমার সংসার বলে একটা বস্তু ছিল। এবং সে ঠিক ঐ টাইপের নয়, যে সবকিছু হেলাফেলা করে সমস্ত একদম ছত্রখান করে দেবে—তারপর যা হোক একটা কিছু করে জীবন কাটাবে। সে শেকড় নামাতে জানত, যদিও কোনো ব্যাপারেই তার কোনো শ্রদ্ধা, ভক্তি বা ভয় কোনোটাই কাজ করেনি। মেয়ে মহুয়াকে নিয়েই সন্তুষ্ট, আর সুজিতের নানারকম উল্টোপাল্টা ব্যাপার, অনিমা ঠিকই জানত, সুজিতের চরিত্র-ফরিত্রের কোনো ঠিকঠিকানা নেই। সে কর্মচারীদের জন্যে ভাবছে, না ঘণ্টা ভাবছে! আসলে সবটাই ওর একটা

অশিক্ষিত মাস্তানি, শুধু নিজের প্রভাব খাটানোর চেষ্টা। সেটা কি সংসারে, কি বাইরে। ললিতার ব্যাপারটা না হয় বাদই দেয়া যাক্ না, সে তো আরেক কেচ্ছা, নোংরামি। সেটার প্রসঙ্গ অনিমা কখনোই তোলে না। প্রথম প্রথম সুজিতকে সে নানারকম ভাবেই দেখেছে। সুজিতের সম্পর্কে (বা স্বামীর সম্পর্কে) তার মতবাদ একেবারে স্পষ্ট, নির্দিষ্ট হয়েই গিয়েছিল। সুজিত আর যাই হোক, কখনো কোনো বড় কাজের মধ্যে যেতে পারবে না! নিজে নিজেকে ছাড়িয়ে যে উর্দ্ধতার দিকে যাত্রা করতে হয়, সুজিত পারবে না।

সুজিত এমার্জেন্সির সময় উত্তর বাংলায় বদলী হয়েছিল। সেটা বেশ একটা ঘটা করে হয়েছিলই বলতে হবে। বাড়ির সামনে পুলিশভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাঁকুড়া ছেড়ে যাবার নির্দেশ ছিল।

সেখানে সুজিতকে বরং কিছুটা স্থিতধী দেখেছে অনিমা, কেননা সংগঠন, সমিতি প্রকাশ্যে করার কোনো উপায় ছিল না। মাঝে মাঝে সবাই মিলে পিকনিক করতে যেত শুকনা কি কাঁকড়াঝোড়। সেখানেই যা কিছু মুখে লাথি মারার চেষ্টা তৎকালীন প্রদেশ সরকারকে। তবে সুজিতের ভূমিকা নিশ্চয়ই খুব একটা বড় বলা যাবে না। মেয়েরা, বাচ্চারা একদিকে পিক্‌নিক করত, অন্যদিকে কর্মচারীরা মিটিং করত, সিদ্ধান্ত নিত, চাঁদা তুলত। ঠিকই আছে। সুজিত তার বাসাবাড়িতে মাঝে মাঝে চিৎপাত হয়ে শুয়ে থাকতে-থাকতে সব ন্যাংটো মেয়ের ছবির বইটই গোগ্রাসে গিলত আর অনিমাকে দেখলেই বালিশের তলায় কি তোষকের নিচে লুকিয়ে রাখত। অনিমার নিজের কোনদিন ওসব লুকিয়ে বার করে, খুলে দেখার প্রবৃত্তি হয় নি! এই তো ব্যাপার।

এমার্জেন্সির পরেই আবার সুজিতের লাফালাফি। ওরা একটানে একেবারে চব্বিশ পরগণার ক্যানিংয়ে চলে এল। (এখন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা)। ততক্ষণে রামফ্রন্টও এসে গেছে। সব হয়ে গেছে। পুরণো হাওয়া টাওয়া সব উধাও। সুজিতকে বলতে শুনত বেশ গর্বভরে—'এখন দেখছি, আগেকার বহু চামচা, এদের, যারা তখন অফিসার আর আমলাদের পোঁদ ছাড়ত না, এখন দেখছি আমাদের মিছিলের একেবারে আগে আগে বুক ফুলিয়ে যেতে চায়, ওদের আর থামানো যায় না! আর কি চিৎকার, জানো, গলার কত জোর, রক্তের কত তেজ—দুনিয়ার মজদুর এক হও, আমাদের সংগ্রাম জনতার সংগ্রাম—কোথায় ছিল শালাদের এত গলার তেজ কে জানে?'

' তোমার তাতে কি? অনিমা বলত। 'সবাই আসুক না, ভালোই ত। হয়তো ভয়ে এতদিন সিঁটিয়ে ছিল। সবাই তোমার মতো আগুপিছু না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি, আর মারামারি করবে? বনে-বাদাড়ে পাহাড়ে বদলী হয়ে-হয়ে ঘুরে বেড়াবে? নিজেকে অত লিড়ার-লিড়ার ভাবো কেন? লিড়াররা আরো সংযত হয়, সংযমী হয়—আরো শান্ত, ঠাণ্ডা হয়, ওদের আগুনটা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। তোমার মত ভ্যাঁকভ্যাক করে রাতদিন তারা বকে না—'

কানিংয়ে আসতে না আসতেই তিন-চার মাসের মধ্যে অনিমা সুজিতের একটা গোলমাল পাকানো টের পেয়ে যায়। অবশ্য তখন আর ওখানে বাসা ভাড়া করতে হয়নি। বণ্ডেল রোডের বাড়ি থেকেই সুজিত যাতায়াত করত। বালিগঞ্জ থেকে ট্রেন ধরে ক্যানিং। ফিরতও রাত নটা-সাড়ে নটা নাগাদ। এ বাড়িতে অনিমার মোটে থাকতে পছন্দ হত না। যদিও নিজেদের সেকেলে বাড়িটাড়ি, ঘরদোর, সব ঠিকই আছে। অনিমার দেওর, ভাসুর, সবাই তখন একসঙ্গে। অনিমাদের জন্যে বরাদ্দ হয়েছিল রাস্তার দিকের সেই ঘরটা, ফাটা দেয়াল, বাইরে থেকে অশ্বত্থ গাছের চারা গজিয়েছে, দু-একটা বুনো লতাও। সামনে একটা ডোবা ছিল। অনিমা বিয়ের সময় ত দেখেছে ডোবাটাতে জল আছে। এই দশ বারো বছরে ডোবাটা শুকনো, ভাসুর খরচ করে ভরাটও করেছিল। হয়তো ভাগরাটোয়ারা হয়ে গেলে এ দিকটা ভাসুররাই নেবে। এখানে হয়তো বাড়ি তুলবে একটি ছোট্ট মতো।

সুজিতের মুখে দীপক মজুমদার বলে একজনের নাম তখন খুবই শুনত অনিমা। ললিতার ব্যাপারটা এখন অনেক ফিকে হয়ে গেছে। বস্তুত ললিতারা কোনোদিনই এ পাড়ায় বড় একটা আসত না। বিয়ের পর দু-কি তিনবার এসেছে হাতে গুনে অনিমা বলতে পারে। এমনিতে বাইরে থেকে তো কিছু বোঝার উপায় নেই ললিতাকে। আপাতদৃষ্টিতে বেশ ভদ্র, মার্জিত। এক ফোঁটা ঔদ্ধত্যের ভাব নেই। ললিতা, বলতে নেই, অনিমাকে বেশ পছন্দই করত মনে হয়, বেশ গূঢ় কথাবার্তা বলত। এমনকি, সুজিত বাড়িতে নেই জেনে যে সঙ্গে-সঙ্গে ঝেড়ে পুড়ে উঠে পড়া, তেমন কোনোদিনই দেখেনি অনিমা। এপাড়ায় এলে যেন অনিমার সঙ্গে চাট্টি গল্পগুজব করার জন্যেই এসে বসত। ঠিকই বোঝা যায়। মিথ্যে বলে লাভ কি? সুজিত বা সুজিতের বন্ধু অসীম, দুজনে মিলে ললিতার অতীতে, যে প্রভাব বা ছাপ রেখে গিয়েছিল, সেটা তো সর্বজনবিদিত। লোকে বলতই, ললিতা আসলে দুজনের

বক্ষিতা। সুজিত আব অসীম। এনিযে সুজিত বা অসীমেব মধ্যেও নিজেদেব কোনো বিবোধ নেই। আশ্চর্য সহাবস্থান! সুন্দব ভাগাভাগি কবে নিযেছে ললিতাকে। সময, দিন, ক্ষণ পর্যন্ত ভাগ কবা আছে। অতীতেও কখনোই তিনজনকে একসঙ্গে প্রকাশ্যে দেখা যায নি। কখনো অসীম ললিতা। কখনও সুজিত-ললিতা। কখনও আবাব অসীম-সুজিত। একেবাবে অংকেব মত।

অসীম তাবপরে একসময মিলিটাবিতে চলে যায। প্রথমে এমনি সেপাই হযে ঢুকেছিল ঠিকই, কিন্তু অসীমও আস্তে আস্তে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে। শিলংযে গ্র্যাজুযেট হয। কমিশনড্ সার্ভিসেব পবীক্ষা দিতে-দিতে ডবল অধ্যাবসায এবং জোবে একসময পেযেও যায। সেকেণ্ড লেফটানেণ্ট, পুরোপুবি লেফটানেণ্ট হযে-হযে সে এখন ক্যাপ্টেন। দিব্যি আছে বোঝা যায। বাঙ্গালোযেব একজন কর্ণাটক-মেযেকে বিযে কবেছে, বেশ লম্বা চওডা। এখানে সেখানে ঘুরে ঘুবে বেডাচ্ছে। অবশ্য কলকাতায ছুটিতে এলে নিশ্চযই নিজেব বাডি ছাডাও সুজিতদের বাডিতে এসে থাকে। ইযার্কি ফাজলামি মাবে। অনিমাকে বেশ মান্যও কবে। যা হোক।

দীপক মজুমদার সম্পর্কে সুজিতেব একটা বাগ, আক্রোশ, বেষাবেষি বেশ ভালোভাবেই দানা বাঁধছিল। অনিমা প্রথমে ভেবেছ, ও ' দু-চারদিন। সুজিতকে তো অনিমা চেনে? ঐ দু-চারদিন যা হোক একটু খিস্তিখাস্তা, গালমন্দ কবে পবে আবাব এবা ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যাবে। তারপব দেখল, না, নাহ, সুজিত যেন এখন সব ছেডেছুডে দিযে ঐ দীপক মজুমদারকে নিযেই পডেছে। অথচ দীপক মজুমদাব সুজিতেব ডিপার্টমেণ্টেব কেউ না। সুজিত ক্ষুদ্র-সেচ। দীপক মজুমদাব, ব্লক। বাতদিন ঠোকাঠোকির কোনো চান্সই নেই। তাছাডা সুজিতেব কাছেই শুনেছে, একজনের অফিস এ মাথায, আরেকজনেব ও-মাথায।

সুজিতের নিজেব কাছেই ব্যাপাবটা জানা যাক্। আসলে সুজিতের মধ্যে একটা কেমন যেন মানসিক পবিবর্তন এসেছিল। এসেছিলই। সে যেমন তার চেতনাকে কখনোই জলাঞ্জলি দেযনি, তেমনি আবাব চাবপাশ নিযেও বড বেশী মাথা ঘামাত। কিছুতেই কিছু মেনে নিতে পাবত না! যেমন, পশ্চিমবাংলাব পবিবর্তিত ব্যবস্থা, বামফ্রণ্ট, জ্যোতিবাবুর মত অমন দক্ষ প্রশাসক, তাব ভিত্তিতে দাঁডিযে সবকাবী কর্মচাবীদেব সাধারণ মনোভাব, মিডিওক্রেসি, এসব নিযে কখনো গভীবে ঢুকতে চাইত না সুজিত। তার একবগ্গা কথা, আমবা অনেক ঘাম বক্ত ঝবিয়ে দেশের আবহাওযা পাল্টাতে

সাহায্য করেছি, সুতরাং আমরাই এর ভালোমন্দ বুঝব। ভূঁইফোড় কর্মচারী সমাজ, দালাল কর্মচারী সমাজ, যাদের অতীত ইতিহাস অত্যন্ত ন্যক্কারজনক, সমাজতন্ত্রের পরিপন্থী, এমনকি সরাসরি যারা তৎকালীন গুণ্ডা সরকারের ছোট-বড়-মাঝারি লেখকদের সঙ্গে সরাসরি রাতের অন্ধকারে হাত পর্যন্ত মিলিয়েছিল, টাকাপয়সা পর্যন্ত ভাগ বাঁটায়ারা করেছে, এবং বাড়ি বয়ে নেতাদের ভাগের টাকা দিয়ে এসেছে, তারপর উচ্ছিষ্ট যা পেয়েছে গুটিয়ে নিয়ে বাড়ি চলে এসেছে এবং সুজিতদের মতো আন্দোলন-মনস্ক কর্মচারীদের সরাসরি ক্ষতি করেছে অহোরাত্র, তাদের সুজিত কখনো ক্ষমা করতে পারবে না। ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে পারবে না। দীপক মজুমদার অতীতে সেই শ্রেণীর কর্মচারী, এখন ক্যানিংয়ে এসে যখন সুজিত দেখল, দীপক মজুমদার ঐ জোনের কোনো পোর্টফোলিওধারী নেতা না, এমনকি এক্সিকিউটিভ মেম্বারও নয়, অথচ সমস্ত ব্যাপারে দীপক মজুমদারই এগিয়ে এসে দালালি করার চেষ্টা করছে, কর্মচারীদের কাছে, সতী সাজছে, নিজেকে কট্টর বামপন্থী বলে প্রমান করতে চাইছে প্রতি পদে-পদে, সুজিত একেবারে গোড়া থেকেই মেনে নিতে পারেনি। তার কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস, এন আর, এস থেকে তাকে যদিও সব বুঝিয়ে বলা হয়েছিল। পরবর্তী কমিটিতে সুজিত জোনাল সেক্রেটারি হবে, এটাও প্রায় নিশ্চিত। আবার নতুন করে সংগঠন-সংগ্রাম শুরু করবে—ঠিক তখনই সুজিত কতগুলো ছেলেমানুষি করে ফেলল। একদিন ক্যানিংয়ের সমিতি অফিসের ঘর থেকে দীপককে বার করে দিল, গালাগাল আর ঘাড়ধাক্কা দিয়ে। দীপক তখন সত্যি-সত্যিই সমিতির কিছু জরুরী কাগজপত্রের কাজ করছিল। সুজিত তাকে শুধু বারই করে দেয় না, এমন বলেও শাসায়, বেশী বাড়াবাড়ি করলে দীপকের ক্যানিংয়ে ঢোকাই নাকি সে বন্ধ করে দেবে! চেষ্টা-চরিত্র করে তাকে একেবারে উত্তরবাংলার ঢুকিয়ে পুরুর কি মাথাভাঙ্গার মতো ব্লকে বদলী করাবার ব্যবস্থা করবে।

কেন্দ্রীয় কমিটি ব্যাপারটি ভালোভাবে নেয় নি। এটাই সুজিতের প্রথম একটা প্রতি বেদনাদায়ক ধাক্কা। আর সেই কমিটির মূল অংশে সে তখনই মনোজ চক্রবর্তীকে দ্যাখে, লক্ষ্য করে। একদিন এন. আর এস-এ ডেকে পবিত্রদা, মুরারীদা, বিমলদা, ইন্দ্রদা, সুজিতকে ভালো করে বোঝায়। এদের সবার সঙ্গেই সুজিতের প্রায় গত পনেরো-ষোল বছরের যোগাযোগ। সুজিত তবু পুরোপুরি মেনে নিতে পারে না। ঠিক আছে, অনুকূল পরিস্থিতি এসেছে, তা বলে দীপক মজুমদারের মতো অতীতের কুখ্যাত চিহ্নধারী কর্মচারীর সঙ্গেও

গলায গলা মিলিয়ে চলতে হবে? কেন! কর্মচাবী আন্দোলনের এখন এতোই খারাপ পবিস্থিতি নাকি? না, না, পবিত্রদা, মুবারীদা—আপনারা আমাকে বোঝাতে পাবছেন না, আমাকে বুঝতেও পারছেন না—আমরা অনেক লডাই করেছি, এখন নতুন কবে লডাই কবতে নামাব সময আমবা কোনো গোঁজামিল দিযে চলতে চাই না—একদম ছাঁকা, বাছাই কর্মচারীবন্ধু, কর্মীদের নিযে সুষ্ঠু ভাবে চলতে চাই।

এমন সময় মনোজ চক্রবর্তী, তাব বিডিব বাণ্ডেলটি একপাশে সরিযে বেশ ঝাঁঝেব সঙ্গেই বলে, 'সুজিতদা, আপনি কিন্তু নিজেকে নিজেই আধখানা খেযে বসে আছেন। এই সেই মুহূর্ত আমাদেব সামনে এসে হাজির, যখন নিজেদেবও পরিস্কাব কবে নিজেবা বুঝতে পাবব! ববং অতীতেই আমবা অনেক আবেগ, মনের মধ্যে অনেক আবর্জনা হাতে নিযে চলেছি। ঐ যা বললাম, অনেকেই নিজেকে আধখানা করে খেয়ে ফেলেছি নিজেই! পঙ্গু হযে গেছি ভেতরে-ভেতবে। তো, কি কবে, কর্মচাবী সমাজকে নেতৃত্ব দেব এই পবিবর্তিত পবিস্থিতিতে বলুন? এতদিন একটাই ইস্যু ছিল, সবরকম দমন পীডন, এ্যাসমা নাসা কালা কানুন, মিসা, সব কিছু ব্যাপাবেই কর্মচাবীদের প্রতিবোধ গডে তোলা। এমনকি যাতে খুন না হয, আরো নানা হাজাব বকমের সামাজিক বাধাগুলো না ক্রিযেট হয? কিন্তু এখন কি? আমাদের এসব ভয নেই। অথচ কর্মচাবীদেব মানসিকতা অন্যদিক থেকে আমাদের বুঝতে হবে কমবেড। বিচাব আমরা কবব, বাছাই আমবা কবব, ঠিকই আছে —কিন্তু সেই সঙ্গে নেতৃত্বেব লাইনও তো আমাদেব আমূল পাল্টাতে হবে, একেবাবে খোলনলচে বদলে দিতে হবে, এটা বুঝতে পাবছেন না?'

আরো বহুবাব এরকম বসা হয। শুধু এন আব এস নয। বহু জাযগায় রাইটার্সে দুপুর বেলা। মৌলালিব সুন্দববন অফিসে বাব পাঁচ-ছয। আর প্রত্যেকবাবই মনোজেব সঙ্গেই সুজিতেব আলোচনা, সমালোচনা হয় বেশী।

সেবার ক্যানিংযে জোনাল কমিটি গডাব সময, সুজিত সম্পাদক হতে অস্বীকাব কবে। এক্সিকিউটিভ কমিটিতে ততক্ষণ তাব সঙ্গে দীপক মজুমদাবও ঢুকে পডেছে। ১১ জনেব কমিটি। সুজিতেব নাম প্রস্তাব কবায, সুজিত অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে তাব প্রতিবাদ কবে। পুরনো সম্পাদক রণবেশদাকেই বাখতে হয নতুন সম্পাদক হিশেবে। যদিও রণবেশদাব বদলীর অর্ডার হযে গেছে, ক্যানিং থেকে তিনি চলে যাবেন। এটাই কেন্দ্রীয কমিটির ইচ্ছে ছিল, সুজিতকে দিযে নতুন করে ঐ এলাকার নেতৃত্ব তাঁবা দেওযাবেন।

সুজিত নিজেই বেঁকে বসে। শেষে রণবেশদা সম্পাদক এবং দীপক মজুমদারকে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করা হয়। সুজিত কোনোরকমের পদ নিতেই অস্বীকার করে আর। শুধুমাত্র কমিটি মেম্বর, সেটাও সুজিত আপত্তি করছিল। আসলে দীপক মজুমদারের কর্ম তৎপরতা তখন দেখবার মত। ঠিকই, কংগ্রেসী আমলে দীপক মজুমদারকে পদস্খলন হয়েছিল। সে সরাসরি তৎকালীন শাসকশ্রেণীর এক কুখ্যাত মন্ত্রীর সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ করত, শলাপরামর্শ করত, টাকার ভাগ-বাটোয়ারা করত, বহু বাম মনোভাবপন্ন কর্মচারীদের গতিবিধি বলে দিত। কিন্তু দীপক মজুমদার হঠাৎ যেন মরিয়া হয়ে উঠে অত্যন্ত বেশীরকমের কর্মচারীদরদী হয়ে উঠল বাতারাতি। তার কর্মক্ষমতার তারিফ করতেই হয়। কোনো লজ্জা, সংকোচ কিছুকেই সে পাত্তা দেয়নি। এমনকি সুজিতও যখন-তখন তাকে অপমান করত, কুকুর-ছাগলের মতো ব্যবহার করত, এবিষয়ে ও দীপক মজুমদারে কোনো ব্যাজার মুখ কেউ কখনো দেখেনি। বরং সে হাসত। সুজিতকে অনুনয় বিনয় করত।

ক্যানিংয়ে জোনাল কমিটি হয়ে যাবার পর সুজিত আরো বেশীরকম বসে গেল ইচ্ছে করেই। নিজেকে সরিয়ে নিল ভীষণভাবে, প্রত্যেক ব্যাপারেই। সে কমিটি মিটিংয়ে তো যেতই না, এমনকি ধীরে ধীরে সবকিছু প্রোগ্রাম, মিছিল, সাধারণ সভা, ডেপুটেশন সবকিছু থেকেই নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকল। অবশ্য কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস, এন. আর এসে-এ প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা যেত, গিয়ে বসে থাকত, গল্পগুজব করত, দেখত, সমস্ত কর্মচারী বন্ধুরা কি সুন্দর মুখ বুজে সমিতির কাজ করে যাচ্ছে একমনে। দোতলায় পোষ্টারিং লেখা হচ্ছে। ছাপা পোষ্টারিং বিলি হচ্ছে। সেই কর্মচাঞ্চল্যে সুজিত শুধু একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে-খেয়ে সময় কাটাত। সমিতির দফায় দফায় আসা চা খেত। কখনো কখনো দাদাদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে আলোচনায় যোগ দিত। পোলাণ্ডের সলিডারিটি, চীনের নতুন নেতৃত্ব, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের মনোভাব বা ফিদেল কাস্ত্রো কি আরাফত। দিব্যি ঝাড়া হাত-পায়ে বাড়ি চলে যেত।

এমন সময় সুজিতের বাড়ি ভাগাভাগি হয়। রণেল রোডের পৈত্রিক বাড়ি আর লাগোয়া কিছু জমি। অনেককাল নোংরামি, কেচ্ছা-কেলেংকারি, অনেক মানসিক জটিল দ্বন্দ্ব এসে উপস্থিত হয়। ঘরে-ঘরে, শরিকে-শরিকে পাঁচিল উঠে যায় বড়-বড়। একেকটা অংশ জাষ্ট একেকটা পায়রার খোপ হয়ে পড়ে। তার চেয়েও বোধহয় ছোট এবং কুৎসিত। সুজিত মার দায়িত্ব

প্রথমে এককভাবে নিতে চায়নি, একদিন তাও দেখল, ছোটভাই মাকে মেরে ঘর থেকে বার করে দিল। সবটাই চরম ব্যবস্থা একেবারে। সুজিত ঐ ছোট্ট অংশের মধ্যে কোনোরকমে মাকেও নিয়ে নেয়। সুজিতের নিজস্ব চিলতে ঘরটা মাকে ছেড়ে দেয়। সময়ে সময়ে মার খাটের তলায় গিয়ে দুপুর বেলাটা ঘুমোয়, ছুটির দিন-টিন।

ললিতা সরকার এর মধ্যে হঠাৎ পালিয়ে যায়। সব ছেড়ে ছুঁড়ে। সুজিত শুনল, আরব-দুবাই, না কোথায় চলে গেছে। না, কেউ ফুঁসলে নিয়ে যায়নি। নিজেই উদ্যোগী হয়ে, যোগাযোগ করে, হয়তো শরীরের শেষ মূলধনটুকু সম্বল করেই—। বললে একেবারে মিথ্যে বলা হবে না—চল্লিশোর্ধ বয়সেও ললিতার বেশ চটক ছিল. যথেষ্ট হেলতে-দুলতে পারত। ওকে নিয়ে অনেকবার নাড়াচাড়া করে-করেই, সুজিত মাঝে মাঝে ভাবত, আরো চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর অনায়াসে কাটানো যায়। মরা হাতি যে লাখ টাকা—সত্যি কথাই।

একসময় সুজিত হঠাৎ তার ঘরদোরগুলো মেরামত করার কথা ভাবে। একফালি জায়গা আছে তার ভাগে সেখানে এক চিলতে রান্নাঘর একটা ছোট্ট করিডর এসব করার একটা পরিকল্পনা নিয়ে ফেলেছিল। ধারধোর করেছে কিছু-কিছু, সে সময় একটা ডিপার্টমেন্টাল কাজ চলছিল গভীর নলকূপের। সেখান থেকে কিছু সিমেন্ট সাময়িকভাবে তার বাড়ির কাজে সে লাগাতে পেরেছিল। অবশ্যই পরে আস্তে-আস্তে সিমেন্টের দাম যথাসময়ে পুরিয়ে যথাস্থানে সিমেন্টের হিশেব ঠিক রাখবে এই মানসিকতায়।

ক্যানিং অফিস বিষবৎ হয়ে ওঠে। একে তো সমিতি-টমিতির সঙ্গে তখন আর বিন্দুমাত্র যোগাযোগ নেই। তার ওপর একটা বিলের ব্যাপারে এক ঠিকাদারের সঙ্গে বচসা, হাতাহাতি. এসব থেকে, ফুসকুড়ি একদিন বিষাক্ত হয়ে যেভাবে শেষ পর্যন্ত গোটা পা কি হাতই কেটে ফেলতে হয়, অসাবধানতার ফলে, সেরকম অসাবধান হয়ে, একটা বিশ্রী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। অফিসে যায় না প্রায়ই। বাড়ি থেকে, রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে তবে অফিসে নিয়ে আসতে হয়। সমিতির এন, আর, এস অফিসেও বেশী আর যাতায়াত করে না। মাঝে মাঝে একা একা মদও খায়। বিলেতি, দিশি, যাই-ই হোক। অর্থাৎ কোনো ব্যাপারেই আর কোনো ইনভলভমেন্ট নেই। জীবনটাকে সে প্রায় এরকম ভাসিয়ে দিয়ে নিজে চুপচাপ নৌকোর ওপর শুয়েই ছিল বলতে গেলে।

অফিসেও ঝামেলা বাড়তে বাড়তে সে প্রায় সাসপেণ্ড হতে-হতেও বেঁচে যায়। যে সিমেণ্টের গরমিল করেছিল সেটা ধরা পড়ার উপক্রম হয়। যদিও অনিমাকে চিঠি-টিঠি লিখে, টাকাপয়সা আনিয়ে, এনকোয়ারি অফিসারকে ঘুষ খাইয়ে-টাইয়ে সুজিত কোনোরকমে পার পায়।

অথচ তার সমিতির এক বিন্দু সাহায্য এসব ব্যাপারে সে হাতে নেয় না।

মেয়ে মহুয়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষার সময় হয় আবার হয়েও যায়, মেয়ে পাশ করে হায়ার-সেকেণ্ডারিতে ভরতিও হয়।

খুব কপালজোরে একসময় মন্ত্রীমহলের একজনকে দিয়ে করে কোনোরকমে ১৯৮৯-র গোড়ায় সুজিত খোদ মহাকরণে একটা বদলীর ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। ততক্ষণে সমিতি অনেক দূরে চলে গেছে—পবিত্রদা, মুরারীদা, বিমলদা, অনেক দূর, কেউ কেউ রিটায়ারও করে যাচ্ছেন বোধ হয়। মনোজ চক্রবর্তী গত সম্মেলন এবং এই সম্মেলন দুবারই সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয় সমিতির।

সুজিত কলকাতায় আসার পর আরো অনেক গুটিয়ে যায়। অথচ নিত্যনতুন পট পরিবর্তন হচ্ছে, সারা বিশ্বে রাজনীতির একটা জোর তৎপরতা। ছোট ছোট মুক্তিকামী দেশগুলো একে একে মুক্তির স্বাদ পাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় ম্যাণ্ডেলা, শহীদ কবি মোলায়েজ, এদিকে প্যালেষ্টাইন, আরব দেশ, নতুনভাবে নিগ্রো ভাইদের চেতনা সারা পশ্চিমবাংলাব্যাপী টি ভি, ভি. সি আর ব্লুফিল্ম আর খবরকাগজগুলোর ন্যক্কারজনক অন্তঃসারশূন্য ভূমিকার প্রভাব—এভাবে ভাসতে-ভাসতে আর পাশ ফিরে শুতে-শুতে যখন একরকম ভাবে সময় বয়ে যাচ্ছিল, সুজিত হঠাৎ ঐ ১৮ মার্চ, ১৯৮৯, সন্ধ্যার একটু পরে মনোজ চক্রবর্তীকে এরকম ওয়েলিংটন দিয়ে হেঁটে এসে মৌলালির দিকে যেতে দেখল আপন মনে। আজকাল তো আর একেবারেই দেখা হয় না। অথচ মহাকরণে মনোজও কাজ করে, দেখা হবে কি করে, দুজনে এখন একেবারে দুই ভিন্ন মেরুর যে। এতক্ষণ ধরে তো সেভাবেই ধীরে ধীরে দেখা গেল, কোথা থেকে কি পর্যন্ত হয়ে গেছে।

মনোজ চক্রবর্তী হেঁটে চলে গেছে, দু-এক মিনিটের মধ্যেই সুজিত হঠাৎ মনোজের প্রতি দারুণ ভালোবাসা অনুভব করে। কোনো সংঘাত না, অভিযোগ না, আক্রোশ না, হিংসা না, একেবারে নিখাদ, নিপাট ভালোবাসা।

দারুণ একটা অন্তরের টান। অথচ এরকম মনে করবার কোনো কারণ নেই। কোনো মানেও নেই।

কিন্তু সুজিত সে-সব শুনবে কেন? হঠাৎই আর্জনার স্তূপের মধ্যে দীর্ঘদিন থাকতে-থাকতে এবং তার ওপর আবর্জনার স্তূপ আরো জমা হয়ে-হয়ে তাকে একেবারেও ঢেকে তলিয়ে ফেলতে পারত যেন ধীরে ধীরে সব কিছু সরিয়ে তার মাথাটা জেগে ওঠে, তারপর সারা শরীর, গায়ে-ভরতি শুধু আবর্জনা। মাথায় আবর্জনার স্তূপ। চুলের ওপর এত, চুলের রঙ দেখা যায় না। একটা কিম্ভূতকিমাকার সত্ত্বা হঠাৎই এই সন্ধ্যে সাতটার সময় ওয়েলিংটনের মোড়ে একটা কালোমতন একটু বেঁটে মতন, মাঝারি চেহারা ও বয়সের মানুষের মধ্যে যেন এসে ওকে প্রবলভাবে নাড়িয়ে দিয়ে যায়।

সুজিত মুহূর্তে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল। সে জানত মনোজ কখনো বাসে উঠবে না, কি ট্রামে উঠবে না। এভাবে হাঁটতে-হাঁটতেই, মাথাটা একবার এপাশে দুলিয়ে আরেকবার ওপাশে দুলিয়ে, বুটজুতোর মশমশ শব্দ করতে-করতে, কাঁধে সাদা ব্যাগটা ঝুলিয়ে, যাতে বোঝাই কাগজপত্র সব, সমিতির, মনোজ এভাবেই মাঝে-মাঝে এক আধটা বিড়ি ধরিয়ে-ধরিয়ে ঠিক নীলরতন মেডিকেল কলেজের এমার্জেন্সির দরজায় পৌঁছে যাবে, তারপর ভেতরের দিকে ঢুকে একবারে সমিতির কেন্দ্রীয় অফিস-ঘরটায়।

সুজিত হঠাৎই সামনে একটা প্রাইভেট বাস পেয়ে গেল এবং লাফিয়ে উঠল। যে করেই হোক্ তার মনোজের আগে গিয়ে ঐ এন আর এস-এর গেটে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। সে মনোজের সঙ্গে কথা বলবে। বেশ কয়েকটা জরুরী কথা। খুব সংক্ষিপ্ত করেই বলবে। মনোজকে মিনিট পাঁচেকের জন্যে গেটে দাঁড় করিয়ে। মনোজের সঙ্গে কিছু কথা বলা সুজিতের পক্ষে একান্ত জরুরী! এখুনিই। একবার মনোজ সমিতি-অফিসে ঢুকে গেলে সুজিত আর মনোজকে কিছু বলতে পারবে না।

বাসের গেটের কাছাকাছিই ছিল সুজিত, যদি মনোজকে হেঁটে যেতে দেখা যায় বাঁদিকের ফুটপাত দিয়ে! কিন্তু ঠিক লক্ষ্য করে উঠতে পারল না।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই সুজিত গিয়ে ঠিক-ঠিক নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে পারল। মনোজ নিশ্চয়ই এখনো হেঁটে হেঁটে এতটা পৌঁছুতে পারেনি।

সুজিত মনোজের অপেক্ষা করতে থাকল।

ধুনারীর বন্দুক

তন্ময় মজুমদার

মজঃফরপুরের এক গ্রামে জাহিরের ভিটে। একসময় কিছু জমিজমাও ছিল। ও জন্মাবার কয়েক বছর আগে ওর বাবা কলকাতার উপকণ্ঠে একটা জুট মিলে চাকরি করবার তাকিদায় ভিটে মাটির বাইরে বাড়তি জমিটুকু বিক্রী করে দিয়েছিল। জমি বিক্রী করা টাকায় একদেশীয় একজন দালাল মারফত ইউনিয়ন নেতা এবং মিলের লেবার অফিসারকে ঘুষ দিয়ে সেই জুট মিলে একটা চাকরি পেয়েছিল সে। চাকরি পাবার পরই জাহিরের বাবা স্থির করেছিল একদিন ইউনিয়নের নেতৃত্বে গিয়ে ঘুষ দেওয়া টাকার বহুগুণ টাকা ঘুষ খেয়েই উপার্জন করতে হবে। সেই টাকায় হারানো জমির বহুগুণ বেশী জমি সে দেখে কিনবে। এই শ্রমিকটি পরিকল্পনা-মাফিক ঠিকই এগুচ্ছিল। ক্রমশঃ কর্মস্থলে গুরুত্বও অর্জন করেছিল। তবে, চাকরিতে যোগ দেবার পর থেকেই একটা বেদনা নিত্যসঙ্গী ছিল তার। গ্রামে থাকতে এক ওস্তাদের কাছে সারেঙ্গী বাজানো শিখতে যেত। চাকরি পাবার পর নেতা হবার জন্য বাড়তি পরিশ্রম করতে গিয়ে সেই শিক্ষার চর্চা করবার সময় আর সে পাচ্ছিল না। তবে মাঝে মধ্যে শৈশবে কেনা সারেঙ্গী আর তার ছড়টার ধুলো ঝেড়ে আনমনে উটের নাড়ি শুকিয়ে তৈরী করা তারে হাত বোলাতে বোলাতে জাহিরের বাবা সারেঙ্গীর তারে নাক স্পর্শ করে ঘ্রাণ নিত। সেই সময় মনে পরত ছেলেবেলা। এমন ঘ্রাণে মনটা বিবশ হয়ে চলে যেত দূর মরুভূমিতে যেখানে উট ঘুরে বেড়ায় কাঁটাঝোপের সন্ধানে। তারপর সে সারেঙ্গীটা তুলে নিয়ে দ্রুত ছড় টেনে সুরের মূর্চ্ছনায় বাতাসের দেয়াল কাটত। যদিও এমন বাজনা শুনে ওস্তাদ রেগে গিয়ে বলতেন, এই বকরীর বাচ্চা কি বাজাচ্ছিস ওটা? কিছুই তো হচ্ছে না।

কিন্তু তার নিজের মনে হতো এই বাজনা বাজিয়েই সে খর দুপুরে মরুভূমিতে পূর্ণিমার ঢল নামাতে পারে। এমন রোমন্থনের মুহূর্তে শ্রমিকটি চোখ তুলে ছেলে জাহিরকে খুঁজত। দেখতে পেলে বলত, ব্যাটা, একটা ভালো উস্তাদের খোঁজ করছি। পেলে তোকে সারেঙ্গী বাজানো শিখাব। আমার তো সময় নেই। নইলে আমি কি কম কিছু! লাইনে থাকলে

এতদিনে আমার ভী ফানশান থেকে ডাক আসত। বেটা শুঁকে দেখ উটের নাড়ি পাকিয়ে তৈবী কবা তাবে কেমন কস্তুবীর খুশবু!

ঘুস পাবাব যোগ্যতা অর্জন কববাব আগেই এই শ্রমিক নেতাটি মাবা গিয়েছিল। তবে মববার আগে জাহিরকে বদলি শ্রমিক হিসাবে ঢুকিয়ে দিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে জাহিবেব চাকবি পাকা হয় তাব। তাব সারেঙ্গী বাজানোব শিক্ষা আর নেওয়া হয়নি। জাহির নিয়মিত তার বাবার প্রিয় সাবেঙ্গীটা ঝাড়মোছ কবে রাখে। নিযমিত তাবে নাক লাগিদে কস্তুবীব খুশবু পাবাব চেষ্টা কবে। প্রাচীনত্বেব গন্ধ ছাড়া অন্য কিছু পায় না। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাব বাবাব কথা মনে পড়ে।

আজ আট মাস জুট মিলে লক্‌আউট। পেটের খিদে মেটাতে জাহির ধুনুরীর কাজ খুঁজে নেয়। পিঠে যন্তব নিযে সে পাড়ায় পাড়ায় ঘোরে। খুব করে ডাক ছাড়ে, এ্যাই বালিশ তুলো । সঙ্গে আরেকটি তুলোব বস্তা, কাপড়েব থান নিয়ে ঘোবে। যন্তবেব তাঁতে সে যখন দিস্তা মেবে তুলো ধোঁনে আওযাজ ওঠে, ধুনচ্‌ ধুনচ্‌ ধুনচ্‌। অবসন্ন হলে বিশ্রামের মুহূর্তে গা থেকে তুলোর আঁশ ঝাড়তে ঝাড়তে তার মনে হয়, যন্তরের তাঁতটাও তো উটের নাড়ি পাকিযে তৈরী। তবে দিস্তাটার সঙ্গে ছড়ের তেমন মিল খুঁজে না পেয়ে দুঃখ হয় তার। আবাব কাজ শুরু কবলে সুব ওঠে, ধুনচ্‌ ধুনচ্‌ ধুনচ্‌। তখন প্রয়াত বাবার উদ্দেশ্যে মনে মনে বলে, আব্বা, সাবেঙ্গী বাজানো শেখা হলো না ঠিক তবে আমি যন্তব বাজানো শিখেছি।

প্রথম কযেক মাস জাহিব সময় পেলে কাবখানাব গেটে যেত ইউনিয়ন-মালিক আলোচনাব খবব নিতে। যা খবব পেত তা হলো: বাই-পার্টাইট আলোচনা চলছে, এরপব ট্রাই-পার্ট্রাইট আলোচনা হবে, ওযেজ ফ্রিজ কবতে চাইছে ওবা, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডেব জমা না নেওযা টাকা মালিক ধাব হিসাবে চাইছে ই এস আই-এব টাকা মালিক চোট কবে দিযেছে, মুখ্যমন্ত্রী বিদেশে গিযেছে—ফিবে এলে কিছু একটা হবে, অর্থমন্ত্রী রাশিয়া থেকে ফিরে এসে চোদ্দ দফা মীমাংসা সূত্র দেবে, শ্রমমন্ত্রী চীন থেকে ফিবলে মালিকেব কান টেনে ছিঁড়ে নেবে ইত্যাদি।

এসব সংবাদের অর্থ সে বুঝতে পাবে না। সবই কতগুলো কর্কশ শব্দ বলে মনে হয। ও যখন খবব নিত তখন সহকর্মীরা তাব যন্তর নিয়ে কাড়াকাড়ি কবত। শ্লোগান দেবাব জন্য গেটেব সামনে ইউনিযনেব শিবিবে

যে মাইক্রোফোনটা আছে তার সামনে যন্ত্রটা নিয়ে তাঁত টান দিয়ে টংকার তুলত, মহাকাব্যের বীরদের মত। কিছুক্ষণ অবস্থানের পর জাহিরের মনে হতো এখানে বসে থেকে এমন সব অর্থহীন কথাবার্তা শোনার চাইতে বেরিয়ে যাওয়া ভাল। ও প্রিয় সহকর্মী দু'একজনকে পেলে সঙ্গে নিয়ে কিছুটা দূর এগিয়ে যেত। চা বিড়ি খাওয়াত। কখনো সখনো দু'চারটাকা ধার দিত। তারপর সঙ্গী তুলোর গাঁটবিবাহক বালকটিকে নিয়ে রাস্তায় নেমে আওয়াজ তুলত, এ্যা-ই-ই বালিস তুলো। যন্তরের তাঁতে টংকার দিয়ে দুটো ডাকের মধ্যে ফাঁক ভরাত।

জাহির ভেবেই নিয়েছে কারখানা গেটের তালা আর খুলবে না, অশীতিপর বৃদ্ধের হাইড্রোসিলের মত এ তালা জুটমিলের অবশিষ্ট জীবনের সঙ্গী হয়ে গিয়েছে। তবুও মিল গেটে যায় সময় পেলেই, খানদানি সম্পর্কের কারণে। এছাড়া জীবন, মধু, ইলিয়াস, প্রসাদ এই সমস্ত পুরানো সহকর্মী বন্ধুদের খোঁজ খবরও পাওয়া যায়। প্রত্যেক দিনই ফেরে বিষাদ নিয়ে। রুক্ষ চুল, ছেঁড়া শার্ট, কাঙালের মত চেহারার এত দিনের পরিচিত মানুষগুলোকে মাঝে মধ্যে চিনে নিতে কষ্ট হয় তার। এছাড়া দারিদ্র বোধহয় অতি ভালো মানুষের স্বভাবও নষ্ট করে দেয়। অন্যদের কাছে শুনেছে ইলিয়াস কোন এক বেশ্যাপল্লীতে চোলাই মদ বেচে। সেখানেই থাকে। বৌ বাচ্চার খোঁজও নেয় না। একদিন ওর বৌ লজ্জায় চোখ কান খেয়ে সেখানে ইলিয়াসের খোঁজে গেলে এক বারবণিতা নাকি মারধোর করে মহিলাটিকে অপমান করে। সেই সময় ইলিয়াস লুকিয়ে ছিল বারবণিতাটির ঘরে। তবে মাঝে মধ্যে ইলিয়াস মিল গেটে আসে। খোঁজখবর নেয়। কিন্তু বেশ্যাপল্লীতে পাতা তার নতুন সংসার নিয়ে কোন আলোচনার ধারে কাছে ভেড়ে না। মধুকে একদিন জাহির চা খাওয়াতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে, দোস্ত, চলছে কি করে এত দিন?

মধু বলে, যা হোক করে চলে যাচ্ছে রে। তবে বড় খারাপ লাগে লোকে যখন বলে প্রসাদের বৌ সন্ধ্যা হলেই কলকাতার বিবেকানন্দ রোড না কোথায় যেন খাটতে যায়। কি যে হবে আমাদের!

জাহির অভিজ্ঞতা থেকে ভেবে নেয় এসব কথার উত্তর না দেওয়াই ভালো। ও বোঝে যদি কখনো কারখানা খোলে, এসব বন্ধুদের পেট থেকে

ক্ষুধায় ক্লেস মুছেও যায়, তবুও প্রসাদ সারা জীবনের জন্য বাকী সকলের খোরাক হয়ে বেঁচে থাকবে।

অন্য কেউ বলছিল একদিন, জাহির মধু তো তোমার জিগরী দোস্ত। ওকে বোঝাও যতই গরিবী থাকুক ঘরের মেয়েছেলেকে সবসময় দাবড়ে রাখতে হয়। লোকে বলে আজকাল মধুকে ওর বউ নাকি দাওয়ায় বিছানা করে দিয়ে নিজে একটা হাঁটুর বয়সী ছেলেকে নিয়ে ঘরের ভিতর মধুর বিছানায় শোয়। অবশ্য ছেলেটি এখন মধুর সংসারের সব খবচাই দেয়।

জাহির এদের বলতে পারে না, ভাই তোমাদের সব কেচ্ছা গল্পই কি আমার জন্য জমা করে রাখ? আমি তো এসব শুনতে আসি না। আমার মোটামুটি কিছু একটা করে সংসার চলে যাচ্ছে, তোমাদের যাচ্ছে না। তাই আসি যদি কখনো কোন ভাল খবর পাই যদি গায়ে গতরে কোন কাজে লাগি, যদি দু'চারজনকে এক কাপ চা খাওয়াতে পারি।

আসলে ও এই দুঃখী সহকর্মীদের কোন রুক্ষ কথা বলে আর দুঃখ দিতে চায় না। তবে কোন সহকর্মীর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনলে ওর চোখ ফেটে জল আসে, বক্তাকে সজোরে একটা থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা করে। কলহপ্রিয়তা ওর স্বভাব বিরুদ্ধ বলে ইচ্ছেটা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই সম্বরণ করে নেয়।

জাহির লোকমুখে শুনেছে জুটমিলের কোন এক শ্রমিক নাকি পরিবারের সবাইকে খুন করবার পর আত্মহত্যা করেছে। ও আতঙ্কিত হলো ভেবে, শ্রমিকটি তাদের মিলের নয় তো। আবার নিজেকে প্রবোধ দিল, এই অঞ্চলে কত মিলই তো দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ। ঘটনাটা নিশ্চয়ই আরো বেশি দিন ধরে বন্ধ হওয়া কোন জুট মিলের শ্রমিকের ভাগ্যে জুটেছে। তবুও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার জন্য তার নিজের প্রাক্তন কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা হলো। কাছাকাছি এলে এক ধরনের উদ্বেগ গ্রাস করে তাকে। হাত পায়ে কাঁপন শুরু হয়। মাথা উঁচু করে হাঁটে সে যাতে দূর থেকেই গেটে অবস্থানরত সহকর্মীদের দেখতে পায়। ভেবে রেখেছে দূর থেকে অস্বাভাবিক কিছু মনে হলে ও আর এগুবে না। এমন দুসংবাদের বিস্তারিত বিবরণে কোন প্রয়োজন নেই ওর। তবু একসময় চোখে পড়ে লাল, তেরঙা পতাকার পাশাপাশি বিরাট এক কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়েছে। পতাকাটি উড়তে পারছে না। বাঁশ দণ্ডের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। জাহির পিছন ফিরতে পারে না। বাঁশের

সঙ্গে জড়াজড়ি করে থাকা কালো পতাকাটাকে মুক্ত হাওয়ায় মেলে ধরা ওর কর্তব্য বলে মনে হয়।

মিল গেটে জাহির জানতে পারল ওর অতি প্রিয় সহকর্মী জীবন ক্ষিধের অপমান সহ্য করতে না পেরে ঘুমন্ত বৌ বাচ্চাকে কয়লা ভাঙার একটা ভোঁতা কাটারি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করে নিজে কীটনাশক পান করেছে। মৃত্যুর আগে রচিত হওয়া ওর একটা অসমাপ্ত লেখা পরে ছিল মৃতদেহের পাশে। লেখাছিল : হে ঈশ্বর মৃত্যুর পর আমায় প্রেত করো। আমি মালিক আর তার দালালদের ঘাড় মটকে রক্ত খাব এবং আমার

খবরটা শুনে জাহির এক পা দু'পা করে পিছনে হাঁটে। তারপর শরীর ঘুরিয়ে দৌড় দেয়। এক সময় খেয়াল হলো তুলো আর কাপড়ের থান বাহক বালকটি অনেকটা পিছনে পড়ে রয়েছে। বাধ্য হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে সে। অপেক্ষারত সময়টাতে বারবার ঘুরে ফিরে মনে পড়ে জীবনের সঙ্গে তার কর্ম জীবনের বহু কথা। ভয়ানক এক অস্বস্তি চেপে ধরে তাকে। এই অস্বস্তি থেকে মুক্ত হবার জন্য সে যন্তরের তাঁতে টংকার তুলে হুঙ্কায় ছোড়ে : এ্যাই বালিশ তুলো

ধুনুরী জাহির ঠিক করেছে আর সে মিল গেটে যাবে না। মিল গেটে যাওয়া তার কাছে কিছু কেচ্ছাবৃত্তান্ত কিংবা দুঃসংবাদ শোনায় সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সকাল হলে সঙ্গি বালকটিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বিকেল-সন্ধে নাগাদ ডেরায় ফেরে। এভাবে বেশ কয়েক মাস চলবার পর একদিন ডেরায় ফিরে দেখে মধু অপেক্ষা করছে। ওর চোখ এর মধ্যে আরো ইঞ্চি খানেক কোটরে বসে গিয়েছে, মাথার চুল পুরো সাদা, বোতামহীন জামার ফাঁক দিয়ে বুকের হাড়গুলো আরো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কোন ভনিতা না করে মধু বলে, জাহির ভাই ইউনিয়ন গবমেণ্ট সব বিক্রি করেছে। মালিক আমাদের ই ইস আই, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের সব টাকা ঝেড়ে দিয়ে কোম্পানির জমি প্রমোটারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। কাল পুলিশ নিয়ে দখল নিতে আসবে। আমরা সব ইউনিয়নের সাধারণ মেম্বাররা ঠিক করেছি বাঁধা দেব। যা হবার হবে। তুইও কাল একবার সকালবেলায় আয়। সবাইকে খবর দিচ্ছি। জমায়েত যত বেশি হবে ততই প্রমোটার পুলিশ এরা ভয় পেয়ে যাবে। এর মধ্যেই কোর্টের অর্ডার নিয়ে প্রমোটার মিল গেটে থান দশেক পুলিশ পোস্টিং করিয়েছে।

জাহির বলে, আমার তুলো ধুনবার যন্তরটা নিয়ে কাল ছুতোরের কাছে

যাবার কথা আছে। দেখি যাবার পথে মিল ঘুরে যাবার চেষ্টা করব। আসিস দোস্ত। সকলে মিলে আমাদের পেটে লাথ মারল। দেখি একবার শেষ চেষ্টা করে।

কথা বলে মধু চলে গেল।

তুলো ধুনবার যন্ত্রে অনেকগুলো ছোট ছোট বিচ্ছেদযোগ্য অংশ আছে। উটের নাড়ি দিয়ে তৈরি তারের মত অংশটাকে বলে তাঁত, মূল কাঠের দণ্ডটাকে বলে যন্তর, এর ওপর দিকে ছোট অর্ধবৃত্তাকার কাঠের পাতটির নাম সাঙ্গী, নিচের দিকে বড় অর্ধ বৃত্তাকার কাঠের পাটাতনটিকে বলা হয় শিড়া। এছাড়া বারবেলের মত কাঠের বস্তুটি যা দিয়ে তাঁতের ওপর বাড়ি মেরে তুলা ধুনা হয় সেটার নাম দিস্তা। মূল কাঠের দণ্ডটা থেকে অন্যান্য অংশ খুলে রেখে বেল্টের ভিতর হাত গলিয়ে জাহির যন্তরটাকে বন্দুকের মত পিঠে নিল। ছুতোরের দোকানে নিয়ে গিয়ে যন্তরটাকে কিছু জরুরি সারাই করতে হবে। ভেবেছিল মিল গেটে আজ আর যাবে না। কি হবে গিয়ে? মালিক যে ক্ষুধার কলঙ্ক চাপিয়ে দিয়েছে শ্রমিকদের ওপর তা আর কোন লড়াই মুছতে পারবে না। ইলিয়াস নিষিদ্ধ পল্লী ছেড়ে যদি আবার বাড়ি ফিরেও আসে ওর বউ সম্ভবত সব সময় ইলিয়াসের ঘামের গন্ধেও কুৎসিত রোগে সংক্রামিত হবার ভয়ে ভীত থাকবে। প্রসাদের বউ যদি তার জীবন ধারা বদলেও ফেলে কেউ তা বিশ্বাস করবে না, ফাঁকায় পেলেই পাঁচ দশটাকা দেখিয়ে বলবে, চল্ রে। মধু কি পারবে তার বাড়িতে রাতে ঘুমাতে আসা ঐ ছোকরাকে বলতে, অনেক হয়েছে। আর যেন তোকে না দেখি বানচোত! শ্মশানের ছাই থেকে মানুষের অস্তিত্বের জীবন কি আর কোন দিন পাবে সপরিবারে ফিরে আসতে? ক্ষুধার যন্ত্রণায় স্ত্রী সন্তান এবং নিজেকে হত্যা করবার কলঙ্ক থেকে জীবন তো আর কখনোই মুক্ত হতে পারবে না। জাহিরের মনে হয় তার নিজের মোটামুটি একটা সংস্থান যখন হয়েই গিয়েছে তখন আর কোন ঝামেলায় না যাওয়াই ভালো।

রাস্তায় বেরিয়ে জাহির মিল গেটের সঙ্গে তার নাড়ির বন্ধন অনুভব করল। মনে পড়ে সেই কত ছেলেবেলায় বাবাকে গেটে খাবার দিয়ে আসত। মনে পড়ে তারপর কত বছর ধরে সে নিজেও ঐ গেটে কার্ড পাঞ্চ করিয়েছে। মনে পড়ে এই মিলে চাকরি করবার জন্যই বহু বছর আগে ওর বাবা পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া জমি বিক্রি করেছিল, সারেঙ্গী বাদক হবার সাধ ত্যাগ করেছিল। ও ভুলে যায় ছুতোরের দোকানে যাবার কথা। মনে হয় মিল গেটে গিয়ে

সবার সঙ্গে ঘর্মাক্ত কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে প্রতিরোধ তৈরি করাই এখন তার একমাত্র কাজ।

নড়বড়ে একটা প্রতিরোধ তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে রেয়োনেট দেখিয়ে মুহূর্তে সেই প্রতিরোধ গুড়িয়ে দেয়। রক্তাক্ত সাথীদের হিচড়ে নিয়ে যেতে যেতে পুলিশ গবর্মেণ্ট মালিক সবার মা বাপ তুলে খিস্তি দিতে দিতে অনাহারী শ্রমিকেরা পিছু হঠছে। পিছন হঠবার সময় কেউ কেউ মাটিতে পড়ে থাকা চায়ের ভাঁড় কিংবা ভাঙা ইটের টুকরো অভিসম্পাত সহ প্রতিপক্ষের দিকে ছুড়ে দিচ্ছে। জাহির সেই মুহূর্তে মিল গেটের কাছাকাছি চলে এসেছে। রাস্তার মানুষের জটলা থেকে ছিটকে আসা টুকরো টুকরো আলোচনা শুনে জাহির বুঝতে পারল গণ্ডগোল হয়েছে। ওর খারাপ লাগে সঠিক সময়ে উপস্থিত থাকতে না পারার-জন্য। তবুও তাড়াতাড়ি পা চালায়। চলার ছন্দে পিঠে যন্ত্রটা আছড়ে পড়ে। পুলিশ ব্যাস্ত ছিল প্রোমোটারের লোকজনকে মিলের জমির দখল পাইয়ে দেবার জন্য। এমন সময় একজন সিপাই ঊর্ধ্বতন অফিসারের মনোযোগ নিবদ্ধ করায় জাহিরের দিকে। অফিসার লক্ষ্য করে দীর্ঘকায় একটা লোক দৃপ্ত ভঙ্গিতে দ্রুত হেঁটে আসছে। তার কাঁধ ও গলার সমকোণের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে একটা বন্দুকের নল। সেই সময় বুক আর কাঁধের ওপর অনেকক্ষণ ধরে সেঁটে থাকা যন্ত্রের বেল্টটা ঠিক করতে করতে জাহির অতি দ্রুত হেঁটে আসছিল মিল গেটের দিকে। অফিসার ভাবে রেঞ্জের মধ্যে পেয়ে লোকটা এবার পুলিশের দিকে বন্দুক তুলবে। মুহূর্তে ভেবে নেয় প্রায় দেড়শ গজ দূরে তার রিভলবারের গুলি পৌছুবে না। অফিসারটি সিপাইকে হুকুম করে, পজিশন!!

দূর থেকে জাহিরের হেঁটে আসা এবং পুলিশের বন্দুক তোলা অনেকের সঙ্গে মধুও লক্ষ্য করে। মধু বুঝতে পারে একটা বিভ্রমের কারণে ঘটনাটা কোন দিকে এগুচ্ছে। ও হৃৎপিণ্ড উপচানো শ্বাস নিল ভিতরে। তারপর তীক্ষ্ণ স্বরে ডাক দিল, জা-হি-ই-ই-র

বাতাসকে এলোপাথাড়ী কাটতে কাটতে সে ডাক জাহিরের কানের পর্দায় ধাক্কা মারে। ও থমকে দাঁড়ায়। মধুর কণ্ঠস্বর তাকে সাপটে জাপটে ধরে প্রযাত নানা নানীর হারানো ভালোবাসার মত। সবেবরাতের রাত বাসী হয়ে গেলে ভোরের দিকে বিচ্ছিন্ন পটকা ফাটার মত আওয়াজ হয় ধারে কাছে কোথাও। কানে সে আওয়াজ পৌছয় কিন্তু মন বিচলিত হয় না। জাহির সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকে মধুর পরবর্তী কথা শুনবার জন্য।

কেন উপজাতি

সুনির্মল দত্ত চৌধুরী

১৯৮১ সালের সেন্সাস অনুযায়ী ভারতের সংখ্যার ৭ ৭৬ শতাংশ হচ্ছে 'তফসিলী' উপজাতি ('Scheduled tribe')—মোট সংখ্যা তাঁদের ৫,১৬,২৮,৬৩৮ জন। কেন তাঁরা জাতি নয়, কেন উপজাতি?

অনেকের ধারণা, উপজাতি হচ্ছে যারা বনজঙ্গল-পাহাড়ে থাকে। কিন্তু বনজঙ্গলহীন সমতলেও বহু উপজাতির বাস। উপজাতিদের সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার মূলে রয়েছে অপরিচয়ের দুস্তর ব্যবধান। বন্য, বর্বর, জংলী, অসভ্য, হিংস্র—এইসব বিশেষণগুলি তাদের উপর নির্বিচারে বর্ষিত হয়। উপজাতি যেন একটি ভিন্ন প্রজাতি! তারা অধম, আমরা উত্তম—এরকম একটি ধারণা উপজাতিদের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয়। জেনে রাখা ভাল যে বেশ কিছু উপজাতি আছে যারা অনেক জাতির (community বা caste) চেয়ে তুলনামূলকভাবে অগ্রসর ও আধুনিক। মিজো ও খাসিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার বিশেষত নারীশিক্ষার হার অনেক জাতির তুলনায় বেশী। সততা, বিশ্বাস ও নৈতিকতার উপজাতীয় মূল্যবোধ কোন কোন তথাকথিত সভ্যসমাজের মূল্যবোধের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠতর।

উপজাতির ও জাতির প্রভেদটিকে বুঝতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে উপজাতি কি এবং কারা। উপজাতীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই উপজাতির পরিচিতি। উপজাতি হচ্ছে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাসূত্রে (Sib বা Kinship) আবদ্ধ, সীমিত আঞ্চলিকতায় গণ্ডিবদ্ধ, ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যে বিশিষ্ট একটি অন্তর্বিবাহধর্মী (en ogamous) সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠী। উপজাতীয় সমাজে 'রক্ত-সম্পর্ক ও আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে সামাজিক বন্ধন জাতি-সমাজের চেয়ে অনেক দৃঢ় ও কঠোর। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে রক্ত-সম্পর্কে গড়ে ওঠা গোষ্ঠী বন্ধন ও গোষ্ঠী চেতনা, বিচ্ছিন্নতা, অনগ্রসরতা, অনুন্নত কৃষি ও শিল্প,

আদিম ও ধর্মীয় বিশ্বাস, নিরক্ষরতা—এই লক্ষণগুলি কোন একটি এককভাবে উপজাতির অভিধা নয়। অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জাতি-সমাজেও এই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিলক্ষিত হয়। এতটুকু বলার পরেও উপজাতি ও জাতির প্রভেদটি তবু অস্পষ্ট থেকে যায়। জীবনধারণ ও উৎপাদন পদ্ধতির দৃষ্টিকোণ থেকে একটি উপজাতিকে স্পষ্টতরভাবে চেনা যায় এবং জাতির সঙ্গে তার মৌল পার্থক্যটি ধরা পড়ে। উপজাতিরা সাধারণত যৌথ প্রচেষ্টা এবং আদিম বা সহজ হাতিয়ারের সাহায্যে জীবিকার সংস্থান করে। প্রকৃতির সম্পদ তারা আহরণ করে সমবেতভাবে। খাদ্য সংগ্রহ, মাছ ধরা, শিকার, কৃষি - জীবিকার যে কোন ক্ষেত্রে এই যৌথ উদ্যোগ দেখা যায়। পথ সেতু বা গৃহনির্মাণ, বনজঙ্গল কেটে ও পুড়িয়ে জুম চাষের জমি প্রস্তুতকরণ, অথবা গ্রামের প্রশাসন ও উন্নয়ন, যেখানে ব্যক্তিগত বা পরিবারগত প্রচেষ্টা পর্যাপ্ত নয় সেখানে স্বেচ্ছায় তাঁরা সেই কাজে সমষ্টির সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। 'শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের' স্তরকে সর্বক্ষেত্রে উপজাতীয় স্তরের সঙ্গে এক বলা চলে না। বরং সীমাবদ্ধ যৌথ কৃষি এবং লাঙল-বলদের পরিবর্তে দা, খুরপি বা কোদাল জাতীয় চাষের হাতিয়ার এবং চোখা বাঁশ, কাঠ বা লোহার ছুরি, তীর-ধনুক, বর্শা ইত্যাদি, বেত, বাঁশ ও কাঠের শিল্পকর্ম তাঁদের উপজাতীয় চরিত্রকে পরিস্ফুট করে।

স্থির কোন সংজ্ঞায় অনেক উপজাতিকেই আজ চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। বাস্তব পরিস্থিতি আজ দ্রুত পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন প্রতিটি উপজাতিকেই কমবেশী প্রভাবিত করছে। কেটে যাচ্ছে তাঁদের যুগ-যুগান্তব্যাপী বিচ্ছিন্নতা, অজ্ঞতা কিম্বা নিরক্ষরতা। অতীতে গাভীর সংখ্যায় অথবা পণ্য-বিনিময় পদ্ধতিতে কোন কোন উপজাতির সীমিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা-অর্থনীতি সেখানে এক মৌলিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। আন্দামানের অরণ্যচারী ওঙ্গে আর অরুণাচলের বৌদ্ধধর্মী সভ্য ও মনপাবা স্পষ্টতই সমপর্যায়ের উপজাতি নয়। সাংস্কৃতিক বিকাশ ও অর্থনৈতিক উন্নতির বিভিন্ন স্তরে আজকের উপজাতিদের অবস্থান। শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের অর্ধ-যাযাবর আদিম পর্যায় থেকে উন্নত সেচপদ্ধতিতে চাষবাস এবং স্থায়ী কৃষিনির্ভর গ্রাম-সমাজের অগ্রগতির সামাজিক-আর্থিক ব্যবধান-দূরত্বে আজ তাঁদের অবস্থিতি। অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব কামেং জেলার উপজাতি পশ্চাদপদ সুলুং এবং নিম্ন সুবনসিরি জেলার উপজাতি অগ্রগামী আপাতানি —এই প্রান্তিক ব্যবধানের একটি দৃষ্টান্ত। উন্নয়নশীল উপজাতীয় সমাজে

উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে আজ উন্নত ধরনের হাতিয়ার এমনকি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখা যাবে। কোন কোন উপজাতীয় অঞ্চল আজ আর গ্রামীন নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি যন্ত্রশিল্প সেখানে গড়ে উঠছে। লোহিত জেলার উপজাতি খামটিরা শুধু যে লাঙলচাষই করে এমন নয়, ছোট ছোট কলকারখানা গড়ে তুলতে তাঁরা আজ উদ্যোগী।

একটি উপজাতি হচ্ছে রক্ত সম্পর্কে আবদ্ধ কতগুলি ক্ল্যান (clan) বা পরিবারবর্গের সমষ্টি। সাধারণত, উপজাতিরা অন্তর্বিবাহধর্মী এবং ক্ল্যানগুলি আপন উপজাতীয় গণ্ডির মধ্যে বহির্বিবাহধর্মী (exogamous)। কোন কোন ক্ল্যান আবার উপ-ক্ল্যানে (Sub-clan) বিভক্ত, জটিল রীতিনীতি তাদের সামাজিক সম্পর্ককে সীমিত ও নিয়মিত করে। পরস্পর-সম্পর্কিত ক্ল্যানগুলিকে নিয়ে গড়ে ওঠে উপজাতিদের ছোট বড় গ্রাম। অন্য ধরনের সামাজিক বিভাগও—phratry, moiety, sept ইত্যাদি উপজাতীয় সমাজে দেখা যায়। এই বিভাগগুলি কোন কোন ক্ষেত্রে বহির্বিবাহধর্মী এবং ক্ল্যান-বিভক্ত।

অনেক উপজাতির মধ্যে উচ্চ-নিম্ন শ্রেণীভেদ আছে, কিন্তু জাতিভেদ নেই। অরুণাচলের উপজাতীয় সমাজ সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত—নায়ক বা অভিজাত উচ্চশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী এবং অনুগত নিম্নশ্রেণী। এই শ্রেণীভেদে কর্মগত (functional), বংশগত বৃত্তি-স্বতন্ত্র (craft-exclusive) নয়। কিন্তু জাতিভেদের কিছু পূর্বলক্ষণ এই উপজাতীয় সমাজে দেখা যায়। কতগুলো শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্বিবাহে (intermarriage) বাধা-নিষেধ আছে, কিন্তু আন্তর্ভোজনে (inter dining) আপত্তি নেই, যদিও শ্রেণীভেদ অনুযায়ী কোন কোন সমাজে উচ্চ ও নিম্নশ্রেণী এক সারিতে বসে আহার করে না। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। টিরাপ জেলার উপজাতি ওয়াঞ্চলের চারটি শ্রেণীর সর্বোচ্চ ওয়াংহাম এবং সর্বনিম্ন ওয়াংপানের একত্রে পঙক্তিভোজন সম্ভব নয়। মধ্যবর্তী দুটি শ্রেণী ওয়াংশা ও ওয়াংশু 'বর্ণসংকর'—তারা সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দু'টি শ্রেণীর অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ফলে সৃষ্ট। আরেকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে আপাতানিরা। তাঁদের দু'টি শ্রেণী—মিতে ও মুরা। মিতেরা উচ্চশ্রেণী, মুরারা নিম্নশ্রেণী। মিতেরা ভূস্বামী, মুরারা অধিকাংশ ভূমিহীন। দু'টি শ্রেণীর মধ্যে আন্তর্বিবাহ অচল।

অরুণাচলের এই উপজাতীয় শ্রেণীভেদ একতা ও মৈত্রীর অন্তরায় নয়। সামাজিক ভোজ ও উৎসব-অনুষ্ঠানে, নাচগান, সভা-সমিতি ও শিকার অভিযানে তারা সবাই একসঙ্গে যোগদান করে। অস্পৃশ্যতায় তারা অভিশপ্ত

নয়। তাঁতী বলে কোন জাতি বা অন্য কোন বৃত্তিস্বতন্ত্র সম্প্রদায় তাদের মধ্যে নেই, ব্যতিক্রমের দু'টি নজীর ছাড়া। সব উপজাতির সব শ্রেণীর মেয়েরাই কাপড় বোনে। তাদের পুরোহিত ভিষক্ (tribal medicine-man), চাষী, জেলে এবং হস্তশিল্পীরা সীমাবদ্ধ নয় কোন নির্দিষ্ট বংশ-পরিবারে এবং তারা অন্তর্বিবাহ ধর্মীও নয়। তবে শৈলী, চর্চা ও দক্ষতার ফলে কিছু বৃত্তি বিশেষ পরিবার-গোষ্ঠী বা গ্রামের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ঝোঁক দেখা যায়।

আমাদের সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে উপজাতীয় সমাজের ভগ্ন-উপাদানগুলি মিশে আছে। সমাজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই উপাদানগুলি রূপান্তরিত হয়ে উপজাতি থেকে সামাজিক জাতিতে (caste) বিবর্তন এবং একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক সংহতির মধ্যে এদেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির সমাজবিন্যাস হয়েছে।

সুদূর অতীতে ভারতে ঋগবৈদিক সমাজের গড়ন কেমন ছিল? বহু উপজাতি-সমন্বিত বৈদিক আর্যরা ছিল একটি সমভাষা ও সমকৃষ্টিগত মিশ্র জনসমষ্টি। ঋগবেদের কালে (আ ১৫০০-৯০০ খ্রীষ্টপূর্ব) আর্য সমাজ ছিল স্পষ্টতই গ্রামীণ এবং উপজাতীয়। পিতৃতান্ত্রিক উপজাতীয় পরিবার গোষ্ঠীগুলিকে (clan বা sept) নিয়ে গঠিত গ্রামগুলি ছিল জোটবদ্ধভাবে এক একজন নায়কের (chief) শাসনাধীন, যাকে বলা হতো রাজন্ বা রাজা। তাদের দু'টি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'সভা' ও 'সমিতি'। গ্রাম-সংগঠনের প্রধান ছিলেন 'গ্রামানি'। উপজাতীয় বিবাদ এবং যুদ্ধে রাজাকে সাহায্য করার দায়িত্ব ছিল একজন সেনাপতি বা 'সেনানির'। তা ছাড়া ছিলেন পুরোহিত এবং উপজাতীয় ভিষক্ বা চিকিৎসক। পুরোহিত প্রায়ই চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা দিতেন। যুদ্ধে জয়লাভ এবং উপজাতির কল্যাণের জন্য রাজাদেশ অনুযায়ী প্রধান পুরোহিত যজ্ঞাদি সম্পাদন করতেন। বৈদিক স্তোত্রগুলি 'শ্রুতি' ও আবৃত্তির মাধ্যমে গেঁথে রাখা হয়েছিল। তাদের কবি ও ঋষিরা মহৎ সাহিত্যের স্রষ্টা হলেও লিপিবিদ্যা তাদের ছিল না এবং সেদিক থেকে তাঁদের নিরক্ষর বলা যায়। পশুচারণ ও সীমাবদ্ধ কৃষি ছিল তাঁদের জীবিকা। ঋগবেদের আদি পর্বে অর্থ উপজাতীয় সমাজ 'ক্ষেত্র' বা অভিজাত এবং 'বিশ' বা জনসাধারণ—এই দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। চারটি শ্রেণীতে এই সমাজ বিন্যস্ত হয় সম্ভবত ঋগবেদের অন্তিম পর্বে। এই শ্রেণীচতুষ্টয়ই পরবর্তী বৈদিক সমাজের চাতুর্বর্ণ। বৈদিক সমাজে গুণকর্মগত বর্ণভেদ বা শ্রেণীভেদ ছিল,

কিন্তু বংশগত বৃত্তিকেন্দ্রিক জাতিভেদ ছিল না। অসবর্ণ বিবাহ ও আন্তর্ভোজনের সুযোগ এবং স্বেচ্ছা-বৃত্তি গ্রহণের স্বাধীনতা যে এই সমাজে ছিল এমন দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তাঁদের কবি ও ঋষিরা এসেছিলেন সকল বর্ণ থেকে।

উপজাতি প্রসঙ্গে ঋগবেদ-বর্ণিত রাজা সুদাস ও 'দশরাজার যুদ্ধের' কাহিনীটি তাৎপর্যময়। সুদাস ছিলেন পরাক্রান্ত ভরত উপজাতির রাজা। পাঞ্জাবের সরস্বতী নদীর উপরাংশে ছিল ভরতদের বসতি। বৈদিক সাহিত্যে কীর্তিত এই বিখ্যাত স্রোতস্বতী সরস্বতী নদীটি সম্পর্কে যথার্থই বলা যায় 'যে নদী মরুপথে হারাল ধারা'। আজ এই নদীটির শীর্ণ ধারা রাজস্থানের মরুভূমিতে প্রায় বিলীন। কিন্তু ঋগবেদের যুগে সরস্বতীর তীরভূমি এবং শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিল আর্য সংস্কৃতির পীঠস্থান। ঋগবেদ-উক্ত ওই দশ রাজা ছিলেন দশটি উপজাতির নেতা। এই দশ উপজাতির মধ্যে সরস্বতীর নিম্নাঞ্চলের অধিবাসী পুরুরা ছিল সবচেয়ে ক্ষমতাশালী। যুদ্ধে রাজা সুদাস জয়লাভ করেন এবং দশটি সম্মিলিত উপজাতি-বাহিনীর নেতা পুরুরাজ পুরুকুৎস সম্ভবত নিহত হন। পরবর্তী যুগে ভরত ও পুরুদের কথা কিন্তু আর শোনা গেল না। পরিবর্তে দেখা গেল, ভরতদের দেশে এবং গঙ্গা-যমুনার উত্তর দোয়ার অঞ্চলের অনেকাংশ জুড়ে কুরু নামে আরেকটি নতুন উপজাতির আধিপত্য। আশ্চর্যের কথা এই যে কুরুকুলের বংশ-ঐতিহ্যে বলা হচ্ছে ভরত ও পুরু উভয়ই কুরুদের পূর্বপুরুষ এবং কুরুরাজারা কেউ 'ভরতের পুত্র' কেউ-বা 'পুরুর পুত্র'। স্পষ্টতই, যুদ্ধের পরিণামে ভরত ও পুরু এই দু টি উপজাতি সংমিশ্রিত হয়ে কুরু নামে একটি বৃহত্তর উপজাতি বা কৌমের (tribal community) জন্ম দিয়েছিল।

ঋগবেদের এই কাহিনীটি বৈদিক যুগে আর্য উপজাতিদের মধ্যে সংঘর্ষ ও মিলন-মিশ্রণের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট উপজাতিগুলি সমন্বিত হয়ে কিভাবে জাতিতে বিবর্তিত হয়েছিল তারই ইঙ্গিত দেয়। উপজাতি থেকে জাতিতে বিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটি ভারতে সমগ্র প্রাচীন যুগ ধরেই সম্ভবত চলছিল।

বৈদিক যুগের সমাজচিত্রের একটি প্রতিরূপকে আমরা দেখতে পাই আজকের অরুণাচল প্রদেশের পার্বত্য উপজাতীয় সমাজে। অরুণাচলের একটি প্রধান উপজাতি-সমষ্টির নাম আদি। নাগা যেমন সেমা, আও, আঙ্গামী, কনিয়াক প্রভৃতি কতগুলি উপজাতির সাধারণ নাম, তেমনি অরুণাচলের পূর্ব ও পশ্চিম সিয়াং জেলার পদম্, মিন্‌ইয়ং, সিমং, গালোং ইত্যাদি বেশ কিছু

উপজাতিব সমষ্টিগত নাম হচ্ছে আদি। ভাষা, সংস্কৃতি ও নৃতাত্ত্বিক বন্ধনে তাবা ঐক্যবদ্ধ একটি জোট। আদি নামে তাবা পবিচিত এবং এই পবিচযে তাবা সবাই গর্বিত। তাদের প্রতি গ্রামে এক বা একাধিক পিতৃতান্ত্রিক ক্ল্যানেব বাস। গ্রামবাসীদেব দ্বারা নির্বাচিত 'গম্' (যাঁকে 'গাঁওবুড়া'ও বলা হয) বা গ্রাম-প্রধানের কর্তৃত্বে তাঁরা সংগঠিত, টিবাপ জেলাব নকটে ও ওযাঞ্চ দু'টি নাগা উপজাতিব মত নাযকতন্ত্র (chieftainship) তাঁদেব মধ্যে নেই। আদিদেব কোন নিজস্ব লিপি নেই, তবে সাহিত্য আছে, যদিও তা মৌখিক। এই সাহিত্য হচ্ছে গীতি ছন্দে রচিত তাঁদেব 'আবাং' বা পৌবাণিক গাথা, 'আবেস' বা গ্রাম-পরিষদ সংক্রান্ত রাজনৈতিক সাহিত্য, 'পেন্‌জি' বা শোকগাথা ইত্যাদি। তাদেব 'মিবি' বা চাবণকবিবা বৈদিক শ্রুতিব মতই 'আবাং' আবৃত্তি কবে আসছে পুরুষপবম্পবায। তাদের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে তাবা গেঁথে বেখেছে এই আবাং ও অন্যান্য গীতি ও আবৃত্তিমূলক বচনায। আদিবা কৃষিনির্ভব পাহাডেব ঢালু বনাঞ্চলে জুম চাষ বা সঞ্চবণশীল কৃষি (shifting cultivation) তাদেব প্রধান জীবিকা। পশুপাখি পালনও তাঁদেব জীবিকার অঙ্গ, তবে টাওযাং জেলাব উপজাতি মন্‌পাদেব মত নিযমিত পশুচাবণা তাদেব পেশা নয।

বৈদিক যুগেব 'সভা' ও 'সমিতিব' মত আদিদেব সুসংগঠিত ও ক্ষমতাসম্পন্ন গ্রাম-ববিষদ 'কেবাং' একটি প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। গ্রামেব প্রশাসন, উন্নযন ও বিচাবকার্য পবিচালনার জন্য গ্রাম-প্রধান এবং সমাজেব প্রবীণ, অভিজ্ঞ, সুবক্তা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদেব নেতৃত্বে সংগঠিত তাদেব কেবাংকে যথার্থই গণতন্ত্রেব উৎস বলা চলে। ব্যক্তিগত স্বেচ্ছাচারিতাব এখানে সামান্যই অবকাশ এবং তাব জন্য উপযুক্ত শাস্তির বিধান আছে। কেবাং-এব অধিবেশন প্রযাই দীর্ঘস্থাযী হয, ঐক্যমতের জন্য প্রযোজন হলে দিনেব পব দিন। মতামত প্রকাশের পূর্ণ স্বাধীনতা এখানে স্বীকৃত। সকলেব বক্তব্য শোনার পব উপজাতিব প্রাচীন বিধি-বিধান ও ঐতিহ্যানুযাযী 'ধ্বনিভোটে' পবিষদ যে সিদ্ধান্ত নেয তা সমাজেব সকলেব অবশ্যমান্য।

কোন এক সুদূব পূর্বপুরুষ থেকে একটি উপজাতির সৃষ্টি—এই বিশ্বাস অরুণাচলেব অনেক উপজাতি আছে। আদিবা ইতিহাস সচেতন। তাঁবা এই পূর্বপুরুষকে বলে, 'আনি' (বা 'আবো তানি')। আদিদের একটি কিংবদন্তী অনুযাযী এই 'তানি' মানবজাতির পিতা। আজও তাবা আদি জনজাতিকে (race) বোঝাতে 'তানি' নামটা ব্যবহার কবে। আদিরেদ

মত স্বনসিবির উপজাতি নিশি, তাগিন, আপাতানি ও পার্বত্য মিবি এবং পূর্ব কামেং-এর বাংনিবাও তাঁদের আদিপুরুষকে বলে 'আবো তানি'। তাঁরা সকলে এই একই ঐতিহ্যে বিশ্বাস করে যে 'আবো তানি' হচ্ছেন তাঁদের উপজাতির জন্মদাতা। আজও দেখা যাবে তাঁদের কোন কোন জ্ঞানবৃদ্ধ ভিষক বা পুরোহিত সুদূর 'আবো তানি' থেকে বর্তমান পুরুষ পর্যন্ত বংশ-পরম্পরা অনর্গল মুখস্থ বলে যাচ্ছে। আশ্চর্য তাদের স্মৃতিশক্তি। অরুণাচলের মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী এই সব উপজাতিরা সম্মিলিতভাবে এই প্রদেশের সবচেয়ে বড় উপজাতীয় গোষ্ঠি। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভেদ সত্ত্বেও ভাষা, ধর্মীয় রীতিনীতি, নৃতাত্ত্বিক ও চারিত্রিক সাদৃশ্যে তাঁরা একটি উপজাতীয় সংহতির মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও পরস্পর প্রতিবেশী। সম্ভবত কোন বিস্মৃত অতীতে তাদের মধ্যে একটা আত্মীয়-বন্ধন ছিল এবং একই ভৌগোলিক উৎস থেকে তাদের আগমন হয়েছিল। পাহাড়-পর্বতের অবরুদ্ধতায় শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করেছে। অতীতের সেই বিচ্ছিন্নতা আজ নেই। 'তানি' নামের ঐতিহ্য আজ তাঁদের মধ্যে ঐক্য ও মৈত্রীর প্রতীক হয়ে দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা। 'আবো তানির' বংশধর এইসব উপজাতিরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে হয়তো একদিন এক বৃহৎ জাতিতে রূপায়িত হবে। উপজাতি থেকে জাতিতে উত্তরণের এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কী একেবারে অস্বীকার করা যায় ?

উপজাতি এবং জাতির ভেদরেখাটি খুব সবল ও সুস্পষ্ট নয়। কোথায় উপজাতির শেষ আর কোথায় জাতির শুরু, তার চিহ্নিতকরণ অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব। মাঝখানে একটি কৃষক সমাজের অস্তিত্ব অনুমিত হয়, যেখানে হয়তো উপজাতীয় সমবায় সংস্থাগুলির ভাঙন, জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা, বৃত্তি-স্বতন্ত্রতা এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয়। আসামের সমতলবাসী কৃষিভিত্তিক কাছারী, কোচ, রাভা, মেচ প্রভৃতি বড়ো খণ্ডজাতিরা তাঁদের উপজাতীয় চরিত্রকে প্রায় অক্ষুন্ন রেখেই হিন্দু সমাজভুক্ত। কিন্তু তারা আবার একটি স্বতন্ত্র বড়ো কৌমের মধ্যেও সঙ্ঘবদ্ধ। আসাম উপত্যকার যে সব অনুন্নত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী স্থায়ী কৃষির (settled বা sedentary cultivation) উপর নির্ভরশীল তাঁরা অসমীয়া উচ্চবর্ণ হিন্দু সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক-অর্থনৈতিক আধিপত্য, উন্নততর কৃষি, শিল্প ও উৎপাদন ব্যবস্থা এবং কৃষ্টি ও ধর্মের প্রভাবে হিন্দু জাতি-কাঠামোর (caste-structure) অন্তর্ভুক্ত। উড়িষ্যার 'আদিবাসী' কোণ্ড, আসামের আহোম, কাছারী, কোচ, রাভা, পশ্চিমবঙ্গের রাজবংশী, সাঁওতাল এবং মণিপুরের কোন কোন

কবি

দেবদাস আচার্য

সেই প্রভাত একদিন তাকে উল্লসিত করেছে,
ভাবি ভালো লাগত তার সব কিছু, আকর্ষণীয় এবং মিষ্টি
ভাবি ভালো লাগত তার স্বপ্নের ভিতর দিয়ে
এই পৃথিবীর ওপর হেঁটে যেতে, যেন
সব কিছুই নতুন, কৌতূহলোদ্দীপক, তীব্র, অন্তর্গূঢ়ময়
সে এক আশ্চর্য সুখের অনুভূতি, রঙিন সূর্য কিরণের দিন
তাকে বিমূঢ় আনন্দের দিকে সর্বদাই আহ্বান জানাত

এমন চমৎকার এই পৃথিবী
এমন রহস্যময় এবং অভিনব
এমন চকিত-বিহ্বলতা ছড়ানো তার প্রকৃতি
তার স্বভাব এবং তার বৈভব,—সে
প্রতিটি স্নায়ুকোষ দিয়ে অনুভব করতে চাইত, সে
সর্বদাই উজ্জ্বল রশ্মির এক তন্তুজালের মধ্যে
তার স্বপ্নকে ঘুরতে দিত তার স্বপ্ন
কেবলই গড়ে তুলত আরো নতুন নতুন স্বপ্ন, যেন
প্রত্যেক জীব-জন্তু-প্রাণী সকল স্বপ্নের ঢেউ থেকে উঠে আসছে,
প্রত্যেক ঝর্ণা ও নদী, গুল্ম ও গান, প্রত্যেক খেত ও খনি
প্রত্যেক কল-কারখানা ও কলতান
এক স্বপ্নলোক থেকে ঝরে পড়ছে, যেন
প্রত্যেক মানুষই, সে ভারত, স্বপ্নের মানুষ, ভারত
এক বিশাল. উদার, মহৎ স্বপ্ন-জগৎ
পৃথিবী ও তার আকাশের ওপর ঝরে পড়ছে, মনে হত
এক স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মহাজগৎ, ছায়াপথ,
এমন কি মানুষের কাল্পনিক অসীমতা, সবই
ধীর ও সমুন্নত ভাবে উঠে আসছে; স্বপ্নের সমুদ্র
সাদা ফেনার ঢেউগুলি তার চোখে ছুঁড়ে দিত, সে
স্বপ্নের ঘোরে এক সুন্দর, সুখী, স্বপ্নময় পৃথিবীর কথা ভাবত,
ভাবত তার জন্ম হয়েছে পিতা-মাতার স্বপ্নের ভিতর থেকে, সে

ভাবত স্বপ্ন এক অখণ্ড স্রোতধাবা, বিনাশ-হীন, ভাবত
স্বপ্ন অনন্ত কল্প বীজেব আশ্রয়, মেধাব দ্যুতি, অসীমকে ছুঁতে পারে, ভাবত
কেবল স্বপ্নের ভিতব দিযে অতিক্রম কবা যাবে মহাজগৎ ও তাব রহস্যলোক
কোনো পাপ বোধ ছিল না তার, ছিল না অনুতাপ,
কোনো অসহায়তা ছিল না তার, ছিল না উদ্বেগ ও বিভ্রম, সে
স্বপ্নেব টুকবো নিযে খেলা করত, স্বপ্নেব প্রবহমান বেনুকণা
কুডিযে শবীবে মাখত, ফলে, সে ছিল সবুজ আর
তাব শরীব ছিল স্বপ্নেব মধ্যে ভাসমান
পৃথিবীকে পাৎলা আব ভাঁজহীন মনে হত তাব, মনে হত
মানুষ তার গৃহ নির্মান করে স্বপ্ন দিযে, মানুষ
সন্তানকে ভাসিযে বাখে তার নিজস্ব স্বপ্নের মধ্যে, মানুষ
তাব সামান্যতম কর্মেবও সৃষ্টিব মধ্যে স্বপ্নকেই
পুনবাবিষ্কাব কবে, পুনর্বিন্যাস করে রূপান্তব ঘটায, বিমূর্ত স্বপ্নকে
মূর্ত ব্যবহারে প্রযোগ করে,—কেবল স্বপ্নই
মানুষকে উদ্দীপিত কবে, তাব ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করে,
তাব মেবাকে উপর্যুপবি ঘাতে দ্যুতিমান কবে,—যখন
সে ক্লান্ত হয সে বাববাব ফিবে আসে স্বপ্নের মধ্যে,
স্বপ্ন-ভঙ্গের যাবতীয নিষ্ঠুরতাব বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ ঘোষণা করে

কেন এই জীব-জগৎ, কেন এই পৃথিবীর জল
কেন ঐ উপগ্রহ-মালা, কেন ছাযাপথ, কেন
অসংখ্য নক্ষত্র জ্বলে মহাকাশে, সবই তাব
মনে হত
দূব কোনো স্বপ্নলোক থেকে নিযন্ত্রিত স্বপ্নের রূপ
সে ভাবত এই অন্ধ যুগেব কথাও, ভাবত
স্বপ্ন-শূন্য রোবট বাহিনীব কথাও, ভাবত
যুদ্ধাপবাধীদের কথাও, কিন্তু সে জানত
স্বপ্ন-হীন কিছু ইট ও পাথবেব মানুষ,
লোহা ও তেলেব মানুষ
যন্ত্রও গবল দিযে গডা মানুষ
একদিন স্বপ্নেব তেজস্ক্রিযতায ধ্বংস হবে, ভাবত
মানুষেব স্বপ্নেব শক্তি আনবিক শক্তিকে পবাস্ত কববে

এই ভাবেই মানুষটি হেঁটে যেত স্বপ্নেব মধ্যে দিযে
স্বপ্নের ঝর্ণা ও কুযাশাব মধ্যে দিযে,
স্বপ্নময এক পৃথিবী বচনা কুবতে কবতে এগিযে যেত এমন এক পৃথিবীতে
যে পৃথিবী অদ্বিতীয, চিবস্থাযী, মহাজাগতিক

আধুনিক শিক্ষার হালচাল

বিদ্যালয়ে প্রথম প্রবেশ পরীক্ষার্থী শিশুকে নিয়ে অভিভাবকের দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত চেহারা, মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর ইংরাজী বাংলা নিয়ে হিমসিম খাওয়া, মাধ্যমিকে ভালো রেজাল্ট করা অথচ উচ্চমাধ্যমিকের বিভিন্ন বিষয়ে অসম্ভব রকম কম নম্বর পেয়ে বিষাদাচ্ছন্ন কিশোর অথবা কিশোরী, স্নাতকস্তরে অনার্স নিয়ে অথবা পাসকোর্সে পড়া ছাত্রছাত্রীদের মানসিকতায় সজীবতার অভাব—এসব দৃশ্যগুলি আমাদের প্রত্যেকেরই পরিচিত। আর এরই ফলশ্রুতিতে বর্তমান শিক্ষাজগত সম্বন্ধে হতাশা এবং শিক্ষক-অধ্যাপকদের কাজে অনাস্থা ক্রমশ আমাদের চারপাশের মানুষের মনে ছড়িয়ে পড়ছে। এর বিস্তৃতি এতদূর পর্যন্ত পৌঁছেছে যে এখন প্রকাশ্য সম্মেলনে অথবা সংবাদপত্রে শিক্ষকদের গাফিলতির কথা বা স্কুল, কলেজ ও ইউনিভার্সিটির কর্মপদ্ধতির ত্রুটির কথা আলোচনা করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি মানুষেরই অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করার কথা। এই অস্বস্তি দূর করতে হ'লে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিটি স্তরের সামগ্রিক অনুসন্ধান বিশেষ প্রয়োজন। 'জল পড়ে, পাতা নড়ে না' গ্রন্থটি লিখে শ্রীযুক্ত দত্ত সেই অপ্রিয় অথচ হিতকারী কাজটির শুভ সূচনা করেছেন।

সংখ্যা দিয়ে ছাড়াও বইয়ের পরিচ্ছেদগুলিকে এক একটি তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যাংশ দিয়ে নামাঙ্কিত করেছেন তিনি, যেমন জল পড়ে পাতা নড়ে না—প্রথম পরিচ্ছেদের এই নামকরণের মধ্যে লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে একসময় শিশুরা জল পড়ে পাতা নড়ে বর্ণপরিচয়ের এই প্রথম পাঠ স্বাভাবিক ভাবে ও সানন্দে গ্রহণ করতো, কিন্তু এখন আর শিশুশিক্ষার জগতে সে আনন্দ নেই, কারণ শিক্ষা দিতে গিয়ে শৈশব থেকেই তাঁদের কঠিন প্রতিযোগিতার মধ্যে ফেলে দিয়ে আমরা শিশুদের স্বাভাবিক জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলি। শৈশব থেকেই 'শুধু পড়া এবং আরও পড়ার তাগিদ দিয়ে তাদের আকাশে চোখ রেখে দেখবার অবসরটুকুও দিতে চাই না।' তাদের কৌতুকবোধ ও

কল্পনাশক্তিকে জাগিয়ে রাখার পরিবর্তে তাদের মুখস্থ করার যন্ত্রে পরিণত হতে শেখাই। কারণ আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে অধিকাংশ অভিভাবক চান সন্তানকে একটি নামী স্কুলে ভর্তি করতে এবং সেখানে নির্বাচন হয় কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রবেশ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শিশুকে অজস্র তথ্য মুখস্থ করানো হয়। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে এই তথ্যজ্ঞানের যথেষ্ট পার্থক্য থেকে যায়। এতে শেষপর্যন্ত তোতাপাখির প্রাণ যাওয়ার মত অবস্থা হয়।

তবুও নামী স্কুলে সব পাখি ধান পায় না, তাই বোধ হয় বইটির দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের নাম—নেই কেন সেই পাখি। নির্বাচনী পরীক্ষার কিছু প্রশ্নের নমুনা তুলে দিয়ে এখানে লেখক দেখিয়েছেন এইসব পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের ভুল ধরার সুযোগের দিকে লক্ষ্য রেখেই কিরকম প্রশ্ন তৈরি করা হয় এবং কোমলমতি শিশুদের সর্বজ্ঞতার সুযোগের অভাবকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে প্রারম্ভিক শিক্ষাব্যবস্থা বেঁচে আছে। এই ব্যবস্থাকে তথাকথিতভাবে ফলপ্রসূ করতে গিয়ে অভিভাবকের সঙ্গে শিক্ষার্থীর সম্পর্কও ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে, জেনারেশন গ্যাপের অন্যতম কারণ এইভাবে তৈরি হচ্ছে বলে লেখক একটি সঙ্গত সূত্র নির্দেশ করেছেন।

শিক্ষা সমস্যা সমাধানের জন্য মাঝে মাঝে কমিশন বসে এবং কিছু কিছু পরিবর্তনও হয়, কিন্তু এই আলোচনা ও পরিবর্তন প্রধানত উচ্চশিক্ষাকে কেন্দ্র করে। শিক্ষার একেবারে প্রাথমিক স্তর নিয়ে আলোচনা-চক্র, সরকারী রিপোর্ট ইত্যাদির একান্তই অভাব। গোড়ায় গলদের এই দিকটি লেখক স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন।

মাধ্যমিকের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে তিনি দেখিয়েছেন যে এর 'মাধ্যমে বিশেষ স্কুলের মান' রক্ষা হয় ঠিকই কিন্তু ছাত্র ছাত্রীরা আত্মনির্ভর হয় না। তাদের নোটবই-এর সাহায্য নিতে হয়।

দু-বছরের মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর মোটসংখ্যা এবং তাদের পাশের হার পাশাপাশি রেখে দেখানো হয়েছে যে দুটি বছরেই প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে কমে গেছে। এর কারণ খুঁজতে গিয়ে লেখক মাধ্যমিক পাশ করে এসে ছাত্ররা উচ্চমাধ্যমিকে কি ধরনের পঠন পাঠনের সম্মুখীন হয় তার বিবরণ দিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিকের প্রথম ভাষা (বাংলা)র পাঠ্যতালিকা বিশ্লেষণ করে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যসূচীকে কিভাবে

গ্রহণ করছে তার পরিচয় থাকে তাদের লেখা উত্তরপত্রে। সেই উত্তরপত্রগুলি থেকে কিছু অংশ তুলে দিয়ে লেখক দেখিয়েছেন উপমাধ্যমিকের বাংলার পাঠ্যসূচী সাধারণ শিক্ষার্থীর কাছে কতখানি গ্রহণীয় সেকথা আমাদের ভেবে দেখা দরকার, প্রশ্নে ভুল থাকা এবং বিভ্রান্তিকর নির্দেশ ও অনেক সময় ছাত্র-ছাত্রীদের বিপদে ফেলছে।

পাঠশালায় পণ্ডিতমশায়ের তত্ত্বাবধানে একসময় আমাদের দেশে যে শিশুশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাতে পণ্ডিতমশাইরা অন্য দৈনিক বিষয়কর্মের সঙ্গে একইভাবে পাঠশালা চালাতেন। এই বক্তব্য দিয়ে গ্রন্থটি আরম্ভ করে পঞ্চম পরিচ্ছেদে লেখক আবার শিক্ষার বাহকদের সম্বন্ধে সরাসরি আলোচনা করেছেন। 'দিন তার পড়ে কত।' 'এই তির্যক শিরোনামের তাৎপর্য আছে। মাসমাহিনা অনুযায়ী—শিক্ষকেরা দৈনিক যত পান তার হিসাব তাঁদের আছে কি? সে অনুযায়ী শ্রম তারা দান করেন কি? স্কুলে এবং কলেজে যথাযথ ভাবে ক্লাশ ঠিক কতদিন হয়? শিক্ষাকেরা এবং অধ্যাপকেরা জ্ঞানচর্চার ধারাকে কিভাবে প্রবাহিত রাখেন? ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের কাছ থেকে কি পায়? 'এই প্রশ্নগুলি তুলে কাউকে বিশেষ করে দায়ী করা যাবে না—কারণ একই বিষয়ে পড়াবার জন্য একাধিক শিক্ষক বা অধ্যাপক থাকেন'। এ সম্বন্ধে লেখক সচেতন তবু তিনি সাহস করে প্রশ্নগুলি তুলে শিক্ষাজগতের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিককে আলোকিত করেছেন।

১৯৮৭-র নতুন সিলেবাস ১৯৮৬-র উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যসূচীর সঙ্গে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ সে সম্বন্ধে একটি বিস্তৃত আলোচনায় লেখক বোঝাতে চেয়েছেন যে শিক্ষার প্রতিটি স্তরের পাঠ্যসূচী প্রণয়নে একটা সামগ্রিক চিন্তার প্রয়োজন। কারণ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরাই চলে আসছে স্নাতক স্তরে। তাদের সমগ্র শিক্ষাজীবনে কতটুকু সময়ের মধ্যে কি তাদের প্রাপ্য সে সম্বন্ধে পাঠ্যসূচী প্রণেতাদের ও শিক্ষকদের গভীর অভিনিবেশ প্রয়োজন।

'সর্ব খর্বতারে দহে' রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই উদ্ধৃতি ব্যবহার করে লেখা পরিচ্ছেদটিতে অধ্যক্ষ, শিক্ষাকর্মী শিক্ষকদের দায়িত্ববোধের অভাব কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ, পরীক্ষার ফল প্রকাশ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকে ত্রুটিযুক্ত করছে এবং তার ফলে শিক্ষাজগতে ক্রমশ অন্ধকার জমে উঠছে। তার প্রমাণ দিয়েছেন লেখক সাম্প্রতিককালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি ঘটনার কারণ বিশ্লেষণ করে। পাঠ্যবই-এর অভাব, একেবারে প্রাথমিক স্তরে পরীক্ষা তুলে দেওয়া

ইত্যাদি নানাবিধ অবিবেচনা প্রসূত ব্যবস্থা শিক্ষাকে কোথায নিযে যাচ্ছে সে বোধটুকু অন্তত আমাদেব জাগ্রত হওযা দরকাব।

প্রারম্ভিক পর্যায থেকে এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার খানিকটা ধাবাবাহিক বিশ্লেষণেব পবে লেখক সামগ্রিক অনুধ্যান কবেছেন শেষ পবিচ্ছেদে। সংহত-ভাবে যুক্তিসিদ্ধ ভাষায তিনি প্রকৃত শিক্ষার সঙ্গে বর্তমান শিক্ষার পার্থক্য নির্ণয কবে দেখিযেছেন। তিনি বলেছেন ইংরেজ আমলে বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতির আওতায থাকা সত্ত্বেও স্বাধীন ভাবনা চিন্তা সম্পন্ন সুশিক্ষিত এবং স্বশিক্ষিত মানুষ ছিলেন যাঁবা লেখাপডাকে সাধনাব স্তরে নিয়ে গেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতাব পরবর্তী সময় তাঁব ভাষায 'এই প্রস্তুতি নেবাব শপথটা হাবিযে গিযেছে আমাদের কাছ থেকে—' এবং তারই ফলে শিক্ষায় এসেছে গভীরতাব অভাব। 'শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্নিহিত প্রতাবণাব' ফলে সাধারণ শিক্ষার্থীবা নিজস্ব শক্তিকে বিকশিত কবতে না পেবে অধ্যাপকদেব অস্বস্তিব কারণ হচ্ছে। অন্যদিকে 'চিহ্নিত ভালো ছেলের দল' 'ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যেব সঙ্কীর্ণ বৃত্ত' বচনা কবে 'দেশের মানুষেব কাছে বিদেশী' হযে যাচ্ছে।

শিক্ষাদরদী ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাব এই ত্রুটিগুলি অনুভব করেন কিন্তু তবুও দীর্ঘদিন ধবে এই দোষগুলি থেকে যাচ্ছে কেন, তাব কারণ হিসাবে লেখক আমাদেব অলস মনোভাব এবং সর্বদা ব্যক্তিগত বা দলগত স্বার্থপবতাব মধ্যে থাকাব কথা বলেছেন।

শুধু সমস্যা নির্দেশ কবেই লেখক থেমে যাননি। তাঁব ব্যক্তিগত চিন্তায এই সমস্ত দোষ থেকে মুক্ত হওযার জন্য শিক্ষাজীবনকে কযেকটি বিশেষ পর্বে ভাগ করে কিভাবে শিক্ষার্থীকে উচ্চশিক্ষাব স্তবে সুস্থভাবে পৌছে দেওযা যায তার একটি পথ নির্দেশও কবেছেন। সব ছাত্রছাত্রীব জন্য এরকম নির্দেশ চলে না। উচ্চশিক্ষা যাদেব কাছে ভাব মনে হয় তাদেরও জীবনে সার্থকতাব পথ দেখিয়ে দিতে হবে। তার জন্য শিক্ষাপথেব পর্বে পর্বে বিশেষ বাছাইয়ের দবকাব। লেখকেব আর একটি আধুনিক এবং উপযোগী মত 'শিক্ষার্থীর সঙ্গে শিক্ষকেবও একটা পরীক্ষা হওয়া দবকার।'

পবিশেষে তাঁব মন্তব্য এইসব পরিকল্পনা সফল কবতে হলে আমাদেব শিক্ষাব্যবস্থার ধাত্রী সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন কবতে হবে। তাহলেই সম্ভব হবে জীবনাশ্রযী এবং সত্যসন্ধানী শিক্ষারীতিব প্রবর্তন।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা নিযে অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এককথায়

সমাজের প্রায় সব ধরনের মানুষই চিন্তিত অথবা হতাশ। শ্রীসরোজ দত্তের সুচিন্তিত এই গ্রন্থখানি অনেককেই আশার আলো দেখাতে পারবে।

পার্বতী সেন

সরোজ দত্ত। জল পড়ে, পাতা নড়ে না। রত্নাবলী। ১৯৮৭। বারো টাকা

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার

গিরিশোত্তর বাংলা রঙ্গজগতের এক প্রধান নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি। কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই তিনি নাট্যাভিনয়ে হাতে খড়ি নেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে শুরু হয় তাঁর অভিনয় জীবন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণ রঙ্গালয়ে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত শিশিরকুমার অভিনয় করেছেন ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট মঞ্চে ও ওল্ড ক্লাবে। এই পর্বে তাঁর অভিনয় দক্ষতা ও নাট্যশিক্ষকতা নাট্যরসিক বাঙালি সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করে। নাট্যাভিনয়ে তাঁর প্রতিভার যথার্থ প্রকাশ ঘটাবে, এই চিন্তায় শিশিরকুমার অধ্যাপনার বৃত্তি পরিত্যাগ করে মঞ্চজীবনের রোমাঞ্চকর পরিবেশে প্রবেশ করেন। অতি শীঘ্রই তিনি প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর নিজস্ব থিয়েটার—নাট্যমন্দির, নবনাট্যমন্দির ও শ্রীরঙ্গম। তাঁর অবিস্মরণীয় অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার পরিচয় মিলবে সীতা, আলমগীর, বিসর্জন, শেষরক্ষা, দিগ্বিজয়ী, তপতী, সধবার একাদশী, ষোড়শী, প্রফুল্ল, মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতির অভিনয়ে। সীতার অভিনয় দেখে রবীন্দ্রনাথ শিশিরকুমারকে প্রযোগকর্তার দুর্লভ সম্মান দান করেন।

শিশিরকুমারের অভিনয়জীবনের ব্যাপ্তি ১৯০৮ থেকে ১৯৫৯ সালে তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বপর্যন্ত প্রায় একান্নবছর। এই দীর্ঘ অভিনয় জীবনে তিনি কিছু প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণা মূলক নিবন্ধ রচনা করেন। দীর্ঘদিন এই রচনাগুলি বিভিন্ন পত্রিকায় ও গ্রন্থে ছড়িয়ে ছিল। শিশিরকুমার ভাদুড়ি ইন্সটিটিউট অফ ড্রামাটিক রিসার্চ এণ্ড কালচারের সুযোগ্য সম্পাদক এবং নাট্যাচার্যের শেষ জীবনের নির্ভরযোগ্য সঙ্গী দেবকুমার বসু ঐ রচনাগুলি সংগ্রহ করে গ্রন্থভুক্ত করেছেন। প্রবন্ধগুলি হল—বাংলা রঙ্গমঞ্চের উৎপত্তি ও গিরিশচন্দ্র অভিনয় কলা, রঙ্গমঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ; শেক্সপীয়র নাট্যশালাপ্রসঙ্গে, রঙ্গালয় ও

নাট্যপরিচালনা, আমার কৈফিয়ৎ ১৫ই আগস্ট ১৯৫২, রঙ্গমঞ্চ ও রাষ্ট্র। পারিবারিক ও ললিতমোহন লাহিড়ী—এই দুটি রচনা স্মৃতিচারণা। ইংরেজি রচনা আছে দুটি—The days gone by ও A Na ional' Theatre F r Calcutta। এ ছাড়া আছে দুটি চিঠি—একখানি প্রফুল্ল চন্দ্র ঘটককে লেখা আর একটি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিবকে তাঁকে প্রদত্ত পদ্মভূষণ খেতাব কেন প্রত্যাখ্যান করতে চান তাই জানিয়ে। এই প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে জানা যাবে শিশিরকুমার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস কত নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ করেছিলেন। সেই সঙ্গে অভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার আধুনিক রূপও যে তাঁর নখদর্পণে ছিল তাও জানা যায়। তিনি যে যথার্থই নাট্যাচার্য তাই এই গ্রন্থ সোচ্চারে ঘোষণা করছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ করে শ্রীদেবকুমার বসু একটি জাতীয় কর্তব্য পালন করেছেন।

জগন্নাথ ঘোষ

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার রচনাসংগ্রহ। সম্পাদনা: দেবকুমার বসু। শিশিরকুমার ভাদুড়ি ইন্সটিটিউট অফ ড্রামাটিক রিসার্চ এণ্ড কালচার, ৯।৩ টেমার লেন, কলকাতা—৭০০০০৯ দাম: কুড়ি টাকা।

ছোটগল্পে নতুন মানুষ

এখন আর নতুন লেখক বলা যাবে না অমর মিত্রকে, বেশ কয়েকটি গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস বেরিয়েছে, লেখায় ইতিমধ্যেই এমন কিছু স্বাতন্ত্র ধরা পড়েছে যা ক্ষমতা ও অনুশীলনের ফলেই একজন লেখকের রচনায় লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে, অমর মিত্র ক্রমশই লক্ষণীয় হয়ে উঠছেন। পাঠক যে কারণে ওঁর প্রতি মনোযোগী হতে বাধ্য হবেন তা হলো অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও তৃণমূল-স্তরের গভীর জ্ঞান ও অনুভব, সঙ্গে মিশেছে সংবেদনশীলতা। অমর এমন একজন তরুণ যিনি লেখক হবার উপযুক্ত সমগুণ নিয়েই কলম ধরেছেন। প্রথম গল্পগ্রন্থ 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ' পণ্য-সাহিত্যের বাইরের নতুন স্বাদের সাহিত্য-পাঠক-দের কাছে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলো, এমন সব গ্রামীণ অভিজ্ঞতার সমাবেশ ছিলো সেখানে যার সঙ্গে শহর-বাসী পাঠকের পরিচয় নেই, আর গ্রামজীবনে

অতি পবিচিত ঘটনা বলে যথেষ্ট মনোযোগ গ্রামীন মানুষ তাতে দেয় না। অমব কার্যসূত্রে কানুনগো। ফিতে নিয়ে মাঠ মাপা থেকে জমির নানা জটিল সমস্যা, অংশীদায়িত্ব ও হস্তান্তরেব তাবৎ স্তবগুলো ওব হাত দিয়েই হয়ে থাকে। শুনতে হয জমি-সম্বল মানুষগুলোর কথা, সমস্যাব গভীরে প্রবেশ করতে হয, সমবেদনা নিযে বিচাব কবতে হয, এ থেকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান জন্মে, পবেব মুখে শুনে বা হাতফেরতা অভিজ্ঞতা নিযে এই জ্ঞান লাভ কবা যায না। এব সঙ্গে, কর্মসূত্রে গ্রামের প্রত্যন্তে থাকতে হয অমরকে, বর্তমান আলোচক ওঁব সঙ্গে থেকেছে, দেখেছে ওঁব কর্মসূত্রে বিচিত্র মানুষেব সঙ্গে মেলামেশার সহজ অধিকার, এর থেকেই বাংলাব গ্রাম, মেলা, মানুষ, হাটবাজার, পবিবাব, জোতদাব, জমিদার, সবার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ কবেছেন অমব। আর কে না জানে, গল্পশিল্পীকে অভিজ্ঞতায সমৃদ্ধ হতেই হবে, যেমন তারাশঙ্কব।

এই মুহূর্তে আশার কথা হলো বেশ কযেকজন তরুণ লেখক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিযেছেন ছোটো গল্পে, এদেব হাতে আঙ্গিক সর্বস্বতাব অসাবতা গ্রাহ্য হযনি, এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব সঙ্গে জীবনেব জটিলতা ও দুর্ভাগ্যেব কারণস্বরূপ আর্থ-সামাজিক কাঠামোটি সম্বন্ধে সপ্রশ্ন ধাবণা হয়েছে যুক্ত, ফলে ছোটগল্প গল্পরস অক্ষুণ্ণ বেখেও হয়ে উঠছে রূপান্তরপ্রযাসী সমাজজীবনেব দলিল। বড আশার কথা।

অমব-এব দানপত্র পডতে পডতে আশ্চর্য হযেছি ওর গ্রামজীবনেব আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও রূপান্তরমুখিন বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান ও ভাবনা দেখে। এই একটা বিষযে ওব সহযাত্রী আফসার আমেদ, শৈবাল মিত্র, স্বপ্নময় চক্রবর্তী। চাব জনেই বলিষ্ঠ তরুণ লেখক।

অমর মিত্রব গল্প আলাদা আলাদা আলোচনা কবতে অনেকটা জাযগা দবকাব, কাবণ চবিত্রগুলো এতোই জীবন্ত চারপাশের জন্য এতই প্রত্যক্ষবৎ, যে গাযে শিবশিবানি লাগে। মনে হয মানুষগুলোর নিঃশ্বাস আমাব গায়ে পডছে। সে আসলে এদেব চলাফেরা, তাও চোখের সামনে সব চবিত্র নিযে উঠে আসে, সঙ্গে কবিদৃষ্টি মিলেছে, অর্থাৎ সর্বব্যাপিণী সহানুভূতি, স্পষ্টই লেখক কোন পক্ষভুক্ত তা বোঝা কঠিন হয না, কিন্তু সমস্যাগুলো এতোই স্বাভাবিক ভাবে উঠে আসে, এই পক্ষপাতিত্বটুকু তখন পাঠকেব মনেই গডে লঠেছে কখন, মনে থাকে না। লেখক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের মনে বড়ো আশা জাগিয়ে তোলেন।

'দানপত্র'-এর প্রায় সবকটি গল্পই অসাধারণ, ব্যাখ্যা করতে পারা কঠিন, শুধু বলা যায়, প্রিয় পাঠক, আপনিও আমার সঙ্গে গল্পগুলির অভ্যন্তরে প্রবেশ করুণ, দেখবেন যৎসামান্য জমির মালিক রামচন্দ্র প্রথমপক্ষের সীতারাণীকে আনতে চলেছে নুরনগর, সঙ্গে তিনটে ছেলেকেও। যে সীতারাণীকে ত্যাগ দিয়েছিল রামচন্দ্র দ্বিতীয়পক্ষের তারারাণীকে ঘরে এনে, তখন রামচন্দ্র অন্যরকম। দিনকুড়ি আগে ক্ষেতের পোকামাকড় মারা বিষ তেল খেয়ে তারারাণী আত্মঘাতী হয়েছে।

এর কারণ সে চূড়ান্ত দরিদ্র, তা ইংগিতে জানিয়ে দেন লেখক। 'যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাবে, দরকারে তার ছোট ছেলে নব-র সঙ্গে দেগাটায় ভিক্ষে করে বেড়াবে, তবু আর এ সংসারে নয়।'

তারারাণীর তিন ছেলে, গৌরাঙ্গ লুটপাট করে বেড়ায়, জুয়ার বোর্ড পাহাড়া দেয়, মাঝে মাঝে জেল খাটে। ভবসিন্ধু শিমূলগাছির পূর্ণদত্তর ঘরে মুনিষ খাটে, ছোট নবর একটা পা কাটা রাস লাইনে ভিক্ষে করে।

বিষতেল খেয়ে মা তারারানী মরলে নব মাথা দুলিয়ে বলে 'খোঁজ লেন না! লোকে যদি বিষতেল ধার দিল তো দুটো ভাত দিল না কেন?'

এক মর্মান্তিক প্রশ্ন এবং ভয়ংকরও। দুটো ভাতের থেকে বিষতেল সেখানে সহজে মেলে সেখানে রামচন্দ্রের ঘর শূন্য হবেই, আর মানুষ বলেই স্বপ্ন সহজে মরেনা, তাই ত্যাগ দেওয়া বউ সীতারাণীকে আনতে যায় আবার, 'কাল সকালে এই পথেই সে ছেলে বউ নিয়ে ফিরবে। সীতারাণী আর তার ছেলেরা তার নিঃঝুম ভিটেয় পা দিলে শক্ত মাটি নরম হবে। উঠোনের শুকনো চেহারা ঘাসে ঘাসে সবুজ হয়ে যাবে।'

শ্বশুরের ভিটেয় পৌঁছে রামচন্দ্র—'আলোতে আবছা মুখ ছাখে তার বউয়ের। মুখ দেখে তার সমস্ত বুক কেঁপে ওঠে। এই কি সেই বউ! প্রতিমার মত সীতারাণী। এই রকম খুন খুনে বুড়ি হয়ে গেছে। বুড়ীর চোখ বুড়ো রামচন্দ্রকে দেখছিল। রামচন্দ্রের বুকটা হা হা ক'রে ওঠে।'

রামচন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে সীতারাণী জানায় একটা ছেলে খোড়া, কাঠের পা নিয়ে গেছে ভিক্ষে করতে, আর একটা জেল খাটে, চাকু হাতে গঞ্জে গঞ্জে ঘুরে বেড়ায়, আর একটা গেছে গতর খাটতে, মাঠে ঘাটে কোথাও কাজ নেই, ধান রোয়া হয়নি, সে ছেলে কুলিগিরি করে। তারা কেউ ঘরে আসেনা, তাদের কারোর হাতে পয়সা নেই।

কি ভয়ংকর ট্রাজেডি, যা রামচন্দ্রের জীবনে পুনরাভিনীত হয়। তাই নির্বাক রামচন্দ্রের কথা শেষ হয় এভাবে—

'এতবড় পৃথিবীতে তার যে তিনটি সন্তান বহু দূরে রয়েছে, তারা জানতেও পারল না তাদের জরাজীর্ণ বাবা বহুদূরের অন্ধকারে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। দুহাত তুলে ডাকছে শীর্ণকায় বয়স্ক একটি শরীর, আয় আমার অন্ধকারে আয়।' যেমন অ-কবিতাকে কবিতার পংক্তিতে বসানো যায় না, গল্প থেকে 'গল্প'টুকুও তেমনি বাদ দিলে আর তাকে ছোটগল্পের রাজসম্মান দেওয়া অসম্ভব! অমর গল্পই বলেন, তাতে নাটকীয়তা, বস্তুজগৎ পরিপার্শ্ব-সচেতনা, ব্যক্তিচরিত্রের বহুমুখিতা ও আত্মদ্বন্দ্ব সমান মর্যাদা পায়, ফলে ট্রাডিশান-অস্বীকৃত হয় না যেমন, তেমনি এরই সঙ্গে নিজের দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র নিবিড়ভাবে বাজিয়ে দেন। ওঁর গল্পের অবস্থানভূমিকে ছোঁয়া যায়, মানুষগুলি কখনো আদর্শায়িত হয় না, পরিস্থিতি অনুযায়ী স্বাভাবিক আচরণকে মর্যাদা দেন অমর। তাই 'আগুনের দিন'-এর মতন রক্তমাংস, লোভ, নিষ্ঠুরতা, কাতরতার গল্প ওঁর হাত থেকে পেয়ে যাই। রমেশচন্দ্র সেনের যেন বা উত্তরাধিকারী অমর। যে সিরাজুল বাপ মারা যেতেও নাজমাকে বাপের বাড়িতে নিয়ে যায় নি সেই হঠাৎ নাজমাকে জানায় বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে তাকে, সন্তানসম্ভবা নাজমা অবাক হয়, তার আনন্দের সঙ্গে বিস্ময় ও কিছু প্রতিবাদ, অবশেষে সিরাজুলের সঙ্গে যাত্রা। অতি-আগ্রহ সিরাজুলের, তা চাপা থাকে না। কেনো এই আগ্রহ, শেষ পর্যন্ত তার উত্তর যখন গল্পে ফুটে ওঠে তখন আমরা আশংকাপাণ্ডুর হয়ে গড়ি। নাজমা সুরত আলির নিজের মেয়ে নয়, গেছারনবিবির প্রথম পক্ষের মেয়ে। সুরত আলির মৃত্যুর পর তার জমির উপর নাজমার কি অধিকার নেই। সামান্য জমির ভাগ চায় সিরাজুল, না হলে হাটানো মেয়ে পড়ে রইলো মায়ের কাছে।

কিছুই বোঝানো গেলো না। অমরের গল্প অংশ অংশ করে উপভোগ, চলে না, তার টোটালিটি বুঝতে হয়। বুদ্ধির সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও হৃদয় মিশেছে ওঁর গল্পে। তাই প্রকৃতি প্রতিটি গল্পে জরুরী ভূমিকা নিয়েছে। মানুষের নিঃসঙ্গতা, বুক-ফাটা হা হাকার প্রকৃতি যেন জানিয়ে দেয় সঠিক ভাবে।

'দানপত্র', 'ডাইন' অসাধারণ অভিজ্ঞতার গল্প। আমাদের চোখের সামনে এক অপরিচিত জগৎ তুলে ধরে অমর মিত্রর গল্প। ওর ছোটোগল্প পড়া পাঠকের এক নান্দনিক অভিজ্ঞতাও বটে।

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

দানপত্র। অমর মিত্র। সংবাদ, ৫৭২ ডি কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা—৭৩

পিটার ব্রুকের মহাভারত

অমর গঙ্গোপাধ্যায়

প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, মূল সংস্কৃত 'মহাভারত' আমি আদৌ পড়িনি। আমার বিদ্যের দৌড় কালী সিংহ আর রাজশেখর বসুর বাংলা অনুবাদ পর্যন্ত। 'মহাভারত' সম্পর্কে কোন গবেষণা-মূলক মন্তব্য করার স্পর্ধা আমার নেই। ভাল করে জানিও না, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বহুবিধ মহাভারতের কোথায় কোনটিকে প্রকৃত গ্রন্থ বা আদি গ্রন্থ বলে গ্রহণ করা যায়। অথচ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে অনুসন্ধান করে জেনেছি, একমাত্র ভারতভূমিতেই প্রায় আঠারো রকমের 'মহাভারত' পাওয়া সম্ভব। বহির্ভারতে নিকটস্থ দ্বীপগুলির কথা বাদই দিলাম। যোগেশচন্দ্র বাগলের তিথি-বিচার অনুসারে 'মহাভারতের' রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলেও একটি ক্ষুদ্র কাহিনী (জয়কাব্য ?) লোকশ্রুতির মাধ্যমে কোন সামাজিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশ পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং বিশাল মহাকাব্যে রূপান্তরিত হয়েছে—সে সম্পর্কে আধুনিক গবেষণার কাজ চলছে। এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গবেষকবৃন্দ ঐকমত আসতে পারেননি।

ছোটবেলা থেকে নানাভাবে শোনা একটি ইতিহ্যমণ্ডিত কাহিনীর লোকায়ত আবেগকে সম্বল করে, প্রচুর দ্বিধা নিয়ে পিটার ব্রুকের 'মহাভারত' দেখতে গেছি। সার্থক ভাবে শুরু করেছিলেন পিটার ব্রুক। ষ্টুডিওর প্রেক্ষাপটে (চান্দ্রবংশের উত্তরপুরুষ) একটি বালক বিভিন্ন দৃশ্যের টুকরোটাকরা টপকে একেবারে ব্যাসদেবের কাছে হাজির। ঋষিকল্প ব্যাসদেব তখন নিজের ভাবনায় বিভোর। বালকটিকে দেখে তারই পূর্বপুরুষদের কীর্তিকাহিনী লিপিবদ্ধ করার বাসনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু এমন বিরাট-বিশাল কাহিনী তাঁর পক্ষে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। এলেন গণেশ। শুরু হল লেখার পালা। নিমেষে মহাভারতের চান্দ্রবংশের আদিকাহিনী অতি সংক্ষেপে বলে গেলেন ব্যাস।

মাঝখানে গণেশের উক্তি 'চমৎকার সূচনা'। মনে হল, সত্যিই চমৎকার। চিত্ররূপায়ণে এমন সাবলীল ভাবে কাহিনীকে ছোট করে নেওয়াটি অসাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর।

দেখতে দেখতে ছোটখাট হোঁচোট খেয়েছি। কিন্তু স্বয়ং ভীষ্মকে যখন দেখলাম প্রায় লিকলিকে এক কালোমানুষের চেহারায় তখন আঁতকে উঠলাম। চমক ভাঙলো মুহূর্তে। মনে পড়ে গেল পিটার ব্রুকের বক্তব্য—আন্তর্জাতিক অভিনেতা-অভিনেত্রীর সমন্বয়ে আমরা একটি আন্তর্জাতিক মহাকাব্যের আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চেয়েছি।—অনায়াসে নিজেকে পাল্টে নিলাম। নিছক ভারতীয় আবেগ দিয়ে এমন চিত্ররূপ দেখা চলে না। নিজেকেই বিদেশী বানিয়ে নিলাম। 'টেন কমেণ্ড্‌মেণ্টস' বা 'দি বাইবেল' দেখতে গিয়ে তো আমরা কখনো মূলের সঙ্গে মিলিয়ে 'ছবি' দেখি না। তাহলে বাধাটা কোথায়? অপরূপ রবীন্দ্র-সঙ্গীত দিয়ে যার সূচনা, স্তোত্রপাঠের মাধুর্য এবং শুদ্ধতা যে ছবিকে ভাষা ছাড়িয়ে বিশ্বজনীন করে তুলতে চেয়েছে, জাপানী সুরকার তোসি সুচিচোরি শুধু একটা চলচ্চিত্রে সুর দেওয়ার জন্য এতটা যত্ন নিয়েছেন, যা ভাবতেও অবাক লাগে। চিত্রায়ণের আন্তর্জাতিকতা রক্ষার ধ্রুবলক্ষ্যটি তিনি কঠিন প্রযত্নে আফ্রিকা, এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিন্যাসে ধরতে পেরেছেন। খটকা লাগে মঞ্চ বা দৃশ্য এবং পোষাক-পরিকল্পনায়। গ্রীসের মহিলা শিল্পী ওর্‌লেনস্কির অতি-সরলীকৃত বিচিত্র আন্তর্জাতিক পোষাক আর দৃশ্য পরিকল্পনায়। স্বয়ং দ্রোণাচার্যকে যখন প্রায় ওভারকোটে ঢাকা অবস্থায় জাপানী অভিবাদন ও যুযুৎসু শিক্ষাদানে রত দেখি তখন 'মহাভারত'-কে একেবারে হারিয়ে ফেলি। হাস্যকর মঞ্চদৃশ্যের সিঁড়ি বেয়ে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ একেবারে অসহ্য। কুকুররূপী ধর্ম দিশি না বিলিতি—এমন প্রশ্ন না ভুলেও স্বর্গ ও নরকের দৃশ্য মর্ত্যভূমিকে কোনক্রমেই অতিক্রম করতে পারেনি। বারংবার ভারতে এসে বহু ভাবে মহাভারতকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করেও পিটার ব্রুক স্বর্গ ও নরকের দার্শনিক চেতনার মৌলিক পার্থক্য বুঝতেই পারেন নি—এটা ভাবতেও কষ্ট হয়। "ভারতীয় রীতিকে শ্রদ্ধা জানিয়েই হুবহু তাকে অনুসরণ না-করেও প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ওপরে গিয়েই আমরা 'মহাভারত' নাটক (প্রথমে এক বিশাল নাটক হিসেবেই দীর্ঘকাল সঞ্চস্থ হয়েছে মহাভারত। পরে চিত্ররূপ।) উপস্থিত করতে চেয়েছি।" উক্ত বিবৃতি পিটার ব্রুকের। প্রকৃত গণ্ডগোলের সূত্রপাত সম্ভবত ওইখানেই। মঞ্চ আঙ্গিক ও চিত্রায়ণ-শৈলী কখনো এক রকম হতে পারে না। পিটার ব্রুকের বিশাল কর্মকাণ্ডের

প্রেক্ষাপটে তাঁকে জ্ঞানদানের চেষ্টা হয়তো আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হয়ে যাবে। তবু চলচ্চিত্রে ওব্‌লেনস্কিকে নিতান্ত অবিশ্বাস্য অঙ্গসজ্জা ও দৃশ্যসম্ভারের জন্য দায়ী করার আগে ভাবা দরকার, আঠারো বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁরা কি করতে চেয়েছিলেন। মূলত এটি নাটক। ওব্‌লেনস্কি নাটমঞ্চের উপকরণ রচয়িতা হিসেবেই সব কিছু পরিকল্পনা করেছেন। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া মঞ্চপরিকল্পনাই চলচ্চিত্রের কাঠামোয় ঢুকে পড়েছে।

নাটক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, সুইজারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং জাপান পরিক্রমা করে পিটার ব্রুক জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে অনুভব করলেন—"দীর্ঘভ্রমণে ক্লান্ত শিল্পীবৃন্দ আর তরতাজা ভাবটি ধরে রাখতে পারছেন না। তখনই নাটকটিকে চলচ্চিত্রে নতুন ভাবে ধরার চিন্তা মাথায় এল। খুব ভাল কথা। চিত্রনাট্য নির্মানে এগিয়ে এলেন ফ্রান্সের প্রখ্যাত জঁা ক্লদ ক্যারিয়ার। অনেক কাজ অবহেলা করে নিষ্ঠা সহকারে তিনি ভারতীয় মহাকাব্য মহাভারতের চিত্রনাট্য রচনায় ব্রতী হলেন। মূল সমস্যা কিন্তু রয়েই গেল। নাটক থেকে চিত্রনাট্য রচনায় নাটকীয় বিন্যাসকে অতিক্রম করা গেল না। ফলস্বরূপ ওব্‌লেনস্কি কিংবা জঁা ক্লদ নাটকের চিত্ররূপ দিলেন। দৃশ্য বৈচিত্র্য গুরুত্ব হারালো। চলচ্চিত্রের দ্রুতগতি শ্লথ হল। সমন্বয় ঘটলো নাটকও চলচ্চিত্রের। টেলিফিল্ম হিসেবে ক্লোজ-আপ আর মিড-শটের ছড়াছড়ি। তিনটি মাধ্যমকে মঞ্চের অভিনেতাদের দিয়েই অভিনয় করাতে গিয়ে বাচনেও নাটকীয়তাকে প্রশ্রয় দিতে হোল। পিটার ব্রুক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন "ফার্ষ্ট স্যুট দেন টক"। উক্তিটির তাৎপর্য আদৌ বুঝতে পারিনি। কাউ-বয়-মার্কা এমন সস্তা বক্তব্য দিয়ে 'মহাভারতের' নাট্য বা চলচ্চিত্র রূপায়ণকে ধরা যায় না। কোন কোন দর্শক শুধু এই কারণেই ব্রুক সাহেবের লক্ষ্যভেদী দৃষ্টিশক্তিকে (যার মধ্যে একটি সম্মোহন আছে) আমল দেননি।

সরকার চড়া দামে চলচ্চিত্রটির ভারতীয়স্বত্ব কিনবেন স্থির করেছেন। প্রশ্ন উঠতেই পারে—'আন্তর্জাতিক' এই 'মহাভারত' ভারতীয় দর্শকদের কি নতুন কিছু দিয়েছে? দুঃশাসনের রক্তপানে ভীমের নারকীয় ভঙ্গি কোনো কোনো দর্শককে বিচলিত করেছে। ভীষ্মের শরশয্যার দৃশ্য নাটকে অবশ্যই দর্শনীয়। কিন্তু চলচ্চিত্র নিতান্তই হাস্যকর। উর্বশীর রূপ-মাধুর্যের অনুপস্থিতি হতবাক করে দেয়। চক্রব্যূহের দৃশ্য তুলনায় নয়নাভিরাম হয়েও 'মহাভারত কে রোমান করে তোলে। যুদ্ধদৃশ্য একেবারে উত্তেজনাহীন।

বিদুর নামে কোন চরিত্রই নেই। সঞ্জয়ের স্থানে ব্যাসদেব। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সাদা চামড়া এবং চরিত্র হিসেবে নিছক পাণ্ডবদের উপদেষ্টা। প্রশ্ন আছে হাজারো রকম। কিন্তু গোড়ার প্রশ্নটা তো গোড়াতেই সমাধান করা দরকার।

সত্যজিৎ রায় মহাশয় 'মহাভারত' তুলবেন ভেবেছিলেন। তিনি কি ভাবে গড়তেন সেটা জানা গেল না। বি, আর, চোপড়া টি, ভি, সিরিয়ালে হলিউড ঢংয়ে লোকায়ত 'মহাভারত' দেখিয়ে চলেছেন। মহাকালের ব্যাখ্যা-সহ কম-বেশী সেটা ভালই লাগছে। কিন্তু সে ব্যাখ্যা তো সমকালীন চিন্তা সমৃদ্ধ। পিটার ব্রুক কিন্তু আদিম ভারতীয় মহাকাব্যকে বিভিন্ন দেশের আদিমতা দিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ দিতে চেয়েছেন। স্বীকার করছি, চলচ্চিত্রের ভাষাগত মাত্রা এখানে অনুপস্থিত। তবুও ক্ষেত্র বিশেষে চিত্রভাষাকে তিনি বাঙ্ময় করে তুলেছেন। সাড়ে আট ঘণ্টার চিত্ররূপকে ভারতীয় দর্শকদের জন্য সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় আনতে গিয়ে চিত্র সম্পাদককে কি নিদারুণ পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং কোন কোন অংশ বাদ যাওয়াতে কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে—সেটা জানাও তো সম্ভব নয়। মহাবীর কর্ণ ও অর্জুনকে শুধু রথ দিয়ে বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে কেন মাচায় বয়ে রণক্ষেত্রে আনা হোল সেটাও দুর্বোধ্য। পরিশেষে যুধিষ্ঠির কোন যুক্তিতে পাঁচ ভাইকে নরক থেকে উদ্ধার না-করে নরকেই বসে রইলেন তার কোন ব্যাখ্যাই নেই।

এবার পিটার ব্রুকের দৃষ্টিকোন থেকে মহাভারতের (রোমান ক্যাথলিক) ভাষ্যটি অনুধাবন করা দরকার। [প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য : জাঁ ক্লদ ক্যারিয়ার আলোচনা সূত্রে স্বীকার করেছেন, এন, সি, পি, এ-এর প্রায় সকল সদস্যই রোমান ক্যাথলিক।] পিটার ব্রুক মহাভারতকে দেখেছেন পৃথিবীর আদিমতম মহাকাব্যের কাহিনীসূত্রে। মহাকাব্যে রূপান্তরিত হবার অনেক, অনেক বছর যার ক্ষরণায়িত রূপ যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে সীমাবদ্ধ। তাঁর মতে মহাভারত একমাত্র মহাকাব্য যার মধ্য থেকে মানবচিন্তার চিরন্তন প্রশ্নটিকে ছেঁকে নিলে, সেটা হবে সর্বজনীন। পাশাখেলা, যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্ন, সমাধান অথবা প্রবহমানতার উত্তর নিটোল কাহিনী হিসেবে মহাভারতে নিহিত আছে। তথাকথিত চিত্রভাষাকে আমল না-দিয়ে তিনি সটান কাহিনীর মূল বিষয়টুকু ধরতে চেয়েছেন।

এমন ভাষ্য হয়তো নিছক 'সহজিয়া'। কিন্তু মরমিয়া পরশ তো থেকেই যায়। এদিক থেকে ব্রুকের 'মহাভারত' সুস্পষ্ট উত্তরে ভারতীয় চেতনার তন্নিষ্ঠ রূপায়ণ বলেই মনে হয়েছে। যা বাদ গেছে, তার অনেকটাই পরবর্তী-

কালে পল্লবিত।—শান্তি যে কোন মূল্যে সর্বদাই কাম্য। যুদ্ধ যে কোন উপায়ে পরিত্যাজ্য। তবে যুদ্ধ নিতান্তই অপরিহার্য হলে ন্যায়যুদ্ধই করা উচিত—এই বক্তব্যে পিটার ব্রুকের 'মহাভারত' আমাদেরই কথা॥ বিচিত্র এক প্রশ্ন বক্তের মুখে বসানো হয়েছে,—'পরাজয়' কি? যুধিষ্ঠিরের উত্তর—'জয়'। অতি সামান্য এই উত্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্তী কান্নাকে নতুন দিগন্তে প্রসারিত করে। উত্তরায়ণের অপেক্ষায় মৃত্যুকামী ভীষ্ম বলেন—'ধ্বংস তো অনিবার্য। তবে তাকে বিলম্বিত করা যায় শান্তি ও সদ্ভাব বজায় রাখলে।' এই বক্তব্যের সময় ভীষ্মের চোখে যে প্রজ্ঞা ও প্রসন্ন-বিষণ্ণতা বিমূর্ত হয়েছে—সেটা তো ভারতীয় ঋষিচৈতন্যের প্রতীক॥

রবীন্দ্রনাথের 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' থেকে কর্ণের কাছে কুন্তীর মাতৃ পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে। কিন্তু কর্ণের সংলাপ এই প্রসঙ্গে বিস্ময়কর উত্তরণে সমুজ্জ্বল। কর্ণের এই উক্তি: রাত্রি এলেই আমি নিদারুণ শীতলতা (শিথিলতা?) অনুভব করি। আবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আমার তেজ (সজীবতা? বীরত্ব?) ফিরে আসে। এমন প্রাজ্ঞ ব্যাখ্যা পিটার ব্রুক কোথায় পেলেন জানি না। মহাজীবনের আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে পৃথিবীর সকল মানুষই তো রাত্রে কিছুটা নির্জীব, প্রভাতে প্রাণবন্ত। সূর্যসন্তান কর্ণকে দিয়ে এমন ধ্রুব সত্যকে অবলীলায় বলিয়ে পিটার ব্রুক কি ভারতীয় সূর্যস্তোত্রের বৈজ্ঞানিক চেতনাকে কোনো মহিমায় উত্তীর্ণ করেন নি?

সকলের পড়ার মত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বই

উপন্যাস

নবাব বাঁদী ঃ অসীম রায় ২৪'০০
ওরা কাজ করে ঃ সৌরী ঘটক ২০'০০
যযাতির মহাপ্রস্থান ঃ চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৪'০০
নবাঙ্কুর ঃ সুলেখা সান্যাল ২৪'০০
আকাশ কত দূর ঃ অনিরুদ্ধ সেন ৩০'০০

গল্প

শ্রেষ্ঠ গল্প ঃ ধর্মদাস মুখোপাধ্যায় ২১'০০
ছায়া-অরণ্য ঃ ছবি বসু ২২'০০
বন্ধনকাল ঃ জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ১২'০০

রচনাবলী

সোমনাথ লাহিড়ী রচনাবলী
দিলীপ বসু রচনা সংকলন ৪০'০০

প্রবন্ধ

সংস্কৃতির বিশ্বরূপ ঃ গোপাল হালদার ১৫'০০
বেদগানের প্রাকৃতরূপ ঃ রাজ্যেশ্বর মিত্র ২০'০০
মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোক সংস্কৃতি ঃ
সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার ১২'০০
ভারত, রবীন্দ্রনাথ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ঃ
একটি সার্থক স্বপ্ন ঃ এ পি. দানিলচুক ৪৫'০০
আদর্শগত সংগ্রাম ও সাহিত্য ঃ
এলবার্ট বেলিয়ায়েভ ২০'০০

মনীষা গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

৪/৩বি, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলি-৭৩

15 JAN 1990
CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০'৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দাম : তিন টাকা